শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ

ভগবদ্গীতার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও প্রামাণিক সংস্করণ

ভারতীয় পারমার্থিক বিজ্ঞানের মুকুটমণি-স্বরূপ এই *ভগবদ্গীতা* সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে খ্যাতি লাভ করেছে। আত্ম-উপলব্ধির পথপ্রদর্শক এই *গীতার* সাতশো শ্লোক পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্ত অর্জুনকে উপদেশ করেছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে, মানুষের অপরিহার্য প্রকৃতি, তার পরিবেশ এবং সর্বোপরি ভগবানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আদি রহস্যোদ্ঘাটনে এই গ্রন্থটি অতুলনীয়।

বৈদিক জ্ঞানের বিদগ্ধ পণ্ডিত ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে আগত গুরু-পরম্পরা ধারায় অবস্থিত তত্ত্বদর্শী সদ্গুরু। তিনি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ কোন রকম বিকৃতি না করে যথাযথভাবে পরিবেশন করেছেন, যা *গীতার* অন্যান্য সংস্করণ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ষোলটি রঙিন চিত্র সমন্বিত এই নতুন সংস্করণটি সময়োপযোগী শিক্ষা দান করে নিঃসন্দেহে যে-কোন পাঠককে উদ্দীপ্ত ও আলোকপাত করবে।

হেনরি ডেভিড থোরিউ

"প্রভাতে আমি আমার বুদ্ধিমত্তাকে বিস্ময়কর সৃষ্টিতত্ত্ব সমন্বিত *ভগবদ্গীতার* দর্শনরূপ জলে অবগাহন করাই। এই *গীতার* তুলনায় আমাদের আধুনিক জগৎ ও তার সাহিত্য অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য বলে প্রতিভাত হয়।"

রাল্ফ ওয়ালডো এমার্সন

"আমি *ভগবদ্গীতার* কাছে একটি চমৎকার দিনের জন্য ঋণী। এই গ্রন্থটি এই প্রথম পেলাম; একটি সাম্রাজ্য যেন আমাদের কাছে ব্যক্ত করছে, কোন কিছুই ক্ষুদ্র বা মূল্যহীন নয়। কিন্তু বৃহৎ, অচঞ্চল সঙ্গতিপূর্ণ এক প্রাচীন বুদ্ধির কণ্ঠস্বর, যা অন্য যুগে ও আবহাওয়ায় ভাবিত হয়েছিল এবং সেই প্রশ্নের বিন্যাস ঘটিয়েছিল, যা আমাদের উপর ব্যবহৃত হয়।"

"যখন সন্দেহ আমাকে ঘিরে ধরে, হতাশা সম্মুখে উপস্থিত হয় আর আমি দূরান্তে কোন আশার আলোক দেখতে পাই না, তখন *ভগবদ্গীতা* আশ্রয় করে শান্তি পাওয়ার মতো কোন শ্লোক খুঁজে পাই। সঙ্গে সঙ্গে আমি অত্যন্ত দুঃখের মধ্যে হাসতে আরম্ভ করি। যাঁরা *গীতার* ওপর ধ্যান করবেন, তাঁরা প্রতিদিন পরম আনন্দ ও নব নব অর্থ পাবেন।"

— মহাত্মা গান্ধী
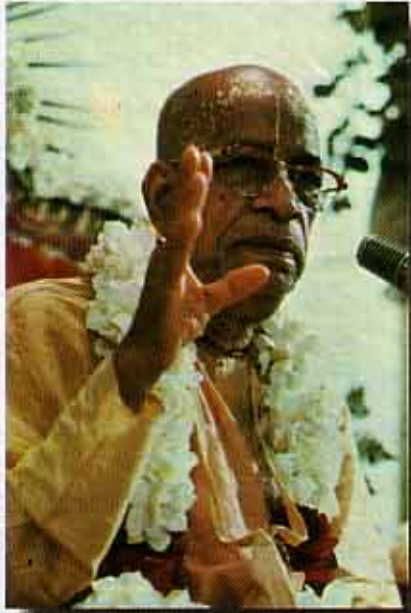
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ
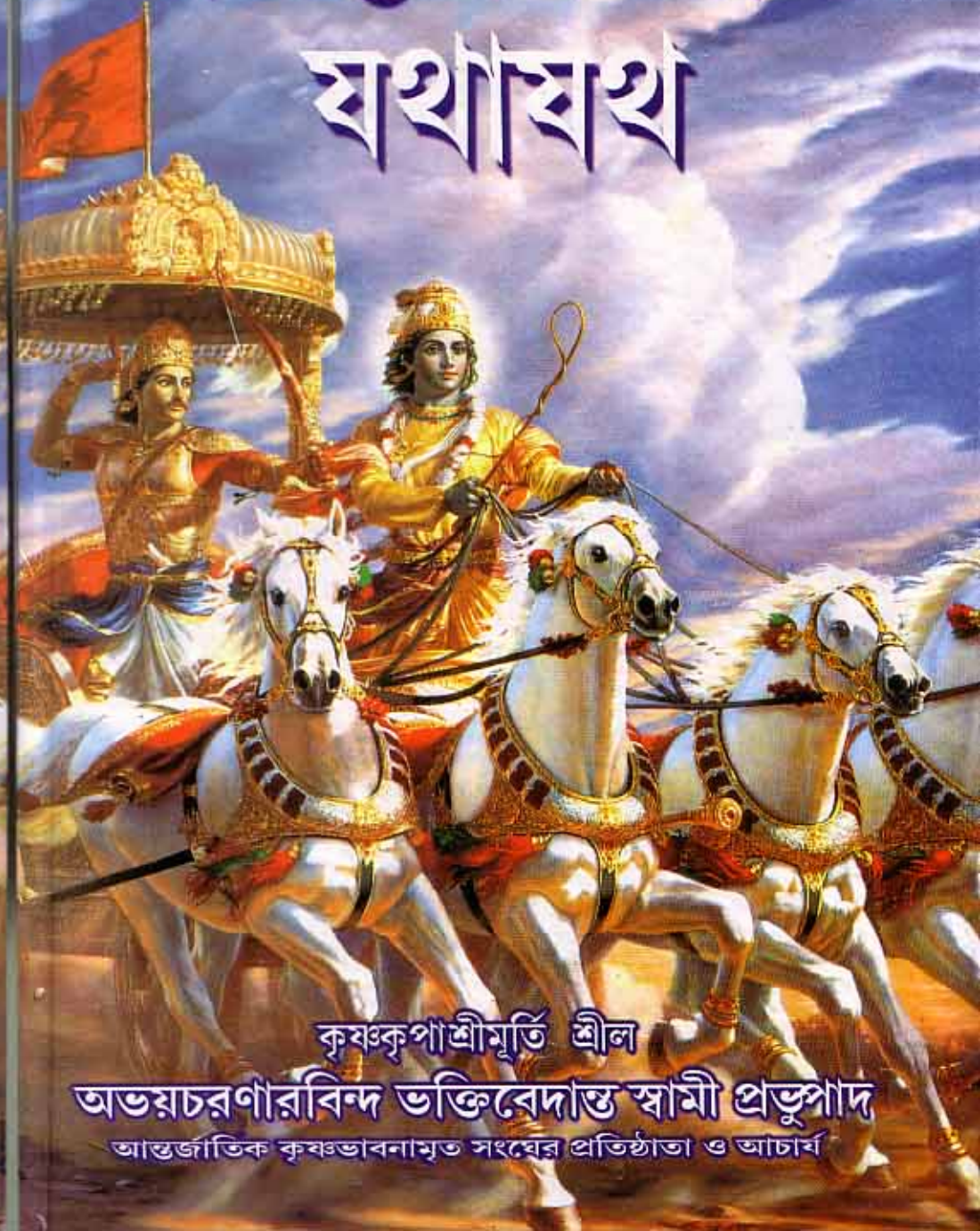
কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল
অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গীতোপনিষদ্

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

(ভগবদ্গীতা ১৮/৬৬)

Bhagavad-Gita As It Is (Bengali)

প্রকাশক ঃ
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে
শ্যামরূপ দাস ব্রহ্মচারী

সংশোধিত ও পরিবর্ধিত প্রথম সংস্করণ	ঃ	১০,০০০ কপি,	২০০০
দ্বিতীয় সংস্করণ	ঃ	৫,০০০ কপি,	২০০১
তৃতীয় সংস্করণ	ঃ	১০,০০০ কপি,	২০০১
চতুর্থ সংস্করণ	ঃ	৫,০০০ কপি,	২০০২
পঞ্চম সংস্করণ	ঃ	৫,০০০ কপি,	২০০৩
ষষ্ঠ সংস্করণ	ঃ	৫,০০০ কপি,	২০০৪
সপ্তম সংস্করণ	ঃ	১০,০০০ কপি,	২০০৫
অষ্টম সংস্করণ	ঃ	১০,০০০ কপি,	২০০৬

মুদ্রণ ঃ
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট প্রেস
শ্রীমায়াপুর, ৭৪১৩১৩
নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ
☎ (০৩৪৭২) ২৪৫-২১৭, ২৪৫-২৪৫

গীতোপনিষদ্

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা যথাযথ

সংশোধিত ও পরিবর্ধিত প্রথম সংস্করণ

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল

অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য

কর্তৃক

মূল সংস্কৃত শ্লোকের শব্দার্থ, অনুবাদ ও বিশদ তাৎপর্য সহ
ইংরেজী ***Bhagavad-Gita As It Is***-এর বাংলা অনুবাদ

অনুবাদক ঃ শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
শ্রীমায়াপুর, কলকাতা, বোম্বাই, নিউ ইয়র্ক, লস্ এঞ্জেলেস, লন্ডন, সিডনি, প্যারিস, রোম, হংকং

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থাবলী ঃ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ
শ্রীমদ্ভাগবত (১ম-১২শ স্কন্ধ, ১৮ খণ্ড)
শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত (৪ খণ্ড)
গীতার গান
গীতার রহস্য
লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা
পঞ্চতত্ত্বরূপে ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু
শ্রীউপদেশামৃত
দেবহূতি নন্দন শ্রীকপিল শিক্ষামৃত
কুন্তীদেবীর শিক্ষা
কৃষ্ণভাবনামৃতের অনুপম উপহার
শ্রীঈশোপনিষদ
যোগসিদ্ধি
কৃষ্ণভাবনার অমৃত
আদর্শ প্রশ্ন আদর্শ উত্তর
আত্মজ্ঞান লাভের পন্থা
জীবন আসে জীবন থেকে
পুনরাগমন
অমৃতের সন্ধানে
ভগবানের কথা
ঈশ্বরের সন্ধানে
পাশ্চাত্য দেশে কৃষ্ণনামের প্রচার
কৃষ্ণ বড় দয়াময়
পরম পিতা
শ্রীকৃষ্ণের সন্ধানে
বুদ্ধিযোগ
কৃষ্ণভক্তি সর্বোত্তম বিজ্ঞান
কৃষ্ণভক্তি প্রচারই প্রকৃত পরোপকার
হরেকৃষ্ণ চ্যালেঞ্জ
পরলোকে সুগম যাত্রা
প্রকৃতির নিয়ম ঃ যেমন কর্ম তেমন ফল
জীবন জিজ্ঞাসা
বৈষ্ণব কে?
বৈষ্ণব শ্লোকাবলী
ভক্তিগীতি সঞ্চয়ন
পঞ্চরাত্র প্রদীপ (শ্রীবিগ্রহ অর্চন পদ্ধতি)
শ্রীল প্রভুপাদ
ভক্তিবেদান্ত স্তোত্রাবলী
প্রশ্ন করুন উত্তর পাবেন
শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদে পরম শান্তি (রঙীন)
পরম সুস্বাদু কৃষ্ণপ্রসাদ
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মাহাত্ম্য
শ্রীএকাদশী মাহাত্ম্য
শ্রীমায়াপুর দর্শন
গৃহে বসে কৃষ্ণভজন
যুগধর্ম
ভক্তবৎসল ভগবান
মায়াপুরে শ্রীশ্রীরাধামাধব
ভক্তবৎসল শ্রীনৃসিংহদেব
মহাজন উপদেশ
ধ্রুব চরিত
শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্ব মহিমা
জগতে আমরা কোথায়?
শ্রীবৃন্দাবন দর্শন
ভগবৎ-দর্শন (মাসিক পত্রিকা)
হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন সমাচার (পাক্ষিক পত্রিকা)

বিশেষ অনুসন্ধানের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ঃ

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন
শ্রীমায়াপুর, ৭৪১৩১৩
নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
১০ গুরুসদয় রোড
অজন্তা অ্যাপার্টমেন্ট, দোতলা
ফ্ল্যাট-১বি, কলকাতা—৭০০০১৯

সমর্পণ

বেদান্ত দর্শনের
তত্ত্ব-প্রকাশক
'গোবিন্দ-ভাষ্যের'
প্রণেতা বৈষ্ণবাচার্য
শ্রীল বলদেব
বিদ্যাভূষণের
করকমলে

সূচীপত্র

নিতান্তই অনিত্য জড়-জাগতিক ফল উৎপন্ন করে। পক্ষান্তরে, শাস্ত্রীয় অনুশাসন আদি মতে অনুষ্ঠিত সত্ত্বগুণময় কার্যাবলী হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করে এবং পরিণামে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ ভক্তি-শ্রদ্ধার পথে মানুষকে পরিচালিত করে ভক্তিভাবে জাগ্রত করে তোলে।

গ্রন্থকারের পরিচিতি

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ আবির্ভূত হন ১৮৯৬ সালে কলকাতায়। তাঁর সঙ্গে তাঁর গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রথম মিলন হয় কলকাতায় ১৯২২ সালে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ছিলেন তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত এবং সর্বাগ্রগণ্য ভগবদ্ভক্ত। তিনি গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সমস্ত ভারত জুড়ে ৬৪টি মন্দির স্থাপন করেন। এই শিক্ষিত যুবক অভয়চরণকে তাঁর খুব ভাল লাগে এবং বৈদিক জ্ঞান শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে নিজেকে উৎসর্গ করতে তিনি তাঁকে অনুপ্রাণিত করেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করেন এবং ১১ বছর পরে ১৯৩৩ সালে এলাহাবাদে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

১৯২২ সালে যখন তাঁদের প্রথম মিলন হয়, তখন শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল প্রভুপাদকে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে বৈদিক জ্ঞান প্রচার করতে অনুরোধ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ গৌড়ীয় মঠের কার্যে সাহায্য করতে থাকেন এবং বৈদিক শাস্ত্রগ্রন্থের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* ভাষ্য রচনা করেন। ১৯৪৪ সালে এককভাবে তিনি Back to Godhead নামক একটি ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। তিনি নিজেই পাণ্ডুলিপিগুলি টাইপ করতেন, সম্পাদনা করতেন, প্রুফ দেখতেন, সেই পত্রিকাগুলি বিতরণ করতেন এবং সেই প্রকাশনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য সংগ্রাম করতেন। একবার শুরু হওয়ার পর, সেই পত্রিকা আর বন্ধ হয়নি; এখনও পর্যন্ত সেই পত্রিকাটি ৩০টি ভাষায় তাঁর পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য শিষ্যদের দ্বারা প্রকাশিত হচ্ছে।

শ্রীল প্রভুপাদের দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞান ও ভক্তির স্বীকৃতি হিসাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ ১৯৪৭ সালে তাঁকে 'ভক্তিবেদান্ত' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৫০ সালে ৫৪ বছর বয়সে শ্রীল প্রভুপাদ সংসার-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তার ৪ বছর পরে অধ্যয়ন ও রচনার কাজে আরও গভীরভাবে মনোনিবেশ করবার জন্য তিনি বানপ্রস্থ-আশ্রম গ্রহণ করেন এবং তার কিছুদিন পরে তিনি বৃন্দাবন ধামে গমন করেন। সেখানে প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরের একটি ঘরে তিনি কয়েক বছর ধরে অধ্যয়ন ও গ্রন্থরচনার কাজে গভীরভাবে মগ্ন ছিলেন। ১৯৫৯ সালে তিনি সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরে শ্রীল

প্রভুপাদ তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অবদান—আঠারো হাজার শ্লোক সমন্বিত সমস্ত বৈদিক সাহিত্যের সার *শ্রীমদ্ভাগবতের* ইংরেজী অনুবাদ ও ভাষ্য রচনার কাজ শুরু করেন। তিনি সেখানে Easy Journey to the Other Planets নামক গ্রন্থটিও রচনা করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পর, শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর গুরুমহারাজের ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য ১৯৬৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। তারপর শ্রীল প্রভুপাদ ভারতীয় দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের সার সমন্বিত শাস্ত্রগ্রন্থের প্রামাণিক অনুবাদ, ভাষ্য ও মূল ভাব সহ ৮০টি গ্রন্থ রচনা করেন।

একটি মালবাহী জাহাজে করে যখন তিনি প্রথম নিউ ইয়র্ক শহরে আসেন, তখন শ্রীল প্রভুপাদ সম্পূর্ণ কপর্দকশূন্য। কিন্তু প্রায় এক বছর কঠোর সংগ্রাম করার পর, তিনি ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে 'আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৭ সালের নভেম্বর মাসে তাঁর অপ্রকট লীলাবিলাস করা পর্যন্ত তিনি নিজেই এই সংস্থাটির পরিচালনা করেন এবং একশটিরও অধিক মন্দির, আশ্রম, স্কুল ও ফার্ম কমিউনিটি সমন্বিত একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে যান।

১৯৬৮ সালে শ্রীল প্রভুপাদ আমেরিকার ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে নব বৃন্দাবন নামক একটি পরীক্ষামূলক বৈদিক সমাজ গড়ে তোলেন। প্রায় ২০০০ একর জমির ওপর এই নব বৃন্দাবনের সাফল্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, তাঁর শিষ্যরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য অনেক দেশে এই রকম আরও কয়েকটি সমাজ গড়ে তুলেছে।

এ ছাড়া ১৯৭২ সালে শ্রীল প্রভুপাদ ডালাস ও টেক্সাসে গুরুকুল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে পাশ্চাত্য জগৎকে বৈদিক প্রথা অনুযায়ী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা দান করে গেছেন। তারপর, তাঁর তত্ত্বাবধানে তাঁর শিষ্যরা ভারতবর্ষে শ্রীধাম বৃন্দাবনে স্থাপিত প্রধান শিক্ষাকেন্দ্রের আদর্শ অনুসরণে আমেরিকা ও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে শিশুদের বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন।

১৯৭৫ সালে বৃন্দাবনে শ্রীল প্রভুপাদের অপূর্ব সুন্দর 'কৃষ্ণ-বলরাম মন্দির' এবং আন্তর্জাতিক অতিথিশালার উদ্বোধন হয়। তা ছাড়া সেখানে শ্রীল প্রভুপাদের কারুকার্য-খচিত স্মৃতিসৌধ ও মিউজিয়াম বিরাজ করছে। ১৯৭৮ সালে জুহুতে বোম্বাইয়ের সমুদ্র উপকূলে চার একর জমির ওপর অপূর্ব শ্রীশ্রীরাধা-রাসবিহারীর মন্দির, আধুনিক প্রেক্ষাগৃহ, অপূর্ব সুন্দর অতিথিশালা ও নিরামিষ ভোজনশালা সমন্বিত একটি বিশাল সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীল প্রভুপাদের সব চাইতে

উচ্চাভিলাষপূর্ণ পরিকল্পনা হচ্ছে পশ্চিমবাংলার মায়াপুরে ৫০ হাজার কৃষ্ণভক্তদের নিয়ে বৈদিক শহর গড়ে তোলার পরিকল্পনা, যা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতিসম্পন্ন বৈদিক জীবনধারার দৃষ্টান্তরূপে সমস্ত পৃথিবীর কাছে আদর্শরূপে প্রতীয়মান হবে।

শ্রীল প্রভুপাদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে তাঁর গ্রন্থসম্ভার। বিদ্বৎ-সমাজ দিব্যজ্ঞান সমন্বিত এই গ্রন্থগুলির প্রামাণিকতা, গভীরতা ও প্রাঞ্জলতা এক বাক্যে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন এবং এই সমস্ত গ্রন্থগুলিকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রভুপাদের লেখা বইগুলি প্রায় ৫০টিরও বেশি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, যা প্রভুপাদের গ্রন্থগুলি প্রকাশ করবার জন্য ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা আজ ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন সংক্রান্ত বৃহত্তম গ্রন্থ-প্রকাশক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এই ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট এখন ৯টি খণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদের ইংরেজী অনুবাদ ও ভাষ্য সমন্বিত বাংলা শাস্ত্রীয়গ্রন্থ *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* প্রকাশ করেছে, যা শ্রীল প্রভুপাদ কেবল ১৮ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ করেছিলেন।

কেবলমাত্র ১২ বছরের মধ্যে, এত বয়েস হওয়া সত্ত্বেও, শ্রীল প্রভুপাদ ছয়টি মহাদেশেরই বিভিন্ন স্থানে ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত ভাষণ দেওয়ার জন্য ১৪ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছেন। এই রকম কঠোর কর্মসূচি থাকা সত্ত্বেও শ্রীল প্রভুপাদ প্রবলভাবে তাঁর লেখার কাজ চালিয়ে যান। তাঁর গ্রন্থসমূহ হচ্ছে বৈদিক দর্শন, ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটি প্রামাণ্য গ্রন্থাগার।

১৯৭৭ সালের ১৪ই নভেম্বর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম বৃন্দাবনে তাঁর অপ্রকট লীলাবিলাস করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী—"*পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম*"—সার্থক করার জন্য তিনি এখানে এসেছিলেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করে সমস্ত জগৎকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করার অমৃতময় পথ প্রদর্শন করে গেছেন। পৃথিবীর মানুষ যে দিন বৈষয়িক জীবনের নিরর্থকতা উপলব্ধি করতে পেরে পারমার্থিক জীবনে ব্রতী হবেন, সেই দিন তাঁরা সর্বান্তঃকরণে শ্রীল প্রভুপাদের অবদান উপলব্ধি করতে পারবেন এবং শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তাঁর চরণারবিন্দে প্রণতি জানাবেন। ১৯৭৭ সালে শ্রীধাম বৃন্দাবনে তিনি অপ্রকট হয়েছেন, কিন্তু আজও তিনি তাঁর অমৃতময় গ্রন্থের মধ্যে, ভগবানের বাণীর মধ্যে মূর্ত হয়ে আছেন। তাঁর শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে যাঁরা ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার প্রয়াসী, তাঁদের পথ দেখাবার জন্য তিনি চিরকাল তাঁদের হৃদয়ে বিরাজ করবেন।

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

শ্রীপঞ্চতত্ত্ব
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥

ব্যাসদেবের আশীর্বাদে সঞ্জয় দিব্যচক্ষু প্রাপ্ত হন, ফলে তিনি ঘরে বসেও কুরুক্ষেত্রের সমস্ত ঘটনা দেখতে পাচ্ছিলেন। তাই ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। (অধ্যায় ১, শ্লোক ১)

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রাক্কালে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন যথাক্রমে 'পাঞ্চজন্য' ও 'দেবদত্ত' নামক দিব্য শঙ্খ বাজালেন। (অধ্যায় ১, শ্লোক ১৫)

জীবের প্রকৃত স্বরূপ হচ্ছে আত্মা এবং তার জড় দেহটি প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে। তার ফলে সে কখনও শিশু, কখনও কিশোর, কখনও যুবক এবং কখনও বৃদ্ধ—এভাবেই সে নানা রূপ ধারণ করছে। দেহ অকেজো হয়ে গেলে, সেই দেহ ত্যাগ করে আত্মা অন্য দেহ গ্রহণ করে। কিন্তু আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না। (অধ্যায় ২, শ্লোক ১৩)

প্রতিটি জীবের হৃদয়ে আত্মা ও পরমাত্মা অবস্থান করছেন। জড় দেহটিকে বৃক্ষের সঙ্গে এবং আত্মা ও পরমাত্মাকে দুটি পক্ষীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আত্মারূপ পক্ষীটি পাপ-পুণ্যের ফলের প্রতি আসক্ত হয়ে জড় দেহে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। তাই, তাকে মুক্ত করতে সাহায্য করবার জন্য পরমাত্মারূপ পক্ষীটি তার পাশে অবস্থান করছেন।
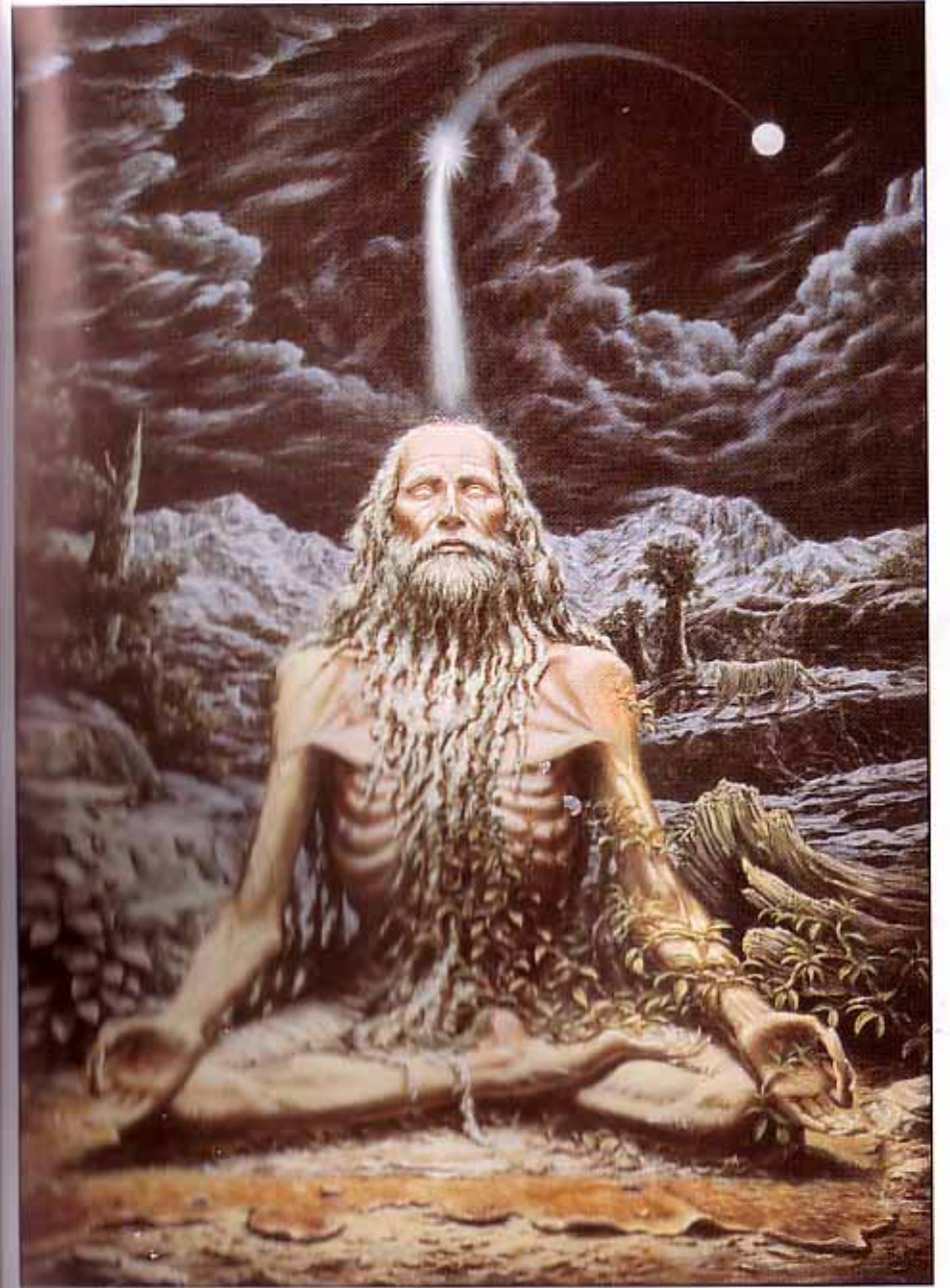
যোগী প্রাণায়ামের সাহায্যে ষট্‌চক্রের মাধ্যমে প্রাণবায়ুকে আজ্ঞাচক্রে উত্তোলন করতে পারেন। তারপর ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে তিনি জড় জগতের যে-কোন গ্রহলোকে যেতে পারেন, অথবা চিন্ময় জগতে ফিরে যেতে পারেন।

অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা কামনা চরিতার্থ করার জন্য দেবতাদের শরণাপন্ন হয়ে ক্ষণস্থায়ী জড় সুখ কামনা করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবানের অনুমতি ছাড়া দেব-দেবীরা তাঁদের ভক্তদের কোন ইচ্ছা পূরণ করতে পারেন না। (অধ্যায় ৭, শ্লোক ২০, ২২)
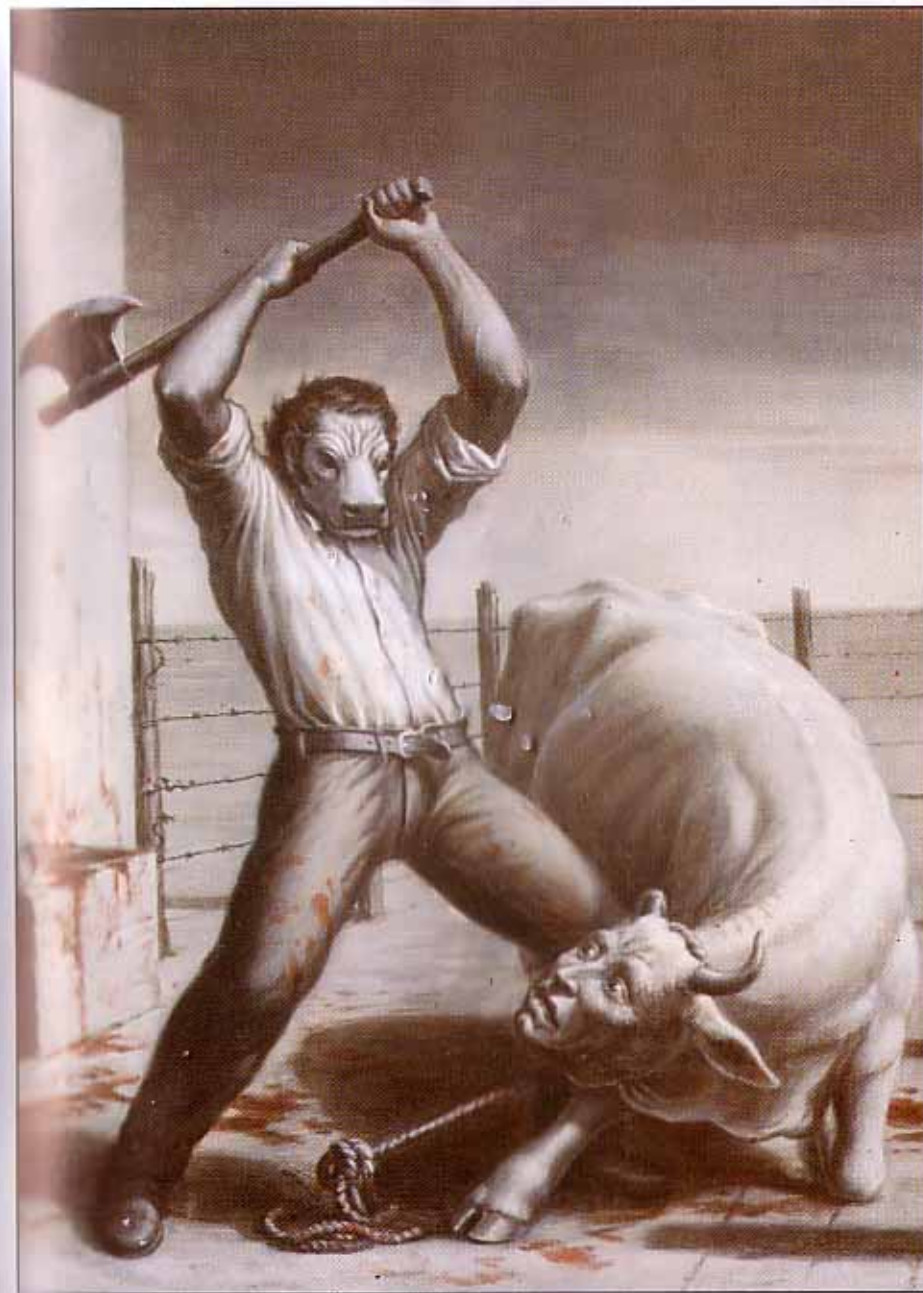
ভগবদ্গীতায় (৮/৬) বলা হয়েছে, জীব মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে যেরূপ স্মরণ করে দেহত্যাগ করে, সে পরবর্তী জন্মে সেরূপ দেহ লাভ করে থাকে। গরুটি কসাই-এর রূপ স্মরণ করে দেহত্যাগ করার ফলে, সে পরবর্তী জন্মে মনুষ্যদেহ লাভ করবে এবং গোহত্যার ফলে কসাইটি গরুর দেহ লাভ করবে। 'যেমন কর্ম, তেমনই ফল।'
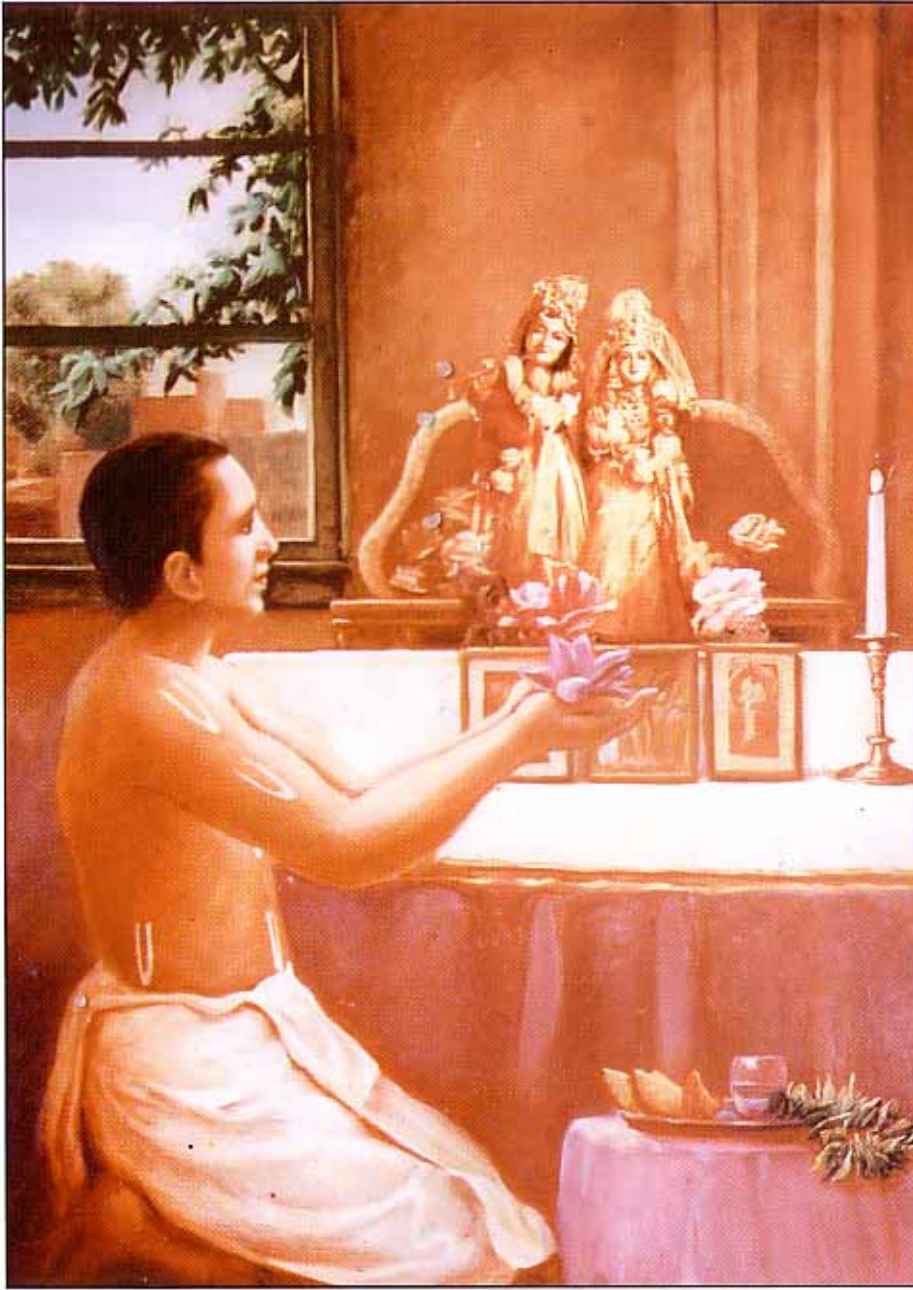
সমস্ত যোগীদের মধ্যে কৃষ্ণভক্ত বা ভক্তিযোগী শ্রেষ্ঠ, কেন না তিনি চব্বিশ ঘন্টা শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিমগ্ন। *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৬) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, কেউ যদি তাঁকে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল নিবেদন করেন, তিনি তা গ্রহণ করেন।
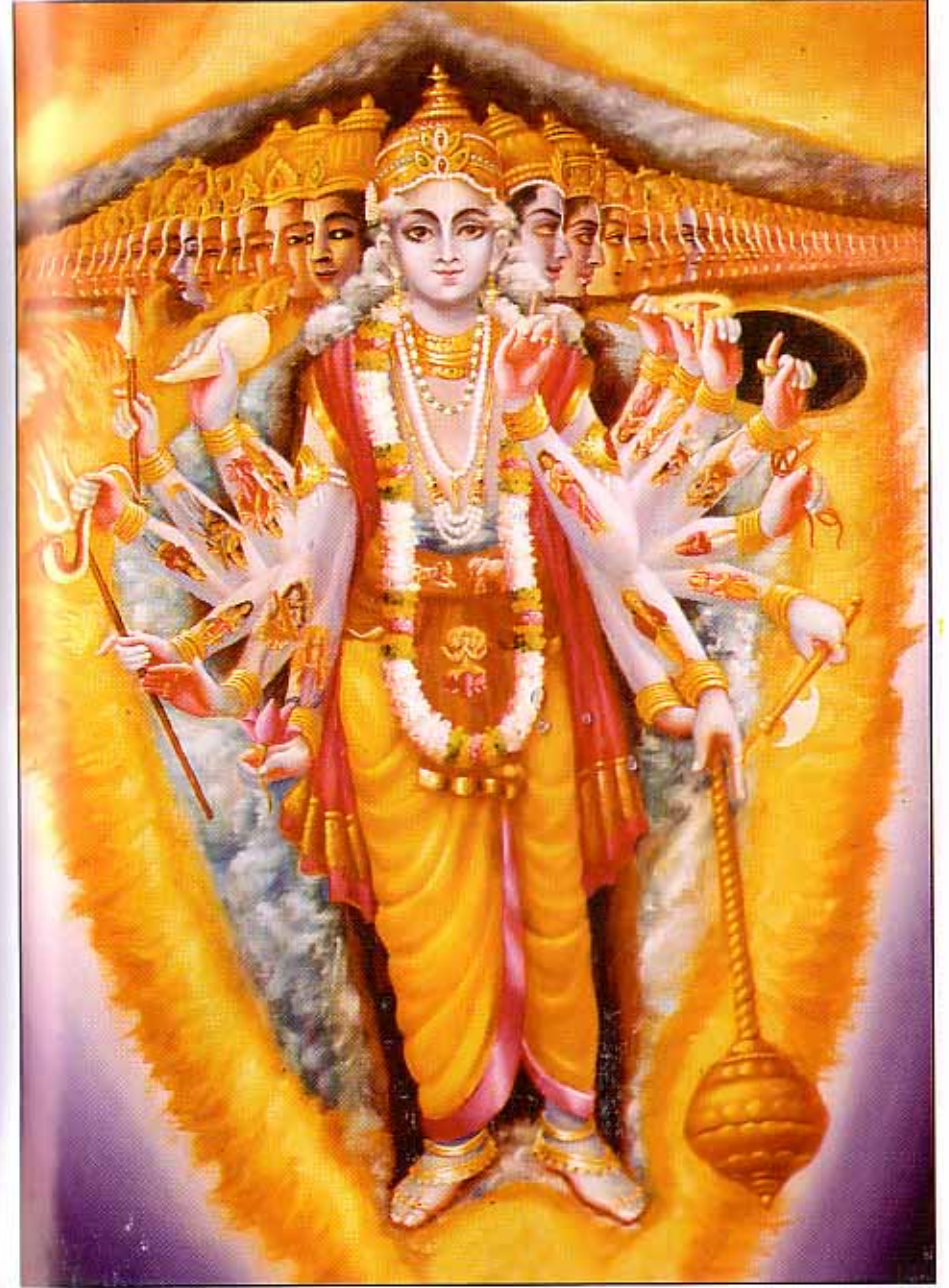
শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবান প্রথমে অর্জুন বুঝতে পারেননি। শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করার পর তাঁর সন্দেহ দূর হয়। কলিযুগে যে-সমস্ত ভুঁইফোড় নিজেদের ভগবান বলে দাবি করে, তাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত, "দয়া করে আপনার বিশ্বরূপটি একবার দেখান।"

অর্জুন মায়াচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের কাছ থেকে *ভগবদ্গীতা* শ্রবণ করার পর, তিনি আবার তাঁর অস্ত্র ধনুর্বাণ তুলে নিলেন যুদ্ধ করার জন্য।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে সূর্যদেব বিবস্বানকে অবিনাশী এই ভক্তিযোগের বিজ্ঞান দান করেন। বিবস্বান তা দেন মনুকে, মনু ইক্ষ্বাকুকে—এভাবেই গুরু-শিষ্য পরম্পরাক্রমে এই জ্ঞান প্রবাহিত হয়ে আসছে। (অধ্যায় ৪, শ্লোক ১)
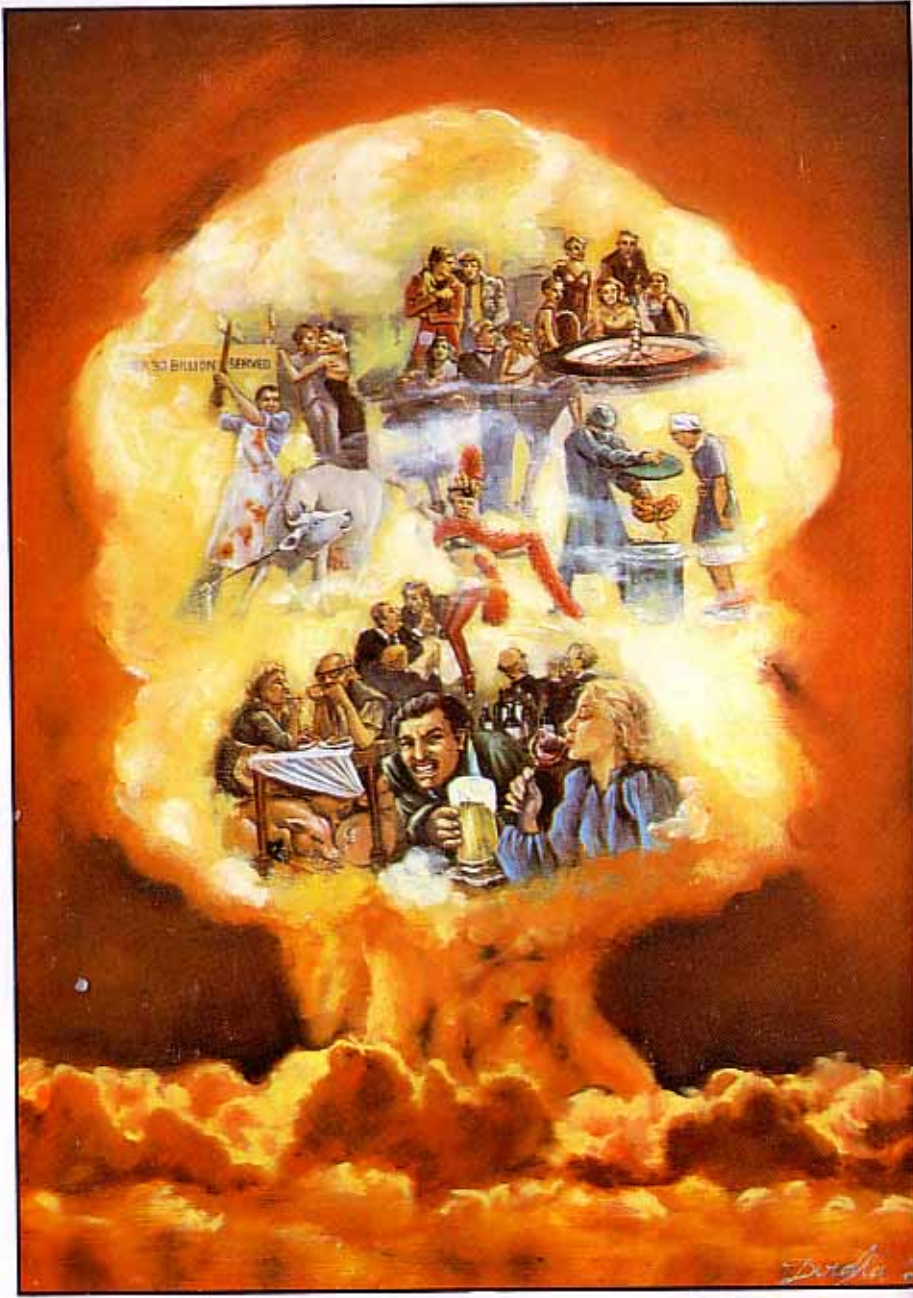
সদ্‌গুণ-বর্জিত আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা ভয়ংকর পাপময় ও অসামাজিক কার্যকলাপের মাধ্যমে জগৎ ধ্বংসের কাজে লিপ্ত হয়। (অধ্যায় ১৬, শ্লোক ৯)
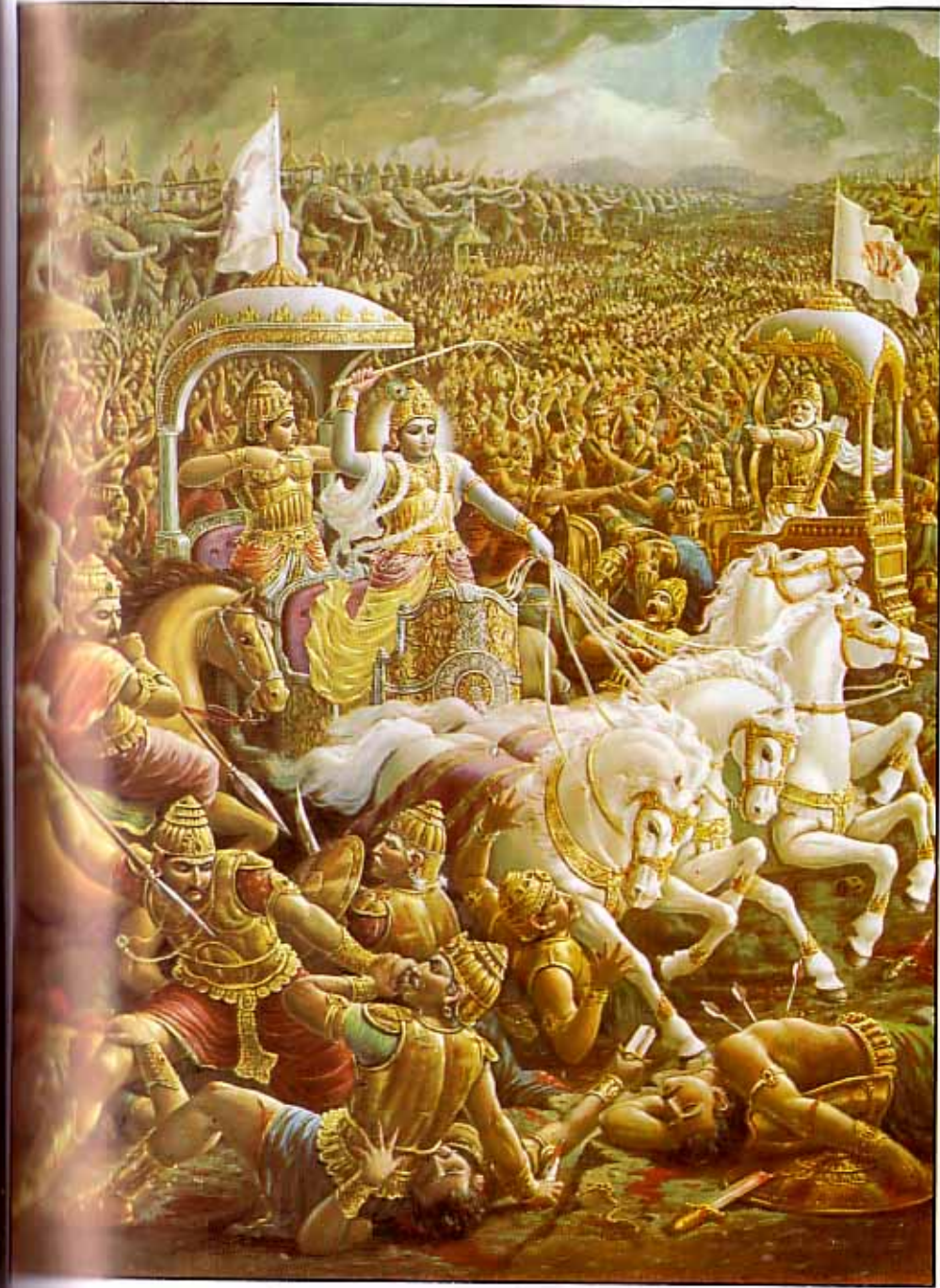
কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গণে উভয় সৈন্যদলের মাঝখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে *ভগবদ্‌গীতার* জ্ঞান দান করছেন। অর্জুনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মায়াবদ্ধ সমস্ত জীবের কর্তব্য, শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি সদ্‌গুরুর কাছ থেকে গীতার জ্ঞান লাভ করা।
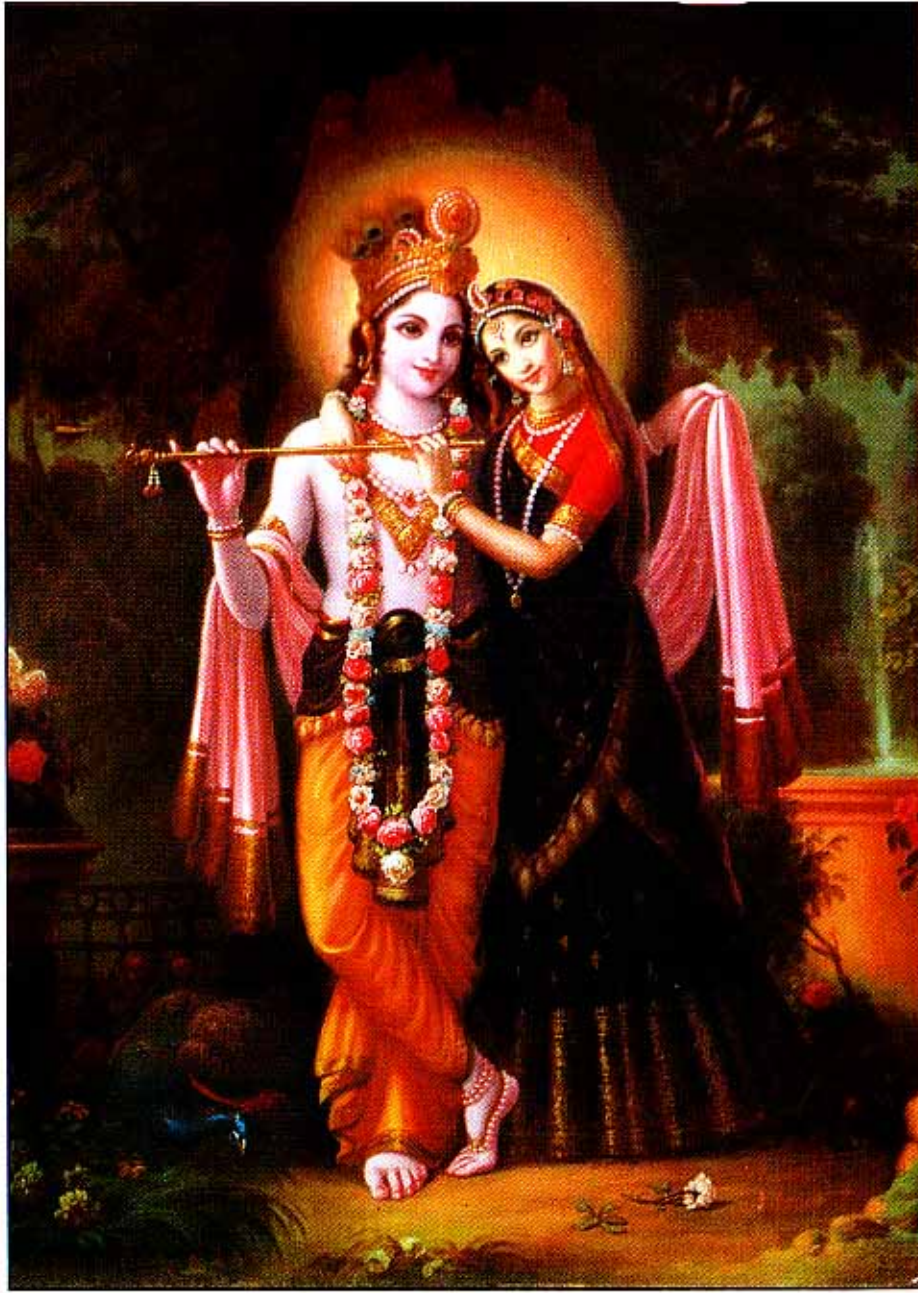
সমস্ত আরাধনার মধ্যে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের যুগলরূপের আরাধনা সর্বশ্রেষ্ঠ, কেন না এটি ভগবানের আদিরূপ, যাঁর থেকে অনন্ত রূপের প্রকাশ। সকলের কর্তব্য শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের সেবায় ব্রতী হওয়া।

ভূমিকা

এই সংস্করণে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ* গ্রন্থটি যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে, সেটিই আমার মূল রচনা। এই গ্রন্থটি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন দুর্ভাগ্যবশত মূল পাণ্ডুলিপিটিকে সংক্ষিপ্ত করে চারশরও কম পৃষ্ঠায় দাঁড় করানো হয় এবং তাতে কোন ছবি ছিল না এবং *ভগবদ্গীতার* অধিকাংশ শ্লোকেরই কোন ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়নি। *শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীঈশোপনিষদ* আদি আমার অন্যান্য সমস্ত গ্রন্থে মূল শ্লোক, তার ইংরেজী বর্ণান্তর, প্রতিটি সংস্কৃত শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ, শ্লোকটির অনুবাদ ও তাৎপর্য দেওয়ার রীতি আছে। তার ফলে গ্রন্থগুলি খুব প্রামাণিক ও পণ্ডিতসুলভ হয় এবং তার অর্থ স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে। তাই, আমার মূল পাণ্ডুলিপিটিকে যখন সংক্ষিপ্ত করতে হয়েছিল, তখন আমি খুব একটা খুশি হতে পারিনি। কিন্তু পরে, যখন *ভগবদ্গীতা যথাযথ* গ্রন্থের চাহিদা বেশ বাড়তে লাগল, তখন অনেক পণ্ডিত ও ভক্ত এই গ্রন্থটি পূর্ণ আকারে প্রকাশ করবার জন্য আমাকে অনুরোধ করতে লাগলেন এবং মেসার্স ম্যাকমিলান এণ্ড কোম্পানিও পূর্ণ আকারে গ্রন্থটি প্রকাশ করতে সম্মত হলেন। তাই গুরু-পরম্পরাক্রমে লব্ধ *ভগবদ্গীতার* পূর্ণজ্ঞান ও যথার্থ ব্যাখ্যা সহ দিব্যজ্ঞান সমন্বিত এই মহৎ গ্রন্থটির মূল পাণ্ডুলিপিকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করা হচ্ছে, যাতে আরও সুষ্ঠু ও ব্যাপকভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন একটি অকৃত্রিম, ঐতিহাসিক প্রমাণসিদ্ধ, স্বতঃস্ফূর্ত ও অপ্রাকৃত আন্দোলন, কারণ তা যথার্থ *ভগবদ্গীতার* ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই আন্দোলনটি ধীরে ধীরে সমস্ত পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় আন্দোলনে পরিণত হচ্ছে, বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়ের কাছে। প্রবীণ লোকদের কাছেও এটি ধীরে ধীরে চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠছে। তাঁরা এর প্রতি এমনভাবে আকৃষ্ট হচ্ছেন যে, আমার অনেক শিষ্যের বাবা এবং ঠাকুরদারাও আমাদের এই মহৎ সংস্থাটির—*আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের* আজীবন সদস্য হয়ে তাঁদের সহানুভূতি জানাচ্ছেন। লস এঞ্জেলসে আমার অনেক শিষ্যের মা-বাবারা সমস্ত পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রচার করছি বলে প্রায়ই আমাকে তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাতে আসেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন যে, আমি যে আমেরিকায় কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শুরু করেছি, তা আমেরিকাবাসীদের পক্ষে

অত্যন্ত কল্যাণকর। প্রকৃতপক্ষে এই আন্দোলনের পিতা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ নিজেই, কারণ বহুদিন পূর্বে তিনিই এই আন্দোলনটি শুরু করেন, কিন্তু গুরু-পরম্পরার ধারায় আজকের মানুষের কাছে তা সুলভ হয়ে নেমে এসেছে। এই সম্পর্কে যদি আমার কোন কৃতিত্ব থেকে থাকে, তবে সেটি আমার ব্যক্তিগত কৃতিত্ব নয়, তা আমার পরমারাধ্য গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃতিত্ব।

এই বিষয়ে আমার যদি কোন কৃতিত্ব থেকে থাকে, তবে সেটি শুধু এই জন্যই যে, *ভগবদ্গীতাকে* আমি অবিকৃতভাবে নিবেদন করবার চেষ্টা করেছি। আমার এই *ভগবদ্গীতা যথাযথ* নিবেদন করার আগে *ভগবদ্গীতার* যতগুলি অনুবাদ হয়েছে, তার প্রায় সব কয়টি সংস্করণই গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করবার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই *ভগবদ্গীতা যথাযথ* প্রকাশ করতে আমাদের এই যে প্রচেষ্টা, সেটি কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রচার করারই প্রচেষ্টা। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠিত করা। জড়বাদী মনোধর্মী, রাজনীতিবিদ, দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকদের মতবাদ প্রচার করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কারণ, অন্যান্য বিষয়ে তাঁদের যথেষ্ট পাণ্ডিত্য থাকলেও শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান অত্যন্ত অল্প। শ্রীকৃষ্ণ যখন বলেন, *মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু* আদি, তখন তথাকথিত অন্যান্য সমস্ত পণ্ডিতদের মতো আমরা বলি না যে, শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর অন্তরাত্মা এক নয়। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম এবং তাঁর নাম, রূপ, গুণ, লীলা আদি সবই অভিন্ন। গুরু-পরম্পরাসূত্রে কৃষ্ণভক্ত না হতে পারলে, শ্রীকৃষ্ণের এই পরম পদটি উপলব্ধি করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সাধারণত তথাকথিত সমস্ত পণ্ডিত, রাজনীতিবিদ, দার্শনিক ও স্বামীরা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও যখন *ভগবদ্গীতার* ভাষ্য রচনা করে, তখন তারা শ্রীকৃষ্ণকে নির্বাসিত করতে চায় বা হত্যা করতে চায়। *ভগবদ্গীতার* উপর এই ধরনের অপ্রামাণিক ভাষ্যগুলিকে বলা হয় *মায়াবাদী ভাষ্য* এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের ঐ সমস্ত পাষণ্ডীগুলির সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়ে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, *"মায়াবাদি-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ।"* তিনি স্পষ্টভাবেই বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন যে, কেউ যদি মায়াবাদীর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে *ভগবদ্গীতা* বুঝতে চেষ্টা করে, তা হলে তার সর্বনাশ হবে। এই সর্বনাশের ফল হচ্ছে যে, *ভগবদ্গীতার* ভ্রান্ত পাঠক অবশ্যই পারমার্থিক জীবনে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে এবং ভগবানের কাছে ফিরে যেতে অক্ষম হবে।

যে উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য ব্রহ্মার প্রতিদিনে একবার, অর্থাৎ প্রতি ৮৬০,০০,০০,০০০ বৎসরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন, সেই উদ্দেশ্যকে অনুপ্রাণিত করে বদ্ধ জীবদের পথপ্রদর্শন করবার জন্যই এই *ভগবদ্গীতা যথাযথ* প্রকাশিত হয়েছে। ভগবানের সেই উদ্দেশ্যের কথা *ভগবদ্গীতায়* বর্ণিত হয়েছে এবং তা আমাদের যথাযথভাবে গ্রহণ করতে হবে; তা না হলে *ভগবদ্গীতা* ও তাঁর বক্তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানবার চেষ্টা করা বৃথা। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান নিজেই বলেছেন যে, লক্ষ কোটি বৎসর আগে তিনি সূর্যদেবকে সর্বপ্রথম এই জ্ঞান দান করেন। এই সত্য আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে এবং এভাবেই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের কদর্থ না করে, *ভগবদ্গীতার* ঐতিহাসিক গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছার কথা উল্লেখ না করে *ভগবদ্গীতার* ব্যাখ্যা করা সবচেয়ে গর্হিত অপরাধ। এই অপরাধ থেকে রক্ষা পেতে হলে, শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে জানতে হবে, ঠিক যেভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রথম শিষ্য অর্জুন তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে জেনে ছিলেন। *ভগবদ্গীতাকে* এভাবে উপলব্ধি করা যথার্থই লাভজনক এবং মানব-জীবনের উদ্দেশ্য পরিপূরণে সমাজের যথার্থ কল্যাণ সাধনের জন্য অনুমোদিত।

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন মানব-সমাজের পক্ষে অপরিহার্য, যেহেতু তা জীবনের সর্বোচ্চ পূর্ণতা প্রদান করে। সেটি কিভাবে সম্ভব তা সম্পূর্ণভাবে *ভগবদ্গীতায়* ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত জড়াসক্ত তার্কিকেরা *ভগবদ্গীতার* অজুহাত দেখিয়ে তাদের আসুরিক প্রবৃত্তিগুলি চরিতার্থ করবার চেষ্টা করছে এবং মানুষকে বিপথে চালিত করছে, যার ফলে সাধারণ মানুষ তাদের জীবনের সহজ সরল উদ্দেশ্যটি উপলব্ধি করতে পারছে না। সকলেরই উচিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা, এবং প্রতিটি জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হওয়া। প্রত্যেকেরই জানা উচিত যে, প্রতিটি জীব হচ্ছে ভগবানের নিত্য সেবক এবং শ্রীকৃষ্ণের সেবা না করলে তাকে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মায়ার সেবা করতে হবে এবং তার ফলে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে নিত্যকাল আবর্তিত হতে হবে; এমন কি তথাকথিত মুক্ত মনোধর্মী মায়াবাদীদেরও এই প্রচণ্ড দুঃখের হাত থেকে নিস্তার নেই। *ভগবদ্গীতার* জ্ঞান হচ্ছে একটি মহৎ বিজ্ঞান এবং নিজের যথার্থ কল্যাণ সাধন করার জন্য এই জ্ঞান আহরণ করা প্রতিটি জীবের পরম কর্তব্য।

সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে এই কলিযুগে, শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা প্রকৃতির দ্বারা মোহিত। বিভ্রান্ত হয়ে তারা মনে করে যে, জড় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উন্নতি সাধন করার ফলেই প্রতিটি মানুষ সুখী হতে পারবে। তারা জানে না যে, এই জড়া

প্রকৃতি বা ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি অত্যন্ত প্রবল, যেহেতু প্রতিটি জীবই জড়া প্রকৃতির কঠিন নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ। ভগবানের বিভিন্ন অংশ হওয়ার ফলে জীব আনন্দময় এবং তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হচ্ছে ভগবানের সেবা করা। মায়ার দ্বারা মোহিত হয়ে জীব বিভিন্নভাবে তার ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করার মাধ্যমে সুখী হবার ভ্রান্ত চেষ্টা করে, কিন্তু সেভাবে সে কোনদিনই সুখী হতে পারে না। আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি সাধনের পরিবর্তে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করাটাই হচ্ছে তার কর্তব্য। সেটিই হচ্ছে জীবনের চরম সার্থকতা। ভগবান সেটিই চান এবং তিনি তা দাবি করেন। *ভগবদ্গীতার* এই মূল ভাবটি উপলব্ধি করতে হবে। আমাদের এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সমস্ত জগৎ জুড়ে *ভগবদ্গীতার* এই মূল ভাবটি শিক্ষা দিচ্ছে, এবং আমরা যেহেতু *ভগবদ্গীতা যথাযথের* মূল ভাবটির কদর্থ করছি না, তাই যে সমস্ত মানুষ *ভগবদ্গীতা* অধ্যয়ন করে ঐকান্তিকভাবে উপকৃত হতে চান, ভগবানের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় *ভগবদ্গীতাকে* যথাযথভাবে উপলব্ধি করার জন্য তাদের অবশ্যই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সহায়তা গ্রহণ করতে হবে। তাই আমরা আশা করি যে, এই *ভগবদ্গীতা যথাযথ* পাঠ করে মানুষ পরম লাভবান হবে এবং যদি একজন মানুষও ভগবানের শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হতে পারে, তা হলে আমাদের এই প্রচেষ্টা সার্থক বলে মনে করব।

—এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী

১২মে, ১৯৭১
সিডনি, অস্ট্রেলিয়া

মুখবন্ধ

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে ।
স্বয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্ ॥

অজ্ঞতার গভীরতম অন্ধকারে আমার জন্ম হয়েছিল এবং আমার গুরুদেব জ্ঞানের আলোকবর্তিকা দিয়ে আমার চক্ষু উন্মীলিত করেছেন। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুপাদ, যিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অভিলাষ পূর্ণ করবার জন্য এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, আমি তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ কবে করতে পারব?

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্ ।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥

আমি আমার গুরুদেবের পাদপদ্মে ও সমস্ত বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীচরণে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আমি শ্রীরূপ গোস্বামী, তাঁর অগ্রজ শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীগোপাল ভট্ট ও শ্রীল জীব গোস্বামীর চরণকমলে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য, শ্রীগদাধর, শ্রীবাস ও অন্যান্য পার্ষদবৃন্দের পাদপদ্মে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আমি শ্রীমতী ললিতা ও বিশাখা সহ শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে ।
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তু তে ॥

হে আমার প্রিয় কৃষ্ণ! তুমি করুণার সিন্ধু, তুমি দীনের বন্ধু, তুমি সমস্ত জগতের

পতি, তুমি গোপীদের ঈশ্বর এবং শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেমাস্পদ। আমি তোমার পাদপদ্মে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গি রাধে বৃন্দাবনেশ্বরি ।
বৃষভানুসুতে দেবি প্রণমামি হরিপ্রিয়ে ॥

শ্রীমতী রাধারাণী, যাঁর অঙ্গকান্তি তপ্তকাঞ্চনের মতো, যিনি বৃন্দাবনের ঈশ্বরী, যিনি মহারাজ বৃষভানুর দুহিতা এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী, তাঁর চরণকমলে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

সমস্ত বৈষ্ণব-ভক্তবৃন্দ, যাঁরা বাঞ্ছাকল্পতরুর মতো সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে পারেন, যাঁরা কৃপার সাগর ও পতিতপাবন, তাঁদের চরণকমলে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য, শ্রীগদাধর ও শ্রীবাস আদি গৌরভক্তবৃন্দের চরণকমলে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

ভগবদ্গীতার আর এক নাম *গীতোপনিষদ্*। এটি বৈদিক দর্শনের সারমর্ম এবং বৈদিক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ *উপনিষদ্*। এই *গীতোপনিষদ্* বা *ভগবদ্গীতার* বেশ কয়েকটি ইংরেজী ভাষ্য ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। তাই অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, *ভগবদ্গীতার* আরও একটি ইংরেজী ভাষ্যের কি দরকার? তাই *ভগবদ্গীতার* এই সংস্করণ সম্বন্ধে দুই-একটি কথা আমাকে বলতে হয়। ইদানীং একজন আমেরিকান ভদ্রমহিলা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "*ভগবদ্গীতার* কোন্ ইংরেজী অনুবাদে *ভগবদ্গীতার* প্রকৃত ভাবকে যথাযথভাবে প্রকাশ করা হয়েছে?" আমেরিকাতে *ভগবদ্গীতার* বহু ইংরেজী সংস্করণ পাওয়া যায়, কিন্তু আজ পর্যন্ত আমি এমন একটি *ভগবদ্গীতা* পেলাম না যাতে *ভগবদ্গীতার* যথার্থ ভাবকে বজায় রেখে তাঁর অনুবাদ করা হয়েছে। শুধু আমেরিকাতেই নয়, ভারতবর্ষেও

ভগবদ্গীতার ইংরেজী অনুবাদের সেই একই অবস্থা। তার কারণ হচ্ছে, ভাষ্যকারেরা *ভগবদ্গীতার* মূল ভাব বজায় না রেখে তাঁদের নিজেদের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে তার ব্যাখ্যা করেছেন।

ভগবদ্গীতাতেই *ভগবদ্গীতার* মূল ভাব ব্যক্ত হয়েছে। এটি ঠিক এই রকম— আমরা যখন কোন ঔষধ খাই, তখন যেমন আমরা আমাদের ইচ্ছামতো সেই ঔষধ খেতে পারি না, ডাক্তারের নির্দেশ বা ঔষধের শিশিতে দেওয়া নির্দেশ অনুসারে সেই ঔষধ খেতে হয়, তেমনই *ভগবদ্গীতাকে* গ্রহণ করতে হবে ঠিক যেভাবে তার বক্তা তাঁকে গ্রহণ করবার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। *ভগবদ্গীতার* বক্তা হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। *ভগবদ্গীতার* প্রতিটি পাতায় বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। *ভগবান্* শব্দটি অবশ্য কখনও কখনও কোন শক্তিমান পুরুষ অথবা কোন দেব-দেবীর ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়। এখানে *ভগবান্* শব্দটির দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মহাপুরুষ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের জ্ঞাত হওয়া উচিত যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই যে পরমেশ্বর তা স্বীকার করেছেন সমস্ত সত্যদ্রষ্টা ও ভগবৎ-তত্ত্ববেত্তা আচার্যেরা—যেমন, শঙ্করাচার্য, রামানুজাচার্য, মধ্বাচার্য, নিম্বার্কাচার্য, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আদি ভারতের প্রতিটি মহাপুরুষ। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই *ভগবদ্গীতাতে* বলে গেছেন যে, তিনিই হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। *ব্রহ্মসংহিতা* ও সব কয়টি *পুরাণে*, বিশেষ করে *ভাগবত-পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতে* শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবানরূপে বর্ণনা করা হয়েছে (*কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্*)। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমনভাবে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, ঠিক তেমনভাবে *ভগবদ্গীতাকে* আমাদের গ্রহণ করতে হবে। *ভগবদ্গীতার* চতুর্থ অধ্যায়ে (৪/১-৩) ভগবান বলেছেন—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্ ।
বিবস্বান্মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥

এখানে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, এই যোগ *ভগবদ্গীতা* প্রথমে তিনি সূর্যদেবকে বলেন, সূর্যদেব তা বলেন মনুকে, মনু ইক্ষ্বাকুকে এবং এভাবে গুরু-পরম্পরাক্রমে গুরুদেব থেকে শিষ্যতে এই জ্ঞান ধারাবাহিকভাবে প্রবাহিত হয়ে

আসছিল। কিন্তু এক সময় এই পরম্পরা ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ফলে আমরা এই জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। তাই ভগবান কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে নিজে এসে আবার এই জ্ঞান অর্জুনের মাধ্যমে দান করলেন।

তিনি অর্জুনকে বললেন, "তুমি আমার ভক্ত ও সখা, তাই রহস্যাবৃত এই পরম জ্ঞান আমি তোমাকে দান করছি।" এই কথার তাৎপর্য হচ্ছে যে, *ভগবদ্গীতার* জ্ঞান কেবল ভগবানের ভক্তই আহরণ করতে পারে। অধ্যাত্মবাদীদের সাধারণত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা—জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত, অথবা নির্বিশেষবাদী, ধ্যানী ও ভক্ত। এখানে ভগবান স্পষ্টভাবে অর্জুনকে বলেছেন যে, পূর্বের পরম্পরা নষ্ট হয়ে যাবার ফলে তিনি তাঁকে দিয়ে পুনরায় সেই পুরাতন যোগের প্রচার করলেন। তিনি চেয়েছিলেন যে, অর্জুন এই জ্ঞানকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করে তার প্রচার করবেন। আর এই কাজের জন্য তিনি অর্জুনকেই কেবল মনোনীত করলেন, কারণ অর্জুন ছিলেন তাঁর ভক্ত, তাঁর অন্তরঙ্গ সখা ও তাঁর প্রিয় শিষ্য। তাই ভগবানের ভক্ত না হলে অর্থাৎ ভক্তি ও ভালবাসার মাধ্যমে তাঁর অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে না এলে ভগবানের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারা সম্ভব নয়। তাই অর্জুনের গুণে গুণান্বিত মানুষেরাই কেবল *ভগবদ্গীতাকে* যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারে। ভক্তির মাধ্যমে ভক্তের সঙ্গে ভগবানের যে প্রেম-মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠে, তারই আলোকে ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। এই সম্পর্কের ব্যাখ্যা করতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়, তবে সংক্ষেপে বলা যায় যে, ভক্ত ভগবানের সঙ্গে নিম্নলিখিত পাঁচটি সম্পর্কের যে কোন একটির দ্বারা যুক্ত থাকেন—

(১) নিষ্ক্রিয়ভাবে ভক্ত হতে পারেন	(শান্ত)
(২) সক্রিয়ভাবে ভক্ত হতে পারেন	(দাস্য)
(৩) বন্ধুভাবে ভক্ত হতে পারেন	(সখ্য)
(৪) অভিভাবক রূপে ভক্ত হতে পারেন	(বাৎসল্য)
(৫) দাম্পত্য প্রেমিকরূপে ভক্ত হতে পারেন	(মাধুর্য)

অর্জুনের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্কের রূপ ছিল সখ্য। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অর্জুনের যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক তার সঙ্গে পার্থিব জগতের বন্ধুত্বের বিস্তর তফাৎ। এই সম্পর্ক হচ্ছে অপ্রাকৃত এবং জড় অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এর বিচার করা কখনই সম্ভব নয়। যে কোন লোকের পক্ষে এই বন্ধুত্বের আস্বাদন লাভ করা সম্ভব নয়, তবুও প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত এবং এই

সম্পর্কের প্রকাশ হয় ভক্তিযোগের পূর্ণতার মাধ্যমে। তবে আমাদের বর্তমান অবস্থায়, আমরা কেবল ভগবানকেই ভুলে যাইনি, সেই সঙ্গে ভুলে গেছি তাঁর সঙ্গে আমাদের চিরন্তন সম্পর্কের কথা। লক্ষ কোটি জীবের মধ্যে প্রতিটি জীবেরই ভগবানের সঙ্গে কোন না কোন রকমের শাশ্বত সম্পর্ক রয়েছে, এবং সেই সম্পর্ক হচ্ছে জীবের স্বরূপ। ভক্তিযোগের মাধ্যমে এই স্বরূপের প্রকাশ হয় এবং তাকে বলা হয় জীবের 'স্বরূপসিদ্ধি'। অর্জুন ছিলেন ভগবানের ভক্ত এবং তাঁর সাথে ভগবানের সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বের সম্পর্ক।

ভগবদ্গীতার মর্মোপলব্ধি করতে হলে প্রথমেই আমাদের দেখতে হবে অর্জুন কিভাবে তা গ্রহণ করেছিলেন। *ভগবদ্গীতার* দশম অধ্যায়ে (১০/১২-১৪) তা বর্ণনা করা হয়েছে—

অর্জুন উবাচ
পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ ।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা ।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে ॥
সর্বমেতদ্ ঋতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব ।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ ॥

"অর্জুন বললেন—তুমিই পরম পুরুষোত্তম ভগবান, পরম ধাম, পরম পবিত্র ও পরব্রহ্ম। তুমিই শাশ্বত, দিব্য, আদি পুরুষ, অজ ও বিভু। নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস আদি সমস্ত মহান ঋষিরাই তোমার এই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করে গেছেন, আর এখন তুমি নিজেও তা আমার কাছে ব্যক্ত করছ। হে শ্রীকৃষ্ণ, তুমি আমাকে যা বলেছ তা আমি সম্পূর্ণ সত্য বলে গ্রহণ করেছি। হে ভগবান! দেব অথবা দানব কেউই তোমার তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারে না।"

পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কাছে *ভগবদ্গীতা* শোনার পর অর্জুন বুঝতে পেরেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন *পরং ব্রহ্ম* অর্থাৎ পরব্রহ্ম। প্রতিটি জীবই ব্রহ্ম, কিন্তু পরম জীব অথবা পরম পুরুষোত্তম ভগবান হচ্ছেন পরব্রহ্ম। *পরং ধাম* কথাটির অর্থ হচ্ছে তিনি সব কিছুর পরম আশ্রয় অথবা পরম ধাম। *পবিত্রম্* মানে তিনি হচ্ছেন বিশুদ্ধ অর্থাৎ জড় জগতের কোন রকম কলুষ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। *পুরুষম্* কথাটির অর্থ হচ্ছে, তিনিই পরম ভোক্তা; *শাশ্বতম্* অর্থ সনাতন; *দিব্যম্* অর্থ অপ্রাকৃত; *আদিদেবম্* অর্থ পরম পুরুষ ভগবান; *অজম্* অর্থ জন্মরহিত এবং *বিভুম্* শব্দটির অর্থ সর্বশ্রেষ্ঠ।

কেউ মনে করতে পারেন যে, অর্জুন যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের বন্ধু ছিলেন, তাই তিনি ভাবোচ্ছ্বসিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তন করেছেন। কিন্তু *ভগবদ্গীতার* পাঠকের মন থেকে সেই সন্দেহ দূর করার জন্য অর্জুন পরবর্তী শ্লোকে বলেছেন যে, নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাসাদি ভগবৎ-তত্ত্ববিদ্ মহাজনেরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান বলে স্বীকার করেছেন। বৈদিক জ্ঞান যথাযথভাবে বিতরণকারী এই সমস্ত মহাপুরুষদের আচার্যেরা স্বীকার করেছেন। তাই অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলেছেন যে, তাঁর মুখনিঃসৃত প্রতিটি কথাকেই তিনি সম্পূর্ণ নির্ভুল বলে গ্রহণ করেন। *সর্বমেতদ্ ঋতং মন্যে*— "তোমার প্রতিটি কথাই আমি পরম সত্য বলে গ্রহণ করি।" অর্জুন আরও বলেছেন যে, ভগবানের ব্যক্তিত্ব উপলব্ধি করা খুবই দুষ্কর এবং দেবতারাও তাঁর প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারেন না। এর অর্থ হচ্ছে যে, মানুষের চেয়ে উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত যে দেবতা, তাঁরাও ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করতে অক্ষম। তাই সাধারণ মানুষ ভগবানের ভক্ত না হলে কিভাবে তাঁকে উপলব্ধি করবে?

ভগবদ্গীতাকে তাই ভক্তির মাধ্যমে গ্রহণ করতে হয়। শ্রীকৃষ্ণকে কখনই আমাদের সমকক্ষ বলে মনে করা উচিত নয়। শ্রীকৃষ্ণকে একজন সাধারণ ব্যক্তি বলে মনে করা উচিত নয়, এমন কি তাঁকে একজন মহাপুরুষ বলেও মনে করা উচিত নয়। *ভগবদ্গীতার* মর্মার্থ উপলব্ধি করতে হলে শ্রীকৃষ্ণকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান বলে স্বীকার করে নিতেই হবে। সুতরাং *ভগবদ্গীতার* বিবৃতি অনুসারে কিংবা অর্জুনের অভিব্যক্তি অনুসরণে যিনি *ভগবদ্গীতা* বুঝতে চেষ্টা করছেন, তাঁকে শ্রীকৃষ্ণ যে পরম পুরুষোত্তম ভগবান, তা অন্তত তত্ত্বগতভাবে মেনে নিতে হবে এবং সেই রকম বিনম্র মনোভাব নিয়ে *ভগবদ্গীতা* উপলব্ধি করা সম্ভব। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে *ভগবদ্গীতা* না পড়লে, তা বুঝতে পারা খুবই কঠিন, কারণ এই শাস্ত্রটি চিরকালই বিপুল রহস্যাবৃত।

ভগবদ্গীতা আসলে কি? *ভগবদ্গীতার* উদ্দেশ্য হচ্ছে অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মানুষকে উদ্ধার করা। প্রতিটি মানুষই নানাভাবে দুঃখকষ্ট পাচ্ছে, যেমন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় অর্জুনও এক মহা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। অর্জুন ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন এবং তার ফলে তখন ভগবান তাঁকে *গীতার* তত্ত্বজ্ঞান দান করে মোহমুক্ত করলেন। এই জড় জগতে কেবল অর্জুনই নন, আমরা প্রত্যেকেই সর্বদাই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় জর্জরিত। এই জড় জগতের অনিত্য পরিবেশে আমাদের যে অস্তিত্ব, তা অস্তিত্বহীনের মতো। এই জড় অস্তিত্বের অনিত্যতা আমাদের ভীতি প্রদর্শন করে, কিন্তু তাতে ভীত হওয়ার কোন কারণ নেই। আমাদের অস্তিত্ব হচ্ছে নিত্য। কিন্তু যে-কোন কারণবশত আমরা *অসৎ* সত্তায় আবদ্ধ হয়ে পড়েছি। *অসৎ* বলতে বোঝায় যার অস্তিত্ব নেই।

এই অনিত্য অস্তিত্বের ফলে মানুষ প্রতিনিয়ত দুঃখকষ্ট ভোগ করছে। কিন্তু সে এতই মোহাচ্ছন্ন যে, তার দুঃখকষ্ট সম্পর্কে সে মোটেই অবগত নয়। হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কেবল দুই-একজন তাদের ক্লেশ-জর্জরিত অনিত্য অবস্থাকে উপলব্ধি করতে পেরে অনুসন্ধান করতে শুরু করে, "আমি কে?" "আমি কোথা থেকে এলাম?" "কেন আমি এই জটিল অবস্থায় পতিত হয়েছি?" মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত না তার মোহাচ্ছন্ন অবস্থা কাটিয়ে উঠে তার দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে সচেতন হয়ে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য অনুসন্ধান করছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে বুঝতে পারছে যে, সে দুঃখ-দুর্দশা চায় না, ততক্ষণ তাকে যথার্থ মানুষ বলে গণ্য করা চলে না। মানুষের মনুষ্যত্বের সূচনা তখনই হয়, যখন তার মনে এই সমস্ত প্রশ্নের উদয় হতে শুরু করে। *ব্রহ্মসূত্রে* এই অনুসন্ধানকে বলা হয় ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। *অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।* মানব-জীবনে এই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ব্যতীত আর সমস্ত কর্মকেই ব্যর্থ বা অর্থহীন বলে গণ্য করা হয়। তাই যারা ইতিমধ্যেই প্রশ্ন করতে শুরু করেছেন, "আমি কে?" "আমি কোথা থেকে এলাম?" "আমি কেন কষ্ট পাচ্ছি?" "মৃত্যুর পরে আমি কোথায় যাব?" তাঁরাই *ভগবদ্গীতার* প্রকৃত শিক্ষার্থী হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। এই তত্ত্ব যিনি আন্তরিকভাবে অনুসন্ধান করেন, তিনিই ভগবানের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি অর্জন করেন। অর্জুন ছিলেন এমনই একজন অনুসন্ধানী শিক্ষার্থী।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মানব-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করে দেবার জন্যই এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন। তা সত্ত্বেও হাজার হাজার তত্ত্বানুসন্ধানী মানুষের মধ্যে কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি কেবল ভগবৎ-তত্ত্ব পূর্ণরূপে উপলব্ধি করে নিজের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হন, এবং এমন মানুষের জন্যই ভগবান *ভগবদ্গীতা* শুনিয়েছেন। অজ্ঞতারূপ হিংস্র জন্তুটি আমাদের প্রতিনিয়ত গ্রাস করে চলেছে, কিন্তু ভগবান করুণাময়, বিশেষ করে মানুষের প্রতি তাঁর করুণা অপার। তাই তিনি তাঁর বন্ধু অর্জুনকে শিক্ষার্থীরূপে গ্রহণ করে *ভগবদ্গীতার* মাধ্যমে মানুষকে ভগবৎ-তত্ত্ব দান করে গেছেন।

অর্জুন ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের সহচর, তাই জড় জগতের অজ্ঞতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারত না, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছানুসারে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় তিনি সাময়িকভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন যাতে তিনি তাঁর সেই সঙ্কটময় অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার

জন্য শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেন, এবং তাঁর মাধ্যমে ভগবান আগামী দিনের মানুষের উদ্ধারের উপায়-স্বরূপ ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত *ভগবদ্গীতা* বর্ণনা করলেন। অপার করুণাময় ভগবান মানব-জীবনকে সার্থক করে তুলবার জন্য মানুষকে তার স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত করলেন, আর তাদের নির্দেশ দিলেন কিভাবে জীবন অতিবাহিত করা উচিত।

ভগবদ্গীতার বিষয়বস্তুতে আমরা পাঁচটি মূল তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারি। সর্বপ্রথমে ভগবানের স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাঁর পরিপ্রেক্ষিতে জীবের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ঈশ্বর আছেন এবং তিনিই সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ করছেন, আর জীব প্রতিনিয়তই তাঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। যদি কেউ বলে যে, সে কারও দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না, সে মুক্ত, তা হলে বুঝতে হবে সে উন্মাদ। জীব সর্বদাই, বিশেষ করে বদ্ধ অবস্থায় সর্বতোভাবে নিয়ন্ত্রিত। তাই *ভগবদ্গীতায়* পরম নিয়ন্তা ঈশ্বর ও সর্বদা নিয়ন্ত্রিত জীবের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচিত হয়েছে। তা ছাড়া প্রকৃতি (জড়া প্রকৃতি), কাল (সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব ও জড়া প্রকৃতির অভিব্যক্তির অস্তিত্বের স্থিতিকাল) এবং কর্মও (কার্যকলাপ) আলোচনা করা হয়েছে। ভৌতিক জগতের প্রকাশ বিভিন্ন কার্যকলাপে পরিপূর্ণ। সমস্ত জীবেরা বিভিন্ন কার্যকলাপে লিপ্ত। তাই *ভগবদ্গীতা* থেকে আমাদের জানতে হবে ভগবান কে? জীব কি? প্রকৃতি কি? ভৌতিক জগৎ কি? আর কিভাবে তা মহাকালের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং জীবের কার্যকলাপ কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

ভগবদ্গীতায় এই পাঁচটি বিষয়বস্তু আলোচনা করার মাধ্যমে সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণ করা হয়েছে যে, ভগবান বা শ্রীকৃষ্ণ বা পরব্রহ্ম বা পরম নিয়ন্তা বা পরমাত্মা—যে নামেই তাঁকে সম্বোধন করা হোক, তিনিই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ। সকল জীবই পরম নিয়ন্তার মতোই গুণগতভাবে সমান। যেমন, জড়া প্রকৃতিজাত এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু ভগবান নিয়ন্ত্রণ করছেন, যা *ভগবদ্গীতার* শেষ অধ্যায়গুলিতে বর্ণনা করা হয়েছে। জড়া প্রকৃতি স্বাধীন নয়। পরমেশ্বরের নির্দেশে তাঁকে কাজ করতে হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণ তাই বলেছেন, *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*—"এই জড়া প্রকৃতি আমার নির্দেশনায় ক্রিয়াশীল।" আমরা যখন ভৌতিক জগতে বিস্ময়কর কোন কিছু ঘটতে দেখি, তখন আমাদের বোঝা উচিত যে, এর পেছনে একজন নিয়ন্তা রয়েছেন। নিয়ন্ত্রিত না হলে কোন কিছুরই প্রকাশ হতে পারে না। যদি কেউ মনে করে যে, কোন পরিচালক ব্যতীতই প্রকৃতি পরিচালিত হচ্ছে, তবে তা শিশুসুলভ নির্বুদ্ধিতা। একটি শিশু যেমন একটি মোটর গাড়ি চলতে দেখে মনে করতে পারে যে, কোন ঘোড়া বা পশুর দ্বারা পরিচালিত না হয়ে মোটর

গাড়িটি নিজে নিজে চলছে, কিন্তু পরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন যে কোন মানুষই মোটর গাড়ির কারিগরি ব্যবস্থার ব্যাপারটি জানে। সে জানে যে, একজন চালক কলকব্জা নাড়িয়ে সেই গাড়িটিকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন এই ভৌতিক জগতের সমস্ত কিছুর পরিচালক। তাঁরই তত্ত্বাবধানে সব কিছু পরিচালিত হচ্ছে। জীব হচ্ছে ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ, এবং *ভগবদ্গীতাতে* তার বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এক বিন্দু সমুদ্রের জল যেমন গুণগতভাবে সমস্ত সমুদ্রের জল থেকে অভিন্ন, এক কণা সোনাও যেমন সোনা, ঠিক তেমনই জীব পরম নিয়ন্তা বা ঈশ্বর বা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপরিহার্য অংশ হবার ফলে, ভগবানের সমস্ত গুণই তার মধ্যে অণু পরিমাণে বিদ্যমান, কেন না প্রতিটি জীব ক্ষুদ্র ঈশ্বর, নিয়ন্ত্রণাধীন ঈশ্বর। আমরা প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব করার চেষ্টা করছি, যেমন এখন আমরা অন্তরিক্ষ অথবা অন্যান্য গ্রহ নিয়ন্ত্রিত করবার চেষ্টা করছি। এই প্রচেষ্টা স্বাভাবিক, কারণ কর্তৃত্ব করার এই গুণ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেই বিদ্যমান। কিন্তু প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব করার বাসনা আমাদের মনে থাকলেও আমাদের বোঝা উচিত যে, আমরা পরম নিয়ন্তা নই। *ভগবদ্গীতাতে* এর বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

জড়া প্রকৃতি কি? *গীতায়* তাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, তা হচ্ছে নিকৃষ্টা প্রকৃতি আর জীবকে বলা হয়েছে উৎকৃষ্টা প্রকৃতি। উৎকৃষ্ট হোক বা নিকৃষ্টই হোক, প্রকৃতি সব সময় নিয়ন্ত্রণাধীন। স্ত্রী যেমন স্বামীর দ্বারা পরিচালিত হয়, নারীস্বরূপা প্রকৃতিও তেমনই ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত হয়। জীব ও জড়া প্রকৃতি উভয়কে পরমেশ্বর পরিচালিত করেন। *গীতাতে* বলা হয়েছে, জীব যদিও ভগবানের অপরিহার্য অংশ, তবুও তাকে প্রকৃতি বলেই স্বীকার করতে হবে। *ভগবদ্গীতার* সপ্তম অধ্যায়ে তা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। *অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্/জীবভূতাম্*—"এই জড়া প্রকৃতি আমার নিম্নতর প্রকৃতি, এই নিম্নতর প্রকৃতির অতীত আর একটি প্রকৃতি আছে—*জীবভূতাম্* অর্থাৎ জীবসত্তা।

জড়া প্রকৃতি গঠিত হয়েছে সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনটি গুণের সমন্বয়ে। এই গুণত্রয়ের ঊর্ধ্বে আছে অনন্ত কাল এবং অনন্ত কালের প্রভাবে ও পরিচালনায় এই গুণগুলির সমন্বয় ঘটে এবং তার ফলে প্রকৃতি সক্রিয় হয়ে ওঠে—একে বলা হয় কর্ম। অনন্ত কাল ধরে এই কর্মপ্রক্রিয়া ঘটে চলেছে। আমরা আমাদের কর্মের ফলস্বরূপ সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করি। যেমন, মনে করা যাক যে, আমি একজন ব্যবসায়ী, তখন আমি যদি বুদ্ধি খাটিয়ে কঠোর পরিশ্রম করে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করি, তবে আমি সেই অর্থ উপভোগ করতে পারি। কিন্তু আমি যদি আমার সমস্ত সম্পদ অপচয় করে ফেলি, তবে আমাকে ক্লেশ স্বীকার করতেই হবে। সেই

রকম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা আমাদের কর্মের ফলস্বরূপ সুখ অথবা দুঃখ পেয়ে থাকি।

ভগবদ্গীতায় ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম—এই সব কিছুরই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই পাঁচটির মধ্যে ঈশ্বর, জীব, জড়া প্রকৃতি ও কাল হচ্ছে নিত্য। প্রকৃতির অভিপ্রকাশ অনিত্য হতে পারে, কিন্তু তা মিথ্যা নয়। কোন কোন দার্শনিক বলে থাকেন যে, জড়া প্রকৃতির প্রকাশ মিথ্যা, কিন্তু *ভগবদ্গীতার* দর্শন বা বৈষ্ণব দর্শন তা স্বীকার করে না। প্রকৃতির প্রকাশ যদিও সাময়িক, তবুও তা সত্য। তাকে আকাশে ভাসমান মেঘ অথবা শস্যের পুষ্টি সাধনকারী বর্ষা ঋতুর সঙ্গে তুলনা করা চলে। যখন বর্ষা ঋতু শেষ হয়ে যায় এবং মেঘ ভেসে চলে যায়, তখন সমস্ত শস্যকণা যা বৃষ্টির ফলে পুষ্ট হয়েছিল, তা শুকিয়ে যায়। তেমনই কোন এক সময়ে এই জড় জগতের প্রকাশ হয়, কিছুকালের জন্য তার স্থিতি হয় এবং তারপর তা অন্তর্হিত হয়ে যায়। প্রকৃতি এভাবে কাজ করে চলে। এভাবে অনন্তকাল ধরে প্রকৃতির প্রকাশ, স্থিতি ও অন্তর্ধান হয়ে চলেছে। তাই প্রকৃতি নিত্য, প্রকৃতি মিথ্যা নয়। ভগবান তাই একে বলেছেন, "আমার প্রকৃতি।" এই জড়া প্রকৃতি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের ভিন্না প্রকৃতি। তেমনই জীবও হচ্ছে ভগবানের শক্তি, তবে তারা বিচ্ছিন্ন নয়, ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কযুক্ত। তাই ঈশ্বর, জীব, জড়া প্রকৃতি ও কাল একে অপরের সঙ্গে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং সকলেই নিত্য। কিন্তু অন্য বিষয় কর্ম নিত্য নয়। বস্তুত কর্মের ফল অতি প্রাচীন হতে পারে। স্মরণাতীত কাল থেকে কর্মের ফলস্বরূপ আমরা সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করছি। কিন্তু আমরা আমাদের কর্মফলকে পরিবর্তিত করতে পারি এবং এই পরিবর্তন নির্ভর করে আমাদের জ্ঞানের পূর্ণতার উপর। আমরা নানা রকমের কর্ম সম্পাদন করি। নিঃসন্দেহে আমরা জানি না, কোন্ কর্ম আমাদের করা উচিত এবং কোন্ কর্ম করা উচিত নয়। বিশেষ করে আমরা জানি না, কোন্ কর্ম করলে কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান তার ব্যাখ্যা করে আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন কোন্ কর্ম করা আমাদের কর্তব্য।

ঈশ্বর হচ্ছেন পরম চেতনার উৎস। জীব ঈশ্বরের অপরিহার্য অংশ, তাই সেও চেতন। জীব ও জড়া প্রকৃতি উভয়কেই প্রকৃতি বা ভগবানের শক্তি বলা হয়। কিন্তু তার মধ্যে জীবই কেবল চেতন—জড়া প্রকৃতি অচেতন। সেটিই হচ্ছে পার্থক্য। তাই জীব-প্রকৃতিকে উৎকৃষ্টতর প্রকৃতি বলা হয়, কেন না জীব ভগবানের মতো চৈতন্যময়। ঈশ্বর কিন্তু পরম চৈতন্যময়, কেউ যদি বলে যে, জীবও পরম চৈতন্যময়, তবে তা ভুল হবে। জীব কোন অবস্থাতেই সমস্ত চেতনার উৎস হতে

পারে না। জীব তার সিদ্ধি লাভের কোন অবস্থাতেই পরম চৈতন্যময় হতে পারে না, এবং জীব তা হতে পারে কোন মতবাদে যদি বলে, তবে সেটি বিভ্রান্তিকর মতবাদ। সে চৈতন্যময় বটে, কিন্তু পরম চৈতন্যময় নয়।

জীব ও ঈশ্বরের পার্থক্য *গীতার* ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, জীবের মতো ভগবানও ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ চেতন, তবে জীব কেবল তার নিজের দেহটি সম্বন্ধে সচেতন, কিন্তু ভগবান সমস্ত দেহ সম্বন্ধেই সচেতন। যেহেতু তিনি সকলের হৃদয়ে অবস্থান করেন, তাই তিনি সকলের অন্তরতম প্রদেশের কথা জানেন। এই কথা আমাদের ভুললে চলবে না। এই সম্বন্ধে আরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান পরমাত্মারূপে সর্বজীবের অন্তরে অধিষ্ঠিত এবং জীবের বাসনা অনুসারে তিনিই তাদের পরিচালিত করেন। মোহাচ্ছন্ন হয়ে জীব তার কর্তব্যকর্ম ভুলে যায়। প্রথমত তার স্বাধীন ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে সে কোন কিছু করার সংকল্প করে, এবং তারপর সে নিজের কর্মের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সে এক দেহ পরিত্যাগ করে আর এক দেহ ধারণ করে—যেমন আমরা পুরাতন কাপড় ফেলে দিয়ে নতুন কাপড় পরি। এভাবে পূর্বকৃত কর্মের ফলস্বরূপ আত্মা এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয় এবং তার বিগত কর্ম অনুসারে সে নানা রকম কষ্ট পায়। কিন্তু জীব যখন সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হয়ে প্রকৃতিস্থ হয় এবং তার কর্তব্যকর্ম সম্বন্ধে সচেতন হয়, তখনই সে তার পূর্বকৃত কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। তখন আর তাকে তার পূর্বকৃত কর্মের ফল ভোগ করতে হয় না। এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, কর্ম নিত্য নয়। তাই *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি ও কাল হচ্ছে নিত্য, কিন্তু কর্ম অনিত্য।

পরম চৈতন্যময় ঈশ্বর ও জীব গুণগতভাবে এক। ঈশ্বরের পরম চৈতন্য এবং জীবের অণুচেতনা, উভয়েই অপ্রাকৃত। এমন নয় যে, জড় বস্তুর সংস্পর্শে আসার ফলে জীবের চেতনার বিকাশ হয়। এই ধারণাটি ভ্রান্ত। কোন বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশে জড়ের মধ্য থেকে চেতনের উদ্ভব হয়, সেই কথা *গীতায়* স্বীকার করা হয়নি। জড়া প্রকৃতির প্রভাবে চেতনার বিকৃত প্রতিফলন হতে পারে এবং তা হচ্ছে রঙিন কাঁচের মাধ্যমে প্রতিফলিত রঙিন আলোকের মতো। কিন্তু পরমেশ্বরের চেতনা কখনই জড়া প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত বা কলুষিত হয় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ*—"আমার দ্বারা পরিচালিত প্রকৃতি।" তিনি যখন এই জড় জগতে অবতরণ করেন, তখন তাঁর চেতনা জড়া প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না। তাই যদি হত, তবে তিনি পরম তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত *ভগবদ্গীতার* জ্ঞান

দান করতে পারতেন না। জড়া প্রকৃতির দ্বারা চেতনা যতক্ষণ কলুষিত থাকে, ততক্ষণ অপ্রাকৃত জগৎ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ব্যক্ত করা যায় না। ভগবান পরম চৈতন্যময় এবং তিনি জড়া প্রকৃতির কলুষ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। তাই, অপ্রাকৃত জগতের পূর্ণ জ্ঞান কেবল তিনিই দান করতে পারেন। আমাদের চেতনা এখন জড়া প্রকৃতির প্রভাবে কলুষিত হয়ে আছে। তাই, *ভগবদ্গীতার* মাধ্যমে ভগবান আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, কিভাবে আমাদের চেতনা কলুষমুক্ত হয়ে পবিত্র হলে আমাদের অন্তর ভগবন্মুখী হয়ে ওঠে এবং তখন আমাদের সমস্ত কর্তব্যকর্মই ভগবানের ইচ্ছানুসারে সাধিত হয়, ফলে আমরা সুখী হতে পারি। এমন নয় যে, কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হলে আমাদের সমস্ত কর্তব্যকর্ম ত্যাগ করতে হবে। কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হবার উপায় হচ্ছে কর্তব্যকর্মকে পবিত্র করা। এই পবিত্র কর্মেরই নাম ভক্তি। ভক্তির বশবর্তী হয়ে যে কর্ম করা হয়, আপাতদৃষ্টিতে তাকে সাধারণ কর্ম বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এই কর্মকে কোন রকম কলুষতা কখনও স্পর্শ করতে পারে না। ভগবানের ভক্তকে দেখে একজন মূর্খ লোক মনে করতে পারে যে, তিনি সাধারণ মানুষের মতোই কাজ করে চলেছেন, কিন্তু সেটি তার নির্বুদ্ধিতা। সে বুঝতে পারে যে, ভগবদ্ভক্ত অথবা ভগবানের কার্যকলাপ অপবিত্র চেতনা বা জড়ের দ্বারা কলুষিত হয় না। সেই সমস্ত ত্রিগুণাতীত। তবে আমাদের মনে রাখা উচিত যে, আমাদের চেতনা এখন কলুষিত এবং তাই ভক্তিযোগ সাধন করার মাধ্যমে আমাদের চেতনাকে কলুষমুক্ত করতে হবে।

আমরা যখন জড়ের প্রভাবে কলুষিত থাকি, তখন আমাদের সেই অবস্থাকে বলা হয় বদ্ধ অবস্থা। এই বদ্ধ অবস্থায় আমাদের চেতনা বিকৃত হয়ে থাকে এবং তার ফলে আমরা মনে করি যে, জড় পদার্থ থেকে আমরা উদ্ভূত হয়েছি। এরই নাম অহঙ্কার। যে মানুষ তার দেহগত চিন্তায় মগ্ন, সে কখনও তার স্বরূপ জানতে পারে না। ভগবান *ভগবদ্গীতায়* বলেছিলেন, যাতে মানুষ তার দেহগত ভাবনাকে অতিক্রম করে তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। ভগবানের কাছ থেকে এই জ্ঞান লাভ করার জন্যই অর্জুন নিজেকে সেই অবস্থায় উপস্থাপিত করেছিলেন। দেহাত্মবুদ্ধি থেকে অবশ্যই মুক্তিলাভ করতে হবে; অধ্যাত্মবাদীদের সেটিই প্রাথমিক কর্তব্য। এই জড় বন্ধন থেকে যে মুক্ত হতে চায়, তাকে প্রথমে জানতে হবে যে, তার প্রকৃত স্বরূপ তার জড় দেহটি নয়। মুক্তির অর্থই হচ্ছে জড় চেতনা থেকে মুক্ত হওয়া। *শ্রীমদ্ভাগবতেও* মুক্তির অর্থ ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে, *মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ*—মুক্তির অর্থ হচ্ছে এই জড় জগতের কলুষিত চেতনা থেকে মুক্ত হয়ে শুদ্ধ চেতনার স্তরে অবস্থিত হওয়া।

ভগবদ্গীতার প্রতিটি নির্দেশই এই পবিত্র শুদ্ধ চেতনার স্তরে অবস্থিত হওয়ার কথা বলছে এবং তাই আমরা দেখতে পাই যে, *ভগবদ্গীতার* শেষ পর্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে জিজ্ঞেস করছেন যে, তাঁর চেতনা কলুষমুক্ত হয়ে পবিত্র হয়েছে কি না। পবিত্র বা বিশুদ্ধ চেতনা বলতে বোঝায় ভগবানের নির্দেশ অনুসারে কর্ম করা। এই হচ্ছে বিশুদ্ধ চেতনার মর্মার্থ। আমরা যেহেতু ভগবানের অপরিহার্য অংশ, তাই আমরা চেতন, কিন্তু জড় প্রকৃতির সান্নিধ্যে আসার ফলে প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা আমাদের চেতনা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে। কিন্তু ভগবান যেহেতু পরমেশ্বর, তাই তিনি কখনই এর দ্বারা প্রভাবান্বিত হন না। ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র জীব ও ভগবানের মধ্যে এটিই হচ্ছে পার্থক্য।

এই চেতনা বলতে কি বোঝায়? এই চেতনা হচ্ছে "আমি আছি।" তারপর আমি কি? কলুষিত চেতনায় এই আমি মানে, "আমি হচ্ছি সমস্ত জগতের অধীশ্বর। আমি হচ্ছি ভোক্তা।" এই জগৎ প্রতিনিয়তই আবর্তিত হচ্ছে, কারণ প্রত্যেকটি জীবসত্তা মনে করে যে, সে হচ্ছে এই জড় জগতের স্রষ্টা ও অধীশ্বর। জড় চেতনার দুটি প্রকাশ হয়। তার একটির প্রভাবে জীব মনে করে সে হচ্ছে স্রষ্টা এবং অন্যটির প্রভাবে সে মনে করে সে হচ্ছে ভোক্তা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবানই হচ্ছেন সব কিছুর স্রষ্টা ও ভোক্তা, আর জীব ভগবানের অপরিহার্য অংশ হবার ফলে সে স্রষ্টাও নয়, ভোক্তাও নয়, সে হচ্ছে সহায়ক। সে হচ্ছে সৃষ্ট ও ভোগ্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, একটি যন্ত্রের একটি অংশ যেমন সমগ্র যন্ত্রটির পরিচালনায় সহযোগিতা করে, ঠিক তেমনই ভগবানের অংশ হবার ফলে জীবের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের কাজে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করা। হাত, পা, চোখ, মুখ আদি হচ্ছে দেহের অংশ, কিন্তু তারা কখনই ভোক্তা নয়। ভোক্তা হচ্ছে উদর, এগুলি সমষ্টিগতভাবে কাজ করে উদরকে ভোগ করতে সাহায্য করে। যেমন পা দেহকে বহন করে নিয়ে চলে, হাত খাদ্য সংগ্রহ করে, দাঁত চর্বণ করে। এভাবে সমস্ত দেহই উদরকে ভোগ করতে সহযোগিতা করে, কারণ উদর তুষ্ট হলে সমস্ত দেহ পুষ্ট হয়। তাই সব কিছু উদরকে দেওয়া হয় এবং তার ফলে সমস্ত দেহ বলিষ্ঠ ও সক্রিয় হয়। গাছের গোড়ায় জল দিলে যেমন সমস্ত গাছটিকে জল দেওয়া হয়, উদরকে খাদ্য দিলে যেমন দেহকে খাদ্য দেওয়া হয়, ঠিক তেমনই পরম স্রষ্টা ও পরম ভোক্তা ভগবানের সৃষ্টিকার্যে ও ভোগের কার্যে সহযোগিতা করাই আমাদের কর্তব্য। এভাবে তাঁকে তুষ্ট করার ফলেই আমাদের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য সফল হয়। যদি হাতের আঙুল মনে করে, উদরকে না দিয়ে সে নিজেই সব কিছু খাবে, তা হলে তাকে

নিরাশ হতে হবে। ঠিক তেমনই জীব যদি মনে করে, ভগবানকে বাদ দিয়ে সে নিজেই সুখী হবে, তবে তাকে নিরাশ হতে হবে। ভগবান সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই হচ্ছেন একমাত্র ভোক্তা, আর সমস্ত জীব হচ্ছে তাঁর সহায়ক। ভগবানের সহায়তা করার মাধ্যমে জীব তার অস্তিত্বের সার্থকতা উপলব্ধি করতে পারে এবং তার ফলেই সে আনন্দ উপভোগ করতে পারে। ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক হচ্ছে প্রভু ও ভৃত্যের সম্পর্ক। প্রভু যদি সম্পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট হয়, তবে ভৃত্যও সন্তুষ্ট হয়। সেই রকম, পরমেশ্বর ভগবানকে সন্তুষ্ট করা উচিত। যদিও সৃষ্টিকর্তা হওয়ার প্রবণতা এবং জড় জগৎ উপভোগের প্রবণতা জীবদের মধ্যেও রয়েছে, কেন না প্রকাশমান জগতের সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে সেই একই প্রবণতা বিদ্যমান।

সুতরাং, *ভগবদ্গীতাতে* আমরা দেখতে পাব যে, পরম নিয়ন্তা, নিয়ন্ত্রণাধীন জীবসকল, নিখিল জগৎ, মহাকাল ও কর্ম—এই সব নিয়েই পূর্ণ সত্তা বিরাজিত, এবং সব কিছুরই আলোচনা এখানে ব্যাখ্যা করা আছে। এগুলি এক সাথে নিয়েই পূর্ণ পরম সত্তা গঠিত হয়। এই পূর্ণ সত্তাকে বলা হয় পরমতত্ত্ব। এই পূর্ণ সত্তা ও পূর্ণ পরমতত্ত্ব হচ্ছেন পূর্ণ পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাঁরই বিভিন্ন শক্তির ফলে সমস্ত কিছুরই অভিপ্রকাশ ঘটে থাকে। তিনিই হচ্ছেন সম্যক্‌ভাবে পূর্ণ।

গীতাতে এই কথাও বলা হয়েছে যে, নির্বিশেষ ব্রহ্মও হচ্ছে পূর্ণ পরম পুরুষের অধীন (*ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্*)। নির্বিশেষ ব্রহ্মের আরও বিশদ ব্যাখ্যা করে *ব্রহ্মসূত্রতে* বলা হয়েছে যে, নির্বিশেষ ব্রহ্ম হচ্ছে সূর্যরশ্মির মতো। নির্বিশেষ ব্রহ্ম হচ্ছে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের রশ্মিচ্ছটা। তাই, নির্বিশেষ ব্রহ্ম হচ্ছে পূর্ণ পরমতত্ত্বের অসম্পূর্ণ উপলব্ধি এবং পরমাত্মার ধারণাও সেই রকম। *ভগবদ্গীতার* পঞ্চদশ অধ্যায়ে দেখা যাবে যে, পরমাত্মা উপলব্ধিও ভগবানের পূর্ণ উপলব্ধি নয়। কারণ পরমাত্মা হচ্ছে ভগবানের আংশিক প্রকাশ। *ভগবদ্গীতাতে* আমরা জানতে পারি যে, পুরুষোত্তম ভগবান হচ্ছেন নির্বিশেষ ব্রহ্ম ও পরমাত্মা উভয়েরই ঊর্ধ্বে পরমতত্ত্ব। ভগবান হচ্ছেন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। *ব্রহ্মসংহিতার* শুরুতেই বলা হয়েছে—*ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ/অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্*। "পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বা গোবিন্দ হচ্ছেন সর্বকারণের কারণ, অনাদির আদি গোবিন্দ এবং সৎ, চিৎ ও আনন্দের মূর্তবিগ্রহ হচ্ছেন তিনিই।" ব্রহ্ম-উপলব্ধি হচ্ছে তাঁর *সৎ* (শাশ্বত সনাতন) বৈশিষ্ট্যের উপলব্ধি। পরমাত্মা-উপলব্ধি হচ্ছে *সৎ-চিৎ* (অনন্ত জ্ঞান) রূপের উপলব্ধি। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করা হচ্ছে তাঁর *সৎ*, *চিৎ* ও *আনন্দের* অপ্রাকৃত রূপকে পূর্ণভাবে অনুভব করা।

অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা মনে করে যে, পরমতত্ত্ব হচ্ছেন নির্বিশেষ, তাঁর কোন রূপ নেই, কোন আকার নেই, কিন্তু তাদের এই ধারণাটি ভুল। তিনি হচ্ছেন অপ্রাকৃত চিন্ময় পুরুষ; সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে এই কথা দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। *নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্*। (*কঠ উপনিষদ* ২/২/১৩) যেমন আমরা সকলে স্বতন্ত্র জীব এবং আমাদের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য আছে, তেমনই পরম-তত্ত্বের সর্বোচ্চ স্তরে যিনি সর্বকারণের কারণ, তাঁরও রূপ আছে। তিনি পুরুষ, তিনি ভগবান এবং প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সমস্ত কিছুর উৎস হচ্ছেন তিনিই। তাঁকে উপলব্ধি করা হলে তাঁর অপ্রাকৃত রূপের সব কিছুই উপলব্ধি করা হয়ে যায়। যিনি স্বয়ং পূর্ণ, তিনি কখনই নির্বিশেষ হতে পারেন না। যদি তিনি নির্বিশেষ হন, যদি তিনি কোন কিছু থেকে ন্যূন হন, তবে তিনি পূর্ণ হবেন কেমন করে? আমাদের অভিজ্ঞতায় যা আছে এবং যা আমাদের অভিজ্ঞতার অতীত, তা সবই ভগবানের মধ্যে বিদ্যমান। নতুবা তা পূর্ণতত্ত্ব হতে পারে না।

সম্যক্ সম্পূর্ণ পুরুষোত্তম ভগবানের মধ্যে রয়েছে বিপুল শক্তিরাজি (*পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে*)। শ্রীকৃষ্ণের শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ কিভাবে হয়, তাও *ভগবদ্গীতাতে* ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ অথবা অনিত্য জড় জগৎ, যাতে আমরা অধিষ্ঠিত হয়েছি, এটিও স্বয়ং পূর্ণ, কারণ যে চব্বিশটি উপাদান দ্বারা এই জড় জগৎ অনিত্যরূপে অভিব্যক্ত হয়েছে, সাংখ্য-দর্শন অনুযায়ী, তাদের সম্যক্‌রূপে সমন্বয়ের ফলে উদ্ভূত হয়েছে পূর্ণ সম্পদ, যা এই ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অপরিহার্য। এর মধ্যে কোন কিছুই অতিরিক্ত নেই, আবার অন্য কিছুর দরকারও নেই। এই অভিপ্রকাশের স্থায়িত্ব পরম পূর্ণের শক্তির দ্বারা নির্ধারিত নিজস্ব সময়ের উপর নির্ভরশীল। সেই সময় শেষ হয়ে গেলে, পরম পূর্ণের পূর্ণ ব্যবস্থার নির্দেশে এই অস্থায়ী অভিব্যক্তির লয় হয়ে যায়। এখানে জীবও তার ক্ষুদ্র সত্তা নিয়ে পূর্ণ এবং পরম পূর্ণ ভগবানকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করবার সমস্ত সুযোগ-সুবিধা সমস্ত জীবেরই আছে। স্বয়ংসম্পূর্ণ ভগবানের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অপূর্ণ, তাই আমরা সব রকমের অপূর্ণতা অনুভব করি। ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ণ প্রকাশ হয়েছে *বেদে* এবং বৈদিক জ্ঞান পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে *ভগবদ্গীতাতে*।

বেদের সমস্ত জ্ঞানই অভ্রান্ত। হিন্দুরা জানে যে, *বেদ* পূর্ণ ও অভ্রান্ত। যেমন *স্মৃতি*, অর্থাৎ বৈদিক অনুশাসন অনুযায়ী পশুর মল অপবিত্র এবং তা স্পর্শ করলে স্নান করে পবিত্র হতে হয়। আবার বৈদিক শাস্ত্রেই বলা হচ্ছে যে, গোময় পশুর মল হলেও তা পবিত্র, এমন কি কোন স্থান যদি অপবিত্র হয়ে থাকে, তবে সেখানে

গোময় লেপন করলে তা পবিত্র হয়ে যায়। আপাতদৃষ্টিতে এটি পরস্পরবিরোধী উক্তি বলে মনে হতে পারে, কিন্তু বৈদিক অনুশাসন বলেই এটি গ্রহণ করা হয়েছে এবং এটি গ্রহণ করে কেউ ভুল করেছে, তা বলা হয় না। পরবর্তী কালে আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয়েছে যে, গোময়ে সব কয়টি জীবাণুনাশক গুণ বর্তমান রয়েছে। সুতরাং বৈদিক জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে অভ্রান্ত এবং তাই *বেদকে* নিঃশঙ্কচিত্তে অনুসরণ করা যায়। বৈদিক জ্ঞান সব রকম সন্দেহ ও ভ্রান্তির অতীত, এবং *ভগবদ্গীতা* হচ্ছে সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারাংশ।

বৈদিক জ্ঞান নিয়ে গবেষণা চলে না। গবেষণা বলতে সাধারণত যা বোঝায়, তা ত্রুটিপূর্ণ, কারণ ত্রুটিপূর্ণ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ঐ সব গবেষণা হয়ে থাকে। ত্রুটিহীন, অভ্রান্ত জ্ঞান আমাদের *ভগবদ্গীতা* থেকে গ্রহণ করতে হবে, যার উৎস হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান এবং যা গুরু-শিষ্য পরম্পরাক্রমে সম্পূর্ণ অপরিবর্তিতভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। অর্জুন যখন শিষ্যরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে *গীতার* জ্ঞান আহরণ করেন, তখন তিনি কোন রকম বাদানুবাদ না করে, ভগবানের মুখনিঃসৃত বাণীকে পরম সত্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। *ভগবদ্গীতাকে* আংশিকভাবে গ্রহণ করা চলে না। আমরা বলতে পারি না যে, *ভগবদ্গীতার* একটি অংশ আমরা গ্রহণ করব, আর বাকিটা গ্রহণ করব না। *ভগবদ্গীতার* বাণী সম্পূর্ণ অপরিবর্তিতভাবে খেয়ালখুশি মতো বাদ না দিয়ে কিংবা মনগড়া ব্যাখ্যা না করেই আমাদের গ্রহণ করতে হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যেভাবে তা বলেছিলেন, ঠিক সেভাবেই *ভগবদ্গীতার* যথাযথ নির্দেশ গ্রহণ করতে হবে। আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে, *গীতা* হচ্ছে বৈদিক জ্ঞানের পূর্ণ প্রকাশ। বৈদিক জ্ঞান এই জড় জগতের জ্ঞান নয়, এর প্রবর্তক হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান, তাই *বেদের* জ্ঞান হচ্ছে দিব্যজ্ঞান। অপ্রাকৃত উৎস থেকে বৈদিক জ্ঞান গ্রহণ করতে হয় এবং এর প্রথম বাণী নিঃসৃত হয়েছিল স্বয়ং ভগবানের কাছ থেকেই। ভগবানের মুখনিঃসৃত বাণীকে বলা হয় *অপৌরুষেয়,* অর্থাৎ ভগবানের কথা সাধারণ মানুষের কথার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ, সাধারণ মানুষ চারটি ত্রুটির দ্বারা কলুষিত—১) ভ্রম, ২) প্রমাদ, ৩) বিপ্রলিপ্সা, ৪) করণাপাটব। ভ্রম—সাধারণ মানুষ অবধারিতভাবে ভুল করে; প্রমাদ—সে মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন, বিপ্রলিপ্সা—সে অন্যকে প্রতারণা করতে চেষ্টা করে এবং করণাপাটব—সে তার ত্রুটিপূর্ণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সীমিত। এই সমস্ত ত্রুটি থাকার ফলে মানুষ সর্বপরিব্যাপ্ত পরম জ্ঞান গ্রহণ করতে ও প্রদান করতে অক্ষম।

বৈদিক জ্ঞান এই ধরনের ত্রুটিপূর্ণ জীবদের দ্বারা প্রদত্ত হয়নি। প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মার হৃদয়ে ভগবান সর্বপ্রথমে এই জ্ঞান প্রদান করেন, তারপর ব্রহ্মা যেভাবে পরমেশ্বরের কাছ থেকে সেই জ্ঞান পেয়েছিলেন, ঠিক সেভাবেই তাঁর সন্তান ও শিষ্যদের মধ্যে তা বিতরণ করেন। ভগবান হচ্ছেন পূর্ণ, জড়া প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা তাঁর কখনই প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাই যাঁরা যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন তাঁরা বুঝতে পারেন, ভগবানই হচ্ছেন আদি স্রষ্টা—ব্রহ্মাকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই হচ্ছেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছুর ভোক্তা। *ভগবদ্গীতার* একাদশ অধ্যায়ে ভগবানকে প্রপিতামহ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ তিনি পিতামহ ব্রহ্মারও পিতা। এভাবে সর্বত্রই আমরা দেখতে পাই যে, ভগবানই হচ্ছেন সব কিছুর স্রষ্টা। তাই আমাদের কখনই মনে করা উচিত নয়, আমরা কোন কিছুর মালিক। মালিক কেবল তিনিই, যিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। জীবন ধারণ করার জন্য যেটুকু প্রয়োজন এবং ভগবান আমাদের জন্য যতটুকু নির্ধারিত করে রেখেছেন, ঠিক ততটুকুই আমাদের গ্রহণ করা উচিত।

আমাদের জন্য ভগবান যতটুকু নির্ধারিত করে রেখেছেন, তা কিভাবে সদ্ব্যবহার করতে হবে তার অনেক সুন্দর সুন্দর উদাহরণ আছে। *ভগবদ্গীতাতেও* এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রারম্ভে অর্জুন ঠিক করেন তিনি যুদ্ধ করবেন না। এটি ছিল তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত। অর্জুন পরমেশ্বর ভগবানকে বলেন যে, সেই যুদ্ধে নিজের আত্মীয়-পরিজনদের হত্যা করে রাজ্যভোগ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।, দেহাত্মবুদ্ধির ফলে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন যে, তাঁর প্রকৃত স্বরূপ হচ্ছে তাঁর দেহ, এবং তাঁর দেহজাত আত্মীয়-পরিজন, ভাই, ভাইপো, ভগ্নীপতি, পিতামহ প্রভৃতিকে তিনি তাঁর আপনজন বলে মনে করেছিলেন। তাই তিনি তাঁর দেহের দাবিগুলি মেটাতে চেয়েছিলেন। তাঁর ঐ ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করার জন্যই ভগবান *ভগবদ্গীতার* দিব্যজ্ঞান তাঁকে দান করেন। এই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে তাঁর প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারার ফলেই অর্জুন ভগবানের পরিচালনায় যুদ্ধ করতে ব্রতী হন। তখন তিনি বলেন, *করিষ্যে বচনং তব*—"তুমি যা বলবে আমি তাই করব।"

এই পৃথিবীতে মানুষ কুকুর-বেড়ালের মতো ঝগড়া করে দিন কাটাবার জন্য আসেনি। তাকে তার বুদ্ধিমত্তা দিয়ে মানব-জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে এবং একটি পশুর মতো জীবন যাপন করা বর্জন করতে হবে। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র মানব-জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছে, এবং সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারাংশ ব্যক্ত হয়েছে *ভগবদ্গীতাতে*। বৈদিক সাহিত্য মানুষের জন্য,

পশুদের জন্য নয়। তাই প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হচ্ছে বৈদিক জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করে মানবজীবন সার্থক করে তোলা। কোন পশু যখন অন্য পশুকে হত্যা করে, তাতে তার পাপ হয় না, কিন্তু মানুষ যদি তার বিকৃত রুচির তৃপ্তি সাধনের জন্য কোন পশুকে হত্যা করে, তখন সে প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করার অপরাধে অপরাধী হয়। *ভগবদ্গীতাতে* বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, প্রকৃতির বিভিন্ন গুণ অনুসারে তিন রকমের কর্ম সাধিত হয়, যথা—সত্ত্বগুণের প্রভাবে কর্ম, রজোগুণের প্রভাবে কর্ম এবং তমোগুণের প্রভাবে কর্ম। তেমনই আহার্য বস্তুও আছে তিন ধরনের—সত্ত্বগুণের আহার, রজোগুণের আহার, আর তমোগুণের আহার। এই সবই পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা আছে এবং যদি আমরা *ভগবদ্গীতার* এই সব নির্দেশ যথার্থভাবে কাজে লাগাই, তা হলে আমাদের সারা জীবন পবিত্র হয়ে উঠবে এবং পরিণামে আমরা এই জড় জগতের আকাশের ঊর্ধ্বে আমাদের পরম লক্ষ্যে উপনীত হতে পারব (*যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম*)।

এই পরম গন্তব্যস্থলের নাম 'সনাতন ধাম'। সেই নিত্য শাশ্বত অপ্রাকৃত জগৎই হচ্ছে আমাদের প্রকৃত আলয়। এই জড় জগতে আমরা দেখতে পাই সব কিছু অস্থায়ী। তাদের প্রকাশ হয়, কিছুকালের জন্য তারা অবস্থান করে, কিছু ফল প্রসব করে, ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং তারপর এক সময় তারা অদৃশ্য হয়ে যায়। এটিই হচ্ছে এই জড় জগতের ধর্ম, আমাদের এই দেহ, অথবা এক টুকরো ফল অথবা অন্য যে-কোন কিছুরই দৃষ্টান্ত আমরা দিই না কেন। কিন্তু এই অস্থায়ী জগতের অতীত আর একটি জগৎ আছে, যার কথা আমরা জানতে পারি বৈদিক শাস্ত্রের মাধ্যমে। সেই জগৎ শাশ্বত, সনাতন। বৈদিক শাস্ত্রের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি জীবও শাশ্বত, সনাতন। *ভগবদ্গীতার* একাদশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, ভগবান সনাতন এবং সনাতন ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হবার ফলে জীবাত্মাও সনাতন। ভগবানের সঙ্গে আমাদের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রয়েছে, এবং যেহেতু গুণগতভাবে সনাতন ধাম, সনাতন ভগবান ও সনাতন জীব—সবই এক, তাই *ভগবদ্গীতার* একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের সনাতন বৃত্তি অথবা আমাদের সনাতন ধর্মকে পুনর্জাগরিত করা। অস্থায়ীভাবে আমরা নানা ধরনের কর্মে নিয়োজিত হয়ে রয়েছি, কিন্তু এই সমস্ত কর্ম পবিত্রতা অর্জন করতে পারে, যদি আমরা এই সমস্ত অস্থায়ী কর্ম বর্জন করি আর পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ মতো কর্মভার গ্রহণ করি। এরই নাম পবিত্র জীবন।

ভগবান ও তাঁর দিব্যধাম উভয়ই সনাতন। জীবও সনাতন। জীব যখন তার সনাতন প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তুলে সনাতন ধামে ভগবানের সান্নিধ্যে আসে, তখনই

তার জীবন সার্থক হয়ে ওঠে। যেহেতু সমস্ত জীব পরমেশ্বরেরই সন্তান, সেই কারণে তাদের সকলেরই প্রতি তিনি পরম করুণাময়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতাতে* (১৪/৪) বলেছেন, *সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ/তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা*—"হে কৌন্তেয়! সমস্ত যোনিতে যে সমস্ত দেহ উৎপন্ন হয়, ব্রহ্মরূপা প্রকৃতিই তাদের জননী এবং আমিই বীজ প্রদানকারী পিতা।" অবশ্যই বিভিন্ন কর্ম অনুসারে সব রকমের জীব রয়েছে, কিন্তু এখানে ভগবান বলেছেন যে, তিনি সকলেরই পিতা। তাই এই পৃথিবীতে ভগবান অবতরণ করেন এই সমস্ত পতিত, বদ্ধ জীবাত্মাদের উদ্ধার করবার জন্য, যাতে তারা তাদের শাশ্বত সনাতন অবস্থা ফিরে পেয়ে ভগবানের সঙ্গে চিরন্তন সঙ্গ লাভ করে এবং সনাতন শাশ্বত চিদাকাশে আবার অধিষ্ঠিত হতে পারে। ভগবান স্বয়ং বিভিন্ন অবতাররূপে অবতরণ করেন, কখনও বা তিনি তাঁর বিশ্বস্ত অনুচরকে অথবা তাঁর প্রিয় সন্তানকে পাঠান, কখনও বা তাঁর অনুগামী ভৃত্যকে বা আচার্যকে পাঠান বদ্ধ জীবাত্মাদের উদ্ধার করবার জন্য।

তাই সনাতন ধর্ম বলতে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মপদ্ধতিকে বোঝায় না। এটি হচ্ছে পরম শাশ্বত ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত নিত্য শাশ্বত জীবসকলের নিত্য ধর্ম। আগেই বলা হয়েছে, সনাতন ধর্ম হচ্ছে জীবের নিত্য ধর্ম। শ্রীপাদ রামানুজাচার্য *সনাতন* শব্দটির ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "যার কোন শুরু নেই এবং শেষ নেই।" তাই যখন আমরা সনাতন ধর্মের কথা বলি, শ্রীপাদ রামানুজাচার্যের নির্দেশানুসারে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এই ধর্মের আদি নেই এবং অন্ত নেই।

বর্তমান জগতে ধর্ম বলতে আমরা সাধারণত যা বুঝি, সনাতন ধর্ম ঠিক তা নয়। ধর্ম বলতে সাধারণত কোন বিশ্বাসকে বোঝায়, এবং এই বিশ্বাসের পরিবর্তন হতে পারে। কোন বিশেষ পন্থার প্রতি কারও বিশ্বাস থাকতে পারে, এবং সে এই বিশ্বাসের পরিবর্তন করে অন্য কিছু গ্রহণ করতেও পারে। কিন্তু সনাতন ধর্ম বলতে সেই সব কার্যকলাপকে বোঝায়, যা পরিবর্তন হতে পারে না। যেমন, জল থেকে তার তরলতা কখনই বাদ দেওয়া যায় না, আগুন থেকে যেমন তাপ ও আলোককে বাদ দেওয়া যায় না, তেমনই সনাতন জীবের সনাতন বৃত্তি জীবের থেকে আলাদা করা যায় না। জীবের সঙ্গে তার সনাতন ধর্ম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। সুতরাং যখন আমরা সনাতন ধর্মের কথা বলি, তখন শ্রীপাদ রামানুজাচার্যের প্রামাণ্য ভাষ্য মেনে নিতে হবে যে, এর কোন আদি-অন্ত নেই। যার কোন আদি নেই, অন্ত নেই, সেই ধর্ম কখনই সাম্প্রদায়িক হতে পারে না। এই ধর্ম সমস্ত জীবের ধর্ম, তাই তাকে কখনই কোন সীমার মধ্যে সীমিত রাখা যায় না। একে

কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে বদ্ধ রাখাও চলে না। কিন্তু তবুও কিছু সাম্প্রদায়িক লোক মনে করে যে, 'সনাতন ধর্মও' একটি সাম্প্রদায়িক ধর্ম, কিন্তু এটি তাদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্কীর্ণতা ও বিকৃত বুদ্ধিজাত অন্ধতার প্রকাশ। আমরা যখন আধুনিক বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে সনাতন ধর্মের যথার্থতা বিশ্লেষণ করি, তখন দেখি যে এই ধর্ম পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের ধর্ম—শুধু তাই নয়, এই ধর্ম সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি জীবের ধর্ম।

অসনাতন ধর্মবিশ্বাসের সূত্রপাতের ইতিহাস পৃথিবীর ইতিহাসের বর্ষপঞ্জিতে লেখা থাকতে পারে, কিন্তু সনাতন ধর্মের সূত্রপাতের কোন ইতিহাস নেই, কারণ সনাতন ধর্ম সনাতন জীবের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত থেকে চিরকালই বর্তমান। জীব সম্বন্ধেও শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, সে জন্ম-মৃত্যুর অতীত। *ভগবদ্গীতাতে* বলা হয়েছে যে, জীবের জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। সে শাশ্বত ও অবিনশ্বর এবং তার দেহের মৃত্যু হলেও তার কখনই মৃত্যু হয় না। সনাতন ধর্ম বলতে যে ধর্ম বোঝায়, তা আমাদের বুঝতে হবে *ধর্ম* কথাটির সংস্কৃত অর্থের মাধ্যমে। *ধর্ম* বলতে বোঝায় যা অপরিহার্য অঙ্গরূপে কোন কিছুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকে। যেমন, তাপ ও আলোক এই দুটি গুণ আগুনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাপ ও আলোক ছাড়া আগুনের কোন রকম প্রকাশ হতে পারে না। তেমনই, জীবের অপরিহার্য অঙ্গ কি? জীবের অস্তিত্বের প্রকাশ কিভাবে হয়? তার নিত্য সঙ্গীরূপে যা তার সঙ্গে চিরকাল বিদ্যমান তা কি? তার এই নিত্য সঙ্গী হচ্ছে তার শাশ্বত গুণবৈশিষ্ট্য, এবং এই শাশ্বত গুণবৈশিষ্ট্যই হচ্ছে তার সনাতন ধর্ম।

সনাতন গোস্বামী যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেন, "জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের নিত্যদাস।" পরম পুরুষোত্তম ভগবানের নিত্যদাসত্বই হচ্ছে জীবের স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উক্তির বিশ্লেষণ যদি আমরা করি, তা হলে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, প্রতিটি জীবই সর্বক্ষণ কারও না কারও সেবায় ব্যস্ত। এভাবে অপরের সেবা করার মাধ্যমেই জীব জীবনকে উপভোগ করে। নীচুস্তরের পশুরা ভৃত্য যেভাবে প্রভুর সেবা করে, ঠিক সেভাবে মানুষের সেবা করে। মানুষের ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই যে, 'খ' প্রভুকে 'ক' সেবা করে, 'গ' প্রভুকে 'খ' সেবা করে, আর 'গ' সেবা করে 'ঘ' প্রভুকে। এভাবে সকলেই কারও না কারও দাসত্ব করে চলেছে। এই পরিবেশে আমরা দেখতে পাই, বন্ধু বন্ধুর সেবা করে, মা সন্তানের সেবা করে, স্ত্রী স্বামীর সেবা করে, স্বামী স্ত্রীর সেবা করে ইত্যাদি। এভাবে খোঁজ করলে দেখা যাবে যে, জীবকুলের সমাজে সেবামূলক কাজের কোন

অন্যথা নেই। রাজনীতিবিদেরা জনগণের কাছে তাদের নানা প্রতিশ্রুতি শুনিয়ে তাদের সেবার ক্ষমতা বোঝাবার চেষ্টা করে থাকে। ভোটদাতারা তাই মনে করে যে, রাজনীতিবিদেরা সমাজের খুব ভাল সেবা করতে পারবে, তাই তারা তাদের মূল্যবান ভোট তাদের দিয়ে দেয়। দোকানদার খরিদ্দারের সেবা করে এবং শিল্পী ধনিক সম্প্রদায়ের সেবা করে। ধনিক সম্প্রদায় তাদের পরিবারের সেবা করে এবং পরিবারের প্রতিটি সদস্য নিত্য জীবের নিত্য সামর্থ্য অনুযায়ী রাষ্ট্র ও সমাজের সেবা করে। এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, কোন জীবই অপর কোন জীবের সেবা না করে থাকতে পারে না। এর ফলে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, সেবা হচ্ছে জীবের সর্বকালীন সাথী এবং সেবাকার্যই হচ্ছে জীবের শাশ্বত ধর্ম।

তবুও মানুষ দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ইত্যাদির ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাসের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করার ফলে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হয়ে পড়ে। এই ধরনের ধর্মবিশ্বাস কখনই সনাতন ধর্ম নয়। কোন হিন্দু তার বিশ্বাস পরিবর্তন করে মুসলমান হতে পারে অথবা কোন মুসলমান তার ধর্ম পরিবর্তন করে হিন্দু হতে পারে, কিংবা কোন খ্রিস্টান তার বিশ্বাস বদলাতে পারে। কিন্তু এই ধর্ম-বিশ্বাসের পরিবর্তন হলেও, অপরকে সেবা করার যে শাশ্বত প্রবৃত্তি মানুষের আছে, তার কোন পরিবর্তন হয় না। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান যে কোন ধর্মাবলম্বীই হোক না কেন, মানুষ প্রতিনিয়তই অপরের সেবা করে চলেছে। তাই যে কোন ধর্ম-বিশ্বাসকে অবলম্বন করা এবং সনাতন ধর্মাচরণ করার অর্থ এক নয়। সেবা করাই হচ্ছে সনাতন ধর্ম।

বাস্তবিকই ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হচ্ছে সেবা করার সম্পর্ক। পরমেশ্বর হচ্ছেন পরম ভোক্তা এবং আমরা, জীবেরা হচ্ছি তাঁর সেবক। তাঁরই সন্তোষ বিধানের জন্য আমাদের সৃষ্টি হয়েছে এবং ভগবানকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা যদি সর্বদাই তাঁর সেবা করে চলি, তবেই আমরা সুখী হতে পারি। এ ছাড়া আর কোনভাবেই সুখী হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। উদরকে বাদ দিয়ে শরীরের কোন অঙ্গ যেমন স্বতন্ত্রভাবে সুখী হতে পারে না, আমরাও তেমন ভগবানের সেবা না করে সুখী হতে পারি না।

বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করা বা তাঁদের সেবা করা *ভগবদ্গীতাতে* অনুমোদন করা হয়নি। সপ্তম অধ্যায়ের বিংশতি শ্লোকে বলা হয়েছে—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥

"জড়-জাগতিক কামনা-বাসনা দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে, তারা তাদের স্বীয় স্বভাব অনুযায়ী এবং পূজার বিশেষ নিয়মবিধি পালন করে বিভিন্ন দেব-দেবীদের শরণাগত হয়।" এখানে পরিষ্কার ভাবেই বলা হয়েছে যে, যারা কামনা-বাসনা দ্বারা পরিচালিত হয়, তারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা না করে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করে। শ্রীকৃষ্ণ বলতে কোন সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি-বিশেষের নাম বোঝায় না। *শ্রীকৃষ্ণ* নামের অর্থ হচ্ছে পরম আনন্দ। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমস্ত আনন্দের উৎস, সমস্ত আনন্দের আধার। আমরা সকলেই আনন্দের অভিলাষী। *আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ* (*বেদান্তসূত্র* ১/১/১২)। ভগবানের অংশ হবার ফলে জীব চৈতন্যময় এবং তাই সে সর্বদাই আনন্দের অনুসন্ধান করে। ভগবান সদানন্দময়, তিনি সমস্ত আনন্দের আধার, তাই জীব যখন ভগবন্মুখী হয়ে সর্বতোভাবে ভগবানের সেবাপরায়ণ হয়ে তাঁর সান্নিধ্যে আসে, তখন তার চিরবাঞ্ছিত দিব্য আনন্দ সে অনুভব করতে পারে।

ভগবান এই মর্ত্যলোকে অবতরণ করেন তাঁর আনন্দময় বৃন্দাবন-লীলা প্রদর্শন করার জন্য। এই বৃন্দাবন-লীলা হচ্ছে আনন্দের চরম প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে থাকেন, তখন সেখানে রাখাল বালকদের সঙ্গে, গোপ-বালিকাদের সঙ্গে, বৃন্দাবনবাসীদের সঙ্গে এবং গাভীদের সঙ্গে তাঁর সমস্ত লীলা হচ্ছে দিব্য আনন্দে পরিপূর্ণ। বৃন্দাবনের প্রতিটি জীবই কৃষ্ণগত প্রাণ, শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই তাঁরা জানেন না। তিনি যে সব কিছুর পরম ভোক্তা, তাঁর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণই যে শ্রেষ্ঠ সমর্পণ এবং বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করাটা যে নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন, তা প্রতিপন্ন করবার জন্য তিনি তাঁর পিতা নন্দ মহারাজকেও ইন্দ্রের পূজা করা থেকে নিরস্ত করেন। কারণ তিনি প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন যে, অন্য কোন দেব-দেবীর পূজা করবার কোন দরকার নেই মানুষের। পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করাই প্রতিটি মানুষের একমাত্র কর্তব্য, কারণ মানব-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবৎ-ধামে ফিরে যাওয়া।

ভগবদ্গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আলয় ভগবৎ-ধামের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

ন তদ্ ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ ।
যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥

"আমার পরম ধাম সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি অথবা বৈদ্যুতিক আলোকের দ্বারা আলোকিত নয়। সেখানে একবার পৌঁছলে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না।"

এই শ্লোকে সেই চিরশাশ্বত অপ্রাকৃত আকাশের কথা বলা হয়েছে। আকাশ সম্বন্ধে আমাদের একটি জড়-জাগতিক ধারণা আছে। এই জড় আকাশের কথা যখনই আমরা ভাবি, তখন সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র আদির কথা আপনা থেকেই মনে আসে। কিন্তু এই শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, দিব্য আকাশকে আলোকিত করার জন্য সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি অথবা কোন বৈদ্যুতিক আলোর প্রয়োজন হয় না, কারণ সেই আকাশ দিব্য ব্রহ্মজ্যোতির দ্বারা আলোকিত। এই ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা। অন্যান্য গ্রহাদিতে পৌঁছানোর জন্য আমরা কঠিন পরিশ্রম করছি, কিন্তু পরমেশ্বরের আলয় সম্বন্ধে ধারণা করা কিছুই কঠিন নয়। ভগবানের দিব্য ধামের নাম গোলোক। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৭) এই গোলোকের খুব সুন্দর বিবরণ আছে—*গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতঃ।* ভগবান চিরকালই তাঁর আলয় গোলোকে অবস্থান করেন, তবু এই জগতে থেকেও তাঁর সমীপবর্তী হওয়া যায় এবং এই জগতে ভগবান তাঁর প্রকৃত সচ্চিদানন্দময় রূপ নিয়ে আবির্ভূত হন। তিনি যখন তাঁর এই রূপ নিয়ে প্রকাশিত হন, তখন আর তাঁর রূপ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করার কোন প্রয়োজনীয়তা আমাদের থাকে না। এই ধরনের জল্পনা-কল্পনা থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করবার জন্য তিনি তাঁর স্বরূপে অবতীর্ণ হন এবং তাঁর শ্যামসুন্দর রূপ প্রদর্শন করেন। দুর্ভাগ্যবশত অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা তাঁকে চিনতে পারে না এবং তাঁকে সাধারণ মানুষ বলে মনে করে উপহাস করে। ভগবান আমাদের কাছে আমাদেরই মতো একজনের রূপ নিয়ে আসেন এবং আমাদের সঙ্গে লীলাখেলা করেন, কিন্তু তাই বলে তাঁকে আমাদের মতো একজন বলে মনে করা উচিত নয়। তাঁর অনন্ত শক্তির প্রভাবে তিনি তাঁর অপ্রাকৃত রূপ নিয়ে আমাদের সামনে আসেন এবং তাঁর লীলা প্রদর্শন করেন। তাঁর আপন আলয় গোলোক বৃন্দাবনে তাঁর যে লীলা, এই লীলা তাঁরই প্রতিরূপ।

চিন্ময় আকাশের ব্রহ্মজ্যোতিতে অসংখ্য গ্রহ ভাসছে। এই ব্রহ্মজ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে পরম ধাম কৃষ্ণলোক থেকে এবং জড় পদার্থ দ্বারা গঠিত নয় সেই রকম অসংখ্য আনন্দময় চিন্ময় গ্রহ সেই ব্রহ্মজ্যোতিতেই ভাসছে। ভগবান বলেছেন—*ন তদ্ ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ / যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।* যে একবার সেই অপ্রাকৃত আকাশে যায়, তাকে আর এই জড় আকাশে নেমে আসতে হয় না। এই জড়-জাগতিক আকাশে, চাঁদের কথা ছেড়েই দিলাম, যদি মানুষ সবচেয়ে উর্ধ্বে যে ব্রহ্মলোক আছে সেখানেও যায়, তবে দেখবে যে, সেখানেও এখানকার মতো জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির হাত থেকে নিস্তার নেই। এই জড় জগতের কোন গ্রহলোকের পক্ষেই এই চারটি জড় নিয়মের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া সম্ভব নয়।

জীবসকল এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে ভ্রমণ করছে, কিন্তু যে-কোন গ্রহেই আমরা ইচ্ছা করলে যান্ত্রিক উপায়ে যেতে পারি না। অন্যান্য গ্রহে যেতে হলে তার জন্য একটি পদ্ধতি আছে। সেই সম্বন্ধে উল্লেখ আছে যে—*যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।* আমাদের গ্রহান্তরে ভ্রমণের জন্য কোন যান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। *গীতাতে* ভগবান বলেছেন—*যান্তি দেবব্রতা দেবান্।* চন্দ্র, সূর্য আদি উচ্চস্তরের গ্রহদের বলা হয় স্বর্গলোক। গ্রহমণ্ডলীকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে—স্বর্গলোক (উচ্চ), ভূলোক (মধ্য) ও পাতাললোক (নিম্ন)। পৃথিবী ভূলোকের অন্তর্গত। *ভগবদ্গীতা* থেকে আমরা জানতে পারি, কিভাবে আমরা দেবলোক বা স্বর্গলোকে অতি সহজ প্রক্রিয়ায় যেতে পারি—*যান্তি দেবব্রতা দেবান্।* কোন বিশেষ গ্রহের বিশেষ দেবতাকে পূজা করলেই সেই গ্রহে যাওয়া যায়। যেমন সূর্যদেবকে পূজা করলে সূর্যলোকে যাওয়া যায়। চন্দ্রদেবকে পূজা করলে চন্দ্রলোকে যাওয়া যায়। এভাবে যে-কোন উচ্চতর গ্রহলোকেই যাওয়া যায়।

কিন্তু *ভগবদ্গীতা* এই জড় জগতের কোন গ্রহলোকে যেতে উপদেশ দিচ্ছে না, কারণ জড় জগতের সর্বোচ্চলোক ব্রহ্মালোকে কোন ধরনের যান্ত্রিক কৌশলে হয়ত চল্লিশ হাজার বছর ভ্রমণ করে (আর ততদিন কেই বা বাঁচবে) গেলেও জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির জড়-জাগতিক ক্লেশ থেকে সেখানেও নিস্তার পাওয়া যাবে না। কিন্তু যদি কেউ পরম লোক কৃষ্ণলোকে কিংবা চিন্ময় আকাশের অন্য কোন গ্রহে যেতে চায়, তা হলে তাকে সেখানে এই সব জড়-জাগতিক দুর্দশা ভোগ করতে হবে না। চিন্ময় আকাশে যে সমস্ত গ্রহলোক আছে, তার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হচ্ছে গোলোক বৃন্দাবন, যেখানে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থাকেন। *ভগবদ্গীতায়* এই সব কিছুই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে কিভাবে সেই চিন্ময় আকাশে ফিরে গিয়ে প্রকৃতই আনন্দময় জীবন শুরু করা যায়, তার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

ভগবদ্গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে এই জড় জগতের প্রকৃত রূপের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্ ।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥

"ঊর্ধ্বমূল ও অধঃশাখাবিশিষ্ট একটি অশ্বত্থ গাছ রয়েছে। বৈদিক মন্ত্রগুলি হচ্ছে এর পাতা। যে এই গাছটিকে জানে, সে বেদকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছে।" এখানে জড় জগৎকে বলা হয়েছে ঊর্ধ্বমূল ও অধঃশাখাবিশিষ্ট একটি অশ্বত্থ গাছের

মতো। সাধারণত গাছের শাখা থাকে ঊর্ধ্বমুখী এবং তার মূল থাকে নিম্নমুখী। কিন্তু আমরা যখন জলাশয়ের সামনে দাঁড়িয়ে সেই জলে গাছের প্রতিবিম্ব দেখি, তখন দেখতে পাই তার মূল ঊর্ধ্বমুখী এবং তার শাখা অধোমুখী। সেই রকম, এই জড় জগৎ হচ্ছে অপ্রাকৃত জগতের প্রতিবিম্ব। প্রতিবিম্বের কোন স্থায়িত্ব নেই, সে শুধু একটি ছায়া মাত্র। কিন্তু এই ছায়া থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, প্রকৃত বস্তু রয়েছে। মরুভূমিতে জল নেই, কিন্তু মরীচিকার মাধ্যমে আমরা ইঙ্গিত পাই যে, জল বলে একটি পদার্থ আছে। জড় জগতে তেমনই জল নেই, আনন্দ নেই, কিন্তু প্রকৃত আনন্দের, বাস্তবিক জলের সন্ধান রয়েছে অপ্রাকৃত জগতে।

ভগবান ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, নিম্নলিখিত উপায়ে আমরা চিন্ময় জগৎ লাভ করতে পারি (*ভঃ গীঃ* ১৫/৫)—

নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥

সেই পদম্ অব্যয়ম্ বা নিত্য জগতে সে-ই যেতে পারে, যে *নির্মানমোহ* অর্থাৎ যে মোহমুক্ত হতে পেরেছে। এর অর্থ কি? এই জড় জগতে সকলেই কিছু না কিছু হতে চায়। কেউ চায় রাজা হতে, কেউ চায় প্রধানমন্ত্রী হতে, কেউ চায় ঐশ্বর্যশালী হতে, এভাবে সকলেই কিছু না কিছু হতে চায়। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই অভিলাষগুলির প্রতি আসক্ত থাকি, ততক্ষণ আমরা আমাদের দেহকে আমাদের স্বরূপ বলে মনে করি, কারণ দেহকে কেন্দ্র করেই এই সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি জন্ম নেয়। আমরা যে আমাদের দেহ নই, এই উপলব্ধিটাই হচ্ছে অধ্যাত্ম-উপলব্ধির প্রথম সোপান। জড় জগতের যে তিনটি গুণের দ্বারা আমরা আবদ্ধ হয়ে পড়ি, তার থেকে মুক্ত হওয়াটাই হচ্ছে আমাদের প্রথম কর্তব্য এবং তার উপায় হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি। ভক্তির মাধ্যমে ভগবানের সেবা করলে এই বন্ধন আপনা থেকেই খসে পড়ে। কামনা-বাসনার বশবর্তী হবার ফলে আমরা জড়া প্রকৃতির উপরে আধিপত্য করতে চাই এবং তার ফলে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ি। যতক্ষণ না আমরা আধিপত্য করার এই বাসনাকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করতে পারছি, ততক্ষণ আমরা জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের আলয় সনাতন ধামে ফিরে যেতে পারব না। সেই ভগবৎ-ধাম, যা সনাতন, সেখানে কেবল তাঁরাই যেতে পারেন, যাঁরা জড় জগতের ভোগ-বাসনার দ্বারা লালায়িত নন, যাঁরা ভগবানের

সেবায় নিজেদের সর্বতোভাবে নিয়োজিত করেছেন। কেউ এভাবে অধিষ্ঠিত হলে তিনি অনায়াসে পরম ধামে উপনীত হন।

ভগবদ্গীতায় অন্যত্র (৮/২১) বলা হয়েছে—

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্ ।
যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥

অব্যক্ত মানে অপ্রকাশিত। এমন কি এই জড় জগতের সব কিছু আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়নি। আমাদের জড় ইন্দ্রিয় এতই সীমিত যে, জড় আকাশে যে সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রাদি আছে, তাও আমাদের গোচরীভূত হয় না। বৈদিক সাহিত্যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য গ্রহ-নক্ষত্রের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা সেই সব বিশ্বাস করতে পারি অথবা বিশ্বাস নাও করতে পারি। বিশেষ করে *শ্রীমদ্ভাগবতে* এর বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। এই জড় আকাশের ঊর্ধ্বে যে অপ্রাকৃত লোক আছে, *শ্রীমদ্ভাগবতে* তাকে *অব্যক্ত* অর্থাৎ অপ্রকাশিত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই যে অপ্রাকৃত লোক যা নিত্য, সনাতন, যেখানে প্রতিনিয়ত দিব্য আনন্দের আস্বাদন পাওয়া যায়, যেখানে প্রতিনিয়ত ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করা যায়, সেই যে দিব্য জগৎ, তাই হচ্ছে মানব-জীবনের পরম লক্ষ্য—মানব-জীবনের পরম গন্তব্যস্থল। সেখানে একবার উত্তীর্ণ হলে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না। সেই পরম রাজ্যের জন্যই মানুষের বাসনা ও আগ্রহ থাকা উচিত।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে—কিভাবে সেই অপ্রাকৃত জগতে যাওয়া যায়? *ভগবদ্গীতার* অষ্টম অধ্যায়ে এই বিষয়ে তথ্য দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে—

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্ ।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥

"মৃত্যুকালে যিনি আমাকে স্মরণ করে শরীর ত্যাগ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ আমার ভাব প্রাপ্ত হন। এই বিষয়ে কোন সংশয় নেই।" (*ভঃ গীঃ* ৮/৫) মৃত্যুকালে শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করতে পারলেই শ্রীকৃষ্ণের কাছে ফিরে যাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের দিব্য রূপ স্মরণ করতে হবে; এই রূপ স্মরণ করতে করতে যদি কেউ দেহত্যাগ করে, তা হলে সে অবশ্যই দিব্য ধামে চলে যায়। এখানে *মদ্ভাবম্* বলতে পরমেশ্বর ভগবানের পরম ভাবের কথা বলা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সৎ-চিৎ-আনন্দ বিগ্রহ অর্থাৎ তাঁর রূপ নিত্য, জ্ঞানময় ও আনন্দময়। আমাদের এই জড় দেহ সৎ-চিৎ-আনন্দময় নয়। এই দেহ *অসৎ*, এই দেহের

কোন স্থায়িত্ব নেই। এই দেহ বিনাশ হয়ে যাবে। এই দেহ *চিৎ* বা জ্ঞানময় নয়, পক্ষান্তরে এই দেহ অজ্ঞানতায় পরিপূর্ণ। অপ্রাকৃত জগৎ সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান নেই, এমন কি এই জড় জগৎ সম্বন্ধেও আমাদের যে জ্ঞান আছে, তা ভ্রান্ত ও সীমিত। এই দেহ নিরানন্দ; আনন্দময় হবার পরিবর্তে এই দেহ দুঃখ-দুর্দশায় পরিপূর্ণ। এই জগতে যত রকমের দুঃখ-দুর্দশা আমরা পেয়ে থাকি, তা সবই এই দেহটির জন্যই। কিন্তু যখন আমরা এই দেহটিকে ত্যাগ করবার সময় পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য রূপটি স্মরণ করি, তখন আমরা জড় জগতের কলুষমুক্ত সৎ-চিৎ-আনন্দময় দিব্য দেহ প্রাপ্ত হই।

এই জগতে দেহত্যাগ করা এবং অন্য একটি দেহ লাভ করা প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা সুচারুভাবে পরিচালিত হয়। পরবর্তী জীবনে কে কি রকম দেহ প্রাপ্ত হবে, তা নির্ধারিত হবার পরেই মানুষ মৃত্যুবরণ করে। জীব নিজে নয়, তার থেকে উচ্চস্তরে যে-সমস্ত নির্ভরযোগ্য অধিকারীরা রয়েছেন, যাঁরা ভগবানের আদেশ অনুসারে এই জড় জগতের পরিচালনা করেন, তাঁরাই জীবের কর্ম অনুসারে তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করেন। আমাদের কর্ম অনুসারে আমরা ঊর্ধ্বলোকে উত্তীর্ণ হই অথবা নিম্নলোকে পতিত হই। এভাবেই প্রতিটি জীবন তার পরবর্তী জীবনের প্রস্তুতির কর্মক্ষেত্র। এই জীবনে যদি আমরা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবৎ-ধামে উত্তীর্ণ হবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারি, তবে এই দেহত্যাগ করবার পর আমরা অবশ্যই ভগবানের মতো সৎ-চিৎ-আনন্দময় দেহ প্রাপ্ত হয়ে ভগবৎ-ধামে ফিরে যেতে পারব।

পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি, বিভিন্ন ধরনের পরমার্থবাদী আছেন—ব্রহ্মবাদী, পরমাত্মবাদী ও ভক্ত। আর এই কথাও বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মজ্যোতিতে বা চিন্ময় আকাশে অগণিত চিন্ময় গ্রহাদি ভাসছে। এই সব গ্রহের সংখ্যা সমস্ত জড় জগতের গ্রহের থেকে অনেক বেশি। এই জড় জগতের আয়তন সৃষ্টির এক চতুর্থাংশের সমান বলে অনুমিত হয়েছে (*একাংশেন স্থিতো জগৎ*)। এই জড় জগতের অংশে অগণিত সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র সমন্বিত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সমস্ত জড় সৃষ্টি হচ্ছে সমগ্র সৃষ্টির এক অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। সৃষ্টির অধিকাংশই রয়েছে চিন্ময় আকাশে। পরমার্থবাদীদের মধ্যে যাঁরা নির্বিশেষবাদী, যাঁরা ভগবানের নিরাকার রূপকে উপলব্ধি করতে চান, তাঁরা ভগবানের দেহনির্গত ব্রহ্মজ্যোতিতে বিলীন হয়ে যান। এভাবে তাঁরা চিদাকাশ প্রাপ্ত হন। কিন্তু ভগবানের ভক্ত ভগবানের দিব্য সান্নিধ্য লাভ করতে চান, তাই তিনি বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হয়ে ভগবানের নিত্য সাহচর্য লাভ করেন। অসংখ্য

বৈকুণ্ঠলোকে ভগবান তাঁর অংশ-প্রকাশ—চতুর্ভুজ বিষ্ণু এবং প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, গোবিন্দ আদি রূপে তাঁর ভক্তদের সঙ্গদান করেন। তাই জীবনের শেষে পরমার্থবাদীরা ব্রহ্মজ্যোতি, পরমাত্মা কিংবা পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করে থাকেন। সকলের ক্ষেত্রেই তাঁরা চিদাকাশে উত্তীর্ণ হন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেবল ভগবানের ভক্তেরাই বৈকুণ্ঠলোকে অথবা গোলোক বৃন্দাবনে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। ভগবান এই বিষয়ে বলেছেন, "এতে কোনও সন্দেহ নেই।" এটি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেই হবে। আমাদের কল্পনার অতীত বলে এই কথা অবিশ্বাস করা উচিত নয়। আমাদের মনোভাব অর্জুনের মতো হওয়া উচিত—"তুমি যা বলেছ তা আমি সমস্তই বিশ্বাস করি।" তাই ভগবান যখন বলেছেন যে, মৃত্যুর সময় ব্রহ্ম, পরমাত্মা কিংবা পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য রূপের ধ্যান করলেই তাঁর আলয় অপ্রাকৃত জগতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, এই কথা ধ্রুব সত্য বলে গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

মৃত্যুর সময়ে ভগবানের রূপের চিন্তা করে চিন্ময় জগতে প্রবেশ করা যে সম্ভব, তা *ভগবদ্গীতায়* (৮/৬) বর্ণিত হয়েছে—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥

"যে যেভাবে ভাবিত হয়ে শরীর ত্যাগ করে, সে নিঃসন্দেহে সেই রকম ভাবযুক্ত শরীর প্রাপ্ত হয়।" এখন, আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে, জড়া প্রকৃতি হচ্ছে ভগবানের বহু শক্তির মধ্যে একটি শক্তির প্রকাশ। *বিষ্ণুপুরাণে* (৬/৭/৬১) ভগবানের শক্তির বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা ।
অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥

ভগবানের শক্তি বিচিত্র ও অনন্তরূপে প্রকাশিত। আমাদের সীমিত অনুভূতি দিয়ে তাঁর সেই শক্তি আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। কিন্তু মহাজ্ঞানী মুনি-ঋষিরা, যাঁরা মুক্ত পুরুষ, যাঁরা সত্যদ্রষ্টা, তাঁরা ভগবানের শক্তিকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং এই শক্তিকে তাঁরা তিনটি ভাগে বিভক্ত করে তার বিশ্লেষণ করেছেন। এই সমস্ত শক্তিই হচ্ছে বিষ্ণুশক্তির প্রকাশ, অর্থাৎ তাঁরা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বিভিন্ন শক্তি। সেই প্রথম শক্তিকে বলা হয় পরা শক্তি বা চিৎ-শক্তি। জীবও এই উৎকৃষ্ট শক্তি থেকে উদ্ভূত, সেই কথা ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে। ভগবানের এই অন্তরঙ্গা শক্তি ব্যতীত আর যে সমস্ত শক্তি, তাকে বলা হয় জড়া শক্তি।

এই সমস্ত শক্তি নিম্নতর শক্তি এবং সেগুলি তামসিক গুণের দ্বারা প্রভাবিত। মৃত্যুর সময় আমরা এই জড় জগতের তামসিক গুণের দ্বারা আচ্ছাদিত নিম্নতর শক্তিতে থাকতে পারি অথবা চিন্ময় জগতের চিৎ-শক্তিতে উত্তীর্ণ হতে পারি। তাই *ভগবদ্গীতায়* (৮/৬) বলা হয়েছে—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥

"যে যেভাবে ভাবিত হয়ে শরীর ত্যাগ করে, সে নিঃসন্দেহে সেই রকম ভাবযুক্ত শরীর প্রাপ্ত হয়।"

আমাদের জীবনে আমরা হয় জড়া শক্তি নতুবা চিৎ-শক্তির সম্বন্ধে ভাবতে অভ্যস্ত। এখন, আমাদের চিন্তা-ভাবনাকে জড়া শক্তি থেকে চিৎ-শক্তিতে কিভাবে রূপান্তরিত করতে পারি? খবরের কাগজ, উপন্যাস আদি নানা রকম বই আমাদের মনকে জড়া শক্তির ভাবনার যোগান দেয়। আমাদের চিন্তাধারা এই ধরনের সাহিত্যের দ্বারা আবিষ্ট হয়ে আছে বলেই আমরা উচ্চতর চিৎ-শক্তিকে উপলব্ধি করতে অক্ষম হয়ে পড়েছি। আমরা যদি এই চিৎ-শক্তিকে জানতে চাই, বা ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে চাই, তবে আমাদের বৈদিক সাহিত্যের শরণ নিতে হবে। মানুষকে অপ্রাকৃত জগতের সন্ধান দেবার জন্যই ভারতের মুনি-ঋষিদের মাধ্যমে ভগবান *বেদ, পুরাণ* আদি বৈদিক শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়েছেন। এই সমস্ত সাহিত্য মানুষের কল্পনাপ্রসূত নয়; এগুলি হচ্ছে সত্য দর্শনের বিশদ ঐতিহাসিক বিবরণ। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (*মধ্য* ২০/১২২) বলা হয়েছে—

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান ।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ ॥

স্মৃতিভ্রষ্ট জীবেরা ভগবানের সঙ্গে তাদের শাশ্বত সম্পর্কের কথা ভুলে গেছে এবং তাই তারা জড়-জাগতিক কার্যকলাপে মগ্ন হয়ে আছে। তাদের চিন্তাধারাকে অপ্রাকৃত স্তরে উন্নীত করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বহু বৈদিক শাস্ত্র প্রদান করেছেন। প্রথমে তিনি *বেদকে* চার ভাগে ভাগ করেন। তারপর *পুরাণে* তিনি তাদের ব্যাখ্যা করেন এবং অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের জন্য তিনি *মহাভারত* রচনা করেন। এই *মহাভারতে* তিনি *ভগবদ্গীতার* বাণী প্রদান করেন। তারপর সমস্ত বৈদিক সাহিত্যের সংক্ষিপ্তসার *বেদান্তসূত্র* প্রণয়ন করেন। *বেদান্তসূত্রকে* সহজবোধ্য করে তিনি তার ভাষ্য *শ্রীমদ্ভাগবত* রচনা করেন। মনোনিবেশ সহকারে এই সমস্ত বৈদিক সাহিত্য অধ্যয়ন করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। জড় জগতে আবদ্ধ

সাংসারিক লোকেরা যেমন খবরের কাগজ, নানা রকমের পত্রিকা, নাটক, নভেল আদি পড়ে থাকে এবং তার ফলে জড় জগতের প্রতি তাদের মোহমুগ্ধ অনুরাগ গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে, তেমনই যারা ভগবানের স্বরূপশক্তিকে উপলব্ধি করে ভগবৎ-ধামে ফিরে যেতে চায়, তাদের কর্তব্য হচ্ছে মহামুনি ব্যাসদেবের রচিত বৈদিক সাহিত্য অধ্যয়ন করা। বৈদিক সাহিত্য অধ্যয়ন করার ফলে আমরা জানতে পারি—ভগবান কে, তাঁর স্বরূপ কি, আমাদের সঙ্গে তাঁর কি সম্পর্ক। এই সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করার ফলে মন ভগবন্মুখী হয়ে ওঠে এবং তার ফলে অন্তকালে ভগবানের সচ্চিদানন্দময় রূপের ধ্যান করতে করতে আমরা দেহত্যাগ করতে পারি। *ভগবদ্গীতাতে* ভগবান বারবার আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে, এটিই হচ্ছে তাঁর কাছে ফিরে যাবার একমাত্র পথ এবং তিনি বলেছেন যে, "এতে কোন সন্দেহ নেই।"

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ ॥

"অতএব অর্জুন! সর্বক্ষণ আমাকে স্মরণ করে তোমার স্বভাব বিহিত যুদ্ধ করা উচিত। তোমার মন ও বুদ্ধি আমাতে অর্পণ করে কার্য করলে নিঃসন্দেহে তুমি আমার কাছে ফিরে আসবে।" (*ভঃ গীঃ* ৮/৭)।

তিনি অর্জুনকে তাঁর কর্তব্যকর্ম থেকে বিরত হয়ে তাঁর ধ্যান করতে আদেশ দেননি। ভগবান কোন অবাস্তব পরামর্শ দেন না। পক্ষান্তরে, তিনি বলেছেন, "আমাকে স্মরণ করে তুমি তোমার কর্তব্যকর্ম করে যাও।" এই জড় জগতে দেহ ধারণ করতে হলে কাজ করতেই হবে। কর্ম অনুসারে মানব-সমাজকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এতে ব্রাহ্মণেরা বা সমাজের বুদ্ধিমান লোকেরা এক ধরনের কাজ করছে, ক্ষত্রিয়েরা বা পরিচালক সম্প্রদায় অন্য ধরনের কাজ করছে এবং ব্যবসায়ী ও শ্রমিক সম্প্রদায় তাদের বিশেষ ধরনের কাজ করছে। মানব-সমাজে প্রত্যেকেই, সে শ্রমিকই হোক, ব্যবসায়ী হোক, যোদ্ধা হোক, চাষী হোক অথবা এমন কি সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, বৈজ্ঞানিক কিংবা ধর্মতত্ত্ববিদই হোন না কেন, এদের সকলকেই জীবন ধারণ করবার জন্য তাদের নির্ধারিত কর্ম করতেই হয়। তাই ভগবান অর্জুনকে তাঁর কর্তব্যকর্ম থেকে বিরত থাকতে নিষেধ করেছেন। পক্ষান্তরে তিনি বলেছেন যে, সব সময় সকল কর্মের মাঝে তাঁকে স্মরণ করে, (*মামনুস্মর*) তাঁর পাদপদ্মে মন ও বুদ্ধি অর্পণ করে কর্তব্যকর্ম করে যেতে। দৈনন্দিন জীবনে জীবন-সংগ্রামের সময় যদি শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ না করা যায়, তবে মৃত্যুর মুহূর্তে তাঁকে স্মরণ করা

সম্ভব হবে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও এই উপদেশ দিয়ে গেছেন। তিনি বলে গেছেন যে, *কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ*—সর্বক্ষণ ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তনের অভ্যাস করা উচিত। ভগবানের নাম তাঁর রূপের থেকে ভিন্ন নয়; তাই যখন আমরা তাঁর নাম কীর্তন করি, তখন আমরা তাঁর পবিত্র সান্নিধ্য লাভ করে থাকি। তাই অর্জুনের প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ, "সব সময় আমাকে স্মরণ কর" এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ "সর্বদাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তন কর"—এই দুটি একই উপদেশ। ভগবানের দিব্য রূপকে স্মরণ করা এবং তাঁর দিব্য নামের কীর্তন করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অপ্রাকৃত স্তরে নাম ও রূপ অভিন্ন। তাই আমাদের সর্বক্ষণ চব্বিশ ঘণ্টাই ভগবানকে স্মরণ করার অভ্যাস করতে হবে। তাঁর পবিত্র নাম কীর্তন করে আমাদের জীবনের কার্যকলাপ এমনভাবে চালিত করতে হবে যাতে আমরা সর্বদাই তাঁকে স্মরণ করতে পারি।

এটি কিভাবে সম্ভব? এই প্রসঙ্গে উদাহরণস্বরূপ আচার্যরা বলেন যে, যখন কোন বিবাহিতা স্ত্রীলোক পর-পুরুষে আসক্ত হয় কিংবা কোন পুরুষ পরস্ত্রীতে আকৃষ্ট হয়, তখন সেই আসক্তি অত্যন্ত প্রবল হয়। তখন সে সারাক্ষণ উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকে কিভাবে, কখন সে তার প্রেমিকের সাথে মিলিত হবে, এমন কি যখন তার গৃহকর্মে সে ব্যস্ত থাকে, তখনও তার মন প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হবার আশায় আকুল হয়ে থাকে। সে তখন অতি নিপুণতার সঙ্গে তার গৃহকর্ম সমাধা করে, যাতে তার স্বামী তাকে তার আসক্তির জন্য কোন রকম সন্দেহ না করে। ঠিক তেমনই, আমাদের সর্বক্ষণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভাবনায় মগ্ন থাকতে হবে এবং সুষ্ঠুভাবে আমাদের সমস্ত কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করতে হবে। এই জন্য ভগবানের প্রতি গভীর অনুরাগের একান্ত প্রয়োজন। ভগবানের প্রতি গভীর ভালবাসা থাকলেই মানুষ জাগতিক কর্তব্যগুলি সম্পাদন করার সময়েও তাঁকে বিস্মৃত হয় না। তাই আমাদের চেষ্টা করতে হবে যাতে ভগবানের প্রতি এই গভীর ভালবাসা আমাদের অন্তরে জাগিয়ে তুলতে পারি। অর্জুন যেমন সব সময়ই ভগবানের কথা চিন্তা করতেন, আমাদেরও তেমন ভগবানের চিন্তায় মগ্ন থাকা উচিত। অর্জুন ছিলেন ভগবানের নিত্যসঙ্গী এবং তিনি ছিলেন যোদ্ধা। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে যুদ্ধ করা থেকে বিরত হয়ে বনে গিয়ে ধ্যান করতে উপদেশ দেননি। যোগ সম্বন্ধে যখন তিনি বিশদ ব্যাখ্যা করে অর্জুনকে শোনান, তখন অর্জুন তাঁকে স্পষ্ট বলেন যে, তা অনুশীলন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। অর্জুন বলেছিলেন—

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন ।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥

"হে মধুসূদন! যোগ সম্বন্ধে তুমি আমাকে যা বললে তা থেকে আমি বুঝতে পারছি যে, এর অনুশীলন করা আমার পক্ষে অসম্ভব ও অসহনীয়, কারণ আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল ও অস্থির।" (*ভঃ গীঃ* ৬/৩৩)

কিন্তু ভগবান তখন তাঁকে বলেছিলেন,—

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা ।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥

"যোগীদের মধ্যে যে গভীর শ্রদ্ধা সহকারে মদ্গতচিত্তে নিজের অন্তরাত্মায় আমাকে চিন্তা করে এবং আমার অপ্রাকৃত সেবায় নিয়োজিত থাকে, সে-ই যোগসাধনায় অন্তরঙ্গভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত এবং সেই হচ্ছে যোগীশ্রেষ্ঠ এবং সেটিই আমার অভিমত।" (*ভঃ গীঃ* ৬/৪৭) সুতরাং যিনি সব সময় ভগবদ্ভাবনায় মগ্ন, তিনিই হচ্ছেন যোগীশ্রেষ্ঠ, তিনি হচ্ছেন পরম জ্ঞানী এবং তিনিই হচ্ছেন শুদ্ধ ভক্ত। ভগবান অর্জুনকে আরও বলেছেন যে, ক্ষত্রিয় হবার ফলে তাঁকে যুদ্ধ করতেই হবে, কিন্তু তিনি যদি শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে যুদ্ধ করেন, তবে সেই যুদ্ধে জয়লাভ তো হবেই, উপরন্তু অন্তকালে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে সমর্থ হবেন। এভাবে আমরা দেখতে পাই, যিনি ভগবানের কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেছেন, তিনিই পারেন ভগবানের কৃপা লাভ করতে।

আমরা সাধারণত আমাদের দেহ দিয়ে কাজ করি না, মন ও বুদ্ধি দিয়ে কাজ করি। তাই, যদি মন ও বুদ্ধি ভগবানের ভাবনায় মগ্ন থাকে, তা হলে ইন্দ্রিয়গুলি আপনা থেকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হয়ে যায়। তখন আপাতদৃষ্টিতে ইন্দ্রিয়ের কর্মগুলি অপরিবর্তিত থেকে যায়, কিন্তু মনোবৃত্তির আমূল পরিবর্তন হয়ে যায়। *ভগবদ্গীতা* আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে, কিভাবে মন ও বুদ্ধিকে ভগবানের ভাবনায় মগ্ন করতে হয়। এভাবে সর্বতোভাবে ভগবানের ভাবনায় মগ্ন হবার ফলেই আমরা ভগবানের আলয়ে প্রবেশ করবার যোগ্যতা অর্জন করি। মন যদি কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হয়, তা হলে ইন্দ্রিয়গুলি আপনা থেকেই তাঁর সেবায় নিয়োজিত থাকে। এটিই হচ্ছে কৌশল এবং এটি *ভগবদ্গীতার* রহস্যও—শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় সর্বতোভাবে নিমগ্ন থাকা।

আধুনিক মানুষ চাঁদে পৌঁছানোর জন্য অনেক পরিশ্রম করে চলেছে, কিন্তু তার পারমার্থিক উন্নতির জন্য সে কোন রকম চেষ্টাই করেনি। পঞ্চাশ-ষাট বছরের অল্প আয়ু নিয়ে আমরা এখানে এসেছি, তাই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানকে স্মরণ করবার জন্য এই সময়টি পুরোপুরিভাবে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করা এবং তার পদ্ধতি হচ্ছে—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ ।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৫/২৩)

ভক্তিযোগ সাধনের নয়টি প্রণালীর মধ্যে সবচেয়ে সহজ হচ্ছে *শ্রবণম্* অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞ পুরুষের কাছে *ভগবদ্গীতা* শ্রবণ করা এবং এর ফলে মন ভগবন্মুখী হয়ে উঠবে। তখন পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করা সহজ হবে এবং এই জড় দেহ ত্যাগ করার পর চিন্ময় দেহ লাভ করে ভগবানের আলয়ে উন্নীত হয়ে আমরা ভগবানের সাহচর্য লাভ করতে সক্ষম হব।

ভগবান আরও বলেছেন—

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা ।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥

"অভ্যাসের দ্বারা যে সর্বদা ভগবানরূপে আমার ধ্যানে মগ্ন, বিপথগামী না হয়ে যার মন সর্বদা আমাকে স্মরণ করে, হে পার্থ! সে নিঃসন্দেহে আমার কাছে ফিরে আসবে।" (*গীঃ* ৮/৮)

এই পদ্ধতি মোটেই কঠিন নয়। তবে আসল কথা হচ্ছে, এর অনুশীলনের শিক্ষা তাঁর কাছ থেকেই নিতে হবে, যিনি অভিজ্ঞ ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞ। *তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ*—যিনি ইতিমধ্যেই অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তাঁর সমীপবর্তী হতে হবে। মনের কাজই হচ্ছে সর্বদা এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ানো, তাই অভ্যাস করতে হবে মনকে একাগ্র করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম ও রূপে নিবদ্ধ করতে। মন স্বভাবতই চঞ্চল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের নামের শব্দতরঙ্গে একে স্থির করা যায়। এভাবে পরব্যোমে চিন্ময় জগতে পরম পুরুষ ভগবানের ধ্যান করে তাঁর করুণা লাভ করা সম্ভব। *ভগবদ্গীতায়* চরম উপলব্ধির পন্থা ও উপায় বা পরম প্রাপ্তির কথা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এবং এই জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার সকলের জন্যই উন্মুক্ত হয়ে আছে। কাউকেই নিষিদ্ধ করা হয়নি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে সকল শ্রেণীর মানুষই তাঁর সমীপবর্তী হতে পারে, কেন না শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রবণ ও স্মরণ সকলের পক্ষেই সম্ভব।

ভগবান আরও বলেছেন (*ভঃ গীঃ* ৯/৩২-৩৩)—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা ।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥

এভাবে ভগবান বলছেন যে, এমন কি বৈশ্য, পতিতা স্ত্রীলোক অথবা শূদ্র কিংবা নিম্নস্তরের মানুষেরাও পরম গতি লাভ করতে পারে। ভগবানের কৃপা লাভ করতে হলে যে উচ্চমানের বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন হতে হবে, এমন কোন কথা নেই। আসল কথা হচ্ছে, যদি কেউ ভক্তিযোগের দ্বারা ভগবানের সেবায় ব্রতী হন এবং ভগবানকে জীবনের পরম আশ্রয় বলে মনে করেন, তবে তিনি অপ্রাকৃত জগতে উত্তীর্ণ হয়ে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করতে সক্ষম হন। কেউ যদি *ভগবদ্গীতার* উপদেশবাণীকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করে তার অনুশীলন করেন, তবে তিনি তাঁর জীবনকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে পারেন এবং এই জড়া প্রকৃতির সান্নিধ্যে আসার ফলে যে সমস্ত জাগতিক সমস্যার উদ্ভব হয়, তার সম্পূর্ণ সমাধান করতে পারেন। এই হচ্ছে *ভগবদ্গীতার* মূল কথা।

উপসংহারে বলা যায়, *ভগবদ্গীতা* হচ্ছে এক অপ্রাকৃত সাহিত্য, যা অতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন করা উচিত। *গীতাশাস্ত্রমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ পুমান্*—*ভগবদ্গীতার* নির্দেশকে যথাযথভাবে অনুসরণ করতে পারলে, অতি সহজেই সমস্ত ভয় ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এই জীবনে ভয় ও শোকাদি বর্জিত হয়ে পরবর্তী জীবনে চিন্ময় সত্তা অর্জন করা যায়। *(গীতা-মাহাত্ম্য ১)*

আরও একটি সুবিধা হচ্ছে—

গীতাধ্যায়নশীলস্য প্রাণায়মপরস্য চ ।
নৈব সন্তি হি পাপানি পূর্বজন্মকৃতানি চ ॥

"কেউ যদি আন্তরিকভাবে এবং অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে *ভগবদ্গীতা* পাঠ করে, তা হলে ভগবানের করুণায় তার অতীতের সমস্ত পাপকর্মের ফল তাকে প্রভাবিত করে না।" *(গীতা-মাহাত্ম্য ২)* *ভগবদ্গীতার* শেষ পর্যায়ে (১৮/৬৬) অতি উচ্চস্বরে ভগবান বলেছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

"সব রকমের ধর্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করে আমার শরণ নাও। তা হলে আমি সমস্ত পাপ থেকে তোমাকে মুক্ত করব। তুমি কোন ভয় করো না।" এভাবে ভগবানের পাদপদ্মে যিনি সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেন, ভগবান তাঁর সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সেই মানুষের সকল পাপকর্মের প্রতিক্রিয়া থেকে তাকে রক্ষা করেন।

মলিনে মোচনং পুংসাং জলস্নানং দিনে দিনে ।
সকৃদ্ গীতামৃতস্নানং সংসারমলনাশনম্ ॥

"প্রতিদিন জলে স্নান করে মানুষ নিজেকে পরিচ্ছন্ন করতে পারে, কিন্তু কেউ যদি *ভগবদ্গীতার* গঙ্গাজলে একটি বারও স্নান করে, তা হলে তার জড় জীবনের মলিনতা একেবারেই বিনষ্ট হয়ে যায়।" *(গীতা-মাহাত্ম্য ৩)*

গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্ বিনিঃসৃতা ॥

যেহেতু *ভগবদ্গীতার* বাণী স্বয়ং পরম পুরুষোত্তম ভগবানের মুখনিঃসৃত বাণী, তাই এই গ্রন্থ পাঠ করলে আর অন্য কোন বৈদিক সাহিত্য পড়বার দরকার হয় না। গভীর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে নিয়মিতভাবে *ভগবদ্গীতা* শ্রবণ ও কীর্তন করলে আমাদের অন্তর্নিহিত ভগবদ্ভক্তির স্বাভাবিক বিকাশ হয়। বর্তমান জগতে মানুষেরা নানা রকম কাজে এতই ব্যস্ত থাকে যে, তাদের পক্ষে সমস্ত বৈদিক সাহিত্য পাঠ করা সম্ভব নয়। সমস্ত বৈদিক সাহিত্য পড়বার প্রয়োজনও নেই। এই একটি গ্রন্থ *ভগবদ্গীতা* পাঠ করলেই মানুষ সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারমর্ম উপলব্ধি করতে পারবে, কারণ *ভগবদ্গীতা* হচ্ছে *বেদের* সার এবং এই *গীতা* স্বয়ং ভগবানের মুখনিঃসৃত উপদেশ বাণী। *(গীতা-মাহাত্ম্য ৪)*

আরও বলা হয়েছে—

ভারতামৃতসর্বস্বং বিষ্ণুবক্ত্রাদ্ বিনিঃসৃতম্ ।
গীতাগঙ্গোদকং পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

"গঙ্গাজল পান করলে অবধারিতভাবে মুক্তি পাওয়া যায়, আর যিনি *ভগবদ্গীতার* পুণ্য পীযূষ পান করেছেন, তাঁর কথা আর কি বলবার আছে? *ভগবদ্গীতা* হচ্ছে *মহাভারতের* অমৃতরস, যা আদি বিষ্ণু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলে গেছেন।" *(গীতা-মাহাত্ম্য ৫)* *ভগবদ্গীতা* পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত, আর গঙ্গা ভগবানের চরণপদ্ম থেকে উদ্ভূত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ভগবানের মুখ ও পায়ের মধ্যে অবশ্য কোন পার্থক্য নেই। তবে আমাদের এটি বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, *ভগবদ্গীতার* গুরুত্ব গঙ্গার চেয়েও বেশি।

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥

"এই *গীতোপনিষদ্ ভগবদ্গীতা* সমস্ত *উপনিষদের* সারাতিসার এবং তা ঠিক একটি গাভীর মতো, এবং রাখাল বালকরূপে প্রসিদ্ধ ভগবান শ্রীকৃষ্ণই এই গাভীকে দোহন করেছেন। অর্জুন যেন গোবৎসের মতো এবং জ্ঞানীগুণী ও শুদ্ধ ভক্তেরাই *ভগবদ্গীতার* সেই অমৃতময় দুগ্ধ পান করে থাকেন।" *(গীতা-মাহাত্ম্য ৬)*

একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্রগীতম্
একো দেবো দেবকীপুত্র এব।
একো মন্ত্রস্তস্য নামানি যানি
কর্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা ॥

(গীতা-মাহাত্ম্য ৭)

বর্তমান জগতে মানুষ আকুলভাবে আকাঙ্ক্ষা করছে একটি শাস্ত্রের, একক ভগবানের, একটি ধর্মের এবং একটি বৃত্তির। তাই, *একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্রগীতম্*—সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য সেই একক শাস্ত্র হোক *ভগবদ্গীতা*। *একো দেবো দেবকীপুত্র এব*—সমগ্র বিশ্বচরাচরের একক ভগবান হোন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। *একো মন্ত্রস্তস্য নামানি*—একক মন্ত্র, একক প্রার্থনা, একক স্তোত্র হোক তাঁর নাম কীর্তন—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

এবং *কর্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা*—সমস্ত মানুষের একটিই বৃত্তি হোক—পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা।

গুরু-পরম্পরা

এবং পরম্পরা প্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ (ভগবদ্গীতা ৪/২)।
এই *ভগবদ্গীতা যথাযথ* নিম্নোক্ত গুরু-পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত হয়েছে ঃ

(১) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ
(২) ব্রহ্মা
(৩) নারদ
(৪) ব্যাসদেব
(৫) মধ্বাচার্য
(৬) পদ্মনাভ
(৭) নৃহরি
(৮) মাধব
(৯) অক্ষোভ্য
(১০) জয়তীর্থ
(১১) জ্ঞানসিন্ধু
(১২) দয়ানিধি
(১৩) বিদ্যানিধি
(১৪) রাজেন্দ্র
(১৫) জয়ধর্ম
(১৬) পুরুষোত্তম
(১৭) ব্রহ্মণ্যতীর্থ
(১৮) ব্যাসতীর্থ
(১৯) লক্ষ্মীপতি
(২০) মাধবেন্দ্রপুরী
(২১) ঈশ্বরপুরী, (নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আচার্য প্রভু)
(২২) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
(২৩) শ্রীরূপ গোস্বামী, (শ্রীস্বরূপ দামোদর, শ্রীসনাতন গোস্বামী)
(২৪) শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী
(২৫) শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী
(২৬) শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর
(২৭) শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর
(২৮) (শ্রীশ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ), শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ
(২৯) শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর
(৩০) শ্রীগৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ
(৩১) শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর
(৩২) শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ।

প্রথম অধ্যায়

বিষাদ-যোগ

শ্লোক ১

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥ ১ ॥

ধৃতরাষ্ট্রঃ উবাচ—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বললেন; **ধর্মক্ষেত্রে**—ধর্মক্ষেত্রে; **কুরুক্ষেত্রে**—কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে; **সমবেতাঃ**—সমবেত হয়ে; **যুযুৎসবঃ**—যুদ্ধকামী; **মামকাঃ**—আমার দল (পুত্রেরা); **পাণ্ডবাঃ**—পাণ্ডুর পুত্রেরা; **চ**—এবং; **এব**—অবশ্যই; **কিম্**—কি; **অকুর্বত**—করেছিল; **সঞ্জয়**—হে সঞ্জয়।

গীতার গান

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে হইয়া একত্র ।
যুদ্ধকামী মমপুত্র পাণ্ডব সর্বত্র ॥
কি করিল তারপর কহত সঞ্জয় ।
ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসয়ে সন্দিগ্ধ হৃদয় ॥

অনুবাদ

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—হে সঞ্জয়! ধর্মক্ষেত্রে যুদ্ধ করার মানসে সমবেত হয়ে আমার পুত্র এবং পাণ্ডুর পুত্রেরা তারপর কি করল?

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতা হচ্ছে বহুজন-পঠিত ভগবৎ-তত্ত্ববিজ্ঞান, যাঁর মর্ম *গীতা-মাহাত্ম্যে* বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, *ভগবদ্গীতা* পাঠ করতে হয় ভগবৎ-তত্ত্বদর্শী কৃষ্ণভক্তের তত্ত্বাবধানে। ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে *গীতার* বিশ্লেষণ করা কখনই উচিত নয়। *গীতার* যথাযথ অর্থ উপলব্ধি করার দৃষ্টান্ত *ভগবদ্গীতাই* আমাদের সামনে তুলে ধরেছে অর্জুনের মাধ্যমে, যিনি স্বয়ং ভগবানের কাছ থেকে সরাসরিভাবে এই *গীতার* জ্ঞান লাভ করেছিলেন। অর্জুন ঠিক যেভাবে *গীতার* মর্ম উপলব্ধি করেছিলেন, ঠিক সেই দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোবৃত্তি নিয়ে সকলেরই *গীতা* পাঠ করা উচিত। তা হলেই *গীতার* যথাযথ মর্ম উপলব্ধি করা সম্ভব। সৌভাগ্যবশত যদি কেউ গুরুপরম্পরা-সূত্রে *ভগবদ্গীতার* মনগড়া ব্যাখ্যা ব্যতীত যথাযথ অর্থ উপলব্ধি করতে পারেন, তবে তিনি সমস্ত বৈদিক জ্ঞান এবং পৃথিবীর সব রকমের শাস্ত্রজ্ঞান আয়ত্ত করতে সক্ষম হন। *ভগবদ্গীতা* পড়ার সময় আমরা দেখি, অন্য সমস্ত শাস্ত্রে যা কিছু আছে, তা সবই *ভগবদ্গীতায়* আছে, উপরন্তু *ভগবদ্গীতায়* এমন অনেক তত্ত্ব আছে যা আর কোথাও নেই। এটিই হচ্ছে *গীতার* মাহাত্ম্য এবং এই জন্যই *গীতাকে* সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র বলে অভিহিত করা হয়। *গীতা* হচ্ছে পরম তত্ত্বদর্শন, কারণ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজে এই জ্ঞান দান করে গেছেন।

মহাভারতে বর্ণিত ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়ের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে *ভগবদ্গীতার* মহৎ তত্ত্বদর্শনের মূল উপাদান। এখানে আমরা জানতে পারি যে, এই মহৎ তত্ত্বদর্শন প্রকাশিত হয়েছিল কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে, যা সুপ্রাচীন বৈদিক সভ্যতার সময় থেকেই পবিত্র তীর্থস্থানরূপে খ্যাত। ভগবান যখন মানুষের উদ্ধারের জন্য এই পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন, তখন এই পবিত্র তীর্থস্থানে তিনি নিজে পরম তত্ত্ব সমন্বিত এই *গীতা* দান করেন।

এই শ্লোকে *ধর্মক্ষেত্র* শব্দটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন তথা পাণ্ডবদের পক্ষে ছিলেন। দুর্যোধন আদি কৌরবদের পিতা ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পুত্রদের বিজয় সম্ভাবনা সম্বন্ধে অত্যন্ত সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। দ্বিধাগ্রস্ত-চিত্তে তাই তিনি সঞ্জয়কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আমার পুত্র ও পাণ্ডুর পুত্রেরা তারপর কি করল?" তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, তাঁর পুত্র ও পাণ্ডুপুত্রেরা কুরুক্ষেত্রের বিস্তীর্ণ ভূমিতে যুদ্ধ করবার জন্য সমবেত হয়েছিলেন। কিন্তু তবুও তাঁর অনুসন্ধানটি ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি চাননি যে, পাণ্ডব ও কৌরবের মধ্যে কোন আপস-মীমাংসা হোক, কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন যুদ্ধে তাঁর পুত্রদের ভাগ্য

সুনিশ্চিত হোক। তার কারণ হচ্ছে কুরুক্ষেত্রের পুণ্য তীর্থে এই যুদ্ধের আয়োজন হয়েছিল। *বেদে* বলা হয়েছে, কুরুক্ষেত্র হচ্ছে অতি পবিত্র স্থান, যা দেবতারাও পূজা করে থাকেন। তাই, ধৃতরাষ্ট্র এই যুদ্ধের ফলাফলের উপর এই পবিত্র স্থানের প্রভাব সম্বন্ধে শঙ্কাকুল হয়ে পড়েছিলেন। তিনি খুব ভালভাবে জানতেন যে, অর্জুন এবং পাণ্ডুর অন্যান্য পুত্রদের উপর এই পবিত্র স্থানের মঙ্গলময় প্রভাব সঞ্চারিত হবে, কারণ তাঁরা সকলেই ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ। সঞ্জয় ছিলেন ব্যাসদেবের শিষ্য, তাই ব্যাসদেবের আশীর্বাদে তিনি দিব্যচক্ষু প্রাপ্ত হন, যার ফলে তিনি ঘরে বসেও কুরুক্ষেত্রের সমস্ত ঘটনা দেখতে পাচ্ছিলেন। তাই, ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন।

পাণ্ডবেরা এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা ছিলেন একই বংশজাত, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের মনোভাব এখানে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি কেবল তাঁর পুত্রদেরই কৌরব বলে গণ্য করে পাণ্ডুর পুত্রদের বংশগত উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন। এভাবে ভ্রাতুষ্পুত্র বা পাণ্ডুর পুত্রদের সঙ্গে সম্পর্কের মাধ্যমেই ধৃতরাষ্ট্রের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ধানক্ষেতে যেমন আগাছাগুলি তুলে ফেলে দেওয়া হয়, তেমনই *ভগবদ্গীতার* সূচনা থেকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে ধর্মের প্রবর্তক ভগবান স্বয়ং উপস্থিত থেকে ধৃতরাষ্ট্রের পাপিষ্ঠ পুত্রদের সমূলে উৎপাটিত করে ধার্মিক যুধিষ্ঠিরের নেতৃত্বে ধর্মপরায়ণ মহাত্মাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করবার আয়োজন করেছেন। বৈদিক এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছাড়াও সমগ্র *গীতার* তত্ত্বদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে *ধর্মক্ষেত্রে* ও *কুরুক্ষেত্রে*—এই শব্দ দুটি ব্যবহারের তাৎপর্য বুঝতে পারা যায়।

শ্লোক ২

সঞ্জয় উবাচ

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্যোধনস্তদা ।
আচার্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

সঞ্জয়ঃ উবাচ—সঞ্জয় বললেন; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **তু**—কিন্তু; **পাণ্ডবানীকম্**—পাণ্ডবদের সৈন্য; **ব্যূঢ়ম্**—সামরিক ব্যূহ; **দুর্যোধনঃ**—রাজা দুর্যোধন; **তদা**—সেই সময়; **আচার্যম্**—দ্রোণাচার্য; **উপসঙ্গম্য**—কাছে গিয়ে; **রাজা**—রাজা; **বচনম্**—বাক্য; **অব্রবীৎ**—বলেছিলেন।

গীতার গান

সঞ্জয় কহিল রাজা শুন মন দিয়া ।
পাণ্ডবের সৈন্যসজ্জা সাজান দেখিয়া ॥
রাজা দুর্যোধন শীঘ্র দ্রোণাচার্য পাশে ।
যাইয়া বৃত্তান্ত সব কহিল সকাশে ॥

অনুবাদ

সঞ্জয় বললেন—হে রাজন্! পাণ্ডবদের সৈন্যসজ্জা দর্শন করে রাজা দুর্যোধন দ্রোণাচার্যের কাছে গিয়ে বললেন—

তাৎপর্য

ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন জন্মান্ধ। দুর্ভাগ্যবশত, তিনি পারমার্থিক তত্ত্বদর্শন থেকেও বঞ্চিত ছিলেন। তিনি ভালভাবেই জানতেন যে, ধর্মের ব্যাপারে তাঁর পুত্রেরাও ছিল তাঁরই মতো অন্ধ, এবং তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, তাঁর পাপিষ্ঠ পুত্রেরা পাণ্ডবদের সঙ্গে কোন রকম আপস-মীমাংসা করতে সক্ষম হবে না, কারণ পাণ্ডবেরা সকলেই জন্ম থেকে অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তবুও তিনি ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের প্রভাব সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতি সম্বন্ধে ধৃতরাষ্ট্রের এই প্রশ্ন করার প্রকৃত উদ্দেশ্য সঞ্জয় বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি নৈরাশ্যগ্রস্ত রাজাকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, এই পবিত্র ধর্মক্ষেত্রের প্রভাবের ফলে তাঁর সন্তানেরা পাণ্ডবদের সঙ্গে কোন রকম আপস-মীমাংসা করতে সক্ষম হবে না। সঞ্জয় তখনই ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন যে, তাঁর পুত্র দুর্যোধন পাণ্ডবদের মহৎ সৈন্যসজ্জা দর্শন করে, তার বিবরণ দিতে তৎক্ষণাৎ সেনাপতি দ্রোণাচার্যের কাছে উপস্থিত হলেন। দুর্যোধনকে যদিও রাজা বলা হয়েছে, তবুও সেই সঙ্কটময় অবস্থায় তাঁকে তাঁর সেনাপতির কাছে উপস্থিত হতে দেখা যাচ্ছে। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি, চতুর রাজনীতিবিদ্ হবার সমস্ত গুণগুলি দুর্যোধনের মধ্যে বর্তমান ছিল। কিন্তু পাণ্ডবদের মহতী সৈন্যসজ্জা দেখে দুর্যোধনের মনে যে মহাভয়ের সঞ্চার হয়েছিল, তা তিনি তাঁর চতুরতার আবরণে ঢেকে রাখতে পারেননি।

শ্লোক ৩

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য মহতীং চমূম্ ।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩ ॥

পশ্য—দেখুন; **এতাম্**—এই; **পাণ্ডুপুত্রাণাম্**—পাণ্ডুর পুত্রদের; **আচার্য**—হে আচার্য; **মহতীম্**—মহান; **চমূম্**—সৈন্যবল; **ব্যূঢ়াম্**—ব্যূহ; **দ্রুপদপুত্রেণ**—দ্রুপদের পুত্র কর্তৃক; **তব**—আপনার; **শিষ্যেণ**—শিষ্যের দ্বারা; **ধীমতা**—অত্যন্ত বুদ্ধিমান।

গীতার গান

আচার্য চাহিয়া দেখ মহতী সেনানী ।
পাণ্ডুপুত্র রচিয়াছে ব্যূহ নানাস্থানী ॥
তব শিষ্য বুদ্ধিমান দ্রুপদের পুত্র ।
সাজাইল এই সব করি একসূত্র ॥

অনুবাদ

হে আচার্য! পাণ্ডবদের মহান সৈন্যবল দর্শন করুন, যা আপনার অত্যন্ত বুদ্ধিমান শিষ্য দ্রুপদের পুত্র অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ব্যূহের আকারে রচনা করেছেন।

তাৎপর্য

চতুর কূটনীতিবিদ্ দুর্যোধন মহৎ ব্রাহ্মণ সেনাপতি দ্রোণাচার্যকে তাঁর ভুল-ত্রুটিগুলি দেখিয়ে দিয়ে তাঁকে সতর্ক করে দিতে চেয়েছিলেন। পঞ্চপাণ্ডবের পত্নী দ্রৌপদীর পিতা দ্রুপদরাজের সঙ্গে দ্রোণাচার্যের কিছু রাজনৈতিক মনোমালিন্য ছিল। এই মনোমালিন্যের ফলে দ্রুপদ এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, এবং সেই যজ্ঞের ফলে তিনি বর লাভ করেন যে, তিনি এক পুত্র লাভ করবেন, যে দ্রোণাচার্যকে হত্যা করতে সক্ষম হবে। দ্রোণাচার্য এই বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে অবগত ছিলেন, কিন্তু দ্রুপদ তাঁর সেই পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকে যখন অস্ত্রশিক্ষার জন্য তাঁর কাছে প্রেরণ করেন, তখন উদার হৃদয় সত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য তাঁকে সব রকমের অস্ত্রশিক্ষা এবং সমস্ত সামরিক কলা-কৌশলের গুপ্ত তথ্য শিখিয়ে দিতে কোনও দ্বিধা করেননি। এখন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবদের পক্ষে যোগদান করেন এবং পাণ্ডবদের সৈন্যসজ্জা তিনিই পরিচালনা করেন, যেই শিক্ষা তিনি দ্রোণাচার্যের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। দ্রোণাচার্যের এই ত্রুটির কথা দুর্যোধন তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, যাতে তিনি পূর্ণ সতর্কতা ও অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধ করেন। দুর্যোধন মহৎ ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্যকে এটিও মনে করিয়ে দিলেন যে, পাণ্ডবদের, বিশেষ করে অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তিনি যেন কোন রকম কোমলতা প্রদর্শন না করেন, কারণ তাঁরাও সকলে তাঁর প্রিয় শিষ্য, বিশেষত অর্জুন ছিলেন সবচেয়ে প্রিয় ও মেধাবী

শিষ্য। দুর্যোধন সতর্ক করে দিতে চেয়েছিলেন যে, এই ধরনের কোমলতা প্রকাশ পেলে যুদ্ধে অবধারিতভাবে পরাজয় হবে।

শ্লোক ৪-৬

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জুনসমা যুধি ।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪ ॥
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্যবান্ ।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫ ॥
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্যবান্ ।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬ ॥

অত্র—এখানে; **শূরাঃ**—বীরগণ; **মহেষ্বাসাঃ**—বলবান ধনুর্ধরগণ; **ভীমার্জুন**—ভীম ও অর্জুন; **সমাঃ**—সমকক্ষ; **যুধি**—যুদ্ধে; **যুযুধানঃ**—যুযুধান; **বিরাটঃ**—বিরাট; **চ**—ও; **দ্রুপদঃ**—দ্রুপদ; **চ**—ও; **মহারথঃ**—মহারথী; **ধৃষ্টকেতুঃ**—ধৃষ্টকেতু; **চেকিতানঃ**—চেকিতান; **কাশিরাজঃ**—কাশিরাজ; **চ**—ও; **বীর্যবান্**—অত্যন্ত বলবান; **পুরুজিৎ**—পুরুজিৎ; **কুন্তিভোজঃ**—কুন্তিভোজ; **চ**—এবং; **শৈব্যঃ**—শৈব্য; **চ**—ও; **নরপুঙ্গবঃ**—মানব-সমাজে শ্রেষ্ঠ; **যুধামন্যুঃ**—যুধামন্যু; **চ**—এবং; **বিক্রান্তঃ**—বলবান; **উত্তমৌজাঃ**—উত্তমৌজা; **চ**—এবং; **বীর্যবান্**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **সৌভদ্রঃ**—সুভদ্রার পুত্র; **দ্রৌপদেয়াঃ**—দ্রৌপদীর পুত্রেরা; **চ**—এবং; **সর্বে**—সকলে; **এব**—অবশ্যই; **মহারথাঃ**—মহারথীগণ।

গীতার গান

এইস্থানে বর্তমান বহু যোদ্ধাগণ ।
ভীমার্জুনসম তারা ধনুর্ধারী হন ॥
যুযুধান বিরাট দ্রুপদ মহারথী সব ।
ধৃষ্টকেতু চেকিতান কাশীর পুঙ্গব ॥
পুরুজিৎ কুন্তিভোজ শৈব্যরাজাগণ ।
যুধামন্যু বিক্রান্ত নহে সাধারণ ॥
বীর্যবান যে এই সৌভদ্র দ্রৌপদেয় ।
সকলেই মহারথী কেহ নহে হেয় ॥

অনুবাদ

সেই সমস্ত সেনাদের মধ্যে অনেকে ভীম ও অর্জুনের মতো বীর ধনুর্ধারী রয়েছেন এবং যুযুধান, বিরাট ও দ্রুপদের মতো মহাযোদ্ধা রয়েছেন। সেখানে ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, কাশিরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ ও শৈব্যের মতো অত্যন্ত বলবান যোদ্ধারাও রয়েছেন। সেখানে রয়েছেন অত্যন্ত বলবান যুধামন্যু, প্রবল পরাক্রমশালী উত্তমৌজা, সুভদ্রার পুত্র এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণ। এই সব যোদ্ধারা সকলেই এক-একজন মহারথী।

তাৎপর্য

যদিও দ্রোণাচার্যের অসীম শৌর্য, বীর্য ও সামরিক কলা-কৌশলের কাছে ধৃষ্টদ্যুম্ন ছিলেন এক অতি নগণ্য প্রতিবন্ধক এবং তাঁর ভয়ে ভীত হবার কোন কারণই ছিল না দ্রোণাচার্যের পক্ষে, কিন্তু ধৃষ্টদ্যুম্ন ছাড়াও পাণ্ডবপক্ষে অন্য অনেক রথী-মহারথী ছিলেন, যাঁরা সত্যিসত্যিই ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। দুর্যোধনের পক্ষে সেই যুদ্ধজয়ের পথে তাঁরা ছিলেন এক-একটি দুরতিক্রম্য প্রতিবন্ধকের মতো, কারণ তাঁরা সকলেই ছিলেন ভীম ও অর্জুনের মতো ভয়ংকর। তাঁদের বীরত্বের কথা দুর্যোধন ভালভাবেই জানতেন, তাই তিনি অন্যান্য রথী-মহারথীদেরও ভীম ও অর্জুনের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

শ্লোক ৭

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম ।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭ ॥

অস্মাকম্—আমাদের; **তু**—কিন্তু; **বিশিষ্টাঃ**—বিশেষভাবে শক্তিমান; **যে**—যাঁরা; **তান্**—তাঁদের; **নিবোধ**—জেনে রাখুন; **দ্বিজোত্তম**—দ্বিজশ্রেষ্ঠ; **নায়কাঃ**—সেনানায়কগণ; **মম**—আমার; **সৈন্যস্য**—সৈন্যদের; **সংজ্ঞার্থম্**—অবগতির জন্য; **তান্**—তাঁদের; **ব্রবীমি**—আমি বলছি; **তে**—আপনাকে।

গীতার গান

আমাদের মধ্যে যারা বিশিষ্ট মহান ।
দ্বিজোত্তম শুন তাহা করিয়া মনন ॥
সেনাপতি যে যে সব মম সৈন্যপাশে ।
সংজ্ঞার্থে তোমারে কহি অশেষ বিশেষে ॥

অনুবাদ

হে দ্বিজোত্তম! আমাদের পক্ষে যে সমস্ত বিশিষ্ট সেনাপতি সামরিক শক্তি পরিচালনার জন্য রয়েছেন, আপনার অবগতির জন্য আমি তাঁদের সম্বন্ধে বলছি।

শ্লোক ৮

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তিস্তথৈব চ ॥ ৮ ॥

ভবান্—আপনি স্বয়ং; **ভীষ্মঃ**—পিতামহ ভীষ্ম; **চ**—ও; **কর্ণঃ**—কুন্তীপুত্র কর্ণ; **চ**—এবং; **কৃপঃ**—কৃপাচার্য; **চ**—এবং; **সমিতিঞ্জয়ঃ**—সর্বদা সংগ্রামে বিজয়ী; **অশ্বত্থামা**—দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামা; **বিকর্ণঃ**—দুর্যোধনের ভ্রাতা বিকর্ণ; **চ**—ও; **সৌমদত্তিঃ**—সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা; **তথা**—এবং; **এব**—অবশ্যই; **চ**—ও।

গীতার গান

আপনি আর পিতামহ ভীষ্মাদিগণ ।
কৃপাচার্য রণজয়ী হয় একত্রে বর্ণন ॥
অশ্বত্থামা বিকর্ণাদি সৌমদত্তি আর ।
যথাযথা তথা তথা সৈন্য সে অপার ॥

অনুবাদ

সেখানে রয়েছেন আপনার মতোই ব্যক্তিত্বশালী—ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপা, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ ও সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা, যাঁরা সর্বদা সংগ্রামে বিজয়ী হয়ে থাকেন।

তাৎপর্য

পাণ্ডব-পক্ষের রথী-মহারথীদের বর্ণনা করবার পর দুর্যোধন তার স্বপক্ষে যে সমস্ত বীরেরা যোগদান করেছেন তাঁদের বর্ণনা করেছে। বিকর্ণ হচ্ছেন দুর্যোধনের ভাই, অশ্বত্থামা হচ্ছেন দ্রোণাচার্যের পুত্র এবং সৌমদত্তি বা ভূরিশ্রবা হচ্ছেন বাহ্লীকের রাজার ছেলে। কর্ণ ছিলেন অর্জুনের বৈপিত্রেয় ভ্রাতা, কেন না রাজা পাণ্ডুর সঙ্গে বিবাহ হবার আগে কুন্তীদেবীর কোলে তাঁর জন্ম হয়। কৃপাচার্যের যমজ ভগ্নীদ্বয়ের সাথে দ্রোণাচার্যের বিবাহ হয়।

শ্লোক ৯

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥

অন্যে—অন্য অনেকে; **চ**—ও; **বহবঃ**—বহু; **শূরাঃ**—সেনানায়কগণ; **মদর্থে**—আমার জন্য; **ত্যক্তজীবিতাঃ**—তাঁদের জীবন ত্যাগ করতে প্রস্তুত; **নানা**—নানা প্রকার; **শস্ত্র**—অস্ত্রশস্ত্র; **প্রহরণাঃ**—সুসজ্জিত; **সর্বে**—তাঁরা সকলে; **যুদ্ধবিশারদাঃ**—সামরিক বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ যোদ্ধা।

গীতার গান

আর যে অনেক বীর আমার লাগিয়া ।
আসিয়াছে হেথা সব জীবন ত্যজিয়া ॥
নানা-অস্ত্রপাণি সব যুদ্ধে বিশারদ ।
এরা সব হয় মোর যুদ্ধের সংসদ ॥

অনুবাদ

এ ছাড়া আরও বহু সেনানায়ক রয়েছেন, যাঁরা আমার জন্য তাঁদের জীবন ত্যাগ করতে প্রস্তুত। তাঁরা সকলেই নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এবং তাঁরা সকলেই সামরিক বিজ্ঞানে বিশারদ।

তাৎপর্য

অন্য আর যে সমস্ত বীরেরা দুর্যোধনের পক্ষে ছিলেন, যেমন—জয়দ্রথ, কৃতবর্মা, শল্য আদি, এঁরা সকলেই দুর্যোধনের জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত ছিলেন। এখানে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, পাপিষ্ঠ দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করার ফলে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে এঁদের সকলেরই মৃত্যু অবধারিত ছিল। দুর্যোধনের কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এই সমস্ত বীরপুঙ্গবেরা স্বপক্ষে থাকায় তার জয় অনিবার্য।

শ্লোক ১০-১১

অপর্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ ।
পর্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥ ১০ ॥
অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব এব হি ॥ ১১ ॥

অপর্যাপ্তম্—অপরিমিত; **তৎ**—তা; **অস্মাকম্**—আমাদের; **বলম্**—বল; **ভীষ্ম**—পিতামহ ভীষ্মের দ্বারা; **অভিরক্ষিতম্**—সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত; **পর্যাপ্তম্**—সীমিত; **তু**—কিন্তু; **ইদম্**—এই সমস্ত; **এতেষাম্**—পাণ্ডবদের; **বলম্**—বল; **ভীম**—ভীমের দ্বারা; **অভিরক্ষিতম্**—সতর্কভাবে রক্ষিত; **অয়নেষু**—যথাস্থানে; **চ**—ও; **সর্বেষু**—সর্বত্র; **যথাভাগম্**—যথাযথভাবে বিভক্ত হয়ে; **অবস্থিতাঃ**—অবস্থিত; **ভীষ্মম্**—পিতামহ ভীষ্মকে; **এব**—অবশ্যই; **অভিরক্ষন্তু**—রক্ষা করুন; **ভবন্তঃ**—আপনারা; **সর্বে**—সকলে; **এব হি**—নিশ্চিতভাবে।

গীতার গান

অপর্যাপ্ত মম সৈন্য ভীষ্ম সেনাপতি ।
পর্যাপ্ত ওদের সৈন্য ভীম যার গতি ॥
যথাস্থানে স্থিত থাকি আপনি সকলে ।
রক্ষ ভীষ্ম পিতামহে হেন যুদ্ধস্থলে ॥

অনুবাদ

আমাদের সৈন্যবল অপরিমিত এবং আমরা পিতামহ ভীষ্মের দ্বারা পূর্ণরূপে সুরক্ষিত, কিন্তু ভীমের দ্বারা সতর্কভাবে সুরক্ষিত পাণ্ডবদের শক্তি সীমিত। এখন আপনারা সকলে সেনাব্যূহের প্রবেশপথে নিজ নিজ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্থিত হয়ে পিতামহ ভীষ্মকে সর্বতোভাবে সাহায্য প্রদান করুন।

তাৎপর্য

এখানে দুর্যোধন পাণ্ডব-পক্ষ ও কৌরব-পক্ষের সামরিক শক্তির তুলনা করেছে। পিতামহ বীরশ্রেষ্ঠ ভীষ্মদেবের রক্ষণাবেক্ষণাধীন অমিত শক্তিশালী এক সৈন্যবাহিনী ছিল দুর্যোধনের স্বপক্ষে। অপর পক্ষে, পাণ্ডবদের সৈন্যবাহিনী ছিল সীমিত এবং তার সেনাপতি ছিলেন ভীমসেন, যাঁর শৌর্যবীর্য ও সৈন্য পরিচালনার ক্ষমতা পিতামহ ভীষ্মদেবের তুলনায় ছিল নিতান্তই নগণ্য। দুর্যোধন চিরকালই ভীমের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল। কারণ সে জানত যে, যদি তাঁকে কোন দিন মরতে হয়, তবে ভীমের হাতেই তার মৃত্যু হবে। কিন্তু ভীষ্মের মতো বিচক্ষণ ও দুর্ধর্ষ যোদ্ধা তার পক্ষের সেনাপতি থাকায় সে নিশ্চিতভাবে ধরে নিয়েছিল, জয় তার হবেই। দুর্যোধনের প্রতিটি কথাতে বোঝা যাচ্ছে, যুদ্ধজয় সম্বন্ধে তার মনে কোনই সংশয় ছিল না।

ভীষ্মের শৌর্যবীর্যের প্রশংসা করার পরে, দুর্যোধন বিবেচনা করে দেখল, অন্যেরা মনে করতে পারে, তাঁদের শৌর্যবীর্যের গুরুত্ব লাঘব করে হেয় করা হচ্ছে, তাই তার স্বভাবসুলভ কূটনৈতিক চাতুরীর সাহায্যে সেই পরিস্থিতির ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সে উপরোক্ত কথাগুলি বলেছিল। এভাবে সে মনে করিয়ে দিল যে, ভীষ্মদেব যত বড় যোদ্ধাই হন, তিনি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন এবং সব দিক থেকে তাই ভীষ্মদেবকে তাঁদের সকলেরই রক্ষা করা উচিত। যুদ্ধ করতে করতে যদি তিনি কোনও একদিকে এগিয়ে যান, তা হলে শত্রুপক্ষ তার সুযোগ নিয়ে অন্য দিক থেকে আক্রমণ করতে পারে। তাই অন্য বীরপুঙ্গবেরা যাতে নিজ নিজ স্থানে অধিষ্ঠিত থেকে শত্রুসৈন্যকে ব্যূহ ভেদ করতে না দেয়, তার গুরুত্ব সম্বন্ধে দ্রোণাচার্যকে দুর্যোধন মনে করিয়ে দিয়েছিল। দুর্যোধন স্পষ্টই অনুভব করেছিল যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তার জয়লাভ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে ভীষ্মদেবের উপর। দুর্যোধনের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সেই যুদ্ধে ভীষ্মদেব ও দ্রোণাচার্য তাঁকে সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করবেন। কারণ সে আগেই দেখেছিল, যখন হস্তিনাপুরের রাজসভায় সমস্ত রাজপুরুষের সামনে দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করা হচ্ছিল, তখন তাঁদের প্রতি অসহায় দ্রৌপদীর আকুল আবেদনে সাড়া দিয়ে তাঁরা একটি কথাও বলেননি। যদিও দুর্যোধন জানত, তার দুই সেনাপতিই পাণ্ডবদের বেশ স্নেহ করতেন, কিন্তু তার বিশ্বাস ছিল যে, পাশা খেলার নিয়মানুসারে তাঁরা যেমন তাঁদের স্নেহপ্রবণতা বর্জন করেছিলেন, এই যুদ্ধেও তাঁরা তাই করবেন।

শ্লোক ১২

তস্য সঞ্জনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২ ॥

তস্য—তাঁর; **সঞ্জনয়ন্**—বর্ধিত করে; **হর্ষম্**—হর্ষ; **কুরুবৃদ্ধঃ**—কুরুবংশের মধ্যে বৃদ্ধ; **পিতামহঃ**—পিতামহ; **সিংহনাদম্**—সিংহের মতো গর্জন; **বিনদ্য**—কম্পিত করে; **উচ্চৈঃ**—অতি উচ্চনাদে; **শঙ্খম্**—শঙ্খ; **দধ্মৌ**—বাজালেন; **প্রতাপবান্**—প্রতাপশালী।

গীতার গান

তবে সেই পিতামহ বৃদ্ধ কুরুপতি ।
হর্ষ উৎপাদনে যবে কৈল স্থিরমতি ॥

সিংহনাদে বাজাইল শঙ্খ সেই বীর ।
উচ্চরব সেই সব অতীব গম্ভীর ॥

অনুবাদ

তখন কুরুবংশের বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম দুর্যোধনের হর্ষ উৎপাদনের জন্য সিংহের গর্জনের মতো অতি উচ্চনাদে তাঁর শঙ্খ বাজালেন।

তাৎপর্য

কুরু-রাজবংশের পিতামহ দুর্যোধনের হৃদ্‌কম্প অনুভব করতে পেরে তাঁর স্বভাবসুলভ করুণার বশবর্তী হয়ে তাঁকে উৎসাহিত করবার জন্য সিংহনাদে তাঁর শঙ্খ বাজালেন। পরোক্ষভাবে, শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে তিনি তাঁর হতাশাচ্ছন্ন পৌত্র দুর্যোধনকে জানিয়ে দিলেন যে, এই যুদ্ধে জয়লাভ করার কোন আশাই তাঁর নেই, কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন তাঁর বিপক্ষে। তবুও, ক্ষাত্রধর্ম অনুসারে জয়-পরাজয়ের কথা বিবেচনা না করে যুদ্ধ করাই তাঁর কর্তব্য এবং এই ব্যাপারে তিনি কোন রকম অবহেলা করবেন না। সেই কথা তিনি দুর্যোধনকে মনে করিয়ে দিলেন।

শ্লোক ১৩

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ১৩ ॥

ততঃ—তারপর; **শঙ্খাঃ**—শঙ্খসমূহ; **চ**—ও; **ভের্যঃ**—ভেরীসমূহ; **চ**—এবং; **পণব-আনক**—পণব ও আনক ঢাক; **গোমুখাঃ**—গোমুখ শিঙা; **সহসা**—হঠাৎ; **এব**—অবশ্যই; **অভ্যহন্যন্ত**—একসঙ্গে বাজতে লাগল; **সঃ**—সেই; **শব্দঃ**—মিলিত শব্দ; **তুমুলঃ**—তুমুল; **অভবৎ**—হয়েছিল।

গীতার গান

শুনি সেই শক্ররব যত শঙ্খ ভেরী ।
গোমুখ পণবানক বাজিল সত্বরি ॥
সহসা উঠিল সেই রণের ঝঙ্কার ।
তুমুল হইল শব্দ বহুল অপার ॥

অনুবাদ

তারপর শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনক, ঢাক ও গোমুখ শিঙাসমূহ হঠাৎ একত্রে ধ্বনিত হয়ে এক তুমুল শব্দের সৃষ্টি হল।

শ্লোক ১৪

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪ ॥

ততঃ—তখন; **শ্বেতৈঃ**—শ্বেত; **হয়ৈঃ**—অশ্বগণ; **যুক্তে**—যুক্ত হয়ে; **মহতি**—মহান; **স্যন্দনে**—রথ; **স্থিতৌ**—অবস্থিত হয়ে; **মাধবঃ**—শ্রীকৃষ্ণ (লক্ষ্মীর পতি); **পাণ্ডবঃ**—অর্জুন (পাণ্ডুর পুত্র); **চ**—ও; **এব**—অবশ্যই; **দিব্যৌ**—অপ্রাকৃত; **শঙ্খৌ**—শঙ্খগুলি; **প্রদধ্মতুঃ**—বাজালেন।

গীতার গান

তারপর শ্বেত অশ্ব রথেতে বসিয়া ।
আসিল যে মহাযুদ্ধে নিযুক্ত হইয়া ॥
মাধব আর পাণ্ডব দিব্য শঙ্খ ধরি ।
বাজাইল পরে পরে অপূর্ব মাধুরী ॥

অনুবাদ

অন্য দিকে, শ্বেত অশ্বযুক্ত এক দিব্য রথে স্থিত শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়ে তাঁদের দিব্য শঙ্খ বাজালেন।

তাৎপর্য

ভীষ্মদেবের শঙ্খের সঙ্গে বৈসাদৃশ্য দেখিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের শঙ্খকে 'দিব্য' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই দিব্য শঙ্খধ্বনি ঘোষণা করল যে, কুরুপক্ষের যুদ্ধজয়ের কোন আশাই নেই, কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবপক্ষে যোগদান করেছেন। *জয়স্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দনঃ।* পাণ্ডবদের জয় অবধারিত, কারণ জনার্দন শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের পক্ষে যোগ দিয়েছেন। ভগবান যে পক্ষে যোগদান করেন, সৌভাগ্য-লক্ষ্মীও সেই পক্ষেই থাকেন, কারণ সৌভাগ্য-লক্ষ্মী সর্বদাই তাঁর পতির অনুগামী। তাই বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের দিব্য শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে ঘোষিত হল যে,

অর্জুনের জন্য বিজয় ও সৌভাগ্য প্রতীক্ষা করছে। তা ছাড়া, যে রথে চড়ে দুই বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তা অগ্নিদেব অর্জুনকে দান করেছিলেন এবং সেই দিব্য রথ ছিল সমগ্র ত্রিভুবনে সর্বত্রই অপরাজেয়।

শ্লোক ১৫

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫ ॥

পাঞ্চজন্যম্—পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ; **হৃষীকেশঃ**—হৃষীকেশ (শ্রীকৃষ্ণ, যিনি তাঁর ভক্তদের ইন্দ্রিয়ের পরিচালক); **দেবদত্তম্**—দেবদত্ত নামক শঙ্খ; **ধনঞ্জয়ঃ**—ধনঞ্জয় (অর্জুন, যিনি ধনসম্পদ জয় করেছেন); **পৌণ্ড্রম্**—পৌণ্ড্র নামক শঙ্খ; **দধ্মৌ**—বাজালেন; **মহাশঙ্খম্**—ভয়ংকর শঙ্খ; **ভীমকর্মা**—প্রচণ্ড কর্ম সম্পাদনকারী; **বৃকোদরঃ**—বিপুল ভোজনপ্রিয় (ভীম)।

গীতার গান

হৃষীকেশ ভগবান্ পাঞ্চজন্যরবে ।
ধনঞ্জয় বাজাইল দেবদত্ত সবে ॥
ভীমকর্মা ভীমসেন বাজাইল পরে ।
পৌণ্ড্রনাম শঙ্খ সেই অতি উচ্চৈঃস্বরে ॥

অনুবাদ

তখন, শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য নামক তাঁর শঙ্খ বাজালেন, অর্জুন বাজালেন, তাঁর দেবদত্ত নামক শঙ্খ এবং বিপুল ভোজনপ্রিয় ও ভীমকর্মা ভীমসেন বাজালেন পৌণ্ড্র নামক তাঁর ভয়ংকর শঙ্খ।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণকে এই শ্লোকে হৃষীকেশ বলা হয়েছে, যেহেতু তিনি হচ্ছেন সমস্ত হৃষীক বা ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর। জীবেরা হচ্ছে তাঁর অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই জীবদের ইন্দ্রিয়গুলিও হচ্ছে তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহের অবিচ্ছেদ্য অংশ। নির্বিশেষবাদীরা জীবের ইন্দ্রিয়সমূহের মূল উৎস কোথায় তার হদিস খুঁজে পায় না, তাই তারা সমস্ত জীবদের ইন্দ্রিয়বিহীন ও নির্বিশেষ বলে বর্ণনা করতে তৎপর। সমস্ত জীবের অন্তরে অবস্থান করে ভগবান

তাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে পরিচালিত করেন। তবে এটি নির্ভর করে আত্মসমর্পণের মাত্রার উপর এবং শুদ্ধ ভক্তের ক্ষেত্রে তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবান প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত করেন। এখানে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের দিব্য ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবান সরাসরিভাবে পরিচালিত করেছেন, তাই এখানে তাঁকে হৃষীকেশ নামে অভিহিত করা হয়েছে। ভগবানের বিভিন্ন কার্যকলাপ অনুসারে তাঁর ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। যেমন, মধু নামক দানবকে সংহার করার জন্য তাঁর নাম মধুসূদন; গাভী ও ইন্দ্রিয়গুলিকে আনন্দ দান করেন বলে তাঁর নাম গোবিন্দ; বসুদেবের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন বলে তাঁর নাম বাসুদেব; দেবকীর সন্তানরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন বলে তাঁর নাম দেবকীনন্দন; বৃন্দাবনে যশোদার সন্তানরূপে তিনি তাঁর বাল্যলীলা প্রদর্শন করেন বলে তাঁর নাম যশোদানন্দন এবং সখা অর্জুনের রথের সারথি হয়েছিলেন বলে তাঁর নাম পার্থসারথি। সেই রকম, কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুনকে পরিচালনা করেছিলেন বলে তাঁর নাম হৃষীকেশ।

এখানে অর্জুনকে ধনঞ্জয় বলে অভিহিত করা হয়েছে, কারণ বিভিন্ন যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করার জন্য তিনি যুধিষ্ঠিরকে ধন সংগ্রহ করতে সাহায্য করতেন। তেমনই, ভীমকে এখানে বৃকোদর বলা হয়েছে, কারণ যেমন তিনি হিড়িম্ব আদি দানবকে বধ করার মতো দুঃসাধ্য কাজ সাধন করতে পারতেন, তেমনই তিনি প্রচুর পরিমাণে আহার করতে পারতেন। সুতরাং পাণ্ডবপক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সহ বিভিন্ন ব্যক্তিরা যখন তাঁদের বিশেষ ধরনের শঙ্খ বাজালেন, সেই দিব্য শঙ্খধ্বনি তাঁদের সৈন্যদের অন্তরে অনুপ্রেরণা সঞ্চার করল। পক্ষান্তরে, কৌরবপক্ষে আমরা কোন রকম শুভ লক্ষণের ইঙ্গিত পাই না, সেই পক্ষে পরম নিয়ন্তা ভগবান নেই, সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীও নেই। অতএব, তাঁদের পক্ষে যে যুদ্ধ-জয়ের কোন আশাই ছিল না তা পূর্বেই নির্ধারিত ছিল এবং যুদ্ধের শুরুতেই শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে সেই বার্তা ঘোষিত হল।

শ্লোক ১৬-১৮

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ ॥
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ ॥

দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে ।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮ ॥

অনন্তবিজয়ম্—অনন্তবিজয় নামক শঙ্খ; **রাজা**—রাজা; **কুন্তীপুত্রঃ**—কুন্তীর পুত্র; **যুধিষ্ঠিরঃ**—যুধিষ্ঠির; **নকুলঃ**—নকুল; **সহদেবঃ**—সহদেব; **চ**—এবং; **সুঘোষ-মণিপুষ্পকৌ**—সুঘোষ ও মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ; **কাশ্যঃ**—কাশীর (বারাণসীর) রাজা; **চ**—এবং; **পরমেষ্বাসঃ**—মহান ধনুর্ধর; **শিখণ্ডী**—শিখণ্ডী; **চ**—ও; **মহারথঃ**—সহস্র সহস্র যোদ্ধার বিরুদ্ধে একাকী যুদ্ধ করতে সক্ষম মহারথী; **ধৃষ্টদ্যুম্নঃ**—(মহারাজ দ্রুপদের পুত্র) ধৃষ্টদ্যুম্ন; **বিরাটঃ**—বিরাট (যিনি পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস কালে আশ্রয় দিয়েছিলেন); **চ**—ও; **সাত্যকিঃ**—সাত্যকি (শ্রীকৃষ্ণের সারথি যুযুধানের মতো); **চ**—এবং; **অপরাজিতঃ**—যিনি কখনও পরাজিত হননি; **দ্রুপদঃ**—পাঞ্চালের রাজা দ্রুপদ; **দ্রৌপদেয়াঃ**—দ্রৌপদীর পুত্রগণ; **চ**—ও; **সর্বশঃ**—সকলে; **পৃথিবী-পতে**—হে মহারাজ; **সৌভদ্রঃ**—সুভদ্রার পুত্র অভিমন্যু; **চ**—ও; **মহাবাহুঃ**—মহা বলবান; **শঙ্খান্**—শঙ্খসমূহ; **দধ্মুঃ**—বাজালেন; **পৃথক্ পৃথক্**—একে একে।

গীতার গান

যুধিষ্ঠির ধরে শঙ্খ রাজা কুন্তীপুত্র ।
অনন্তবিজয় সেই ঘোষণা সর্বত্র ॥
নকুল বাজাল শঙ্খ সুঘোষ তার নাম ।
সহদেব বাজাল মণিপুষ্পক নাম ॥
তারপর একে একে যত মহারথী ।
ধনুর্ধর কাশীরাজ শিখণ্ডী সারথি ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বিরাটাদি বীর সে সাত্যকি ।
মহাযোদ্ধা পারে যারা যুঝিতে একাকী ॥
দ্রুপদ আর দ্রৌপদেয় পৃথিবীপতে ।
সৌভদ্র বাজাল শঙ্খ যার যার মতে ॥

অনুবাদ

কুন্তীপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় নামক শঙ্খ বাজালেন এবং নকুল ও সহদেব বাজালেন সুঘোষ ও মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ। হে মহারাজ! তখন মহান ধনুর্ধর কাশীরাজ, প্রবল যোদ্ধা শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, অপরাজিত সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, সুভদ্রার মহা বলবান পুত্র এবং অন্য সকলে তাঁদের নিজ নিজ পৃথক শঙ্খ বাজালেন।

তাৎপর্য

সঞ্জয় সুকৌশলে ধৃতরাষ্ট্রকে জানিয়ে দিলেন যে, পাণ্ডুপুত্রদের প্রতারণা করে তাঁর নিজের ছেলেদের সিংহাসনে বসাবার দুরভিসন্ধি করাটা তাঁর পক্ষে মোটেই প্রশংসনীয় কাজ হয়নি। চারদিক থেকেই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল যে, কুরুবংশের সমূলে বিনাশ হবে এবং পিতামহ ভীষ্ম থেকে শুরু করে অভিমন্যু আদি পৌত্রেরা সকলেই যুদ্ধে নিহত হবেন। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে উপস্থিত রাজা-মহারাজা ও রথী-মহারথীরা সকলেই নিহত হবেন। এই বিপর্যয়ের মূল কারণ ছিলেন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র স্বয়ং, কারণ তাঁর পুত্রদের দুষ্কর্মে তিনি কখনও কোন রকম বাধা দেননি, উপরন্তু তাদের সব রকম দুষ্কর্মে তিনি অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন।

শ্লোক ১৯

স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ ।
নভশ্চ পৃথিবীং চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ ॥ ১৯ ॥

সঃ—সেই; **ঘোষঃ**—শব্দ-স্পন্দন; **ধার্তরাষ্ট্রাণাম্**—ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের; **হৃদয়ানি**—হৃদয়; **ব্যদারয়ৎ**—চূর্ণবিচূর্ণ করেছিল; **নভঃ**—আকাশ; **চ**—ও; **পৃথিবীম্**—পৃথিবীকে; **চ**—ও; **এব**—অবশ্যই; **তুমুলঃ**—প্রচণ্ড; **অভ্যনুনাদয়ন্**—অনুরণিত হয়ে।

গীতার গান

সে শব্দ ভাঙিল বুক ধার্তরাষ্ট্রগণে ।
আকাশ ভেদিল পৃথ্বী কাঁপিল সঘনে ॥

অনুবাদ

শঙ্খ-নিনাদের সেই প্রচণ্ড শব্দ আকাশ ও পৃথিবী প্রতিধ্বনিত করে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের হৃদয় বিদারিত করতে লাগল।

তাৎপর্য

ভীষ্মদেব আদি কৌরব-পক্ষের বীরেরা যখন শঙ্খ বাজিয়েছিলেন, তখন পাণ্ডবদের বুক ভয়ে কেঁপে ওঠেনি। কিন্তু এই শ্লোকে আমরা দেখছি যে, পাণ্ডবদের শঙ্খনাদে

ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের হৃদয় ভয়ে বিদীর্ণ হল। পাণ্ডবদের মনে কোন ভয় ছিল না, কারণ তাঁরা ছিলেন সদাচারী এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত। ভগবানের কাছে যিনি আত্মসমর্পণ করেন, তাঁর মনে কোন ভয় থাকে না, চরম বিপদেও তিনি থাকেন অবিচলিত।

শ্লোক ২০

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥ ২০ ॥

অথ—অতঃপর; **ব্যবস্থিতান্**—অবস্থিত; **দৃষ্ট্বা**—দেখে; **ধার্তরাষ্ট্রান্**—ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের; **কপিধ্বজঃ**—যাঁর পতাকায় হনুমান চিহ্ন শোভা পায়; **প্রবৃত্তে**—প্রবৃত্ত হওয়ার সময়; **শস্ত্রসম্পাতে**—অস্ত্র নিক্ষেপ করতে; **ধনুঃ**—ধনুক; **উদ্যম্য**—তুলে নিয়ে; **পাণ্ডবঃ**—পাণ্ডুপুত্র (অর্জুন); **হৃষীকেশম্**—শ্রীকৃষ্ণকে; **তদা**—তখন; **বাক্যম্**—বাক্য; **ইদম্**—এই; **আহ**—বললেন; **মহীপতে**—হে মহারাজ।

গীতার গান

কপিধ্বজ দেখি ধার্তরাষ্ট্রের গণেরে।
যুদ্ধের সজ্জায় সেথা মিলিল অচিরে ॥
নিজ অস্ত্র ধনুর্বাণ যথাস্থানে ধরি।
যুদ্ধের লাগিয়া সেথা স্মরিল শ্রীহরি ॥

অনুবাদ

সেই সময় পাণ্ডুপুত্র অর্জুন হনুমান চিহ্নিত পতাকা শোভিত রথে অধিষ্ঠিত হয়ে, তাঁর ধনুক তুলে নিয়ে শর নিক্ষেপ করতে প্রস্তুত হলেন। হে মহারাজ! ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের সমরসজ্জায় বিন্যস্ত দেখে, অর্জুন তখন শ্রীকৃষ্ণকে এই কথাগুলি বললেন—

তাৎপর্য

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের শুরুতেই আমরা দেখতে পাই, পাণ্ডবদের অপ্রত্যাশিত সৈন্যসজ্জা দেখে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের হৃদ্‌কম্প শুরু হয়ে গেছে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

স্বয়ং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে উপস্থিত থেকে পাণ্ডবদের পরিচালিত করেছিলেন, তাই কৌরবদের এই হৃদ্‌কম্প হওয়াটা স্বাভাবিক। অর্জুনের রথে হনুমান অঙ্কিত ধ্বজাও একটি বিজয়সূচক ইঙ্গিত, কারণ রাম-রাবণের যুদ্ধে হনুমান শ্রীরামচন্দ্রকে সহযোগিতা করেছিলেন এবং শ্রীরামচন্দ্র বিজয়ী হয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেও অর্জুনকে সাহায্য করবার জন্য তাঁর রথে শ্রীরামচন্দ্র ও হনুমান দুজনকেই উপস্থিত থাকতে দেখতে পাই। শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন শ্রীরামচন্দ্র এবং যেখানে শ্রীরামচন্দ্র, সেখানেই তাঁর নিত্য সেবক ভক্ত-হনুমান এবং নিত্য সঙ্গিনী সীতা লক্ষ্মীদেবী উপস্থিত থাকেন। তাই, অর্জুনের কোন শত্রুর ভয়েই ভীত হবার কারণ ছিল না, আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে পরিচালিত করবার জন্য স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। এভাবে, যুদ্ধজয়ের সমস্ত শুভ পরামর্শ অর্জুন পাচ্ছিলেন। তাঁর নিত্যকালের ভক্তের জন্য ভগবানের দ্বারা আয়োজিত এই রকম শুভ পরিস্থিতিতে সুনিশ্চিত জয়েরই ইঙ্গিত বহন করে।

শ্লোক ২১-২২

অর্জুন উবাচ

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত।
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্ ॥ ২১ ॥
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২২ ॥

অর্জুনঃ উবাচ—অর্জুন বললেন; **সেনয়োঃ**—সৈন্যদের; **উভয়োঃ**—উভয়; **মধ্যে**—মধ্যে; **রথম্**—রথ; **স্থাপয়**—স্থাপন কর; **মে**—আমার; **অচ্যুত**—হে অচ্যুত; **যাবৎ**—যাতে; **এতান্**—এই সমস্ত; **নিরীক্ষে**—দেখতে পারি; **অহম্**—আমি; **যোদ্ধুকামান্**—যুদ্ধ করতে অভিলাষী; **অবস্থিতান্**—যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত; **কৈঃ**—কাদের সঙ্গে; **ময়া**—আমাকে; **সহ**—সঙ্গে; **যোদ্ধব্যম্**—যুদ্ধ করতে হবে; **অস্মিন্**—এই; **রণ**—সংগ্রাম; **সমুদ্যমে**—প্রচেষ্টায়।

গীতার গান

মহীপতে! পাণ্ডুপুত্র কহে হৃষীকেশে।
উভয় সেনার মাঝে রথের প্রবেশে ॥
যাবৎ দেখিব এই যুদ্ধকামীগণে।
তাবৎ রাখিবে রথ অচ্যুত এখানে ॥

দেখিবারে চাহি কেবা আসিয়াছে হেথা ।
কাহার সহিত হবে যুঝিবারে সেথা ॥

অনুবাদ

অর্জুন বললেন—হে অচ্যুত! তুমি উভয় পক্ষের সৈন্যদের মাঝখানে আমার রথ স্থাপন কর, যাতে আমি দেখতে পারি যুদ্ধ করার অভিলাষী হয়ে কারা এখানে এসেছে এবং এই মহা সংগ্রামে আমাকে কাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে।

তাৎপর্য

যদিও শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, তবুও তিনি অহৈতুকী কৃপাবশে তাঁর প্রিয় সখা অর্জুনের রথের সারথি হয়ে তাঁর সেবা করছেন। ভক্তের প্রতি করুণা প্রদর্শনে ভগবান কখনও চ্যুত হন না, তাই তাঁকে এখানে *অচ্যুত* বলে সম্ভাষণ করা হয়েছে। অর্জুনের রথের সারথি হবার ফলে তাঁকে অর্জুনের আদেশ অনুযায়ী কাজ করতে হয়েছিল এবং যেহেতু তা করতে তিনি কুণ্ঠিত হননি, তাই তাঁকে *অচ্যুত* বলে সম্বোধন করা হয়েছে। যদিও তিনি তাঁর ভক্তের রথের সারথি হয়েছেন, তবুও তাঁর পরম পদ কেউ দাবি করতে পারে না। সকল অবস্থাতেই তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষ ভগবান বা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর হৃষীকেশ। ভগবানের সঙ্গে ভক্তের সম্পর্ক মধুর ও অপ্রাকৃত। ভক্ত সর্বদাই ভগবানের সেবায় উন্মুখ, ঠিক তেমনই ভগবানও তাঁর ভক্তের কোন রকম পরিচর্যা করতে সুযোগের অন্বেষণ করেন। ভগবান যখন তাঁর কোন শুদ্ধ ভক্তের আদেশ অনুসারে তাঁকে পরিচর্যা করার সুযোগ পান, তখন তিনি অসীম আনন্দ উপভোগ করেন। ভগবান হচ্ছেন সর্বলোক-মহেশ্বর। যেহেতু তিনি হচ্ছেন প্রভু, প্রত্যেকেই তাঁর আদেশের অধীন, এবং তাই তাঁকে আদেশ দেবার মতো তাঁর ঊর্ধ্বে আর কেউ নেই। কিন্তু যখন তিনি দেখেন যে, কোন শুদ্ধ ভক্ত তাঁকে আদেশ করছেন, তখন তিনি দিব্য আনন্দ লাভ করেন, যদিও সকল অবস্থাতেই তিনি হচ্ছেন অভ্রান্ত প্রভু।

ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরূপে অর্জুন কখনই কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাননি, কিন্তু কোন রকম শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করতে অনাগ্রহী দুর্যোধনের দুর্দমনীয় মনোভাব তাঁকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বাধ্য করেছিল। তাই, তিনি যুদ্ধের আগে একবার দেখে নিতে চেয়েছিলেন, তাঁর বিপক্ষে যুদ্ধ করতে কে কে সেই রণাঙ্গনে উপস্থিত হয়েছিল। যদিও যুদ্ধক্ষেত্রে শান্তি স্থাপন করার কোন প্রশ্নই ওঠে না, তবুও যুদ্ধের আগে অর্জুন একবার সকলকে দেখতে চেয়েছিলেন এবং তিনি দেখে নিতে চেয়েছিলেন সেই অন্যায় যুদ্ধে কৌরবেরা কতখানি উৎসাহী ছিল।

শ্লোক ২৩

যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ ।
ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩ ॥

যোৎস্যমানান্—যারা যুদ্ধ করবে; **অবেক্ষে**—দেখতে চাই; **অহম্**—আমি; **যে**—যে; **এতে**—যারা; **অত্র**—এখানে; **সমাগতাঃ**—সমবেত হয়েছে; **ধার্তরাষ্ট্রস্য**—ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রের পক্ষে; **দুর্বুদ্ধেঃ**—দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন; **যুদ্ধে**—যুদ্ধে; **প্রিয়**—ভাল; **চিকীর্ষবঃ**—বাসনা করে।

গীতার গান

যুদ্ধকামীগণে আজ নিরখিব আমি ।
দুর্বুদ্ধি ধার্তরাষ্ট্রের জন্য যুদ্ধকামী ॥

অনুবাদ

ধৃতরাষ্ট্রের দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন পুত্রকে সন্তুষ্ট করার বাসনা করে যারা এখানে যুদ্ধ করতে এসেছে, তাদের আমি দেখতে চাই।

তাৎপর্য

এই কথা সকলেরই জানা ছিল যে, দুর্যোধন তার পিতা ধৃতরাষ্ট্রের সহযোগিতায় অন্যায়ভাবে পাণ্ডবদের রাজত্ব আত্মসাৎ করতে চেষ্টা করছিল। তাই, যারা দুর্যোধনের পক্ষে যোগ দিয়েছিল, তারা সকলেই ছিল 'এক গোয়ালের গরু'। যুদ্ধের প্রারম্ভে অর্জুন দেখে নিতে চেয়েছিলেন তারা কারা। কৌরবদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করবার সব রকম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার ফলেই কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের আয়োজন করা হয়, তাই সেই যুদ্ধক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার কোন রকম বাসনা অর্জুনের ছিল না। অর্জুন যদিও স্থির নিশ্চিতভাবে জানতেন, জয় তাঁর হবেই, কারণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পাশেই বসে আছেন, তবুও যুদ্ধের প্রারম্ভে তিনি শত্রুপক্ষের সৈন্যবল কতটা তা দেখে নিতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ২৪

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত ।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ ২৪ ॥

সঞ্জয়ঃ উবাচ—সঞ্জয় বললেন; **এবম্**—এভাবে; **উক্তঃ**—আদিষ্ট হয়ে; **হৃষীকেশঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **গুড়াকেশেন**—অর্জুনের দ্বারা; **ভারত**—হে ভরতবংশীয়; **সেনয়োঃ**—সৈন্যদের; **উভয়োঃ**—উভয় পক্ষের; **মধ্যে**—মধ্যে; **স্থাপয়িত্বা**—স্থাপন করে; **রথ-উত্তমম্**—অতি উত্তম রথ।

গীতার গান

সে কথা শুনিয়া হৃষীকেশ ভগবান্ ।
উভয় সেনার দিকে হইল আগুয়ান ॥
উভয় সেনার মধ্যে রাখি রথোত্তম ।
কহিতে লাগিল কৃষ্ণ হইয়া সম্ভ্রম ॥

অনুবাদ

সঞ্জয় বললেন—হে ভরত-বংশধর! অর্জুন কর্তৃক এভাবে আদিষ্ট হয়ে, শ্রীকৃষ্ণ সেই অতি উত্তম রথটি চালিয়ে নিয়ে উভয় পক্ষের সৈন্যদের মাঝখানে রাখলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে অর্জুনকে গুড়াকেশ বলে অভিহিত করা হয়েছে। *গুড়াকা* মানে হচ্ছে নিদ্রা এবং যিনি নিদ্রা জয় করেছেন, তাঁকে বলা হয় *গুড়াকেশ*। নিদ্রা অর্থে অজ্ঞানতাকেও বোঝায়। অতএব শ্রীকৃষ্ণের বন্ধুত্ব লাভ করার ফলে অর্জুন নিদ্রা ও অজ্ঞানতা উভয়কেই জয় করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত অর্জুন এক মুহূর্তের জন্যও শ্রীকৃষ্ণকে বিস্মৃত হতেন না, কারণ এটিই হচ্ছে ভক্তের লক্ষণ। শয়নে অথবা জাগরণে ভক্ত ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা স্মরণে কখনও বিরত হন না। এভাবেই কৃষ্ণভক্ত সর্বদাই কৃষ্ণচিন্তায় মগ্ন থেকে নিদ্রা ও অজ্ঞানতা জয় করতে পারেন। একেই বলা হয় কৃষ্ণভাবনা বা সমাধি। হৃষীকেশ অথবা সমস্ত জীবের ইন্দ্রিয় ও মনের নিয়ন্তা হবার ফলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের অভিপ্রায় বুঝতে পেরেছিলেন, কেন তাঁকে সৈন্যের মধ্যে রথ স্থাপন করতে বলেছেন। এভাবে অর্জুনের নির্দেশ পালন করার পর তিনি বললেন।

শ্লোক ২৫

ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাং চ মহীক্ষিতাম্ ।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥ ২৫ ॥

ভীষ্ম—পিতামহ ভীষ্ম; **দ্রোণ**—দ্রোণাচার্য; **প্রমুখতঃ**—সম্মুখে; **সর্বেষাম্**—সমস্ত; **চ**—ও; **মহীক্ষিতাম্**—নৃপতিদের; **উবাচ**—বললেন; **পার্থ**—হে পার্থ; **পশ্য**—দেখ; **এতান্**—এদের সকলকে; **সমবেতান্**—সমবেত; **কুরূন্**—কুরুবংশের সমস্ত সদস্যদের; **ইতি**—এভাবে।

গীতার গান

দেখ পার্থ সমবেত ধার্তরাষ্ট্রগণ ।
ভীষ্ম দ্রোণ প্রমুখত যত যোদ্ধাগণ ॥

অনুবাদ

ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ পৃথিবীর অন্য সমস্ত নৃপতিদের সামনে ভগবান হৃষীকেশ বললেন, হে পার্থ! এখানে সমবেত সমস্ত কৌরবদের দেখ।

তাৎপর্য

সর্বজীবের পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ জানতেন অর্জুনের মনে কি হচ্ছিল। এই প্রসঙ্গে তাঁকে হৃষীকেশ বলার মধ্য দিয়ে বোঝানো হচ্ছে, তিনি সবই জানতেন, তিনি সর্বজ্ঞ। এখানে অর্জুনকে পার্থ, অর্থাৎ পৃথা বা কুন্তীর পুত্র বলে অভিহিত করাটাও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বন্ধু হিসাবে তিনি অর্জুনকে জানাতে চেয়েছিলেন যে, যেহেতু অর্জুন হচ্ছেন তাঁর পিতা বসুদেবের ভগ্নী পৃথার পুত্র, তাই তিনি তাঁর রথের সারথি হতে সম্মত হয়েছেন। এখন শ্রীকৃষ্ণ যখন বললেন, "দেখ পার্থ, সমবেত ধার্তরাষ্ট্রগণ", তখন তিনি কি অর্থ করেছিলেন? সেই জন্যই কি অর্জুন সেখানে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, যুদ্ধ করতে অসম্মত হননি? পিতামহ ভীষ্ম, পিতৃতুল্য আচার্য দ্রোণ, এঁদের দেখে কি অর্জুনের হৃদয় আর্দ্র হয়ে ওঠেনি? কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতৃস্বসা কুন্তীদেবীর পুত্র অর্জুনের কাছ থেকে এমন আচরণ কখনই আশা করেননি। অর্জুনের মনের ভাব বুঝতে পেরে পরিহাসছলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভবিষ্যৎ-বাণী করলেন।

শ্লোক ২৬

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্ ।
আচার্যান্মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা ।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬ ॥

তত্র—সেখানে; **অপশ্যৎ**—দেখলেন; **স্থিতান্**—অবস্থিত; **পার্থঃ**—অর্জুন; **পিতৄন্**—পিতৃব্যদের; **অথ**—ও; **পিতামহান্**—পিতামহদের; **আচার্যান্**—শিক্ষকদের; **মাতুলান্**—মাতুলদের; **ভ্রাতৄন্**—ভ্রাতাদের; **পুত্রান্**—পুত্রদের; **পৌত্রান্**—পৌত্রদের; **সখীন্**—বন্ধুদের; **তথা**—ও; **শ্বশুরান্**—শ্বশুরদের; **সুহৃদঃ**—শুভাকাঙ্ক্ষীদের; **চ**—ও; **এব**—অবশ্যই; **সেনয়োঃ**—সেনাদলের; **উভয়োঃ**—উভয়; **অপি**—অন্তর্ভুক্ত।

গীতার গান

তারপর দেখে পার্থ যোদ্ধপিতৃগণ ।
আচার্য মাতুল আদি পিতৃসম হন ॥
দেখে পুত্র পৌত্রাদিক যত সখাজন ।
আর সব বহু লোক আত্মীয়স্বজন ॥
শ্বশুরাদি কুটুম্বীয় নাহি পারাপার ।
উভয়পক্ষীয় সৈন্য সে হল অপার ॥

অনুবাদ

তখন অর্জুন উভয় পক্ষের সেনাদলের মধ্যে পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, শ্বশুর, মিত্র ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের উপস্থিত দেখতে পেলেন।

তাৎপর্য

যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুন সমস্ত আত্মীয়স্বজনকে দেখতে পেলেন। তিনি ভূরিশ্রবা আদি পিতৃবন্ধুদের দেখলেন; ভীষ্মদেব, সোমদত্ত আদি পিতামহদের দেখলেন; দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য আদি শিক্ষা-গুরুদের দেখলেন; শল্য, শকুনি আদি মাতুলদের দেখলেন; দুর্যোধন আদি ভাইদের দেখলেন; পুত্রতুল্য লক্ষ্মণকে দেখলেন; অশ্বত্থামার মতো বন্ধুকে দেখলেন; কৃতবর্মার মতো শুভাকাঙ্ক্ষীকে দেখলেন। এভাবে শত্রুপক্ষের সৈন্যদের মধ্যে তিনি কেবল আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদেরই দেখলেন।

শ্লোক ২৭

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্ ।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২৭ ॥

তান্—তাঁদের; **সমীক্ষ্য**—দেখে; **সঃ**—তিনি; **কৌন্তেয়ঃ**—কুন্তীপুত্র; **সর্বান্**—সব রকমের; **বন্ধূন্**—বন্ধুদের; **অবস্থিতান্**—অবস্থিত; **কৃপয়া**—কৃপার দ্বারা; **পরয়া**—অত্যন্ত; **আবিষ্টঃ**—অভিভূত হয়ে; **বিষীদন্**—দুঃখ করতে করতে; **ইদম্**—এভাবে; **অব্রবীৎ**—বললেন।

গীতার গান

তাদের দেখিল পার্থ সবই বান্ধব ।
কাঁপিল হৃদয় তার বিষণ্ণ বৈভব ॥
কৃপাতে কাঁদিল মন অতি দয়াবান ।
বিষণ্ণ হইয়া বলে শুন ভগবান্ ॥

অনুবাদ

যখন কুন্তীপুত্র অর্জুন সকল রকমের বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনদের যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত দেখলেন, তখন তিনি অত্যন্ত কৃপাবিষ্ট ও বিষণ্ণ হয়ে বললেন।

শ্লোক ২৮

অর্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেমং স্বজনং কৃষ্ণ যুযুৎসুং সমুপস্থিতম্ ।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখং চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮ ॥

অর্জুনঃ উবাচ—অর্জুন বললেন; **দৃষ্ট্বা**—দেখে; **ইমম্**—এই সমস্ত; **স্বজনম্**—আত্মীয়-স্বজনদের; **কৃষ্ণ**—হে কৃষ্ণ; **যুযুৎসুম্**—যুদ্ধাভিলাষী; **সমুপস্থিতম্**—সমবেত; **সীদন্তি**—অবসন্ন হচ্ছে; **মম**—আমার; **গাত্রাণি**—সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ; **মুখম্**—মুখ; **চ**—ও; **পরিশুষ্যতি**—শুষ্ক হচ্ছে।

গীতার গান

অর্জুন কহয়ে কৃষ্ণ এরা যে স্বজন ।
রণাঙ্গনে আসিয়াছে করিবারে রণ ॥
দেখিয়া আমার গাত্রে হয়েছে রোমাঞ্চ ।
মুখমধ্যে রস নাই এ যে মহাবঞ্চ ॥

অনুবাদ

অর্জুন বললেন—হে প্রিয়বর কৃষ্ণ! আমার সমস্ত বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের এমনভাবে যুদ্ধাভিলাষী হয়ে আমার সামনে অবস্থান করতে দেখে আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবশ হচ্ছে এবং মুখ শুষ্ক হয়ে উঠছে।

তাৎপর্য

যিনি প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত তাঁর মধ্যে সদ্‌গুণগুলিই বর্তমান থাকে, যা সাধারণত দেবতা ও দৈবী ভাবাপন্ন মানুষের মধ্যে কেবল দেখা যায়। পক্ষান্তরে যারা অভক্ত, ভগবৎ-বিমুখ, তারা জাগতিক শিক্ষা-সংস্কৃতির মাপকাঠিতে যতই উন্নত বলে প্রতীত হোক, তাদের মধ্যে এই সমস্ত দৈব গুণগুলির প্রকাশ একেবারেই দেখা যায় না। সেই কারণেই, যে সমস্ত হীন মনোভাবাপন্ন আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবেরা অর্জুনকে সব রকম দুঃখ-কষ্টের মধ্যে ঠেলে দিতে কুণ্ঠাবোধ করেনি, যারা তাঁকে তাঁর ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করবার জন্য এই যুদ্ধের আয়োজন করেছিল, এই যুদ্ধক্ষেত্রে তাদেরই দেখে অর্জুনের অন্তরাত্মা কেঁদে উঠেছিল। তাঁর স্বপক্ষের সৈন্যদের প্রতি অর্জুনের সহানুভূতি ছিল অতি গভীর, কিন্তু যুদ্ধের পূর্বমুহূর্তে এমন কি শত্রুপক্ষের সৈন্যদের দেখে এবং তাদের আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে অর্জুন শোকাতুর হয়ে পড়েছিলেন। সেই গভীর শোকে তাঁর শরীর কাঁপছিল, মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। কুরুপক্ষের এই যুদ্ধলালসা তাঁকে আশ্চর্যান্বিত করেছিল। বাস্তবিকপক্ষে সমস্ত শ্রেণীর লোকেরা এবং অর্জুনের রক্তের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছিল। তিনি বুঝতে পারছিলেন না তাঁর সমস্ত আত্মীয়-স্বজনেরা কেন তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে সমবেত হয়েছে। তাদের এই নিষ্ঠুর মনোভাব অর্জুনের মতো দয়ালু ভগবদ্ভক্তকে অভিভূত করেছিল। এখানে যদিও এই কথার উল্লেখ করা হয়নি, তবু আমাদের অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, অর্জুনের শরীর কেবল শুষ্ক ও কম্পিতই হয়নি, সেই সঙ্গে অনুকম্পা ও সহানুভূতিতে তাঁর চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় জলও পড়ছিল। অর্জুনের এই ধরনের আচরণ তাঁর দুর্বলতার প্রকাশ নয়, এ হচ্ছে তাঁর হৃদয়ের কোমলতার প্রকাশ। ভগবানের ভক্ত করুণার সিন্ধু, অপরের দুঃখে তাঁর অন্তর কাঁদে। তাই, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত অর্জুন বীরশ্রেষ্ঠ হলেও তাঁর অন্তরের কোমলতার পরিচয় আমরা এখানে পাই। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥

"ভগবানের প্রতি যাঁর অবিচলিত ভক্তি আছে, তিনি দেবতাদের সব কয়টি মহৎ গুণের দ্বারা ভূষিত। কিন্তু যে ভগবদ্ভক্ত নয়, তার যা কিছু গুণ সবই জাগতিক এবং সেগুলির কোনই মূল্য নেই। কারণ, সে মনোধর্মের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং সে অবধারিত ভাবেই চোখ-ধাঁধানো জাগতিক শক্তির দ্বারা আকর্ষিত হয়ে পড়ে।"
(*ভাগবত* ৫/১৮/১২)

শ্লোক ২৯

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে ।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥ ২৯ ॥

বেপথুঃ—কম্প; **চ**—ও; **শরীরে**—দেহে; **মে**—আমার; **রোমহর্ষঃ**—রোমাঞ্চ; **চ**—ও; **জায়তে**—হচ্ছে; **গাণ্ডীবম্**—গাণ্ডীব নামক অর্জুনের ধনুক; **স্রংসতে**—স্খলিত হচ্ছে; **হস্তাৎ**—হাত থেকে; **ত্বক্**—ত্বক; **চ**—ও; **এব**—অবশ্যই; **পরিদহ্যতে**—দগ্ধ হচ্ছে।

গীতার গান

কাঁপিছে শরীর মোর সহিতে না পারি ।
গাণ্ডীব খসিয়া যায় কি করিয়া ধরি ॥
জ্বলিয়া উঠিছে ত্বক মহাতাপ বাণ ।
হইও না হইও না বন্ধু আর আগুয়ান ॥

অনুবাদ

আমার সর্বশরীর কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হচ্ছে, আমার হাত থেকে গাণ্ডীব খসে পড়ছে এবং ত্বক যেন জ্বলে যাচ্ছে।

তাৎপর্য

শরীরে কম্পন দেখা দেওয়ার দুটি কারণ আছে এবং রোমাঞ্চ হওয়ারও দুটি কারণ আছে। তার একটি হচ্ছে চিন্ময় আনন্দের অনুভূতি এবং অন্যটি হচ্ছে প্রচণ্ড জড়-জাগতিক ভয়। অপ্রাকৃত অনুভূতি হলে কোন ভয় থাকে না। অর্জুনের এই রোমাঞ্চ ও কম্পন অপ্রাকৃত আনন্দের অনুভূতির ফলে নয়, পক্ষান্তরে জড়-জাগতিক ভয়ের ফলে। এই ভয়ের উদ্রেক হয়েছিল তাঁর আত্মীয়-পরিজনদের প্রাণহানির আশঙ্কার ফলে। তার অন্যান্য লক্ষণ দেখেও আমরা তা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি।

অর্জুন এতই অস্থির হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর হাত থেকে গাণ্ডীব ধনু খসে পড়েছিল এবং প্রচণ্ড দুঃখে তাঁর হৃদয় দগ্ধ হবার ফলে, তাঁর ত্বক জ্বলে যাচ্ছিল। এই সমস্ত কিছুরই মূল কারণ হচ্ছে ভয়। অর্জুন এই মনে করে ভীষণভাবে ভীত হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর সমস্ত আত্মীয়-স্বজনেরা সেই যুদ্ধে হত হবে এবং এই যে হারাবার ভয়, তারই বাহ্যিক প্রকাশ হচ্ছিল তাঁর দেহের কম্পন, রোমাঞ্চ, মুখ শুকিয়ে যাওয়া, গা জ্বালা করা আদির মাধ্যমে। গভীরভাবে বিবেচনা করলে আমরা দেখতে পাই, অর্জুনের এই ভয়ের কারণ হচ্ছে, তিনি তাঁর দেহটিকেই তাঁর স্বরূপ বলে মনে করেছিলেন এবং তাঁর দেহের সম্বন্ধে যারা তথাকথিত আত্মীয়, তাদের হারাবার শোকে তিনি মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন।

শ্লোক ৩০

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০ ॥

ন—না; **চ**—ও; **শক্নোমি**—সক্ষম হই; **অবস্থাতুম্**—স্থির থাকতে; **ভ্রমতি**—বিস্মরণ; **ইব**—যেন; **চ**—এবং; **মে**—আমার; **মনঃ**—মন; **নিমিত্তানি**—নিমিত্তসমূহ; **চ**—ও; **পশ্যামি**—দেখছি; **বিপরীতানি**—বিপরীত; **কেশব**—হে কেশী দানবহন্তা (শ্রীকৃষ্ণ)।

গীতার গান

অস্থির হয়েছি আমি স্থির নহে মন ।
সব ভুল হয়ে যায় কি করি এখন ॥
বিপরীত অর্থ দেখি শুনহ কেশব ।
এ যুদ্ধে কাজ নাহি হল পণ্ড সব ॥

অনুবাদ

হে কেশব! আমি এখন আর স্থির থাকতে পারছি না। আমি আত্মবিস্মৃত হচ্ছি এবং আমার চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হচ্ছে। হে কেশী দানবহন্তা শ্রীকৃষ্ণ! আমি কেবল অমঙ্গলসূচক লক্ষণসমূহ দর্শন করছি।

তাৎপর্য

অর্জুন অস্থির হয়ে পড়েছিলেন, তাই তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে থাকতে অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁর মন এতই বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল যে, তিনি আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ছিলেন। জড় জগতের প্রতি অত্যধিক আসক্তি মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করে ফেলে। *ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ* (*ভাগবত* ১১/২/৩৭)—এই ধরনের ভীতি ও আত্মবিস্মৃতি তখনই দেখা দেয়, যখন মানুষ জড়া শক্তির দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হয়ে পড়ে। অর্জুন অনুভব করেছিলেন, সেই যুদ্ধের পরিণতি হচ্ছে কেবল স্বজন হত্যা এবং এভাবে শত্রুনিধন করে যুদ্ধে জয়লাভ করার মধ্যে কোন সুখই তিনি পাবেন না। এখানে *নিমিত্তানি বিপরীতানি* কথাগুলি তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষ যখন নৈরাশ্য ও হতাশার সম্মুখীন হয়, তখন সে মনে করে, "আমার বেঁচে থাকার তাৎপর্য কি?" সকলেই কেবল তার নিজের সুখ-সুবিধার কথাই চিন্তা করে। ভগবানের বিষয়ে কেউই মাথা ঘামায় না। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতেই অর্জুন তাঁর প্রকৃত স্বার্থ বিষয়ে অজ্ঞতা প্রদর্শন করেছেন। মানুষের প্রকৃত স্বার্থ নিহিত রয়েছে বিষ্ণু অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণেরই মাঝে। মায়াবদ্ধ জীবেরা এই কথা ভুলে গেছে, তাই তারা নানাভাবে কষ্ট পায়। এই দেহাত্মবুদ্ধির প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ার ফলে অর্জুন মনে করেছিলেন, তাঁর পক্ষে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয় লাভ করাটা হবে গভীর মর্মবেদনার কারণ।

শ্লোক ৩১

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে ।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥ ৩১ ॥

ন—না; **চ**—ও; **শ্রেয়ঃ**—মঙ্গল; **অনুপশ্যামি**—দেখছি; **হত্বা**—হত্যা করে; **স্বজনম্**—আত্মীয়-স্বজনদের; **আহবে**—যুদ্ধে; **ন**—না; **কাঙ্ক্ষে**—আকাঙ্ক্ষা করি; **বিজয়ম্**—যুদ্ধে জয়; **কৃষ্ণ**—হে কৃষ্ণ; **ন**—না; **চ**—ও; **রাজ্যম্**—রাজ্য; **সুখানি**—সুখ; **চ**—ও।

গীতার গান

কোন হিত নাহি হেথা স্বজনসংহারে ।
যুদ্ধে মোর কাজ নাই ফিরাও আমারে ॥
হে কৃষ্ণ! বিজয় মোর নাহি সে আকাঙ্ক্ষা ।
রাজ্য আর সুখ শান্তি সবই আশঙ্কা ॥

অনুবাদ

হে কৃষ্ণ! যুদ্ধে আত্মীয়-স্বজনদের নিধন করা শ্রেয়স্কর দেখছি না। আমি যুদ্ধে জয়লাভ চাই না, রাজ্য এবং সুখভোগও কামনা করি না।

তাৎপর্য

মায়াবদ্ধ মানুষ বুঝতে পারে না, তার প্রকৃত স্বার্থ নিহিত আছে বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের মাঝে। এই কথা বুঝতে না পেরে তারা তাদের দেহজাত আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তাদের সাহচর্যে সুখী হতে চায়। জীবনের এই প্রকার অন্ধ-ধারণার বশবর্তী হয়ে, তারা এমন কি জাগতিক সুখের কারণগুলিও ভুলে যায়। এখানে অর্জুনের আচরণে আমরা দেখতে পাই, তিনি তাঁর ক্ষাত্রধর্মও ভুলে গেছেন। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, দুই রকমের মানুষ দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত সূর্যলোকে উত্তীর্ণ হন, তাঁরা হচ্ছেন (১) শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে যে ক্ষত্রিয় রণভূমিতে প্রাণত্যাগ করেন, তিনি এবং (২) যে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী অধ্যাত্ম-চিন্তায় গভীরভাবে অনুরক্ত, তিনি। অর্জুনের অন্তঃকরণ এতই কোমল যে, তাঁর আত্মীয়-স্বজনের প্রাণ হনন করা তো দূরের কথা, তিনি তাঁর শত্রুকে পর্যন্ত হত্যা করতে নারাজ ছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, তাঁর স্বজনদের হত্যা করে তিনি সুখী হতে পারবেন না। যার ক্ষুধা নেই সে যেমন রান্না করতে চায় না, অর্জুনও তেমন যুদ্ধ করতে চাইছিলেন না। পক্ষান্তরে তিনি স্থির করেছিলেন, অরণ্যের নির্জনতায় নৈরাশ্য-পীড়িত জীবন অতিবাহিত করবেন। অর্জুন ছিলেন ক্ষত্রিয়, এই ধর্ম পালন করার জন্য তাঁর রাজত্বের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ন্যায়সঙ্গতভাবে পাওয়া সেই রাজত্ব থেকে দুর্যোধন আদি কৌরবেরা তাঁকে বঞ্চিত করার ফলে, সেই রাজ্যে তাঁর অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। কিন্তু যুদ্ধ করতে এসে তিনি যখন দেখলেন, তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করে সেই রাজ্যে তাঁর অধিকারের প্রতিষ্ঠা করতে হবে, তখন তিনি গভীর দুঃখে ও নৈরাশ্যে স্থির করলেন যে, তিনি সব কিছু ত্যাগ করে বনবাসী হবেন।

শ্লোক ৩২-৩৫

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা ।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥ ৩২ ॥

ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ ।
আচার্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩ ॥
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা ।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥ ৩৪ ॥
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে ।
নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দন ॥ ৩৫ ॥

কিম্—কি প্রয়োজন; **নঃ**—আমাদের; **রাজ্যেন**—রাজ্যে; **গোবিন্দ**—হে কৃষ্ণ; **কিম্**—কি; **ভোগৈঃ**—সুখভোগ; **জীবিতেন**—বেঁচে থেকে; **বা**—অথবা; **যেষাম্**—যাদের; **অর্থে**—জন্য; **কাঙ্ক্ষিতম্**—আকাঙ্ক্ষিত; **নঃ**—আমাদের; **রাজ্যম্**—রাজ্য; **ভোগাঃ**—ভোগসমূহ; **সুখানি**—সমস্ত সুখ; **চ**—ও; **তে**—তারা সকলে; **ইমে**—এই; **অবস্থিতাঃ**—অবস্থিত; **যুদ্ধে**—রণক্ষেত্রে; **প্রাণান্**—প্রাণ; **ত্যক্ত্বা**—ত্যাগ করে; **ধনানি**—ধনসম্পদ; **চ**—ও; **আচার্যাঃ**—আচার্যগণ; **পিতরঃ**—পিতৃব্যগণ; **পুত্রাঃ**—পুত্রগণ; **তথা**—এবং **এব**—অবশ্যই; **চ**—ও; **পিতামহাঃ**—পিতামহগণ; **মাতুলাঃ**—মাতুলগণ; **শ্বশুরাঃ**—শ্বশুরগণ; **পৌত্রাঃ**—পৌত্রগণ; **শ্যালাঃ**—শ্যালকগণ; **সম্বন্ধিনঃ**—কুটুম্বগণ; **তথা**—এবং; **এতান্**—এই সমস্ত; **ন**—না; **হন্তুম্**—হত্যা করতে; **ইচ্ছামি**—ইচ্ছা করি; **ঘ্নতঃ**—হত হলে; **অপি**—ও; **মধুসূদন**—হে মধু দৈত্যহন্তা (শ্রীকৃষ্ণ); **অপি**—এমন কি; **ত্রৈলোক্য**—ত্রিভুবনের; **রাজ্যস্য**—রাজ্যের জন্য; **হেতোঃ**—বিনিময়ে; **কিম্ নু**—কি আর কথা; **মহীকৃতে**—পৃথিবীর জন্য; **নিহত্য**—বধ করে; **ধার্তরাষ্ট্রান্**—ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের; **নঃ**—আমাদের; **কা**—কি; **প্রীতিঃ**—সুখ; **স্যাৎ**—হবে; **জনার্দন**—হে সমস্ত জীবের পালনকর্তা।

গীতার গান

যাদের লাগিয়া চাহি সুখ-ভোগ শান্তি ।
তারাই এসেছে হেথা দিতে সে অশান্তি ॥
ধন প্রাণ সব ত্যজি মরিবার তরে ।
সবাই এসেছে হেথা কে জীয়ে কে মরে ॥
এসেছে আচার্য পূজ্য পিতার সমান ।
সঙ্গে আছে পিতামহ আর পুত্রগণ ॥

মাতুল শ্বশুর পৌত্র কত যে কহিব ।
শালা আর সম্বন্ধী সবাই মরিব ॥
আমি মরি ক্ষতি নাই এরা যদি মরে ।
এদের মরিতে শক্তি নাহি দেখিবারে ॥
ত্রিভুবন রাজ্য যদি পাইব জিনিয়া ।
তথাপি না লই তাহা এদের মারিয়া ॥
ধার্তরাষ্ট্রগণে মারি কিবা প্রীতি হবে ।
জনার্দন তুমি কৃষ্ণ আপনি কহিবে ॥

অনুবাদ

হে গোবিন্দ! আমাদের রাজ্যে কি প্রয়োজন, আর সুখভোগ বা জীবন ধারণেই বা কী প্রয়োজন, যখন দেখছি—যাদের জন্য রাজ্য ও ভোগসুখের কামনা, তারা সকলেই এই রণক্ষেত্রে আজ উপস্থিত? হে মধুসূদন! যখন আচার্য, পিতৃব্য, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক ও আত্মীয়স্বজন, সকলেই প্রাণ ও ধনাদির আশা পরিত্যাগ করে আমার সামনে যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছেন, তখন তাঁরা আমাকে বধ করলেও আমি তাঁদের হত্যা করতে চাইব কেন? হে সমস্ত জীবের প্রতিপালক জনার্দন! পৃথিবীর তো কথাই নেই, এমন কি সমগ্র ত্রিভুবনের বিনিময়েও আমি যুদ্ধ করতে প্রস্তুত নই। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের নিধন করে কি সন্তোষ আমরা লাভ করতে পারব?

তাৎপর্য

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে গোবিন্দ নামে সম্বোধন করেছেন, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ *গো* অর্থাৎ গরু ও ইন্দ্রিয়গুলিকে আনন্দ দান করেন। এই তাৎপর্যপূর্ণ নামের দ্বারা তাঁকে সম্বোধন করার মাধ্যমে তিনি প্রকাশ করেছেন, কিসে তাঁর নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্ত হবে। বাস্তবিকপক্ষে, গোবিন্দ নিজে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে তৃপ্ত করেন না, কিন্তু আমরা যদি গোবিন্দের ইন্দ্রিয়গুলিকে তৃপ্ত করি, তবে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি আপনা থেকেই তৃপ্ত হয়ে যায়। দেহাত্মবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষেরা তাদের নিজেদের ইন্দ্রিয়গুলির তৃপ্তিসাধন করতে ব্যস্ত এবং তারা চায়, ভগবান তাদের ইন্দ্রিয়গুলির সব রকম তৃপ্তির যোগান দিয়ে যাবেন। যার যতটা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি প্রাপ্য, ভগবান তাকে তা দিয়ে থাকেন। কিন্তু তা বলে আমরা যত চাইব, ভগবান ততই দিয়ে যাবেন, মনে করা ভুল। কিন্তু তার বিপরীত পন্থা গ্রহণ করে, অর্থাৎ যখন আমরা আমাদের

ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কথা না ভেবে গোবিন্দের ইন্দ্রিয়ের সেবায় ব্রতী হই, তখন গোবিন্দের আশীর্বাদে আমাদের সমস্ত বাসনা আপনা থেকেই তৃপ্ত হয়ে যায়। আত্মীয়-স্বজনের প্রতি অর্জুনের গভীর মমতা তাঁর স্বভাবজাত করুণার প্রকাশ এবং এই মমতার বশবর্তী হয়ে তিনি যুদ্ধ করতে নারাজ হন। প্রত্যেকেই নিজের সৌভাগ্য ও ঐশ্বর্য তার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকে দেখাতে চায়। কিন্তু অর্জুন যখন বুঝতে পারলেন, যুদ্ধে তাঁর সমস্ত আত্মীয়স্বজন নিহত হবে এবং যুদ্ধের শেষে সেই যুদ্ধলব্ধ ঐশ্বর্য ভোগ করবার জন্য তাঁর সঙ্গে আর কেউ থাকবে না, তখন ভয়ে ও নৈরাশ্যে তিনি মুহ্যমান হয়ে পড়েন। সাংসারিক মানুষের স্বভাবই হচ্ছে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই ধরনের হিসাব-নিকাশ এবং জল্পনা-কল্পনা করা। কিন্তু অপ্রাকৃত অনুভূতিসম্পন্ন জীবন অবশ্য ভিন্ন ধরনের। তাই ভগবদ্ভক্তের মনোভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভগবানকে তৃপ্ত করাটাই হচ্ছে তাঁর একমাত্র ব্রত, তাই ভগবান যখন চান, তখন তিনি পৃথিবীর সব রকম ঐশ্বর্য গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হন না। আবার ভগবান যখন চান না, তখন তিনি একটি কপর্দকও গ্রহণ করেন না। অর্জুন সেই যুদ্ধে তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের হত্যা করতে চাননি এবং তাঁদের হত্যা করাটা যদি একান্তই প্রয়োজন থাকে, তবে তিনি চেয়েছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাদের বিনাশ করুন। তখনও অবশ্য তিনি জানতেন না, যুদ্ধক্ষেত্রে আসার পূর্বেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় তারা সকলেই হত হয়ে আছে, এবং সেই ইচ্ছাকে রূপ দেবার জন্য তিনি ছিলেন কেবল একটি উপলক্ষ্য মাত্র। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এই কথা বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত অর্জুনের কোন ইচ্ছাই ছিল না তাঁর দুর্বৃত্ত ভাইদের উপর প্রতিশোধ নেবার, কিন্তু ভগবান চেয়েছিলেন তাদের সকলকে বিনাশ করতে। ভগবানের ভক্ত কখনই কারও প্রতি প্রতিহিংসা পরায়ণ হন না, অন্যায়ভাবে যে তাঁকে প্রতারণা করে, তার প্রতিও তিনি করুণা বর্ষণ করেন। কিন্তু ভগবানের ভক্তকে যে আঘাত দেয়, ভগবান কখনই তাকে সহ্য করেন না। ভগবানের শ্রীচরণে কোন অপরাধ করলে ভগবান তা ক্ষমা করতে পারেন, কিন্তু তাঁর ভক্তের প্রতি অন্যায় ভগবান ক্ষমা করেন না। তাই অর্জুন যদিও সেই দুর্বৃত্তদের ক্ষমা করতে চেয়েছিলেন, তবুও ভগবান তাদের বিনাশ করা থেকে নিরস্ত হননি।

শ্লোক ৩৬

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্ ।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৬ ॥

পাপম্—পাপ; **এব**—নিশ্চয়ই; **আশ্রয়েৎ**—আশ্রয় করবে; **অস্মান্**—আমাদের; **হত্বা**—বধ করলে; **এতান্**—এদের সকলকে; **আততায়িনঃ**—আততায়ীদের; **তস্মাৎ**—তাই; **ন**—না; **অর্হাঃ**—উচিত; **বয়ম্**—আমাদের; **হন্তুম্**—হত্যা করা; **ধার্তরাষ্ট্রান্**—ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের; **সবান্ধবান্**—সবান্ধব; **স্বজনম্**—স্বজনদের; **হি**—অবশ্যই; **কথম্**—কিভাবে; **হত্বা**—হত্যা করে; **সুখিনঃ**—সুখী; **স্যাম**—হব; **মাধব**—হে লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণ।

গীতার গান

এদের মারিলে মাত্র পাপ লাভ হবে ।
এমন বিপক্ষ শত্রু কে দেখেছে কবে ॥
এই ধার্তরাষ্ট্রগণ সবান্ধব হয় ।
উচিত না হয় কার্য তাহাদের ক্ষয় ॥
স্বজন মারিয়া বল কেবা কবে সুখী ।
সুখলেশ নাহি মাত্র হব শুধু দুঃখী ॥

অনুবাদ

এই ধরনের আততায়ীদের বধ করলে মহাপাপ আমাদের আচ্ছন্ন করবে। সুতরাং বন্ধুবান্ধব সহ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের সংহার করা আমাদের পক্ষে অবশ্যই উচিত হবে না। হে মাধব, লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণ! আত্মীয়-স্বজনদের হত্যা করে আমাদের কী লাভ হবে? আর তা থেকে আমরা কেমন করে সুখী হব?

তাৎপর্য

বেদের অনুশাসন অনুযায়ী শত্রু ছয় প্রকার—১) যে বিষ প্রয়োগ করে, ২) যে ঘরে আগুন লাগায়, ৩) যে মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করে, ৪) যে ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে, ৫) যে অন্যের জমি দখল করে এবং ৬) যে বিবাহিত স্ত্রীকে হরণ করে। এই ধরনের আততায়ীদের অবিলম্বে হত্যা করার নির্দেশ শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে এবং এদের হত্যা করলে কোন রকম পাপ হয় না। এই ধরনের শত্রুকে সমূলে বিনাশ করাটাই সাধারণ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু অর্জুন সাধারণ মানুষ ছিলেন না। তাঁর চরিত্র ছিল সাধুসুলভ, তাই তিনি তাদের সঙ্গে সাধুসুলভ ব্যবহারই করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই ধরনের সাধুসুলভ ব্যবহার ক্ষত্রিয়দের জন্য নয়। যদিও উচ্চপদস্থ রাজপুরুষকে সাধুর মতোই ধীর, শান্ত ও সংযত হতে হয়, তাই

বলে তাঁকে কাপুরুষ হলে চলবে না। যেমন শ্রীরামচন্দ্র এত সাধু প্রকৃতির ছিলেন যে, পৃথিবীর ইতিহাসে 'রামরাজ্য' শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রতীক হিসাবে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে আছে, কিন্তু তাঁর চরিত্রে কোন রকম কাপুরুষতা আমরা দেখতে পাই না। রাবণ ছিল রামের শত্রু, যেহেতু সে তাঁর পত্নী সীতাদেবীকে হরণ করেছিল এবং সেই জন্য শ্রীরামচন্দ্র তাকে এমন শাস্তি দিয়েছিলেন যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। অর্জুনের ক্ষেত্রে অবশ্য আমরা দেখতে পাই, তাঁর শত্রুরা ছিল অন্য ধরনের। পিতামহ, শিক্ষক, ভাই, বন্ধু, এরা সকলেই তাঁর শত্রু হবার ফলে সাধারণ শত্রুদের প্রতি যে-রকম আচরণ করতে হয়, তা তিনি করতে পারছিলেন না। তা ছাড়া, সাধু প্রকৃতির লোকেরা সর্বদাই ক্ষমাশীল। শাস্ত্রেও সাধু প্রকৃতির লোককে ক্ষমাপরায়ণ হবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং সাধুদের প্রতি এই ধরনের উপদেশ যে-কোন রাজনৈতিক সঙ্কটকালীন অনুশাসন থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অর্জুন মনে করেছিলেন, রাজনৈতিক কারণবশত তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করার চেয়ে সাধুসুলভ আচরণ ও ধর্মের ভিত্তিতে তাদের ক্ষমা করাই শ্রেয়। তাই, সাময়িক দেহগত সুখের জন্য এই হত্যাকার্যে লিপ্ত হওয়া তিনি সমীচীন বলে মনে করেননি। তিনি বুঝেছিলেন, রাজ্য ও রাজ্যসুখ অনিত্য। তাই, এই ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য আত্মীয়স্বজন হত্যার পাপে লিপ্ত হয়ে মুক্তির পথ চিরতরে রুদ্ধ করার ঝুঁকি তিনি কেন নেবেন? এখানে অর্জুন যে শ্রীকৃষ্ণকে 'মাধব' অথবা লক্ষ্মীপতি বলে সম্বোধন করেছেন, তা তাৎপর্যপূর্ণ। এই নামের দ্বারা তাঁকে সম্বোধন করে অর্জুন বুঝিয়ে দিলেন, তিনি হচ্ছেন সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর পতি, তাই অর্জুনকে এমন কোন কার্যে প্ররোচিত করা তাঁর কর্তব্য নয়, যার পরিণতি হবে দুর্ভাগ্যজনক। শ্রীকৃষ্ণ অবশ্য কাউকেই দুর্ভাগ্য এনে দেন না, সুতরাং তাঁর ভক্তের ক্ষেত্রে তো সেই কথা ওঠেই না।

শ্লোক ৩৭-৩৮

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৭ ॥
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্তিতুম্ ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দন ॥ ৩৮ ॥

যদি—যদি; **অপি**—এমন কি; **এতে**—এরা; **ন**—না; **পশ্যন্তি**—দেখছে; **লোভ**—লোভে; **উপহত**—অভিভূত; **চেতসঃ**—চিত্ত; **কুলক্ষয়**—বংশনাশ; **কৃতম্**—জনিত;

দোষম্—দোষ; **মিত্রদ্রোহে**—মিত্রের প্রতি শত্রুতায়; **চ**—ও; **পাতকম্**—পাপ; **কথম্**—কেন; **ন**—না; **জ্ঞেয়ম্**—জানবে; **অস্মাভিঃ**—আমাদের দ্বারা; **পাপাৎ**—পাপ থেকে; **অস্মাৎ**—এই; **নিবর্তিতুম্**—নিবৃত্ত হতে; **কুলক্ষয়**—বংশনাশ; **কৃতম্**—জনিত; **দোষম্**—অপরাধ; **প্রপশ্যদ্ভিঃ**—দর্শনকারী; **জনার্দন**—হে কৃষ্ণ।

গীতার গান

যদ্যপি এরা নাহি দেখে লোভীজন।
কুলক্ষয় মিত্রদ্রোহ সব অলক্ষণ ॥
এসব পাপের রাশি কে বহিতে পারে।
বুঝিবে তুমি ত সব বুঝাবে আমারে ॥
উচিত কি নহে এই পাপে নিবৃত্তি।
বুঝা কি উচিত নহে সেই কুপ্রবৃত্তি ॥
কুলক্ষয়ে যেই দোষ জান জনার্দন।
অতএব এই যুদ্ধ কর নিবারণ ॥

অনুবাদ

হে জনার্দন! যদিও এরা রাজ্যলোভে অভিভূত হয়ে কুলক্ষয় জনিত দোষ ও মিত্রদ্রোহ নিমিত্ত পাপ লক্ষ্য করছে না, কিন্তু আমরা কুলক্ষয় জনিত দোষ লক্ষ্য করেও এই পাপকর্মে কেন প্রবৃত্ত হব?

তাৎপর্য

যুদ্ধে ও পাশাখেলায় আহ্বান করা হলে কোনও ক্ষত্রিয় বিরোধীপক্ষের সেই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না। দুর্যোধন সেই যুদ্ধে অর্জুনকে আহ্বান করেছিলেন, তাই যুদ্ধ করতে অর্জুন বাধ্য ছিলেন। কিন্তু এই অবস্থায় অর্জুন বিবেচনা করে দেখলেন যে, তাঁর বিরুদ্ধপক্ষের সকলেই এই যুদ্ধের পরিণতি সম্বন্ধে একেবারে অন্ধ হতে পারে, কিন্তু তা বলে তিনি এই যুদ্ধের অমঙ্গলজনক পরিণতি উপলব্ধি করতে পারার পর, সেই যুদ্ধের আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারবেন না। এই ধরনের আমন্ত্রণের বাধ্যবাধকতা তখনই থাকে, যখন তার পরিণতি মঙ্গলজনক হয়, নতুবা এর কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এই সব কথা সুচিন্তিতভাবে বিবেচনা করে অর্জুন এই যুদ্ধ থেকে নিরস্ত থাকতে মনস্থির করেছিলেন।

শ্লোক ৩৯

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্মোঽভিভবত্যুত ॥ ৩৯ ॥

কুলক্ষয়ে—বংশনাশ হলে; **প্রণশ্যন্তি**—বিনষ্ট হয়; **কুলধর্মাঃ**—কুলধর্ম; **সনাতনাঃ**—চিরাচরিত; **ধর্মে**—ধর্ম; **নষ্টে**—নষ্ট হলে; **কুলম্**—বংশকে; **কৃৎস্নম্**—সমগ্র; **অধর্মঃ**—অধর্ম; **অভিভবতি**—অভিভূত করে; **উত**—বলা হয়।

গীতার গান

কুলক্ষয়ে কলুষিত সনাতন ধর্ম।
ধর্মনষ্টে প্রাদুর্ভাবে হইবে অধর্ম ॥

অনুবাদ

কুলক্ষয় হলে সনাতন কুলধর্ম বিনষ্ট হয় এবং তা হলে সমগ্র বংশ অধর্মে অভিভূত হয়।

তাৎপর্য

বর্ণাশ্রম সমাজ-ব্যবস্থায় অনেক রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেওয়া আছে, যা পরিবারের প্রতিটি লোকের যথাযথ পারমার্থিক উন্নতি সাধনে সহায়তা করে। পরিবারের প্রবীণ সদস্যেরা পরিবারভুক্ত অন্য সকলের জন্ম থেকে আরম্ভ করে মৃত্যু পর্যন্ত শুদ্ধিকরণ সংস্কার দ্বারা তাদের যথাযথ মঙ্গল সাধন করার জন্য সর্বদাই তৎপর থাকেন। কিন্তু এই সমস্ত প্রবীণ লোকদের মৃত্যু হলে, মঙ্গলজনক এই সমস্ত পারিবারিক প্রথাকে রূপ দেওয়ার মতো কেউ থাকে না। তখন পরিবারের অল্পবয়স্ক সদস্যেরা অমঙ্গলজনক কাজকর্মে লিপ্ত হতে পারে এবং তার ফলে তাদের আত্মার মুক্তির সম্ভাবনা চিরতরে নষ্ট হয়ে যায়। তাই, কোন কারণেই পরিবারের সদস্যদের হত্যা করা উচিত নয়।

শ্লোক ৪০

অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪০ ॥

অধর্ম—অধর্ম; **অভিভবাৎ**—প্রাদুর্ভাব হলে; **কৃষ্ণ**—হে কৃষ্ণ; **প্রদুষ্যন্তি**—ব্যভিচারে প্রবৃত্ত হয়; **কুলস্ত্রিয়ঃ**—কুলবধূগণ; **স্ত্রীষু**—স্ত্রীলোকেরা; **দুষ্টাসু**—অসৎ চরিত্রা হলে; **বার্ষ্ণেয়**—হে বৃষ্ণিবংশজ; **জায়তে**—উৎপন্ন হয়; **বর্ণসঙ্করঃ**—অবাঞ্ছিত প্রজাতি।

গীতার গান

অধর্মের প্রাদুর্ভাবে কুলনারীগণ ।
পতিতা হইবে সব কর অন্বেষণ ॥

অনুবাদ

হে কৃষ্ণ! কুল অধর্মের দ্বারা অভিভূত হলে কুলবধূগণ ব্যভিচারে প্রবৃত্ত হয় এবং হে বার্ষ্ণেয়! কুলস্ত্রীগণ অসৎ চরিত্রা হলে অবাঞ্ছিত প্রজাতি উৎপন্ন হয়।

তাৎপর্য

সমাজের প্রতিটি মানুষ যখন সৎ জীবনযাপন করে, তখনই সমাজে শান্তি ও সমৃদ্ধি দেখা দেয় এবং মানুষের জীবন অপ্রাকৃত ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। বর্ণাশ্রম প্রথার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সমাজ-ব্যবস্থাকে এমনভাবে গড়ে তোলা, যার ফলে সমাজের মানুষেরা সৎ জীবনযাপন করে সর্বতোভাবে পারমার্থিক উন্নতি লাভ করতে পারে। এই ধরনের সৎ জনগণ তখনই উৎপন্ন হন, যখন সমাজের স্ত্রীলোকেরা সৎ চরিত্রবতী ও সত্যনিষ্ঠ হয়। শিশুদের মধ্যে যেমন অতি সহজেই বিপথগামী হবার প্রবণতা দেখা যায়, স্ত্রীলোকদের মধ্যেও তেমন অতি সহজেই অধঃপতিত হবার প্রবণতা থাকে। তাই, শিশু ও স্ত্রীলোক উভয়েরই পরিবারের প্রবীণদের কাছ থেকে প্রতিরক্ষা ও তত্ত্বাবধানের একান্ত প্রয়োজন। নানা রকম ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নিয়োজিত করার মাধ্যমে স্ত্রীলোকদের চিত্তবৃত্তিকে পবিত্র ও নির্মল রাখা হয় এবং এভাবেই তাদের ব্যভিচারী মনোবৃত্তিকে সংযত করা হয়। চাণক্য পণ্ডিত বলে গেছেন, স্ত্রীলোকেরা সাধারণত অল্পবুদ্ধিসম্পন্না, তাই তারা নির্ভরযোগ্য অথবা বিশ্বস্ত নয়। সেই জন্য তাদের পূজার্চনা আদি গৃহস্থালির নানা রকম ধর্মানুষ্ঠানে সব সময় নিয়োজিত রাখতে হয় এবং তার ফলে তাদের ধর্মে মতি হয় এবং চরিত্র নির্মল হয়। তারা তখন চরিত্রবান, ধর্মপরায়ণ সন্তানের জন্ম দেয়, যারা হয় বর্ণাশ্রম-ধর্ম পালন করার উপযুক্ত। বর্ণাশ্রম-ধর্ম পালন না করলে, স্বভাবতই স্ত্রীলোকেরা অবাধে পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা করতে শুরু করে এবং তাদের ব্যভিচারের ফলে সমাজে অবাঞ্ছিত সন্তান-সন্ততির জন্ম হয়। দায়িত্বজ্ঞানশূন্য লোকদের পৃষ্ঠপোষকতায় যখন সমাজে ব্যভিচার প্রকট হয়ে ওঠে এবং অবাঞ্ছিত মানুষে সমাজ ছেয়ে যায়, তখন মহামারী ও যুদ্ধ দেখা দিয়ে মানব-সমাজকে ধ্বংসোন্মুখ করে তোলে।

শ্লোক ৪১

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪১ ॥

সঙ্করঃ—এই প্রকার অবাঞ্ছিত সন্তান; **নরকায়**—নারকীয় জীবনের জন্য সৃষ্টি; **এব**—অবশ্যই; **কুলঘ্নানাম্**—কুলনাশক; **কুলস্য**—বংশের; **চ**—ও; **পতন্তি**—পতিত হয়; **পিতরঃ**—পিতৃপুরুষেরা; **হি**—অবশ্যই; **এষাম্**—তাদের; **লুপ্ত**—লুপ্ত; **পিণ্ড**—পিণ্ডদান; **উদক-ক্রিয়াঃ**—তর্পণক্রিয়া।

গীতার গান

দুষ্টা স্ত্রী হইলে জন্মে বর্ণসঙ্কর দল ।
বর্ণসঙ্কর হলে হবে নরকের ফল ॥
যেই সে কারণ হয় বর্ণসঙ্করের ।
কুলক্ষয় কুলগ্লানি যেই অপরের ॥

অনুবাদ

বর্ণসঙ্কর উৎপাদন বৃদ্ধি হলে কুল ও কুলঘাতকেরা নরকগামী হয়। সেই কুলে পিণ্ডদান ও তর্পণক্রিয়া লোপ পাওয়ার ফলে তাদের পিতৃপুরুষেরাও নরকে অধঃপতিত হয়।

তাৎপর্য

কর্মকাণ্ডের বিধি অনুসারে পিতৃপুরুষের আত্মাদের প্রতি পিণ্ডদান ও জল উৎসর্গ করা প্রয়োজন। এই উৎসর্গ সম্পন্ন করা হয় বিষ্ণুকে পূজা করার মাধ্যমে, কারণ বিষ্ণুকে উৎসর্গীকৃত প্রসাদ সেবন করার ফলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্তিলাভ হয়। অনেক সময় পিতৃপুরুষেরা নানা রকমের পাপের ফল ভোগ করতে থাকে এবং অনেক সময় তাদের কেউ কেউ জড় দেহ পর্যন্ত ধারণ করতে পারে না। সূক্ষ্ম দেহে প্রেতাত্মারূপে থাকতে বাধ্য করা হয়। যখন বংশের কেউ তার পিতৃপুরুষদের ভগবৎ-প্রসাদ উৎসর্গ করে পিণ্ডদান করে, তখন তাদের আত্মা ভূতের দেহ অথবা অন্যান্য দুঃখময় জীবন থেকে মুক্ত হয়ে শান্তি লাভ করে। পিতৃপুরুষের আত্মার সদ্গতির জন্য এই পিণ্ডদান করাটা বংশানুক্রমিক রীতি। তবে যে সমস্ত লোক ভক্তিযোগ সাধন করেন, তাঁদের এই অনুষ্ঠান করার প্রয়োজন নেই। ভক্তিযোগ

সাধন করার মাধ্যমে ভক্ত শত-সহস্র পূর্বপুরুষের আত্মার মুক্তি সাধন করতে পারেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/৫/৪১) বলা হয়েছে—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্ ।
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্ ॥

"যিনি সব রকম কর্তব্য পরিত্যাগ করে মুক্তি দানকারী মুকুন্দের চরণ-কমলে শরণ নিয়েছেন এবং ঐকান্তিকভাবে পন্থাটি গ্রহণ করেছেন, তাঁর আর দেব-দেবী, মুনি-ঋষি, পরিবার-পরিজন মানব-সমাজ ও পিতৃপুরুষের প্রতি কোন কর্তব্য থাকে না। পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার ফলে এই ধরনের কর্তব্যগুলি আপনা থেকেই সম্পাদিত হয়ে যায়।"

শ্লোক ৪২

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪২ ॥

দোষৈঃ—দোষ দ্বারা; **এতৈঃ**—এই সমস্ত; **কুলঘ্নানাম্**—কুলনাশকদের; **বর্ণসঙ্কর**—অবাঞ্ছিত সন্তানাদি; **কারকৈঃ**—কারক; **উৎসাদ্যন্তে**—উৎপন্ন হয়; **জাতিধর্মাঃ**—জাতির ধর্ম; **কুলধর্মাঃ**—কুলের ধর্ম; **চ**—ও; **শাশ্বতাঃ**—সনাতন।

গীতার গান

নরকে পতন হয় লুপ্ত পিণ্ড জন্য ।
তরিবার নাহি কোন উপায় যে অন্য ॥
কুলধর্মের নষ্টকারী বর্ণসঙ্কর ফলে ।
শাশ্বত জাতি ধর্ম উৎসাদিত হলে ॥

অনুবাদ

যারা বংশের ঐতিহ্য নষ্ট করে এবং তার ফলে অবাঞ্ছিত সন্তানাদি সৃষ্টি করে, তাদের কুকর্মজনিত দোষের ফলে সর্বপ্রকার জাতীয় উন্নয়ন প্রকল্প এবং বংশের কল্যাণ-ধর্ম উৎসন্নে যায়।

তাৎপর্য

সনাতন-ধর্ম বা বর্ণাশ্রম-ধর্মের মাধ্যমে সমাজ-ব্যবস্থায় যে চারটি বর্ণের উদ্ভব হয়েছে, তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ যাতে তাদের জীবনের চরম লক্ষ্য মুক্তি লাভে সক্ষম হয়। তাই, সমাজের দায়িত্বজ্ঞানশূন্য নেতাদের পরিচালনায় যদি সনাতন-ধর্মের যথাযথ আচরণ না করা হয়, তবে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং ক্রমে ক্রমে মানুষ তাদের জীবনের চরম লক্ষ্য বিষ্ণুকে ভুলে যায়। এই ধরনের সমাজ-নেতাদের বলা হয় অন্ধ এবং যারা এদের অনুসরণ করে, তারা অবধারিতভাবে অন্ধকূপে পতিত হয়।

শ্লোক ৪৩

উৎসন্নকুলধর্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন ।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ৪৩ ॥

উৎসন্ন—বিনষ্ট; **কুলধর্মাণাম্**—যাদের কুলধর্ম আছে তাদের; **মনুষ্যাণাম্**—সেই সমস্ত মানুষের; **জনার্দন**—হে কৃষ্ণ; **নরকে**—নরকে; **নিয়তম্**—নিয়ত; **বাসঃ**—অবস্থিতি; **ভবতি**—হয়; **ইতি**—এভাবে; **অনুশুশ্রুম**—আমি পরম্পরাক্রমে শ্রবণ করেছি।

গীতার গান

নরকে নিয়ত বাস সে মনুষ্যের হয় ।
তুমি জান জনার্দন সে সব বিষয় ॥
আমি শুনিয়াছি তাই সাধুসন্ত মুখে ।
নরকের পথে চলি কে রহিবে সুখে ॥

অনুবাদ

হে জনার্দন! আমি পরম্পরাক্রমে শুনেছি যে, যাদের কুলধর্ম বিনষ্ট হয়েছে, তাদের নিয়ত নরকে বাস করতে হয়।

তাৎপর্য

অর্জুনের সমস্ত যুক্তি-তর্ক তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, পক্ষান্তরে তিনি সাধুসন্ত আদি মহাজনদের কাছ থেকে আহরণ করা জ্ঞানের ভিত্তিতে এই সমস্ত যুক্তির অবতারণা করেছিলেন। প্রকৃত জ্ঞান উপলব্ধি করেছেন যে-মানুষ,

তাঁর তত্ত্বাবধানে এই জ্ঞান শিক্ষালাভ না করলে, এই জ্ঞান আহরণ করা যায় না। বর্ণাশ্রম-ধর্মের বিধি অনুসারে মানুষকে মৃত্যুর পূর্বে তার সমস্ত পাপ মোচনের জন্য কতকগুলি প্রায়শ্চিত্ত বিধি পালন করতে হয়। যে সব সময় পাপকার্যে লিপ্ত থেকে জীবন অতিবাহিত করেছে, তার পক্ষে এই বিধি অনুসরণ করে প্রায়শ্চিত্ত করাটা অবশ্য কর্তব্য। প্রায়শ্চিত্ত না করলে তার পাপের ফলস্বরূপ মানুষ নরকে পতিত হয়ে নানা রকম দুঃখকষ্ট ভোগ করে।

শ্লোক ৪৪

অহো বত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্ ।
যদ্ রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৪ ॥

অহো—হায়; **বত**—কী আশ্চর্য; **মহৎ**—মহা; **পাপম্**—পাপ; **কর্তুম্**—করতে; **ব্যবসিতাঃ**—সংকল্পবদ্ধ; **বয়ম্**—আমরা; **যৎ**—যেহেতু; **রাজ্য-সুখ-লোভেন**—রাজ্য-সুখের লোভে; **হন্তুম্**—হত্যা করতে; **স্বজনম্**—আত্মীয়-স্বজনদের; **উদ্যতাঃ**—উদ্যত।

গীতার গান

হায় হায় মহাপাপ করিতে উদ্যত ।
হয়েছি আমরা শুধু হয়ে কলুষিত ॥
রাজ্যের লোভেতে পড়ে এ দুষ্কার্য করি ।
স্বজন হনন এই উচিত কি হরি? ॥

অনুবাদ

হায়! কী আশ্চর্যের বিষয় যে, আমরা রাজ্যসুখের লোভে স্বজনদের হত্যা করতে উদ্যত হয়ে মহাপাপ করতে সংকল্পবদ্ধ হয়েছি।

তাৎপর্য

স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষকে মাতা-পিতা, ভাই-বন্ধুকে হত্যা করতে দেখা যায়। পৃথিবীর ইতিহাসে এর অনেক নজির আছে। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত অর্জুন সদাসর্বদা নৈতিক কর্তব্য অকর্তব্যের প্রতি সচেতন, তাই তিনি এই ধরনের কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকাকেই শ্রেয় বলে মনে করেছেন।

শ্লোক ৪৫

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ ।
ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥

যদি—যদি; **মাম্**—আমাকে; **অপ্রতীকারম্**—প্রতিরোধ রহিত; **অশস্ত্রম্**—নিরস্ত্র; **শস্ত্রপাণয়ঃ**—শস্ত্রধারী; **ধার্তরাষ্ট্রাঃ**—ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা; **রণে**—রণক্ষেত্রে; **হন্যুঃ**—হত্যা করে; **তৎ**—তবে; **মে**—আমার; **ক্ষেমতরম্**—অধিকতর মঙ্গল; **ভবেৎ**—হবে।

গীতার গান

যদি ধার্তরাষ্ট্রগণ আমাকে মারিয়া ।
এই রণে রাজ্য লয় অশস্ত্র বুঝিয়া ॥
সেও ভাল মনে করি যুদ্ধ সে অপেক্ষা ।
বিনাযুদ্ধে সেই আমি করিব প্রতীক্ষা ॥

অনুবাদ

প্রতিরোধ রহিত ও নিরস্ত্র অবস্থায় আমাকে যদি শস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা যুদ্ধে বধ করে, তা হলে আমার অধিকতর মঙ্গলই হবে।

তাৎপর্য

ক্ষত্রিয় রণনীতি অনুসারে নিয়ম আছে, শত্রু যদি নিরস্ত্র হয় অথবা যুদ্ধে অনিচ্ছুক হয়, তবে তাকে আক্রমণ করা যাবে না। কিন্তু অর্জুন স্থির করলেন যে, এই রকম বিপজ্জনক অবস্থায় তাঁর শত্রুরা যদি তাঁকে আক্রমণও করে, তবুও তিনি যুদ্ধ করবেন না। তিনি বিবেচনা করে দেখলেন না, শত্রুপক্ষ যুদ্ধ করতে কতটা আগ্রহী ছিল। অর্জুনের এই ধরনের আচরণ ভগবদ্ভক্তোচিত কোমল হৃদয়বৃত্তির পরিচায়ক।

শ্লোক ৪৬

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৬ ॥

সঞ্জয়ঃ উবাচ—সঞ্জয় বললেন; **এবম্**—এভাবে; **উক্ত্বা**—বলে; **অর্জুনঃ**—অর্জুন; **সংখ্যে**—যুদ্ধক্ষেত্রে; **রথোপস্থে**—রথের উপর; **উপাবিশৎ**—উপবেশন করলেন; **বিসৃজ্য**—ত্যাগ করে; **সশরম্**—শরযুক্ত; **চাপম্**—ধনুক; **শোক**—শোক দ্বারা; **সংবিগ্ন**—অভিভূত; **মানসঃ**—চিত্তে।

গীতার গান

একথা বলিয়া পার্থ নিশ্চল বসিল ।
রথোপস্থ যুদ্ধ মধ্যে অস্ত্র সে ত্যজিল ॥
শোকেতে উদ্বিগ্নমনা অর্জুন সদয় ।
বিষাদ-যোগ নাম এই গীতার বিষয় ॥

অনুবাদ

সঞ্জয় বললেন—রণক্ষেত্রে এই কথা বলে অর্জুন তাঁর ধনুর্বাণ ত্যাগ করে শোকে ভারাক্রান্ত চিত্তে রথোপরি উপবেশন করলেন।

তাৎপর্য

শত্রুসৈন্যকে নিরীক্ষণ করতে অর্জুন রথের উপর দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু তিনি শোকে এতই মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর গাণ্ডীব ধনু ও অক্ষয় তূণ ফেলে দিয়ে, তিনি রথের উপর বসে পড়লেন। এই ধরনের কোমল হৃদয়বৃত্তি-সম্পন্ন মানুষই কেবল ভগবদ্ভক্তি সাধন করার মাধ্যমে সমগ্র জগতের যথার্থ মঙ্গল সাধন করতে পারেন।

ভক্তিবেদান্ত কহে শ্রীগীতার গান ।
শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ ॥

ইতি—কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে সেনা-পর্যবেক্ষণ বিষয়ক 'বিষাদ-যোগ' নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রথম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাংখ্য-যোগ

শ্লোক ১

সঞ্জয় উবাচ
তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্ ।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১ ॥

সঞ্জয়ঃ উবাচ—সঞ্জয় বললেন; **তম্**—অর্জুনকে; **তথা**—এভাবে; **কৃপয়া**—কৃপায়; **আবিষ্টম্**—আবিষ্ট হয়ে; **অশ্রুপূর্ণ**—অশ্রুসিক্ত; **আকুল**—ব্যাকুল; **ঈক্ষণম্**—চক্ষু; **বিষীদন্তম্**—অনুশোচনা করে; **ইদম্**—এই; **বাক্যম্**—কথাগুলি; **উবাচ**—বললেন; **মধুসূদনঃ**—মধুহন্তা।

গীতার গান

সঞ্জয় কহিল ঃ
দেখিয়া অর্জুনে কৃষ্ণ সেই অশ্রুজলে ।
কৃপায় আবিষ্ট হয়ে ভাবিত বিকলে ॥
কৃপাময় মধুসূদন কহিল তাহারে ।
ইতিবাক্য বন্ধুভাবে অতি মিষ্টস্বরে ॥

অনুবাদ

সঞ্জয় বললেন—অর্জুনকে এভাবে অনুতপ্ত, ব্যাকুল ও অশ্রুসিক্ত দেখে, কৃপায় আবিষ্ট হয়ে মধুসূদন বা শ্রীকৃষ্ণ এই কথাগুলি বললেন।

তাৎপর্য

জাগতিক করুণা, শোক ও চোখের জল হচ্ছে প্রকৃত সত্তার অজ্ঞানতার বহিঃপ্রকাশ। শাশ্বত আত্মার জন্য করুণার অনুভব হচ্ছে আত্ম-উপলব্ধি। এই শ্লোকে 'মধুসূদন' শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ মধু নামক দৈত্যকে হত্যা করেছিলেন এবং এখানে অর্জুন চাইছেন, অজ্ঞতারূপ যে দৈত্য তাঁকে তাঁর কর্তব্যকর্ম থেকে বিরত রেখেছে, তাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হত্যা করুন। মানুষকে কিভাবে করুণা প্রদর্শন করতে হয়, তা কেউই জানে না। যে মানুষ ডুবে যাচ্ছে, তার পরনের কাপড়ের প্রতি করুণা প্রদর্শন করাটা নিতান্তই অর্থহীন। তেমনই, যে মানুষ ভবসমুদ্রে পতিত হয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে, তার বাইরের আবরণ জড় দেহটিকে উদ্ধার করলে তাকে উদ্ধার করা হয় না। এই কথা যে জানে না এবং যে জড় দেহটির জন্য শোক করে, তাকে বলা হয় শূদ্র, অর্থাৎ যে অনর্থক শোক করে। অর্জুন ছিলেন ক্ষত্রিয়, তাই তাঁর কাছ থেকে এই ধরনের আচরণ আশা করা যায় না। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মানুষের শোকসন্তপ্ত হৃদয়কে শান্ত করতে পারেন, তাই তিনি অর্জুনকে *ভগবদ্‌গীতা* শোনালেন। *গীতার* এই অধ্যায়ে জড় দেহ ও চেতন আত্মার সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনার মাধ্যমে পরম নিয়ন্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন—আমাদের স্বরূপ কি, আমাদের প্রকৃত পরিচয় কি। পারমার্থিক তত্ত্বের উপলব্ধি এবং কর্মফলে নিরাসক্তি ছাড়া এই অনুভূতি হয় না।

শ্লোক ২

শ্রীভগবানুবাচ

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্ ।
অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **কুতঃ**—কোথা থেকে; **ত্বা**—তোমার; **কশ্মলম্**—কলুষ; **ইদম্**—এই অনুশোচনা; **বিষমে**—সঙ্কটকালে; **সমুপস্থিতম্**—উপস্থিত হয়েছে; **অনার্য**—যে মানুষ জীবনের মূল্য জানে না; **জুষ্টম্**—উচিত; **অস্বর্গ্যম্**—যে কার্য উচ্চতর লোকে নিয়ে যায় না; **অকীর্তি**—অপকীর্তি; **করম্**—কারণ; **অর্জুন**—হে অর্জুন।

গীতার গান

শ্রীভগবান কহিলেন ঃ

কিভাবে অর্জুন তুমি ঘোর যুদ্ধস্থলে ।
অনার্যের শোকানল প্রদীপ্ত করিলে ॥
অকীর্তি অস্বর্গ লাভ হইবে তোমার ।
ছি ছি বন্ধু ছাড় এই অযোগ্য আচার ॥

অনুবাদ

পুরুষোত্তম শ্রীভগবান বললেন—প্রিয় অর্জুন, এই ঘোর সঙ্কটময় যুদ্ধস্থলে যারা জীবনের প্রকৃত মূল্য বোঝে না, সেই সব অনার্যের মতো শোকানল তোমার হৃদয়ে কিভাবে প্রজ্বলিত হল? এই ধরনের মনোভাব তোমাকে স্বর্গলোকে উন্নীত করবে না, পক্ষান্তরে তোমার সমস্ত যশরাশি বিনষ্ট করবে।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ ও পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন অভিন্ন। তাই সমগ্র *ভগবদ্‌গীতায়* তাঁকে ভগবান বলে সম্বোধন করা হয়েছে। ভগবান হচ্ছেন পরম-তত্ত্বের চরম সীমা। পরমতত্ত্ব উপলব্ধির তিনটি স্তর রয়েছে—ব্রহ্ম অর্থাৎ নির্বিশেষ সর্বব্যাপ্ত সত্তা, পরমাত্মা অর্থাৎ প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজমান পরমেশ্বরের প্রকাশ এবং ভগবান অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। পরম-তত্ত্বের এই বিশ্লেষণ সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/১১) বলা হয়েছে—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

"যা অদ্বয় জ্ঞান, অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় বাস্তব বস্তু, জ্ঞানীরা তাকেই পরমার্থ বলেন। সেই পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান—এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় অভিব্যক্ত হয়।"

এই তিনটি চিন্ময় প্রকাশ সূর্যের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা যায়। সূর্যেরও তিনটি বিভিন্ন প্রকাশ রয়েছে, যেমন—সূর্যরশ্মি, সূর্যগোলক ও সূর্যমণ্ডল। সূর্যরশ্মি সম্বন্ধে জানাটা প্রাথমিক স্তর, সূর্যগোলক সম্বন্ধে জানাটা আরও উচ্চ স্তরের এবং

সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করে সূর্য সম্বন্ধে জানাটা হচ্ছে সর্বোচ্চ। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা সূর্যকিরণ সম্বন্ধে জেনেই সন্তুষ্ট থাকে—তার সর্বব্যাপকতা এবং তার নির্বিশেষ রশ্মিচ্ছটা সম্বন্ধে যে জ্ঞান, তাকে পরম-তত্ত্বের ব্রহ্ম-উপলব্ধির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। যাঁরা আরও উন্নত স্তরে রয়েছেন, তাঁরা সূর্যগোলকের সম্বন্ধে অবগত, সেই জ্ঞানকে পরম-তত্ত্বের পরমাত্মা উপলব্ধির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে এবং যাঁরা সূর্যমণ্ডলের অন্তঃস্থলে প্রবিষ্ট হয়েছেন, তাঁদের জ্ঞান পরম-তত্ত্বের সর্বোত্তম সবিশেষ রূপ সম্বন্ধে অবগত হওয়ার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। তাই, ভগবদ্ভক্তবৃন্দ অথবা যে সমস্ত পরমার্থবাদী পরম-তত্ত্বের ভগবৎ-স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তাঁরাই হচ্ছেন সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত পরমার্থবাদী, যদিও সমস্ত পরমার্থবাদীরা সেই একই পরম-তত্ত্বের অনুসন্ধানে রত। সূর্যরশ্মি, সূর্যগোলক ও সূর্যমণ্ডল—এই তিনটি একে অপর থেকে পৃথক হতে পারে না, কিন্তু তবুও তিনটি বিভিন্ন স্তরের অন্বেষণকারীরা সমপর্যায়ভুক্ত নন।

শ্রীল ব্যাসদেবের পিতা পরাশর মুনি *ভগবান্* কথাটির বিশ্লেষণ করেছেন। সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র যশ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য যাঁর মধ্যে পূর্ণরূপে বর্তমান, সেই পরম পুরুষ হচ্ছেন ভগবান। অনেক মানুষ রয়েছেন, যাঁরা খুব ধনী, অত্যন্ত শক্তিশালী, সুপুরুষ, অত্যন্ত জ্ঞানী ও অত্যন্ত অনাসক্ত, কিন্তু এমন কেউ নেই যার মধ্যে সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য আদি গুণগুলি পূর্ণরূপে বিরাজমান। কেবল শ্রীকৃষ্ণই তা দাবি করতে পারেন, কারণ তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। কোন জীবই, এমন কি ব্রহ্মা, শিব অথবা নারায়ণও শ্রীকৃষ্ণের মতো পূর্ণ ঐশ্বর্যসম্পন্ন হতে পারেন না। তাই, *ব্রহ্মসংহিতাতে* ব্রহ্মা নিজে বলেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তাঁর চেয়ে বড় আর কেউ নেই, এমন কি তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই। তিনিই হচ্ছেন আদি পুরুষ, অথবা গোবিন্দ নামে পরিজ্ঞাত ভগবান এবং তিনি হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

"ভগবানের গুণাবলী ধারণকারী বহু পুরুষ আছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষ, কারণ তাঁর ঊর্ধ্বে আর কেউ নেই। তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর এবং তাঁর শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দময়। তিনি হচ্ছেন অনাদির আদিপুরুষ গোবিন্দ এবং তিনিই হচ্ছেন সর্ব কারণের কারণ।" (*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/১)

ভাগবতেও পরমেশ্বর ভগবানের অনেক অবতারের বর্ণনা আছে, কিন্তু সেখানেও বলা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পুরুষোত্তম এবং তাঁর থেকে বহু বহু অবতার ও ঈশ্বর বিস্তার লাভ করে—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ ।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥

"সমস্ত অবতারেরা হচ্ছেন ভগবানের অংশ অথবা তাঁর অংশের অংশ-প্রকাশ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান।" (*ভাগবত* ১/৩/২৮)

তাই শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের আদিরূপ, পরমতত্ত্ব এবং পরমাত্মা ও নির্বিশেষ ব্রহ্মের উৎস।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সামনে আত্মীয়-পরিজনদের জন্য অর্জুনের এই শোক অত্যন্ত অশোভন, তাই ভগবান আশ্চর্যান্বিত হয়ে ব্যক্ত করেছেন, *কুতঃ*, "কোথা থেকে।" এই ধরনের ভাবপ্রবণতা পুরুষোচিত নয় এবং একজন সুসভ্য আর্যের কাছ থেকে এটি কখনই আশা করা যায় না। *আর্য* বলে তাঁকেই অভিহিত করা হয়, যিনি জীবনের মূল্য বোঝেন এবং যাঁর সভ্যতা অধ্যাত্ম উপলব্ধির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যে সমস্ত মানুষ তাদের দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়, তারা কখনই উপলব্ধি করতে পারে না যে, জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমতত্ত্ব বিষ্ণু বা ভগবানকে উপলব্ধি করা। তারা জড় জগতের বহিরঙ্গা রূপের দ্বারা মোহিত হয়, তাই তারা জানে না মুক্তি বলতে কি বোঝায়। জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জ্ঞান যাদের নেই, তাদেরকে বলা হয় অনার্য। যদিও অর্জুন ছিলেন ক্ষত্রিয়, তবুও যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে তিনি তাঁর স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হচ্ছিলেন। এই ধরনের কাপুরুষতা অনার্যের কাছ থেকেই কেবল আশা করা যায়। এভাবে কর্তব্যকর্ম থেকে বিচ্যুত হলে আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর হওয়া যায় না, এমন কি পার্থিব জগতে কাউকে যশস্বী হওয়ার সুযোগও প্রদান করে না। আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি অর্জুনের এই তথাকথিত সহানুভূতিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনুমোদন করেননি।

শ্লোক ৩

ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে ।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩ ॥

ক্লৈব্যম্—ক্লীবত্ব; **মা স্ম**—করো না; **গমঃ**—গ্রহণ করা; **পার্থ**—হে পৃথাপুত্র; **ন**—কখনই নয়; **এতৎ**—এই; **ত্বয়ি**—তোমার; **উপপদ্যতে**—উপযুক্ত; **ক্ষুদ্রম্**—ক্ষুদ্র; **হৃদয়**—হৃদয়ের; **দৌর্বল্যম্**—দুর্বলতা; **ত্যক্ত্বা**—পরিত্যাগ করে; **উত্তিষ্ঠ**—উঠ; **পরন্তপ**—শত্রু দমনকারী।

গীতার গান

নপুংসক নহ পার্থ এ কি ব্যবহার ।
যোগ্য নহে এ কার্য বন্ধু যে আমার ॥
হৃদয়দৌর্বল্য এই নিশ্চয়ই জানিবে ।
ছাড় এই, কর যুদ্ধ যদি শত্রুকে মারিবে ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! এই সম্মান হানিকর ক্লীবত্বের বশবর্তী হয়ো না। এই ধরনের আচরণ তোমার পক্ষে অনুচিত। হে পরন্তপ! হৃদয়ের এই ক্ষুদ্র দুর্বলতা পরিত্যাগ করে তুমি উঠে দাঁড়াও।

তাৎপর্য

অর্জুন ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেবের ভগিনী পৃথার পুত্র, তাই তাঁকে এখানে 'পার্থ' নামে সম্বোধন করে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন। ক্ষত্রিয়ের সন্তান যদি যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে, তখন বুঝতে হবে, সে কেবল নামেই ক্ষত্রিয়; তেমনই, ব্রাহ্মণের সন্তান যখন অধার্মিক হয়, তখন বুঝতে হবে, সে কেবল নামেই ব্রাহ্মণ। এই ধরনের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা তাদের পিতার অযোগ্য সন্তান। তাই, শ্রীকৃষ্ণ চাননি, অর্জুন অযোগ্য ক্ষত্রিয় সন্তান বলে কুখ্যাত হোক। অর্জুন ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁর রথের সারথি হয়ে নিজেই তাঁকে পরিচালিত করছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও যদি অর্জুন যুদ্ধ না করে, তবে তা হবে নিতান্ত অখ্যাতির বিষয়। তাই, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বললেন, এই রকম আচরণ করা তাঁর পক্ষে অশোভন। অর্জুন যুক্তি দেখিয়েছিলেন, অত্যন্ত সম্মানীয় ভীষ্ম ও নিজের আত্মীয়দের প্রতি উদার মনোভাবহেতু তিনি যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করবেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বুঝিয়েছিলেন, এই ধরনের মহানুভবতা হৃদয়ের দুর্বলতা ছাড়া আর কিছু নয়। এই ধরনের ভ্রান্ত মহানুভবতাকে মহাজনেরা কখনই অনুমোদন করেননি। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের পরিচালনায় অর্জুনের মতো পুরুষের এই ধরনের মহানুভবতা, অথবা তথাকথিত অহিংসা পরিত্যাগ করা উচিত।

শ্লোক ৪

অর্জুন উবাচ
কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণং চ মধুসূদন ।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪ ॥

অর্জুনঃ উবাচ—অর্জুন বললেন; **কথম্**—কিভাবে; **ভীষ্মম্**—ভীষ্ম; **অহম্**—আমি; **সংখ্যে**—যুদ্ধে; **দ্রোণম্**—দ্রোণাচার্য; **চ**—ও; **মধুসূদন**—হে মধুহন্তা; **ইষুভিঃ**—বাণের দ্বারা; **প্রতিযোৎস্যামি**—প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব; **পূজার্হৌ**—পূজনীয়; **অরিসূদন**—হে শত্রুহন্তা।

গীতার গান

অর্জুন কহিলেন ঃ

মধুসূদন! কি আজ্ঞা কর তুমি মোরে ।
ভীষ্ম দ্রোণ গুরুজন তারে মারিবারে? ॥
পূজার যোগ্য যে তাঁরা হন নিত্যকাল ।
তাঁদের শরীরে বাণ সুতীক্ষ্ণ ধারাল? ॥

অনুবাদ

অর্জুন বললেন—হে অরিসূদন! হে মধুসূদন! এই যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষ্ম ও দ্রোণের মতো পরম পূজনীয় ব্যক্তিদের কেমন করে আমি বাণের দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব?

তাৎপর্য

পিতামহ ভীষ্ম ও শিক্ষক দ্রোণাচার্যের মতো গুরুজনেরা সর্বদাই পূজনীয়। এমন কি যদি তাঁরা আক্রমণও করেন, তবুও তাঁদের প্রতি-আক্রমণ করা উচিত নয়। সাধারণ শিষ্টাচার হচ্ছে যে, গুরুজনদের প্রতি এমন কি মৌখিক তর্কযুদ্ধ করাও উচিত নয়। এমন কি তাঁদের আচরণ যদি কখনও কখনও রূঢ়ও হয়, তবুও তাঁদের প্রতি রূঢ়ভাবে আচরণ করা উচিত নয়। তা হলে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতি-আক্রমণ করা অর্জুনের পক্ষে কি করে সম্ভব? শ্রীকৃষ্ণ কি কখনও তাঁর পিতামহ উগ্রসেন অথবা তাঁর গুরুদেব সান্দীপনি মুনিকে আক্রমণ করতে সমর্থ হবেন? অর্জুন যুদ্ধ থেকে বিরত হবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে এই রকম যুক্তি প্রদর্শন করলেন।

শ্লোক ৫

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে ।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥ ৫ ॥

গুরূন্—গুরুজনেরা; **অহত্বা**—হত্যা না করে; **হি**—অবশ্যই; **মহানুভাবান্**—মহান আত্মাগণ; **শ্রেয়ঃ**—শ্রেয়; **ভোক্তুম্**—ভোগ করা; **ভৈক্ষ্যম্**—ভিক্ষার দ্বারা; **অপি**—ও; **ইহ**—এই জীবনে; **লোকে**—এই জগতে; **হত্বা**—হত্যা করে; **অর্থ**—লাভ; **কামান্**—কামনা করে; **তু**—কিন্তু; **গুরূন্**—গুরুজনদের; **ইহ**—এই জগতে; **এব**—অবশ্যই; **ভুঞ্জীয়**—ভোগ করতে হবে; **ভোগান্**—ভোগ্যবস্তু; **রুধির**—রক্ত; **প্রদিগ্ধান্**—মাখা।

গীতার গান

শুধু গুরু নহে তাঁরা, মহানুভব হয় যাঁরা,
হত্যা করি তাঁদের সবারে ।
তদপেক্ষা ভিক্ষা ভাল, কাটিয়ে যাইবে কাল,
মিথ্যা যুদ্ধ করাও আমারে ॥
হত্যা এই মহাকাম, বিধি যে হইল বাম,
এই যুদ্ধে গুরু হত্যা হবে ।
সে ভোগ রুধিরমাখা, কেমনে করিব সখা,
সে যুদ্ধ কে করিয়াছে কবে ॥

অনুবাদ

আমার মহানুভব শিক্ষাগুরুদের জীবন হানি করে এই জগৎ ভোগ করার থেকে বরং ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করা ভাল। তাঁরা পার্থিব বস্তুর অভিলাষী হলেও আমার গুরুজন। তাঁদের হত্যা করা হলে, যুদ্ধলব্ধ সমস্ত ভোগ্যবস্তু তাঁদের রক্তমাখা হবে।

তাৎপর্য

শাস্ত্রনীতি অনুসারে, যে গুরু জঘন্য কার্যে লিপ্ত হয়েছে এবং ভাল-মন্দ বিচারবোধ হারিয়ে ফেলেছে, তাকে পরিত্যাগ করা উচিত। দুর্যোধনের কাছ থেকে অর্থ-সাহায্য পেতেন বলে ভীষ্ম ও দ্রোণ তার পক্ষ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিলেন, যদিও কেবলমাত্র আর্থিক সাহায্য পাবার ফলে দুর্যোধনের পক্ষে যোগ দেওয়া তাঁদের উচিত হয়নি। এই অনুচিত কার্য করার ফলে, তাঁরা পাণ্ডবদের পরমারাধ্য শিক্ষাগুরুর পদের মর্যাদা থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের প্রতি অর্জুনের শ্রদ্ধা কোন অংশে হ্রাস পায়নি এবং অর্জুন এই কথা ভেবে মনে মনে শিহরিত হয়েছেন যে, জাগতিক সুখ উপভোগ করার জন্য তাঁদের হত্যা করা হলে, সেই ভোগ হবে তাঁদের রুধিরমাখা।

শ্লোক ৬

ন চৈতদ্ বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্ বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষামস্
তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬ ॥

ন—না; **চ**—ও; **এতৎ**—এই; **বিদ্মঃ**—আমরা জানি; **কতরৎ**—যা; **নঃ**—আমাদের; **গরীয়ঃ**—শ্রেয়ঃ; **যৎ**—যা; **বা**—অথবা; **জয়েম**—জয় করি; **যদি**—যদি; **বা**—অথবা; **নঃ**—আমাদের; **জয়েয়ু**—জয় করা হয়; **যান্**—যারা; **এব**—অবশ্যই; **হত্বা**—হত্যা করে; **ন**—না; **জিজীবিষামঃ**—জীবন ধারণের ইচ্ছা করি; **তে**—তারা সকলে; **অবস্থিতাঃ**—অবস্থিত; **প্রমুখে**—সম্মুখে; **ধার্তরাষ্ট্রাঃ**—ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ।

গীতার গান

বুঝিতে পারি না ভাল, কোথায় গরিমা হল,
কোন কার্য জুয়ায় আমায় ।
কিবা আমি জয় করি, কিংবা আমি নিজে মরি,
দুই নৌকা আমারে নাচায় ॥
যাদের মারিয়া রণে, বাঁচিব সে অকারণে,
তারা সব আমার সম্মুখে ।

ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ, আর যত বন্ধুজন,
মরিলে সে হবে মোর দুঃখ ॥

অনুবাদ

তাদের জয় করা শ্রেয়, না তাদের দ্বারা পরাজিত হওয়া শ্রেয়, তা আমি বুঝতে পারছি না। আমরা যদি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের হত্যা করি, তা হলে আমাদের আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করবে না। তবুও এই রণাঙ্গনে তারা আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে।

তাৎপর্য

যুদ্ধ করাটা যদিও ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, তবুও অর্জুন স্থির করতে পারছিলেন না যে, সেই অনর্থক হিংসাত্মক যুদ্ধে রত হবেন, না কি ভিক্ষা বৃত্তি গ্রহণ করে জীবন ধারণ করবেন। তিনি যদি তাঁর শত্রুদের পরাজিত না করেন, তা হলে ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করা ছাড়া আর কোন পথ থাকবে না। আর তা ছাড়া, যুদ্ধে যে কোন্ পক্ষের জয় হবে, তার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। যুদ্ধে পাণ্ডবদের জয় হলেও (কারণ, তাঁদের দাবি ছিল ন্যায়সঙ্গত) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের অবর্তমানে জীবন ধারণ করা তাঁদের পক্ষে নিতান্ত দুর্বিষহ হবে বলে অর্জুন মনে করেছিলেন। এদিক দিয়ে বিচার করলে সেটিও তাদের পক্ষে এক রকম পরাজয়। অর্জুনের এই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিবেচনা অবধারিতভাবে প্রমাণ করে যে, তিনি কেবল মহৎ ভগবদ্ভক্তই ছিলেন না, তিনি গভীর তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন এবং তিনি তাঁর মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে সর্বতোভাবে সংযত করেছিলেন। যদিও তিনি রাজকীয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করে জীবন ধারণ করতে মনস্থ করেছিলেন। এর মাধ্যমেও আমরা দেখতে পাই যে, অন্তরে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অনাসক্ত। এই সমস্ত সদ্গুণাবলী এবং তাঁর গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম-বাক্যের প্রতি তাঁর গভীর নিষ্ঠা, এই দুইয়ের সমন্বয়ের ফলে তিনি ছিলেন প্রকৃত ধার্মিক। আমরা এখন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, মুক্তি লাভের জন্য অর্জুন সম্পূর্ণরূপে যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন। ইন্দ্রিয় যদি সংযত না হয়, তবে দিব্যজ্ঞান উপলব্ধির স্তরে উন্নীত হওয়ার কোন সুযোগ থাকে না। এই দিব্যজ্ঞান ও ভক্তি ছাড়া জড় জগতের বন্ধন থেকে কোন রকমেই মুক্ত হওয়া যায় না। অর্জুন এই সমস্ত গুণাবলীর দ্বারা ভূষিত ছিলেন এবং সেই সঙ্গে ছিল জাগতিক সম্পর্কিত অস্বাভাবিক গুণাবলী।

শ্লোক ৭

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসম্মূঢ়চেতাঃ ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ৭ ॥

কার্পণ্য—কৃপণতা; **দোষ**—দুর্বলতা; **উপহত**—প্রভাবিত হয়ে; **স্বভাবঃ**—স্বভাব; **পৃচ্ছামি**—আমি জিজ্ঞাসা করছি; **ত্বাম্**—তোমাকে; **ধর্ম**—ধর্ম; **সম্মূঢ়**—হতবুদ্ধি; **চেতাঃ**—চিত্ত; **যৎ**—যা; **শ্রেয়ঃ**—শ্রেয়স্কর; **স্যাৎ**—হয়; **নিশ্চিতম্**—নিশ্চিতভাবে; **ব্রূহি**—বল; **তৎ**—তা; **মে**—আমাকে; **শিষ্যঃ**—শিষ্য; **তে**—তোমার; **অহম্**—আমি; **শাধি**—নির্দেশ দাও; **মাম্**—আমাকে; **ত্বাম্**—তোমার; **প্রপন্নম্**—আত্মসমর্পিত।

গীতার গান

কার্পণ্য দোষেতে দূষী, মোহেতে হয়েছি বশী,
স্ব স্বভাব হল অপহত ।
নিজ ধর্ম ছাড়ি মূঢ়, জিজ্ঞাসি তোমারে দৃঢ়,
কৃপা করি করহ সংযত ॥
তুমি জান হিত মোর, হয়েছি মোহেতে ভোর,
ভাল যাতে করহ বিচারে ।
হইনু তোমার শিষ্য, দেখুক সকল বিশ্ব,
শিক্ষা দাও এই প্রপন্নরে ॥

অনুবাদ

কার্পণ্যজনিত দুর্বলতার প্রভাবে আমি এখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছি এবং আমার কর্তব্য সম্বন্ধে বিভ্রান্ত হয়েছি। এই অবস্থায় আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, এখন কি করা আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর, তা আমাকে বল। এখন আমি তোমার শিষ্য এবং সর্বতোভাবে তোমার শরণাগত। দয়া করে তুমি আমাকে নির্দেশ দাও।

তাৎপর্য

প্রকৃতির প্রভাবে জড়-জাগতিক কর্মচক্রের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে সকলেই হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে আমরা এই কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা অনুভব

করি। তাই আমাদের সত্যদ্রষ্টা সদ্গুরুর শরণ নিতে হয় এবং তিনি আমাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন করবার পথে পরিচালিত করেন। আমাদের অনাকাঙ্ক্ষিত জীবনের জটিল সমস্যাগুলি থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য সদ্গুরুর শরণাপন্ন হবার উপদেশ সমস্ত বৈদিক সাহিত্যে দেওয়া হয়েছে। জড়-জাগতিক ক্লেশ হচ্ছে দাবানলের মতো যা আপনা থেকেই জ্বলে ওঠে, এই আগুন কেউ লাগায় না। ঠিক তেমনই, জগতের এমনই অবস্থা যে, জীবনের কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা আপনা থেকেই আবির্ভূত হয়, এই প্রকার বিভ্রান্তি আমরা না চাইলেও। কেউ আগুন চায় না, তবুও আগুন জ্বলতে থাকে এবং তার ফলে আমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ি। বৈদিক সাহিত্য তাই উপদেশ দিচ্ছে যে, জীবনের কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা সমাধানের জন্য এবং সেই সমাধানের বিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করবার জন্য গুরু-পরম্পরার ধারায় ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছেন যে সদ্গুরু, তাঁর শরণাপন্ন হতে হবে। যে ব্যক্তি সদ্গুরু তিনি সর্ব বিষয়ে পারদর্শী। তাই, জড় জগতের মোহের দ্বারা আবদ্ধ না থেকে সদ্গুরুর শরণাপন্ন হওয়া উচিত। এটিই হচ্ছে এই শ্লোকের তাৎপর্য।

জড় জগতের মোহের দ্বারা আচ্ছন্ন কে? যে মানুষ তার সমস্যাগুলি সম্বন্ধে অবগত নয়, সেই হচ্ছে মোহের দ্বারা আচ্ছন্ন। *বৃহদারণ্যক উপনিষদে* (৩/৮/১০) মোহাচ্ছন্ন মানুষের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—*যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্ লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।* "যে মানুষ তার মনুষ্য জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান করে না এবং আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি না করে কুকুর-বেড়ালের মতো এই জগৎ থেকে বিদায় নেয়, সেই হচ্ছে কৃপণ।" এই মানবজন্ম হচ্ছে একটি অমূল্য সম্পদ, কারণ, জীব এই জন্মের সদ্ব্যবহার করে জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে; তাই, যে এই অমূল্য সম্পদের সদ্ব্যবহার করে না, সে হচ্ছে কৃপণ। পক্ষান্তরে, যিনি যথার্থ বুদ্ধিমত্তা সহকারে মানব-জন্মের সদ্ব্যবহার করে জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান করেন, তিনি হচ্ছেন ব্রাহ্মণ। *য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্ লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।*

যে কৃপণ সে পরিবার, সমাজ, দেশ, জাতি আদি জড় সম্বন্ধের প্রতি অত্যধিক আসক্ত হয়ে তার সময়ের অপচয় করে। মানুষ প্রায়ই এক ধরনের 'চর্মরোগের' দ্বারা আক্রান্ত হয়ে স্ত্রী, পুত্র, পরিজন সমন্বিত পরিবারের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়ে। এই রোগকে 'চর্মরোগ' বলা হয়, কারণ দেহের ভিত্তিতে বা চর্মের ভিত্তিতে এই আত্মীয়তার বন্ধন গড়ে ওঠে এবং এই বন্ধনের ফলে জীব অত্যন্ত ক্লেশদায়ক ভবযন্ত্রণা ভোগ করে। কৃপণ মনে করে, সে তার পরিবারের তথাকথিত আত্মীয়দের মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবে; নয়ত সে মনে করে, তার আত্মীয়স্বজন তাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবে। এই ধরনের পারিবারিক বন্ধন এমন কি পশুদের মধ্যেও দেখা যায়, তারাও তাদের সন্তানদের যত্ন করে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন অর্জুন বুঝতে পেরেছিলেন, আত্মীয়-পরিজনদের প্রতি তাঁর মমতা এবং তাদের মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার বাসনাই ছিল তাঁর মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ার কারণ। যদিও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর যুদ্ধ করার কর্তব্য তাঁকে সম্পাদন করতে হবে, কিন্তু তবুও কৃপণতা জনিত দুর্বলতার ফলে তিনি তাঁর সেই কর্তব্য সম্পাদন করতে পারছিলেন না। তাই তিনি পরম গুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অনুনয় করছেন, তাঁর এই সমস্যার সমাধান করার উপায় প্রদর্শন করতে। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে তাঁর শিষ্যরূপে আত্মসমর্পণ করেন। শ্রীকৃষ্ণকে তিনি আর বন্ধুরূপে সম্ভাষণ করছেন না। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে যে কথা হয়, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এখন অর্জুন তাই গভীর গুরুত্বের সঙ্গে পরম গুরু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পরম তত্ত্বদর্শনের আলোচনা করতে চান। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন *ভগবদ্গীতার* তত্ত্ববিজ্ঞানের আদি গুরু এবং অর্জুন হচ্ছেন *গীতার* তত্ত্ব-উপলব্ধিকারী প্রথম শিষ্য। অর্জুন কিভাবে *ভগবদ্গীতার* জ্ঞান উপলব্ধি করেছিলেন, তার ব্যাখ্যা *ভগবদ্গীতাতেই* করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও গর্দভসদৃশ জড় পণ্ডিতেরা *গীতার* ব্যাখ্যা করে বলে, শ্রীকৃষ্ণ নামক কোন পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ করার কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃস্থিত অপ্রকাশিত যে-তত্ত্ব, তাকে উপলব্ধি করাই হচ্ছে *গীতার* প্রকৃত শিক্ষা। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন অনাদির আদিপুরুষ স্বয়ং ভগবান। তাঁর অন্তর আর বাইরের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই, তিনি সর্বব্যাপ্ত, সর্বশক্তিমান। কিন্তু এই জ্ঞান যার নেই, সেই মহামূর্খের পক্ষে *গীতার* মর্ম উপলব্ধি করা কখনই সম্ভব নয়।

শ্লোক ৮

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্ ।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥ ৮ ॥

ন—না; হি—অবশ্যই; **প্রপশ্যামি**—দেখছি; **মম**—আমার; অপনুদ্যাৎ—দূর করতে পারে; যৎ—যা; **শোকম্**—শোক; **উচ্ছোষণম্**—শুকিয়ে দিচ্ছে; **ইন্দ্রিয়াণাম্**—ইন্দ্রিয়গুলিকে; **অবাপ্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **ভূমৌ**—এই পৃথিবীতে; **অসপত্নম্**—

প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন; ঋদ্ধম্—সমৃদ্ধিশালী; রাজ্যম্—রাজ্য; সুরাণাম্—দেবতাদের; অপি—এমন কি; চ—ও; আধিপত্যম্—আধিপত্য।

গীতার গান

দেখি না আমি যে অন্ধ, তাহে বুদ্ধি অতি মন্দ,
শোকানল নিভিবে কিভাবে ।
যে শোক জ্বালায় মোরে, ইন্দ্রিয়াদি সব পোড়ে,
ভবরোগ কিরূপে ঘুচাবে ॥
যদি পাই ত্রিভুবন, রাজ্যলক্ষ্মী সুলোভন,
অসপত্ন রাজ্যের বিকাশ ।
দেবলোকে আধিপত্য, তোমাকে কহিনু সত্য,
নাহি হবে এ শোক বিনাশ ॥

অনুবাদ

আমার ইন্দ্রিয়গুলিকে শুকিয়ে দিচ্ছে যে শোক, তা দূর করবার কোন উপায় আমি খুঁজে পাচ্ছি না। এমন কি স্বর্গের দেবতাদের মতো আধিপত্য নিয়ে সমৃদ্ধিশালী, প্রতিদ্বন্দ্বিতাবিহীন রাজ্য এই পৃথিবীতে লাভ করলেও আমার এই শোকের বিনাশ হবে না।

তাৎপর্য

অর্জুন যদিও তাঁর মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াসে ধর্মগত ও নীতিগত যুক্তির অবতারণা করছিলেন, কিন্তু তবুও যেন তিনি তাঁর গুরু শ্রীকৃষ্ণের সাহায্য ছাড়া তাঁর প্রকৃত সমস্যার সমাধান করতে পারছিলেন না। তিনি বুঝতে পারছিলেন, যে সমস্যা তাঁর সমস্ত সত্তাকে দগ্ধ করছিল, তাঁর তথাকথিত জ্ঞানের সাহায্যে তিনি সেই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন না। তাই তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে গুরুরূপে বরণ করে তাঁর শরণাপন্ন হলেন। কেতাবী বিদ্যা, পাণ্ডিত্য, উচ্চপদ আদি জীবনের প্রকৃত সমস্যার সমাধান কখনই করতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের মতো গুরুর কৃপার ফলেই কেবল সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়। তাই, সিদ্ধান্ত হচ্ছে, যে গুরু সর্বতোভাবে কৃষ্ণচেতনার অমৃত আস্বাদন করেছেন, তিনিই হচ্ছেন সদ্গুরু, কেন না তিনিই কেবল পারেন মানব-জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে। শ্রীচৈতন্য

মহাপ্রভু বলেছেন, যিনি কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা, তিনি ব্রাহ্মণই হন বা শূদ্রই হন, তিনিই কেবল পারেন গুরু হতে।

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয় ।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই 'গুরু' হয় ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৮/১২৮)

সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানী না হলে সদ্গুরু হওয়া কখনই সম্ভব নয়। বৈদিক শাস্ত্রেও বলা হয়েছে—

ষট্‌কর্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ ।
অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ ॥

"সমস্ত বৈদিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণ যদি বৈষ্ণব না হন, অথবা যদি তিনি কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা না হন, তবে তিনি গুরু হবার যোগ্য নন। কিন্তু যদি নীচকুলোদ্ভূত চণ্ডাল কৃষ্ণ-তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন বৈষ্ণব হন, তবে তিনি গুরু হতে পারেন।" *(পদ্ম পুরাণ)*

জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি—এই চতুর্বিধ সমস্যা জড় অস্তিত্বকে সর্বদাই জর্জরিত করছে এবং ধনৈশ্বর্যের সঞ্চয় অথবা অর্থনৈতিক উন্নতির মাধ্যমে কখনই এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। পৃথিবীর অনেক দেশ সব রকমের জাগতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যে পরিপূর্ণ। সেই সমস্ত দেশ চরম অর্থনৈতিক উন্নতি লাভ করে ধনৈশ্বর্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানে জড় জীবনের যে সমস্ত সমস্যা তা কোন অংশেই লাঘব হয়নি। নানাভাবে তারা শান্তি পাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু তাদের সেই সমস্ত প্রচেষ্টা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হচ্ছে, কারণ শান্তি লাভ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ গ্রহণ করা, অর্থাৎ *ভগবদ্গীতা* ও *শ্রীমদ্ভাগবতের* উপদেশ গ্রহণ করা, অথবা শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ প্রতিনিধি সদ্গুরুর শরণ গ্রহণ করা।

যদি অর্থনৈতিক উন্নতি এবং জাগতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য মানুষকে পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় অথবা আন্তর্জাতিক প্রমত্ততা জনিত শোক থেকে উদ্ধার করতে পারত, তবে অর্জুন বলতেন না যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতাবিহীন পৃথিবীর সাম্রাজ্য অথবা স্বর্গলোকের আধিপত্য লাভ করলেও তিনি শোকমুক্ত হতে পারবেন না। তাই তিনি কৃষ্ণভাবনার আশ্রয় অবলম্বন করেছিলেন এবং সুখ ও শান্তি লাভের সেটিই হচ্ছে পন্থা। অর্থনৈতিক উন্নতি এবং জড় জগতের উপর আধিপত্য প্রকৃতির অঙ্গুলিহেলনে মুহূর্তের মধ্যেই ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে। মানুষের গ্রহান্তরে যাবার

আপ্রাণ প্রচেষ্টা, যেমন চাঁদে যাবার জন্য অনুসন্ধান করছে, তাও প্রকৃতির এক ঘাতে সর্বতোভাবে বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। *ভগবদ্‌গীতায়* তা প্রতিপন্ন হয়েছে—*ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।* "সমস্ত পুণ্যকর্মের ফল শেষ হয়ে গেলে, চরম সুখ ও সমৃদ্ধিপূর্ণ জীবন থেকে নিতান্তই নিম্নস্তরের জীবনে পতিত হতে হয়।" অনেক রাজনীতিবিদ এভাবেই অধঃপতিত হয়েছে এবং এই ধরনের অধঃপতন কেবল দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

তাই, আমরা যদি আমাদের মঙ্গলের জন্য সর্ববিধ শোকের নিরসন করতে চাই, তবে আমাদের অর্জুনের মতো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হতে হবে। সুতরাং অর্জুন যেমন শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে অনুরোধ করেছিলেন, প্রতিটি মানুষেরই উচিত সেভাবে ভগবানের শরণাগত হওয়া। সেটিই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা।

শ্লোক ৯

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ ॥ ৯ ॥

সঞ্জয়ঃ উবাচ—সঞ্জয় বললেন; **এবম্**—এভাবে; **উক্ত্বা**—বলে; **হৃষীকেশম্**—ইন্দ্রিয়ের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণকে; **গুড়াকেশঃ**—নিদ্রাজয়ী অর্জুন; **পরন্তপঃ**—শত্রু দমনকারী; **ন যোৎস্যে**—আমি যুদ্ধ করব না; **ইতি**—এভাবে; **গোবিন্দম্**—ইন্দ্রিয়সমূহের আনন্দদাতা শ্রীকৃষ্ণকে; **উক্ত্বা**—বলে; **তূষ্ণীম্**—নীরব; **বভূব**—হলেন; **হ**—নিশ্চিতভাবে।

গীতার গান

সঞ্জয় কহিল ঃ

সে কথা বলিয়া গুড়াকেশ পরতাপী ।
হৃষীকেশে নিবেদিল যদিও প্রতাপী ॥
হে গোবিন্দ! মোর দ্বারা যুদ্ধ নাহি হবে ।
যুদ্ধ ছাড়ি সেই বীর রহিল নীরবে ॥

অনুবাদ

সঞ্জয় বললেন—এভাবে মনোভাব ব্যক্ত করে গুড়াকেশ অর্জুন তখন হৃষীকেশকে বললেন, "হে গোবিন্দ! আমি যুদ্ধ করব না", এই বলে তিনি মৌন হলেন।

তাৎপর্য

ধৃতরাষ্ট্র যখন শুনলেন, অর্জুন যুদ্ধ না করে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করে জীবন ধারণ করবেন, তখন তিনি মনে মনে খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে নিরাশ করার মানসে সঞ্জয় তাঁকে জানিয়ে দিলেন, অর্জুন হচ্ছেন *পরন্তপঃ* অর্থাৎ শত্রুর বিনাশকারী। যদিও অর্জুন পারিবারিক বন্ধনের মোহের বশবর্তী হয়ে সাময়িকভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু তার পরই তিনি পরম গুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মনিবেদন করে তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করেছিলেন। এর থেকে বোঝা যায়, অর্জুন শীঘ্রই পারিবারিক বন্ধনের মোহ থেকে মুক্ত হয়ে আত্মজ্ঞান বা কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করবেন এবং ভগবানের নির্দেশে সেই যুদ্ধে রত হয়ে নির্মমভাবে শত্রু সংহার করবেন। এভাবে ক্ষণস্থায়ী যে আশার আনন্দে ধৃতরাষ্ট্রের বুক ভরে উঠেছিল, তা অচিরেই অন্তর্হিত হল।

শ্লোক ১০

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত ।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০ ॥

তম্—তাঁকে; **উবাচ**—বললেন; **হৃষীকেশঃ**—ইন্দ্রিয়সমূহের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণ; **প্রহসন্**—হেসে; **ইব**—এভাবে; **ভারত**—হে ভরতবংশজ ধৃতরাষ্ট্র; **সেনয়োঃ**—সেনাদের; **উভয়োঃ**—উভয় পক্ষের; **মধ্যে**—মাঝখানে; **বিষীদন্তম্**—বিষাদগ্রস্ত; **ইদম্**—এই; **বচঃ**—বাক্য।

গীতার গান

স্নিগ্ধ হাসি মনোহর হৃষীকেশ বলে ।
হে ভারত! অর্জুনের শুনিয়া সকলে ॥
যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যমধ্যে হাসিয়া হাসিয়া ।
উপদেশ করেন গীতা বিষণ্ণ দেখিয়া ॥

অনুবাদ

হে ভরতবংশীয় ধৃতরাষ্ট্র! সেই সময় স্মিত হেসে, শ্রীকৃষ্ণ উভয় পক্ষের সৈন্যদের মাঝখানে বিষাদগ্রস্ত অর্জুনকে এই কথা বললেন।

তাৎপর্য

দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু হৃষীকেশ ও গুড়াকেশের মধ্যে কথোপকথন হচ্ছিল। বন্ধু হিসাবে তাঁরা দুজনেই ছিলেন সমপর্যায়ভুক্ত, কিন্তু তাঁদের মধ্যে একজন স্বেচ্ছাকৃতভাবে অপরের শিষ্যত্ব বরণ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই সময় হাসছিলেন, কারণ তাঁর বন্ধু তাঁর শিষ্য হতে মনস্থ করেছিলেন। তিনি পরমেশ্বর, তাই প্রভুরূপে তিনি সকলেরই নিয়ন্তা, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর ভক্তের বাসনা অনুযায়ী তাঁদের বন্ধু, পুত্র ও প্রেমিক হতে সম্মত হন। কিন্তু তাঁর ভক্ত যখন তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করে তাঁকে গুরু হিসাবে গ্রহণ করেন, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ গুরুর ভূমিকা গ্রহণ করে গুরুবৎ গাম্ভীর্য সহকারে উপদেশ দেন। এখানে আমরা দেখতে পাই, গুরু ও শিষ্যের মধ্যে কথোপকথন হয়েছিল প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে দুই সেনানীর মাঝখানে, যার ফলে সেই কথা শ্রবণ করে সকলেই লাভবান হতে পেরেছিল। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, *ভগবদ্গীতার* বাণী কোন বিশেষ ব্যক্তি, সমাজ অথবা সম্প্রদায়ের জন্য নয়। এই বাণী সকলের জন্য এবং শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলেই এর যথার্থ মর্ম হৃদয়ঙ্গম করে ভগবানের চরণে শরণাগতি লাভ করতে পারে।

শ্লোক ১১

শ্রীভগবানুবাচ

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে ।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **অশোচ্যান্**—যে বিষয়ে শোক করা উচিত নয়; **অন্বশোচঃ**—তুমি শোক করছ; **ত্বম্**—তুমি; **প্রজ্ঞাবাদান্**—প্রাজ্ঞ বচন; **চ**—ও; **ভাষসে**—বলছ; **গত**—বিগত; **অসূন্**—জীবন; **অগত**—যা গত হয়নি; **অসূন্**—জীবন; **চ**—ও; **ন**—না; **অনুশোচন্তি**—অনুশোচনা করেন; **পণ্ডিতাঃ**—পণ্ডিতগণ।

গীতার গান

শ্রীভগবান কহিলেন ঃ

অশোচ্য বিষয়ে শোক কর তুমি বীর ।
প্রজ্ঞাবাদ ভাষ্যকার যেন কোন ধীর ॥
পণ্ডিত যে জন হয় শোক নাহি তার ।
মৃত দেহ নিত্য আত্মা সে জানে বিচার ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—তুমি প্রাজ্ঞের মতো কথা বলছ, অথচ যে বিষয়ে শোক করা উচিত নয়, সেই বিষয়ে শোক করছ। যাঁরা যথার্থই পণ্ডিত তাঁরা কখনও জীবিত অথবা মৃত কারও জন্যই শোক করেন না।

তাৎপর্য

শিষ্যরূপে ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করা মাত্রই ভগবান আচার্যের ভূমিকা গ্রহণ করে, অর্জুনের ভুল সংশোধন করার জন্য পরোক্ষভাবে তাঁকে মহামূর্খ বলে শাসন করতে লাগলেন। ভগবান তাঁকে বললেন, "তুমি প্রাজ্ঞের মতো কথা বলছ, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান তোমার নেই। যিনি জ্ঞানী তিনি জানেন দেহ কি ও আত্মা কি, তাই তিনি জীবিত অথবা মৃত কোন অবস্থাতেই দেহের জন্য শোক করেন না। পরবর্তী অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, প্রকৃত জ্ঞান হচ্ছে সেই জ্ঞান যা জড় দেহ ও চেতন আত্মার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে এবং পরম নিয়ন্তা ভগবানের সঙ্গে আমাদের নিত্য সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দেয়। অর্জুন যুক্তি দেখাচ্ছিলেন যে, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজনীয়তার থেকে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তিনি জানতেন না, জড় পদার্থ, আত্মা ও ভগবৎ-সম্বন্ধীয় জ্ঞান ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান করার চাইতেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর যেহেতু তাঁর সেই জ্ঞান ছিল না, তাই তাঁর পক্ষে পাণ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তি দেখানো অনুচিত। যেহেতু তিনি পরম জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না, তাই তিনি অনর্থক শোক করছিলেন। জড় দেহের জন্ম হয় এবং এক সময় না এক সময় তার বিনাশ হবেই, কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর তার কখনই বিনাশ হয় না। তাই, জড় দেহটি আত্মার মতো গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই আত্মাই হচ্ছে জীবের প্রকৃত সত্তা, তাই দেহের বিনাশ হবার ভয়ে শোক করা নিতান্তই মূর্খতা। এই সত্য সম্বন্ধে যিনি অবগত তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত জ্ঞানী এবং তিনি কোন অবস্থাতেই জড় দেহের জন্য শোক করেন না।

শ্লোক ১২

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃপরম্ ॥ ১২ ॥

ন—না; **তু**—কিন্তু; **এব**—অবশ্যই; **অহম্**—আমি; **জাতু**—কোনও সময়; **ন**—না; **আসম্**—অস্তিত্ব; **ন**—এমন নয়; **ত্বম্**—তুমি; **ন**—না; **ইমে**—এই সমস্ত; **জনাধিপাঃ**—নৃপতিগণ; **ন**—না; **চ**—ও; **এব**—অবশ্যই; **ন**—তেমন নয়; **ভবিষ্যামঃ**—অস্তিত্ব থাকবে; **সর্বে**—সকলের; **বয়ম্**—আমাদের; **অতঃপরম্**—তারপর।

গীতার গান

তুমি আমি যত রাজা সম্মুখে তোমার ।
এরা সব চিরনিত্য করহ বিচার ॥
পূর্বে এরা নাহি ছিল পরে না থাকিবে ।
মূর্খের বিচার এই নিশ্চয়ই জানিবে ॥

অনুবাদ

এমন কোন সময় ছিল না যখন আমি, তুমি ও এই সমস্ত রাজারা ছিলেন না এবং ভবিষ্যতেও কখনও আমাদের অস্তিত্ব বিনষ্ট হবে না।

তাৎপর্য

বেদ, কঠ উপনিষদ ও *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে* বলা হয়েছে, কৃত কর্ম এবং তার ফল অনুসারে জীব যদিও বিভিন্ন অবস্থায় পতিত হয়, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান সর্ব অবস্থাতেই তাদের পালন করেন। সেই পরমেশ্বর ভগবান পরমাত্মারূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন। যে সমস্ত মহাত্মা অন্তরে ও বাইরে সেই একই পরমেশ্বর ভগবানকে দেখতে পান, তাঁরাই কেবল পূর্ণতা লাভ করে শাশ্বত শান্তি লাভ করতে পারেন।

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্ ।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্
তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্ ॥

(কঠ উপনিষদ ২/২/১৩)

"যিনি নিত্যের মধ্যে পরম নিত্য, চেতনের মধ্যে পরম চেতন এবং যিনি এক হয়েও সকলের কামনা পূর্ণ করেন, যাঁরা ধীর তাঁরা অন্তরের অন্তস্তলে সর্বদাই তাঁকে দর্শন করেন এবং শাশ্বত শান্তি অনুভব করেন। কিন্তু যারা তাঁর ভজন করে না, তারা কখনই তা লাভ করতে পারে না।"

এই বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান যা ভগবান অর্জুনকে দান করলেন, তা তিনি পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে দান করলেন, যারা নিজেদের মহাপণ্ডিত বলে জাহির করতে চায়, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে যারা এক-একজন মহামূর্খ। ভগবান স্পষ্টভাবে বলছেন, তিনি, অর্জুন ও সেই যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত সমস্ত রাজারা সকলেই শাশ্বত স্বতন্ত্র জীব এবং ভগবান সমস্ত জীবকে তাদের বদ্ধ ও মুক্ত উভয় অবস্থাতেই প্রতিপালন করেন। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম স্বতন্ত্র পুরুষ এবং ভগবানের নিত্য পার্ষদ অর্জুন এবং সেখানে সমবেত সমস্ত রাজারা হচ্ছেন স্বতন্ত্র শাশ্বত ব্যক্তি। এমন নয় যে, পূর্বে তাঁরা ছিলেন না এবং ভবিষ্যতে থাকবেন না। তাঁদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পূর্বে বর্তমান ছিল এবং ভবিষ্যতেও নিরবচ্ছিন্নভাবে বর্তমান থাকবে। তাই, কারও জন্য শোক করা নিতান্তই নিরর্থক।

মায়াবাদীরা বলে থাকে যে, মুক্তির পর স্বতন্ত্র আত্মা মায়ার আবরণমুক্ত হয়ে নির্বিশেষ ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যায় এবং তখন আর আত্মার নিজস্ব সত্তা থাকে না —এই মতবাদ পরম শাস্ত্রজ্ঞ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে অনুমোদন করেননি। তা ছাড়া কেবল বদ্ধদশায় আমরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অনুভব করি, সেই মতবাদও ভগবান এখানে অনুমোদন করেননি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে স্পষ্টভাবে বলছেন, ভগবানের নিজের এবং অন্য সকলের অস্তিত্ব শাশ্বত, কারও স্বতন্ত্র সত্তার বিনাশ কখনই হয় না—এই কথা *উপনিষদেও* বলা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত এই সমস্ত কথা প্রামাণিক, কারণ তিনি কখনই মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হন না। জীবের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যদি সর্ব অবস্থায় বজায় না থাকত, তবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কখনই বলতেন না যে, ভবিষ্যতেও কখনও এর বিনাশ হবে না। মায়াবাদী তার্কিকেরা বলতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের কথা বলেছেন তা চিন্ময় স্বাতন্ত্র্য নয়, তা হচ্ছে জড় স্বাতন্ত্র্য। কিন্তু এই যুক্তি মেনে নিলেও প্রশ্ন থেকে যায়, তা হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজের সম্বন্ধে যে স্বাতন্ত্র্যের কথা বলেছেন, সেটি কি ধরনের স্বাতন্ত্র্য? শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, তিনি অতীতেও ছিলেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। তিনি নানাভাবে তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিপন্ন করেছেন এবং তিনি ঘোষণা করেছেন, ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে তাঁর অঙ্গকান্তি। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অপ্রাকৃত স্বাতন্ত্র্য সব সময়ই বজায় রেখে গেছেন; যদি তাঁকেও সীমিত সাধারণ চেতনাবিশিষ্ট বদ্ধ জীবাত্মা বলে মনে করা হয়, তবে *ভগবদ্গীতাকে* কখনই পরম তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত শাস্ত্র হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না।

সীমিত জ্ঞানবিশিষ্ট, ভ্রান্তিপূর্ণ সাধারণ মানুষ কখনই পরম তত্ত্বজ্ঞানের শিক্ষা দিতে পারে না। *ভগবদ্‌গীতা* সাধারণ কাব্যগ্রন্থ নয়। সাধারণ মানুষের লেখা কোন বইয়ের সঙ্গেই *ভগবদ্‌গীতার* তুলনা করা চলে না। শ্রীকৃষ্ণকে যদি কেউ সাধারণ মানুষ বলে মনে করে, তবে তার কাছে *ভগবদ্‌গীতার* কোনই তাৎপর্য থাকতে পারে না। মায়াবাদী তার্কিকেরা বলে থাকে, প্রচলিত রীতি অনুসারে এই শ্লোকে বহুবচনের ব্যবহার করা হয়েছে এবং তা জড় দেহটিকে বোঝাচ্ছে। কিন্তু পূর্ববর্তী শ্লোকে জড় দেহগত পরিচয়কে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করার পর, প্রচলিত রীতি অনুসারে সেই জড় দেহগত পরিচয়কেই আবার অনুমোদন করা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে কি করে সম্ভব? তাই স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, অপ্রাকৃত স্তরেও জীব স্বতন্ত্র আত্মারূপে বর্তমান থাকে। এই কথা রামানুজাচার্য আদি মহৎ আচার্যেরা স্বীকার করে গেছেন। *ভগবদ্‌গীতাতে* বহু জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে, এই অপ্রাকৃত স্বাতন্ত্র্য ভগবদ্ভক্তেরা উপলব্ধি করতে পারেন। যারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ, *ভগবদ্‌গীতার* মতো মহৎ শাস্ত্রকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা তাদের নেই। ভগবদ্ভক্তিহীন মানুষের *ভগবদ্‌গীতা* পাঠ করা মৌমাছির মধুর বোতল চাটার মতোই নিরর্থক। বোতল না খুললে যেমন মধুর স্বাদ পাওয়া যায় না, তেমনই ভগবানের ভক্ত না হলে *ভগবদ্‌গীতার* অন্তর্নিহিত তত্ত্ব উপলব্ধি করা যায় না। এই কথা চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হয়েছে। ভগবানের অস্তিত্বে যে অবিশ্বাস করে, তার পক্ষে *ভগবদ্‌গীতা* স্পর্শ করাও সম্ভব নয়। তাই, মায়াবাদীরা *গীতার* যে ভাষ্য দিয়ে থাকে, তা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত এবং তা মানুষকে বিপথগামী করে। তাই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মায়াবাদীদের ভাষ্য পড়তে অথবা শুনতে নিষেধ করে গেছেন। কারণ, মায়াবাদী-ভাষ্যের দ্বারা একবার প্রভাবিত হলে *গীতার* অন্তর্নিহিত তত্ত্বকে আর উপলব্ধি করতে পারা যায় না। যদি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে উল্লেখ করে, তা হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের কোন আবশ্যকতা থাকে না। স্বতন্ত্র আত্মার বহুবচন ও ভগবান চিরন্তন সত্য এবং তা *বেদে* প্রতিপন্ন হয়েছে, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ১৩

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩ ॥

দেহিনঃ—দেহীর; **অস্মিন্**—এই; **যথা**—যেমন; **দেহে**—দেহে; **কৌমারম্**—কৌমার; **যৌবনম্**—যৌবন; **জরা**—বার্ধক্য; **তথা**—তেমনই; **দেহান্তর**—দেহান্তর; **প্রাপ্তিঃ**—লাভ হয়; **ধীরঃ**—স্থিরবুদ্ধি; **তত্র**—তাতে; **ন**—না; **মুহ্যতি**—মোহগ্রস্ত হন।

গীতার গান

দেহ দেহী ভেদ দুই নিত্যানিত্য সেই ।
কৌমার যৌবন জরা পরিবর্তন যেই ॥
দেহের স্বকার্য হয় দেহী নিত্য রহে ।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তি পণ্ডিতেরা কহে ॥

অনুবাদ

দেহীর দেহ যেভাবে কৌমার, যৌবন ও জরার মাধ্যমে তার রূপ পরিবর্তন করে চলে, মৃত্যুকালে তেমনই ঐ দেহী (আত্মা) এক দেহ থেকে অন্য কোনও দেহে দেহান্তরিত হয়। স্থিতপ্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা কখনও এই পরিবর্তনে মুহ্যমান হন না।

তাৎপর্য

যেহেতু প্রত্যেকটি জীব হচ্ছে একটি স্বতন্ত্র আত্মা, কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই প্রত্যেকেই তার দেহ পরিবর্তন করে চলেছে, তার ফলে কখনও সে শিশু, কখনও কিশোর, কখনও যুবক এবং কখনও বৃদ্ধ। এভাবে সে নানা রূপ ধারণ করছে। কিন্তু জীবের প্রকৃত সত্তা আত্মার কোনও পরিবর্তন হয় না। এক সময় দেহটি যখন অকেজো হয়ে যায়, তখন আত্মা সেই দেহ ত্যাগ করে অন্য দেহ ধারণ করে। মৃত্যুর পর জড় অথবা চিন্ময় আর একটি দেহ প্রাপ্ত হওয়া যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন ভীষ্ম দ্রোণাচার্য আদি আত্মীয়-পরিজনের জন্য শোক করা অর্জুনের পক্ষে নিতান্তই নিরর্থক। বরং, তাঁদের মৃত্যুর কথা ভেবে শোক করার পরিবর্তে তাঁর আনন্দিত হওয়া উচিত ছিল, কারণ মৃত্যু হলে তাঁরা তাঁদের জরাগ্রস্ত বৃদ্ধদেহ ত্যাগ করে নতুন দেহ প্রাপ্ত হবেন এবং নবশক্তি লাভ করবেন। পূর্বকৃত কর্মের ফল অনুসারে জীব নতুন দেহ প্রাপ্ত হয় এবং নানা রকম সুখ ও দুঃখ ভোগ করে থাকে। তাই, ভীষ্ম ও দ্রোণের মতো মহাত্মারা যে দেহত্যাগের পর জড় জগতের বন্ধনমুক্ত হয়ে ভগবৎ-ধাম বৈকুণ্ঠে ফিরে যাবেন, অথবা স্বর্গলোকে দিব্য দেহ প্রাপ্ত হয়ে নানা রকম সুখভোগ করবেন, সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সুতরাং তাঁদের মৃত্যুতে শোক করার কোনই কারণ ছিল না।

যে মানুষ জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ এবং পরা ও অপরা উভয় প্রকৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবগত, তাঁকে বলা হয় ধীর। এই প্রকার মানুষ জড় দেহের পরিবর্তনের জন্য কখনও শোক করেন না।

আত্মাকে খণ্ড খণ্ড অংশে বিভক্ত করা যায় না এই যুক্তিতে, আত্মা ও পরমাত্মার একত্ব সম্বন্ধে মায়াবাদীদের যে মতবাদ, তা গ্রহণযোগ্য নয়। পরমাত্মাকে খণ্ড খণ্ড করে বিভক্ত করার ফলে যদি জীবাত্মার উদ্ভব হত, তবে পরমাত্মা হতেন পরিবর্তনশীল। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত পরমাত্মা যে অপরিবর্তনীয় তার পরিপন্থী। *গীতাতে* ভগবান বলেছেন, পরমেশ্বরের অংশ জীবাত্মা সনাতন এবং তাকে বলা হয় *ক্ষর*; অর্থাৎ, তার জড়া প্রকৃতিতে পতিত হবার প্রবণতা থাকে। জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশ এবং জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হবার পরেও সে পরমাত্মার অংশরূপেই বর্তমান থাকে। তবে মুক্ত হবার পর সে সৎ, চিৎ ও আনন্দময় দেহপ্রাপ্ত হয়ে ভগবৎ-ধামে ভগবানের সাহচর্য লাভ করে। জলে যখন আকাশের প্রতিফলন দেখা যায়, তখন তাতে সূর্য, চন্দ্র, এমন কি তারাদেরও পর্যন্ত দেখা যায়। তারাগুলিকে জীবাত্মার সঙ্গে তুলনা করা চলে এবং সূর্য অথবা চন্দ্রকে পরমেশ্বরের সঙ্গে তুলনা করা চলে। অর্জুন হচ্ছেন স্বতন্ত্র অণুচৈতন্য-বিশিষ্ট জীবাত্মা এবং বিভুচৈতন্য পরমাত্মা হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। জীবাত্মা ও পরমাত্মা সমপর্যায়ভুক্ত নয়, চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমেই তা আমরা দেখতে পাব। অর্জুন যদি শ্রীকৃষ্ণের সমপর্যায়ভুক্ত হতেন এবং শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের ঊর্ধ্বতন না হতেন তা হলে তাঁদের মধ্যে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক গড়ে ওঠা কখনই সম্ভব হত না। তাঁরা দুজনেই যদি মায়ার দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হতেন, তা হলে একজন উপদেষ্টা এবং অন্য জন উপদেশ গ্রহণকারী হওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। এই প্রকার উপদেশ অর্থহীন হয়ে পড়ে, কারণ মায়ায় কবলিত কেউ প্রামাণিক উপদেষ্টা হতে পারে না। এই অবস্থান আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, যিনি জীব থেকে অতি ঊর্ধ্বে অবস্থিত আর অর্জুন হচ্ছে বিস্মরণশীল আত্মা, যে মায়ার দ্বারা মোহিত।

শ্লোক ১৪

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪ ॥

মাত্রাস্পর্শাঃ—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি; **তু**—কেবল; **কৌন্তেয়**—হে কুন্তীপুত্র; **শীত**—শীত; **উষ্ণ**—গ্রীষ্ম; **সুখ**—সুখ; **দুঃখদাঃ**—দুঃখদায়ক; **আগম**—আসে; **অপায়িনঃ**—চলে যায়; **অনিত্যাঃ**—অস্থায়ী; **তান্**—সেগুলিকে; **তিতিক্ষস্ব**—সহ্য করার চেষ্টা কর; **ভারত**—হে ভারত।

গীতার গান

শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ ইন্দ্রিয় বিকার ।
ইন্দ্রিয়ের দাস যারা তাহে অধিকার ॥
যে সব অনিত্য বস্তু আসি চলি যায় ।
সহিষ্ণুতা মাত্র গুণ তাহার উপায় ॥

অনুবাদ

হে কৌন্তেয়! ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগের ফলে অনিত্য সুখ ও দুঃখের অনুভব হয়। সেগুলি ঠিক যেন শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুর গমনাগমনের মতো। হে ভরতকুল-প্রদীপ! সেই ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতির দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সেগুলি সহ্য করার চেষ্টা কর।

তাৎপর্য

মানব জীবনের প্রকৃত কর্তব্য সম্পাদন করতে হলে মানুষকে সহনশীলতার মাধ্যমে বুঝতে হবে, সুখ ও দুঃখ কেবল ইন্দ্রিয়ের বিকার মাত্র। শীতের পর যেমন গ্রীষ্ম আসে, তেমনই পর্যায়ক্রমে সুখ ও দুঃখ আসে। সত্যকে উপলব্ধি করে দুঃখে ও সুখে অবিচলিত থাকাই মানুষের কর্তব্য। *বেদে* নির্দেশ দেওয়া আছে, খুব সকালে স্নান করা উচিত। যে শাস্ত্রের অনুশাসন মেনে চলে, সে মাঘ মাসের প্রচণ্ড শীতেও খুব ভোরে স্নান করতে ইতস্তত করে না। তেমনই, গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গরমেও গৃহিণীরা রান্না করা থেকে বিরত থাকেন না। আবহাওয়া জনিত অসুবিধা সত্ত্বেও মানুষকে তার কর্তব্যকর্ম করে যেতেই হয়। তেমনই, যুদ্ধ করাটাই হচ্ছে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম এবং কর্তব্যের খাতিরে তাকে যদি তার আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গেও যুদ্ধ করতে হয়, তবুও সে তার কর্তব্যকর্ম থেকে বিরত হতে পারে না। শাস্ত্র-নির্ধারিত অনুশাসন মেনে চলাটাই হচ্ছে সভ্য মানুষের লক্ষণ। এই অনুশাসন মেনে চলার ফলে মানুষের বুদ্ধিমত্তার বিকাশ হয় এবং সে তখন ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়। এই জ্ঞানের প্রভাবে তার হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির সঞ্চার হয় এবং ভগবানের প্রতি তার এই আন্তরিক ভক্তি তাকে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করে।

এই শ্লোকে অর্জুনকে *কৌন্তেয়* ও *ভারত* নামে সম্বোধন করাটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁকে কৌন্তেয় নামে সম্বোধন করার মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মাতৃকুলের মহান রক্তের সম্পর্ক স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং *ভারত* নামে সম্বোধন করে তাঁর পিতৃকুলের মহত্ত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। উভয় দিক থেকে তিনি সুমহান বংশজাত ছিলেন। মহৎ বংশে জাত পুরুষ কখনই তাঁর কর্তব্যকর্ম থেকে বিচ্যুত হন না। তাই, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে জানিয়ে দিলেন, তাঁর বংশ-গৌরবের কথা স্মরণ করে তাঁকে যুদ্ধ করতেই হবে।

শ্লোক ১৫

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫ ॥

যম্—যে; **হি**—অবশ্যই; **ন**—না; **ব্যথয়ন্তি**—বিচলিত হন; **এতে**—এই সমস্ত; **পুরুষম্**—ব্যক্তিকে; **পুরুষর্ষভ**—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ; **সম**—অপরিবর্তিত; **দুঃখ**—দুঃখ; **সুখম্**—সুখ; **ধীরম্**—সহিষ্ণু; **সঃ**—তিনি; **অমৃতত্বায়**—মুক্তি লাভের; **কল্পতে**—যোগ্য হয়।

গীতার গান

ব্যথা নাহি দেয় যারে অনিত্য এইসব ।
সেজন বুঝিল জান পুরুষার্থ বৈভব ॥
সমদুঃখ সুখধীর অনিত্য ব্যাপারে ।
অমরত্ব সেই পায় জিতিয়া সংসারে ॥

অনুবাদ

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ (অর্জুন)! যে জ্ঞানী ব্যক্তি সুখ ও দুঃখকে সমান জ্ঞান করেন এবং শীত ও উষ্ণ আদি দ্বন্দ্বে বিচলিত হন না, তিনিই মুক্তি লাভের প্রকৃত অধিকারী।

তাৎপর্য

যে মানুষ সুখে-দুঃখে সম্পূর্ণ অবিচলিত থেকে তাঁর পারমার্থিক উন্নতি সাধন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, তিনি অনায়াসে এই ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভের যোগ্য হন।

বর্ণাশ্রম-ধর্মের চতুর্থ আশ্রম সন্ন্যাস অত্যন্ত কষ্টসাপেক্ষ পথ। কিন্তু যে মানুষ তাঁর জীবনকে সার্থক করে তুলতে চান, তিনি সমস্ত রকম অসুবিধা সত্ত্বেও এই সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন না। সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করলে মানুষকে তার সব রকম পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করতে হয়। স্ত্রী, পুত্র, পরিজনের এই বন্ধনমুক্ত হওয়া খুবই কষ্টকর। কিন্তু যিনি এই বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন, নিঃসন্দেহে তাঁর পারমার্থিক জীবন সার্থক হয়ে ওঠে এবং অচিরেই তিনি ভগবৎ-দর্শন লাভ করেন। ঠিক তেমনই, অর্জুনকে তাঁর ক্ষাত্রধর্ম পালন করার উপদেশ দিয়ে ভগবান তাঁকে বললেন, এই ধর্মযুদ্ধে তাঁর আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে যুদ্ধ করা যদিও অত্যন্ত দুঃখদায়ক এবং কষ্টসাপেক্ষ, কিন্তু তবুও তাঁর কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করবার জন্য তাঁর দেহজাত আত্মীয়তার বন্ধন থেকে তাঁকে মুক্ত হতে হবে এবং যুদ্ধ করতে হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চব্বিশ বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, ঘরে তখন তাঁর যুবতী স্ত্রী এবং বৃদ্ধা মাতা ছিলেন। তাঁদের দেখাশোনা করার জন্য কেউই ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও, মহত্তর উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য তিনি তাঁদের পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস-ধর্ম গ্রহণ করেন। মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হবার এই হচ্ছে উপায়।

শ্লোক ১৬

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬ ॥

ন—না; **অসতঃ**—অনিত্য বস্তুর; **বিদ্যতে**—হয়; **ভাবঃ**—স্থায়িত্ব; **ন**—না; **অভাবঃ**—বিনাশ; **বিদ্যতে**—হয়; **সতঃ**—নিত্য বস্তুর; **উভয়োঃ**—উভয়ের; **অপি**—যথার্থই; **দৃষ্টঃ**—দর্শন করে; **অন্তঃ**—সিদ্ধান্ত; **তু**—কিন্তু; **অনয়োঃ**—তাদের; **তত্ত্ব**—সত্য; **দর্শিভিঃ**—দ্রষ্টাদের দ্বারা।

গীতার গান

অসৎ শরীর এই সত্ত্বা নাহি তার ।
নিত্যসত্য জীব হয় মৃত্যু নাহি যার ॥
উভয় বিচার করি করিল নিশ্চিত ।
তত্ত্বদর্শী সেই কহে যেই হয় হিত ॥

অনুবাদ

যাঁরা তত্ত্বদ্রষ্টা তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে অনিত্য জড় বস্তুর স্থায়িত্ব নেই এবং নিত্য বস্তু আত্মার কখনও বিনাশ হয় না। তাঁরা উভয় প্রকৃতির যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

তাৎপর্য

প্রতি মুহূর্তে এই জড় দেহের পরিবর্তন হচ্ছে—এই দেহের কোনই স্থায়িত্ব নেই। আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সাহায্যেও জানা যায়, বিভিন্ন জীবকোষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে প্রতি মুহূর্তে জীবদেহের অবিরাম পরিবর্তন হচ্ছে, তার ফলে জীবদেহ শিশু অবস্থা থেকে ক্রমে ক্রমে পূর্ণ যৌবনে বিকশিত হয় এবং অবশেষে বৃদ্ধ অবস্থায় উপনীত হয়। কিন্তু দেহ ও মনের সব রকম পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও জীবের প্রকৃত সত্তা আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না। জড় দেহ ও সনাতন আত্মার মধ্যে এটিই হচ্ছে পার্থক্য। দেহের প্রকৃতিই হচ্ছে চির-পরিবর্তনশীল আর আত্মা হচ্ছে চিরশাশ্বত—সনাতন। এই সিদ্ধান্ত নির্বিশেষবাদী ও সবিশেষবাদী উভয় শ্রেণীর তত্ত্বদ্রষ্টারা স্বীকার করেছেন। *বিষ্ণু পুরাণে* (২/১২/৩৮) বলা হয়েছে, শ্রীবিষ্ণু ও তাঁর ধামসকল স্বতঃস্ফূর্ত চিন্ময় জ্যোতির দ্বারা উদ্ভাসিত (*জ্যোতীংষি বিষ্ণুর্ভুবনানি বিষ্ণুঃ*)। তত্ত্বদর্শী মহাজনেরা যথাক্রমে সৎ, অসৎ—নিত্য ও অনিত্য বলতে চেতন ও জড় বস্তুকেই উল্লেখ করেন।

মায়ার দ্বারা মোহাচ্ছন্ন বদ্ধ জীবের প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এটিই হচ্ছে সর্বপ্রথম উপদেশ। জীব হচ্ছে ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই সে ভগবানের নিত্যদাস। এই জ্ঞান উপলব্ধি করা হলেই অজ্ঞানতার আবরণ উন্মোচিত হয় এবং সে তখন ভগবানের সঙ্গে উপাস্য আর উপাসকের সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। পূর্ণের সঙ্গে অংশের যে সম্পর্ক, ভগবানের সঙ্গে জীবের সেই সম্পর্ক—ভগবান হচ্ছেন পূর্ণ, আর জীব তাঁর অংশ। *বেদান্তসূত্র* ও *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে, ভগবান হচ্ছেন সব কিছুর উৎস—সব কিছুই উদ্ভূত হয়েছে ভগবানের থেকে। ভগবানের থেকে উদ্ভূত এই প্রকৃতিতে পরা ও অপরা এই দুটি স্তর আছে। জীব ভগবানের পরা প্রকৃতির অন্তর্গত। সপ্তম অধ্যায়ে এই সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যদিও কোন ভেদ নেই, তবুও শক্তিমান হচ্ছেন শক্তির নিয়ন্তা। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন শক্তিমান এবং শক্তি বা প্রকৃতি সর্ব অবস্থাতেই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই, প্রভু ও ভৃত্য অথবা গুরু ও শিষ্যের সম্পর্কের মতো জীবসমূহ পরমেশ্বর ভগবানের অধীন। মায়ার অন্ধকারে যখন জীব আচ্ছন্ন থাকে,

তখন সে ভগবৎ-তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারে না। ভগবান তাই জীবকে মায়ান্ধকার থেকে মুক্ত হয়ে সত্য দর্শন করাবার জন্য এই *ভগবদ্গীতার* শিক্ষা দান করেছেন।

শ্লোক ১৭

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্ ।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি ॥ ১৭ ॥

অবিনাশি—বিনাশ রহিত; **তু**—কিন্তু; **তৎ**—তা; **বিদ্ধি**—জানবে; **যেন**—যার দ্বারা; **সর্বম্**—সমগ্র শরীর; **ইদম্**—এই; **ততম্**—ব্যাপ্ত; **বিনাশম্**—বিনাশ; **অব্যয়স্য**—অক্ষয়ের; **অস্য**—এই; **ন কশ্চিৎ**—কেউ নয়; **কর্তুম্**—করতে; **অর্হতি**—সমর্থ।

গীতার গান

অবিনাশী সেই বুঝ সর্বত্র বিস্তার ।
যাহার অভাবে হয় দেহ মহাভার ॥
ক্ষয়ব্যয় নাহি যার কে মারিতে পারে ।
অমরের মার কিবা করহ বিচার ॥

অনুবাদ

যা সমগ্র শরীরে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে, তাকে তুমি অবিনাশী বলে জানবে। সেই অব্যয় আত্মাকে কেউ বিনাশ করতে সক্ষম নয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে আরও স্পষ্টভাবে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই আত্মা সারা দেহ জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে। যে-কেউ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, সমগ্র দেহ জুড়ে কি বিস্তৃত হয়ে আছে—সেটি হচ্ছে চেতনা। প্রত্যেকেই তার দেহের সুখ ও বেদনা সম্বন্ধে সচেতন। চেতনার এই বিস্তার প্রত্যেকের তার নিজের দেহেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু একজনের দেহের অনুভূতি অন্য আর কেউ অনুভব করতে পারে না। এর থেকে বোঝা যায়, এক-একটি দেহ হচ্ছে এক-একটি স্বতন্ত্র আত্মার মূর্তরূপ এবং স্বতন্ত্র চেতনার মাধ্যমে আত্মার উপস্থিতির লক্ষণ অনুভূত হয়। এই আত্মার আয়তন কেশাগ্রের দশ সহস্র ভাগের একভাগের সমান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে* (৫/৯) প্রতিপন্ন করা হয়েছে—

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥

"কেশাগ্রকে শতভাগে ভাগ করে তাকে আবার শতভাগে ভাগ করলে তার যে আয়তন হয়, আত্মার আয়তনও ততখানি।" সেই রকম অনুরূপ একটি শ্লোকে বলা হয়েছে—

কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশসদৃশাত্মকঃ ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ ॥

"অসংখ্য যে চিৎকণা রয়েছে, তার আয়তন কেশাগ্রের দশ সহস্র ভাগের এক ভাগের সমান।"

সুতরাং, এর থেকে আমরা বুঝতে পারি, জীবাত্মা হচ্ছে এক-একটি চিৎকণা, যার আয়তন পরমাণুর থেকেও অনেক ছোট এবং এই জীবাত্মা বা চিৎকণা সংখ্যাতীত। এই অতি সূক্ষ্ম চিৎকণাগুলি জড় দেহের ও চেতনার মূল তত্ত্ব। কোন ওষুধের প্রভাব যেমন দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, এই চিৎ-স্ফুলিঙ্গের প্রভাবও তেমনই সারা দেহ জুড়ে বিস্তৃত থাকে। আত্মার এই প্রবাহ চেতনারূপে সমগ্র দেহে অনুভূত হয় এবং সেটিই হচ্ছে আত্মার উপস্থিতির প্রমাণ। সাধারণ মানুষও বুঝতে পারে, জড় দেহে যখন চেতনা থাকে না, তখন তা মৃত দেহে পরিণত হয় এবং কোন রকম জড় প্রচেষ্টার দ্বারাই আর সেই দেহে চেতনা ফিরিয়ে আনা যায় না। এর থেকে বোঝা যায়, চেতনার উদ্ভব জড় পদার্থের সংমিশ্রণের ফলে হয় না, তা হয় আত্মার থেকে। চেতনা হচ্ছে আত্মার স্বাভাবিক প্রকাশ। আত্মার পারমাণবিক পরিমাপ সম্বন্ধে *মুণ্ডক উপনিষদে* (৩/১/৯) বলা হয়েছে—

এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ ।
প্রাণৈশ্চিত্তং সর্বমোতং প্রজানাং যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা ॥

"আত্মা পরমাণুসদৃশ এবং শুদ্ধ বুদ্ধিমত্তার দ্বারা তাকে অনুভব করা যায়। পরমাণুসদৃশ এই আত্মা পঞ্চবিধ বায়ুতে (প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান) ভাসমান থেকে হৃদয়ে অবস্থান করে এবং জীবাত্মার সমগ্র দেহে তার প্রভাব বিস্তার করে। আত্মা যখন এই পঞ্চবিধ জড় বায়ুর কলুষিত প্রভাব থেকে পবিত্র হয়, তখন তার অপ্রাকৃত গুণাবলীর প্রকাশ হয়।"

হঠযোগের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন আসন প্রণালী অভ্যাস করার মাধ্যমে জড় পরিবেশের বন্ধন থেকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আত্মাকে মুক্ত করার জন্য আত্মার চারদিকে

পরিবেষ্টিত পঞ্চবিধ বায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, দেহতত্ত্বের এই অতি উন্নত বিজ্ঞানকে তথাকথিত হঠযোগীরা এক অতি বিকৃত রূপ দান করে জাগতিক সুখভোগ ও ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনায় প্রয়োগ করছে।

সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রেই বলা হয়েছে, জীবাত্মা পরমাণুসদৃশ। সুস্থ বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন যে কোন মানুষই উপলব্ধি করতে পারে যে, আত্মা হচ্ছে পরমাণুসদৃশ চিৎকণা। যারা বলে থাকে যে, জীবাত্মাই হচ্ছে সর্বব্যাপ্ত বিষ্ণুতত্ত্ব, অতি সহজেই বোঝা যায় যে, তারা বিকৃত মস্তিষ্কসম্পন্ন—অপ্রকৃতিস্থ মানুষ।

পরমাণু চৈতন্যবিশিষ্ট জীবাত্মা কোন একটি বিশেষ দেহের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হতে পারে, কিন্তু জীবাত্মা কোন অবস্থাতেই সর্বব্যাপ্ত বিষ্ণুতত্ত্ব হতে পারে না। *মুণ্ডক উপনিষদে* বলা হয়েছে, প্রতিটি জীবের হৃদয়ে জীবাত্মা বর্তমান থাকে, কিন্তু এই আত্মা এত সূক্ষ্ম যে, জড় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তা দেখা যায় না। বর্তমান যুগে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও এই অতি সূক্ষ্ম আত্মা মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না। তাই আধুনিক যুগের তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা হঠকারিতা করে আত্মার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। কিন্তু একটু সুস্থ-মস্তিষ্কে চিন্তা করলেই আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সমস্ত সন্দেহের নিরসন হয়। কারণ জীবের হৃদয়ে আত্মার সঙ্গে একসাথে অধিষ্ঠিত থেকে পরমাত্মাই জীবকে পরিচালিত করেন। তাই আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায়, জীবদেহের সমস্ত কার্যকলাপ হৃদয়ের দ্বারা পরিচালিত হয়। যে সমস্ত রক্তকণিকা ফুসফুস থেকে অক্সিজেন বহন করে, তারা তাদের শক্তি আহরণ করে আত্মা থেকে। আত্মা যখন জড় দেহ ত্যাগ করে চলে যায়, তখন রক্ত সঞ্চালন, শ্বাস-প্রশ্বাস আদি দেহের সমস্ত ক্রিয়াগুলিই বন্ধ হয়ে যায়। চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা রক্তকণিকার এই গুরুত্ব স্বীকার করে থাকে, কিন্তু সমস্ত শক্তির উৎস যে আত্মা, তা তারা বুঝতে পারে না। কিন্তু তা হলেও তারা স্বীকার করে যে, হৃদয়ই হচ্ছে দেহের সমস্ত শক্তির কেন্দ্রস্থল।

আত্মার এই পারমাণবিক চিৎ-কণাগুলিকে সূর্যকিরণের অণুর সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে। সূর্যকিরণের মধ্যে অসংখ্য প্রভাময় অণু আছে। সেই রকম, পরমেশ্বর ভগবানের বিচ্ছুরিত চিৎকণাগুলি পরমেশ্বরের জ্যোতির পারমাণবিক কণাস্বরূপ—যাকে বলা হয় *প্রভা* অর্থাৎ উৎকৃষ্টা শক্তি। সুতরাং, বৈদিক তত্ত্ববিজ্ঞান কিংবা আধুনিক বিজ্ঞান, যা কিছুই অনুসরণ করা যাক, দেহের মধ্যে আত্মার অস্তিত্ব কেউ অস্বীকার করতে পারে না। আত্মা সম্পর্কিত এই বৈজ্ঞানিক তথ্য পরম পুরুষোত্তম ভগবান স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ১৮

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮ ॥

অন্তবন্তঃ—বিনাশশীল; **ইমে**—এই সমস্ত; **দেহাঃ**—জড় দেহসকল; **নিত্যস্য**—নিত্যস্থায়ী; **উক্তাঃ**—বলা হয়; **শরীরিণঃ**—দেহী আত্মার; **অনাশিনঃ**—অবিনাশী; **অপ্রমেয়স্য**—অপরিমেয়; **তস্মাৎ**—অতএব; **যুধ্যস্ব**—যুদ্ধ কর; **ভারত**—হে ভরত-বংশীয়।

গীতার গান

নিঃশেষ হইয়া যাবে এই জড় দেহ ।
নিত্য আত্মা জান ভাল না মরিবে কেহ ॥
বিনাশি প্রমেয় নহে আত্মা ভাল মতে ।
সত্য বুঝি দৃঢ়ব্রত হও ত' যুদ্ধেতে ॥

অনুবাদ

অবিনাশী, অপরিমেয় ও শাশ্বত আত্মার জড় দেহ নিঃসন্দেহে বিনাশশীল। অতএব হে ভারত। তুমি শাস্ত্রবিহিত স্বধর্ম পরিত্যাগ না করে যুদ্ধ কর।

তাৎপর্য

জড় দেহের ধর্মই হচ্ছে বিনাশ প্রাপ্ত হওয়া। জড় দেহ এই মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, নয়তো একশ বছর পরে ধ্বংস হতে পারে, কিন্তু একদিন না একদিন এর ধ্বংস হবেই। অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত আত্মাকে টিকিয়ে রাখার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু আত্মা এত সূক্ষ্ম যে, তাকে দেখাই যায় না, সুতরাং কোন শত্রুই তাকে হত্যা করতে পারে না। পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, আত্মা এত সূক্ষ্ম যে, তাকে পরিমাপ করাও অসম্ভব। সুতরাং দেহ ও আত্মা এই দুই তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে জীবের স্বরূপ বিচার করলে তখন আর কোন অনুশোচনা থাকতে পারে না, কারণ মানুষের প্রকৃত স্বরূপ আত্মা চিরশাশ্বত এবং কোন অবস্থাতেই তার বিনাশ হয় না, আর জড় দেহ হচ্ছে অনিত্য, একদিন না একদিন যখন তার ধ্বংস হবেই, তখন কোনভাবেই অনির্দিষ্ট কালের জন্য অথবা চিরকালের জন্য দেহটিকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে সমগ্র আত্মার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র

অংশ এক-একটি জড় দেহ প্রাপ্ত হয়। সেই জন্যই শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে জীবনযাপন করা উচিত। শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে কর্তব্যকর্ম অনুষ্ঠান করার ফলে উপযুক্ত দেহ প্রাপ্ত হয়ে জীবাত্মা জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। *বেদান্ত-সূত্রে* আত্মাকে আলোক বলে সম্বোধন করা হয়েছে, কারণ সে হচ্ছে পরম আলোকের অংশ। সূর্যের আলোক যেমন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে প্রতিপালন করে, তেমনই আত্মার আলোকও জড় দেহকে প্রতিপালন করে। যে মুহূর্তে আত্মা তার দেহটি পরিত্যাগ করে, তখন থেকেই সেই দেহটি পচতে শুরু করে। এর থেকে বোঝা যায়, আত্মাই এই দেহটিকে প্রতিপালন করে। দেহে আত্মা থাকে বলেই দেহটিকে এত সুন্দর বলে মনে হয়, কিন্তু আত্মা ব্যতীত দেহের কোনই গুরুত্ব নেই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছিলেন, দেহাত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করে ধর্ম সংস্থাপনের জন্য যুদ্ধ করতে।

শ্লোক ১৯

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্ ।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ১৯ ॥

যঃ—যিনি; **এনম্**—একে; **বেত্তি**—জানেন; **হন্তারম্**—হন্তা; **যঃ**—যিনি; **চ**—এবং; **এনম্**—একে; **মন্যতে**—মনে করেন; **হতম্**—নিহত; **উভৌ**—উভয়ে; **তৌ**—তাঁরা; **ন**—না; **বিজানীতঃ**—জানেন; **ন**—না; **অয়ম্**—এই; **হন্তি**—হত্যা করেন; **ন**—না; **হন্যতে**—নিহত হন।

গীতার গান

যে জন বুঝেছে আত্মা মরে যেতে পারে ।
অথবা যে জন বুঝে আত্মা অন্যে মারে ॥
উভয়েই ভ্রমাত্মক কিছু নাহি বুঝে ।
মরে না মারে না আত্মা জান যুদ্ধ যুঝে ॥

অনুবাদ

যিনি জীবাত্মাকে হন্তা বলে মনে করেন কিংবা যিনি একে নিহত বলে ভাবেন, তাঁরা উভয়েই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ জানেন না। কারণ আত্মা কাউকে হত্যা করেন না এবং কারও দ্বারা নিহতও হন না।

তাৎপর্য

যখন কোন দেহধারী জীব মারাত্মক অস্ত্রের দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয়, তখন জানতে হবে যে, দেহের মধ্যে আত্মার মৃত্যু হয় না। আত্মা তখন আর সেই দেহে বাস করতে পারে না। বাস করার অনুপযোগী বলে আত্মা তখন সেই দেহটি ত্যাগ করে। যারা মুর্খ, তারা আত্মার এই দেহত্যাগ করাকে আত্মার মৃত্যু বলে মনে করে। কিন্তু পরবর্তী শ্লোকে আমরা জানতে পারব—আত্মা এত সূক্ষ্ম যে, কোন অস্ত্রের দ্বারাই তাকে হত্যা করা সম্ভব নয়। আর তা ছাড়া আত্মা চিরশাশ্বত ও চিন্ময় হবার ফলে, কোন অবস্থাতেই তার বিনাশ হয় না। যার মৃত্যু হয় অথবা মৃত্যু হয়েছে বলে মনে হয়, তা হচ্ছে জড় দেহটি মাত্র। অবশ্য তা বলতে এটি বোঝায় না যে, দেহটিকে হত্যা করলে কোন অন্যায় হয় না। *বেদে* নির্দেশ দেওয়া আছে, *মা হিংস্যাৎ সর্বা ভূতানি*—কোন জীবের প্রতি হিংসা করো না। কোনও জীবের আত্মিক সত্তাকে হত্যা করা যায় না, এই উপলব্ধি হওয়ার ফলে প্রাণিহত্যায় উৎসাহ লাভ করা উচিত নয়। বিনা কারণে অন্যায়ভাবে যখন পশু হত্যা করা হয়, তখন তাতে অবশ্যই পাপ হয়। অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করলে যেমন রাষ্ট্রের আইন অনুসারে হত্যাকারী শাস্তি পায়, ভগবানের আইনেও তেমনই তার জন্য শাস্তি পেতে হয়। সনাতন-ধর্মকে রক্ষা করার জন্য ভগবান অবশ্য অর্জুনকে যুদ্ধ করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, তিনি কখনই অর্জুনকে তাঁর খেয়ালখুশি মতো হত্যা করতে আদেশ দেননি।

শ্লোক ২০

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০ ॥

ন—না; **জায়তে**—জন্ম হয়; **ম্রিয়তে**—মৃত্যু হয়; **বা**—অথবা; **কদাচিৎ**—কখনও (অতীত, বর্তমান অথবা ভবিষ্যতে), **ন**—না; **অয়ম্**—এই; **ভূত্বা**—উৎপন্ন হয়ে; **ভবিতা**—উৎপন্ন হবে; **বা**—অথবা; **ন**—না; **ভূয়ঃ**—উৎপন্ন হয়েছে; **অজঃ**—জন্মরহিত; **নিত্যঃ**—নিত্য; **শাশ্বতঃ**—চিরস্থায়ী; **অয়ম্**—এই; **পুরাণঃ**—পুরাতন; **ন**—না; **হন্যতে**—নিহত হয়; **হন্যমানে**—হত হলেও; **শরীরে**—দেহ।

গীতার গান

জনম মরণ নাই, হয় নাই, হবে নাই,
হয়েছিল তাহা নহে আত্মা ।
অজ নিত্য শাশ্বত, পুরাতন নিত্যসত্য,
শরীরের নাশ নহে মৃত্যু ॥

অনুবাদ

আত্মার কখনও জন্ম হয় না বা মৃত্যু হয় না, অথবা পুনঃ পুনঃ তাঁর উৎপত্তি বা বৃদ্ধি হয় না। তিনি জন্মরহিত, শাশ্বত, নিত্য এবং পুরাতন হলেও চিরনবীন। শরীর নষ্ট হলেও আত্মা কখনও বিনষ্ট হয় না।

তাৎপর্য

গুণগতভাবে পরমাত্মা ও তাঁর পরমাণুসদৃশ অংশ জীবাত্মার মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। জড় দেহের যেমন পরিবর্তন হয়, আত্মার তেমন কোন পরিবর্তন হয় না। তাই আত্মাকে বলা হয় কূটস্থ, অর্থাৎ কোন কালে, কোন অবস্থায় তার কোন পরিবর্তন হয় না। জড় দেহে ছয় রকমের পরিবর্তন দেখা যায়। মাতৃগর্ভে তার জন্ম হয়, তার বৃদ্ধি হয়, কিছুকালের জন্য স্থায়ী হয়, তা কিছু ফল প্রসব করে, ক্রমে ক্রমে তা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং অবশেষে তার বিনাশ হয়। আত্মার কিন্তু এই রকম কোন পরিবর্তনই হয় না। আত্মার কখনও জন্ম হয় না, কিন্তু, যেহেতু সে জড় দেহ ধারণ করে, তাই সেই দেহটির জন্ম হয়। যার জন্ম হয়, তার মৃত্যু অবধারিত। এটিই প্রকৃতির নিয়ম। তেমনই আবার, যার জন্ম হয় না তার কখনই মৃত্যু হতে পারে না। আত্মার কখনও জন্ম হয় না, তাই তার মৃত্যুও হয় না, আর সেই জন্য তার অতীত, বর্তমান অথবা ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। সে নিত্য, শাশ্বত ও পুরাতন, অর্থাৎ কবে যে তার উদ্ভব হয়েছিল তার কোনও ইতিহাস নেই। আমরা দেহ-চেতনার দ্বারা প্রভাবিত, তাই আমরা আত্মার জন্ম-ইতিহাস খুঁজে থাকি। কিন্তু যা নিত্য, শাশ্বত, তার তো কোনও শুরু থাকতে পারে না। দেহের মতো আত্মা কখনও জরাগ্রস্ত হয় না। তাই, বৃদ্ধ অবস্থাতেও মানুষ তার অন্তরে শৈশব অথবা যৌবনের উদ্যমতা অনুভব করে। দেহের পরিবর্তন কখনই আত্মাকে প্রভাবিত করে না। জড় দেহের মতো আত্মার কখনও ক্ষয় হয় না। দেহের মাধ্যমে যেমন সন্তান-সন্ততি উৎপন্ন হয়, আত্মা কখনও তেমনভাবে অন্য কোনও আত্মা উৎপাদন করে না। দেহজাত সন্তান-সন্ততিরা প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন ভিন্ন

আত্মা। স্ত্রী-পুরুষের দেহের মিলনের ফলে আত্মা নতুন দেহ প্রাপ্ত হয় বলে, সেই আত্মাকে কোন বিশেষ স্ত্রী-পুরুষের সন্তান বলে মনে হয়। আত্মার উপস্থিতির ফলে দেহের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু আত্মার কখনও বৃদ্ধি বা কোন রকম পরিবর্তন হয় না। এভাবেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি, দেহে যে ছয় রকমের পরির্তন হয়, আত্মা তার দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

কঠ উপনিষদেও (১/২/১৮)*গীতার* এই শ্লোকের মতো একটি শ্লোক আছে—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥

এই শ্লোকটির সঙ্গে *ভগবদ্গীতার* শ্লোকটির পার্থক্য কেবল এখানে *বিপশ্চিৎ* শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে জ্ঞানী অথবা জ্ঞানের সহিত।

আত্মা পূর্ণ জ্ঞানময়, অথবা সে সর্বদাই পূর্ণচেতন। তাই, চেতনাই হচ্ছে আত্মার লক্ষণ। এমন কি আত্মাকে হৃদয়ের মধ্যে দেখা না গেলেও চেতনার প্রকাশের মধ্যে দিয়ে তার উপস্থিতি অনুভব করা যায়। অনেক সময় মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে যাবার ফলে অথবা অন্য কোন কারণে সূর্যকে দেখা যায় না, কিন্তু সূর্যের আলো সর্বদাই সেখানে রয়েছে এবং আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, এখন দিনের বেলা। ভোরের আকাশে যখনই একটু আলোর আভাস দেখতে পাওয়া যায়, তখনই আমরা বুঝতে পারি, আকাশে সূর্যের উদয় হচ্ছে। ঠিক তেমনই, মানুষই হোক বা পশুই হোক, কীট-পতঙ্গই হোক বা উদ্ভিদই হোক, একটুখানি চেতনার বিকাশ দেখতে পেলেই আমরা তাদের মধ্যে আত্মার উপস্থিতি অনুভব করতে পারি। আত্মার সচেতনতা ও পরমাত্মার সচেতনতার মধ্যে অবশ্য অনেক পার্থক্য রয়েছে, কারণ পরমাত্মা হচ্ছেন সর্বজ্ঞ। তিনি সর্ব অবস্থায় ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে অবগত। স্বতন্ত্র জীবের চেতনা বিস্মৃতিপ্রবণ, সে যখন তার সচ্চিদানন্দময় স্বরূপের কথা ভুলে যায়, তখন সে শ্রীকৃষ্ণের পরম উপদেশ থেকে শিক্ষা ও আলোক প্রাপ্ত হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বিস্মরণশীল জীবের মতো নন। যদি তাই হত, কৃষ্ণের *ভগবদ্গীতার* উপদেশাবলী অর্থহীন হয়ে পড়ত।

আত্মা দুই রকমের—অণু আত্মা ও পরমাত্মা বা বিভু-আত্মা। *কঠ উপনিষদে* (১/২/২০) তার বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ান্ আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্ ।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ ॥

"পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়েই বৃক্ষসদৃশ জীবদেহের হৃদয়ে অবস্থিত। যিনি সব রকম জড় বাসনা ও সব রকমের শোক থেকে মুক্ত হতে পেরেছেন, তিনি কেবল ভগবানের কৃপার ফলে আত্মার মহিমা উপলব্ধি করতে পারেন।" ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমাত্মারও উৎস, যা পরবর্তী অধ্যায়ে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হবে। আর অর্জুন হচ্ছেন তাঁর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে আত্মবিস্মৃত জীবাত্মা; তাই তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে অথবা তাঁর সুযোগ্য প্রতিনিধি সদ্গুরুর কাছ থেকে এই পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে হয়।

শ্লোক ২১

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্ ।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥ ২১ ॥

বেদ—জানেন; **অবিনাশিনম্**—অবিনাশী; **নিত্যম্**—সর্বদা বর্তমান; **যঃ**—যিনি; **এনম্**—এই (আত্মাকে); **অজম্**—জন্মরহিত; **অব্যয়ম্**—অক্ষয়; **কথম্**—কিভাবে; **সঃ**—সেই; **পুরুষঃ**—ব্যক্তি; **পার্থ**—হে পার্থ (অর্জুন); **কম্**—কাকে; **ঘাতয়তি**—বধ করাতে; **হন্তি**—হত্যা করতে; **কম্**—কাউকে।

গীতার গান

যে জেনেছে আত্মা নিত্য অজ অবিনাশী ।
অব্যয় অজর আত্মা সর্ব দিবানিশি ॥
সে কেন মারিবে অন্যে মূর্খের মতন ।
সে জানে নিশ্চিত আত্মা মরে না কখন ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! যিনি এই আত্মাকে অবিনাশী, শাশ্বত, জন্মরহিত ও অক্ষয় বলে জানেন, তিনি কিভাবে কাউকে হত্যা করতে বা হত্যা করাতে পারেন?

তাৎপর্য

সব কিছুরই যথার্থ উপযোগিতা আছে এবং যিনি পূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন, তিনি জানেন কোন্ জিনিস কোথায় এবং কিভাবে নিয়োগ করলে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা হবে। আর সব কিছুর মতো হিংসারও যথার্থ উপযোগিতা আছে এবং যিনি যথার্থ জ্ঞানী,

তিনি জানেন কোথায়, কখন, কিভাবে হিংসার প্রয়োগ করতে হয়। বিচারক যখন আসামীকে খুনের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে প্রাণদণ্ড দেন, তখন হিংসাত্মক কাজ করেছেন বলে বিচারককে কেউ অভিযুক্ত করে না। তার কারণ, তিনি বিচারের রীতি অনুযায়ী এই দণ্ড দেন। মানব-সমাজের শ্রেষ্ঠ নীতিশাস্ত্র *মনুসংহিতাতে* খুনীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করার নির্দেশ দেওয়া আছে। কারণ, এই শাস্তি পাবার ফলে সেই খুনির মহাপাপের ভার লাঘব হয়, পরবর্তী জীবনে তাকে আর তার ফলভোগ করতে হয় না। সুতরাং, রাজা যখন খুনীকে প্রাণদণ্ড দেন, তখন তার মঙ্গলের জন্যই তা দেওয়া হয়। তেমনই, শ্রীকৃষ্ণ যখন যুদ্ধ করবার আদেশ দেন, তখন আমরা সহজেই বুঝতে পারি, চরম বিচারের জন্যই তিনি এই হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তাই, অর্জুনের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের নির্দেশ পালন করা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম করুণাময়, তাই আপাতদৃষ্টিতে তাঁর কার্যকলাপ হিংসাত্মক বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে তাঁর আশীর্বাদ। তেমনই, তাঁর নির্দেশে যখন হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়, তখন সেই হিংসা আশীর্বাদে পরিণত হয়। আর তা ছাড়া, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে অর্জুনকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, মানুষের প্রকৃত পরিচয় হচ্ছে তার আত্মা এবং সেই আত্মাকে কখনও হত্যা করা যায় না। সুতরাং, সুবিচারমূলক প্রশাসনের স্বার্থে ঐ ধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। শল্য-চিকিৎসক অস্ত্রোপচার করেন রোগ সারাবার জন্য, রোগীকে মেরে ফেলবার জন্য নয়। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান, তাঁর আদেশ অনুসারে যুদ্ধ করার ফলে অর্জুনের কোনও পাপ হবারই সম্ভাবনা নেই, উপরন্তু তাতে সমগ্র মানব-সমাজের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হওয়াটাই স্বাভাবিক।

শ্লোক ২২

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি ।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্য-
ন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২ ॥

বাসাংসি—বস্ত্র; **জীর্ণানি**—জীর্ণ; **যথা**—যেমন; **বিহায়**—পরিত্যাগ করে; **নবানি**—নতুন বস্ত্র; **গৃহ্লাতি**—গ্রহণ করে; **নরঃ**—মানুষ; **অপরাণি**—অন্য; **তথা**—তেমনই; **শরীরাণি**—শরীর; **বিহায়**—ত্যাগ করে; **জীর্ণানি**—জীর্ণ; **অন্যানি**—অন্য; **সংযাতি**—ধারণ করে; **নবানি**—নতুন দেহ; **দেহী**—শরীরী।

গীতার গান

পুরাতন বস্ত্র যথা, ভঙ্গুর শরীর তথা,
এক ছাড়ি অন্য বস্ত্র পরে ।
পুরাতন বস্ত্র ছাড়ে, নবীন বসন পরে,
নবীন শরীর সেই ধরে ॥
জীর্ণ শরীর ছাড়ি, নবীন শরীর ধরি,
দেহীনব্য হয় পুনর্বার ।
দেহ দেহী এই ভেদ, তাহাতে বা কিবা খেদ,
ছাড় দুঃখ যুদ্ধ করিবার ॥

অনুবাদ

মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে, দেহীও তেমনই জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করেন।

তাৎপর্য

পারমাণবিক জীবাত্মা যে এক দেহ ছেড়ে আর এক দেহ ধারণ করে, তা সর্বজনস্বীকৃত তথ্য। তবু আধুনিক যুগের কিছু বৈজ্ঞানিক আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, অথচ হৃদয় থেকে কেমন করে শক্তি সঞ্চালিত হয় তা বোঝাতে পারে না। কিন্তু তারাও স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, প্রতি মুহূর্তে দেহের পরিবর্তন হচ্ছে এবং এই পরিবর্তনের ফলেই দেহে শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্য দেখা দেয়। বার্ধক্যের পর আত্মা অন্য দেহ ধারণ করে। এই সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই (২/১৩) বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

পরমাত্মার কৃপার ফলেই অণু আত্মা ভিন্ন ভিন্ন দেহ প্রাপ্ত হয়। বন্ধু যেমন বন্ধুর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে, পরমাত্মাও তেমন অণু আত্মার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। *মুণ্ডক উপনিষদ* ও *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে* আত্মা ও পরমাত্মাকে একই গাছে বসে থাকা দুটি পাখির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একটি পাখি (জীবাত্মা) সেই গাছের ফল খাচ্ছে, অন্য পাখিটি (শ্রীকৃষ্ণ) তাঁর বন্ধুকে পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন। এই দুটি পাখি গুণগতভাবে যদিও এক, তবুও তাদের একজন সেই জড়-জাগতিক গাছের ফলের আকর্ষণে আবদ্ধ, আর অন্য জন একান্ত সুহৃদের মতো তার কার্যকলাপ কেবল পর্যবেক্ষণ করে চলেছে। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সাক্ষীরূপ পাখি,

আর অর্জুন হচ্ছেন ফল আহারে রত পাখি। যদিও তাঁরা একে অপরের বন্ধু, তবুও তাঁদের একজন হচ্ছেন প্রভু এবং অন্য জন হচ্ছেন ভৃত্য। জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে তার এই সম্পর্কের কথা ভুলে যাবার ফলেই এক গাছ থেকে আর এক গাছে অর্থাৎ এক দেহ থেকে আর এক দেহে সে ঘুরে বেড়ায়। এই জড় দেহরূপ বৃক্ষে জীবাত্মা কঠোর সংগ্রাম করছে, কিন্তু যে মুহূর্তে সে অন্য পাখিটিকে পরম গুরুরূপে গ্রহণ করতে সম্মত হয়, যেভাবে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ লাভের জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে সম্মত হয়েছিলেন, তৎক্ষণাৎ অধীন পাখিটি সমস্ত শোক থেকে মুক্ত হয়। *মুণ্ডক উপনিষদে* (৩/১/২) ও *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে* (৪/৭) প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥

"দুটি পাখি একই গাছে বসে আছে, কিন্তু যে পাখিটি ফল আহারে রত সে গাছের ফলের ভোক্তারূপে সর্বদাই শোক, আশঙ্কা ও উদ্বেগের দ্বারা মুহ্যমান। কিন্তু যদি সে একবার তার নিত্যকালের বন্ধু অপর পাখিটির দিকে ফিরে তাকায়, তবে তৎক্ষণাৎ তার সমস্ত শোকের অবসান হয়, কারণ তার বন্ধু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং তিনি সমগ্র ঐশ্বর্যের দ্বারা মহিমান্বিত।" অর্জুন তাঁর নিত্যকালের বন্ধু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিকে ফিরে তাকিয়েছেন এবং তাঁর কাছ থেকে *ভগবদ্‌গীতার* তত্ত্ব জানতে পেরেছেন। এভাবেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে শ্রবণ করার ফলে তিনি ভগবানের পরম মহিমা উপলব্ধি করতে পারেন এবং সমস্ত শোক থেকে মুক্ত হন।

ভগবান এখানে অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন, তাঁর বৃদ্ধ পিতামহ, শিক্ষক আদি আত্মীয়-পরিজনদের জন্য শোক না করতে। পক্ষান্তরে, সেই ধর্মযুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করার ফলে তাঁদের দেহগত কর্মফল জনিত সমস্ত পাপ থেকে তাঁরা মুক্ত হবেন বলে, আনন্দিত হওয়া উচিত। যজ্ঞবেদিতে অথবা ধর্মযুদ্ধে আত্মোৎসর্গ করলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায় এবং তার ফলে উচ্চতর জীবন লাভ হয়। সুতরাং, অর্জুনের শোক করবার কোনই কারণ ছিল না।

শ্লোক ২৩

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩ ॥

ন—না; **এনম্**—এই আত্মাকে; **ছিন্দন্তি**—ছেদন করতে পারে; **শস্ত্রাণি**—অস্ত্রসমূহ; ন—না; **এনম্**—এই আত্মাকে; **দহতি**—দহন করতে পারে; **পাবকঃ**—অগ্নি; **ন**—না; চ—ও; **এনম্**—এই আত্মাকে; **ক্লেদয়ন্তি**—আর্দ্র করতে পারে; **আপঃ**—জল; ন—না; **শোষয়তি**—শুষ্ক করতে পারে; **মারুতঃ**—বায়ু।

গীতার গান

অস্ত্রাঘাতে নাহি কাটে চিন্ময় শরীর।
অগ্নি না জ্বালায় তাহা শুন বিজ্ঞ বীর ॥
জল দ্বারা নাহি ভিজে বায়ু না শুকায়।
ঘাত প্রতিঘাত সব জড়েতে জুয়ায় ॥

অনুবাদ

আত্মাকে অস্ত্রের দ্বারা কাটা যায় না, আগুনে পোড়ানো যায় না, জলে ভেজানো যায় না, অথবা হাওয়াতে শুকানোও যায় না।

তাৎপর্য

তরবারি, আগ্নেয় অস্ত্র, পর্জন্যাস্ত্র, বায়বীয় অস্ত্র আদি কোন রকমের অস্ত্রশস্ত্রই আত্মাকে হত্যা করতে পারে না। এই শ্লোকে বোঝা যায়, *মহাভারতের* যুগে আধুনিক যুগের মতো আগ্নেয়াস্ত্র তো ছিলই, আর তা ছাড়া জল, বায়ু, আকাশ আদির তৈরি অস্ত্রের ব্যবহারও ছিল। আধুনিক যুগের পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রগুলি এক রকমের আগ্নেয়াস্ত্র, কিন্তু তথাকথিতভাবে বিজ্ঞানের উন্নতি হলেও জল, বায়ু, আকাশ আদির দ্বারা নির্মিত অস্ত্রের ব্যবহার আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। *মহাভারতের* যুগে জলীয় অস্ত্রের দ্বারা পারমাণবিক অস্ত্রের মতো আগ্নেয়াস্ত্রকে খণ্ডন করা হত—যা আজকের বৈজ্ঞানিকদের কল্পনারও অতীত। সেই যুগের বীরেরা যে-সমস্ত অদ্ভুত ঝটিকা অস্ত্রের ব্যবহার জানতেন, তা আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা কল্পনাও করতে পারে না। অগ্নি, জল, বায়ু, আকাশ আদির এত সমস্ত অস্ত্র থাকলেও, কোন বৈজ্ঞানিক অস্ত্রের দ্বারাই আত্মাকে হত্যা করা যায় না।

মায়াবাদীরা বোঝাতে পারেন না কেমন করে জীবাত্মা নিতান্তই অজ্ঞতার ফলে জড় অস্তিত্ব লাভ করে এবং তার ফলে মায়াশক্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আত্মাকে যেমন অস্ত্রের দ্বারা কাটা যায় না, তেমনই আত্মাকে তার উৎস পরমাত্মার থেকেও

কখনও বিচ্ছিন্ন করা যায় না; বরং, স্বতন্ত্র জীবাত্মাগুলি পরমাত্মার শাশ্বত ভিন্নাংশ। যেহেতু সনাতন জীবাত্মা পরমাণুসদৃশ, তাই ভগবানের বহিরঙ্গা মায়াশক্তির দ্বারা তাদের আচ্ছাদিত হয়ে পড়ার প্রবণতা দেখা যায় এবং এভাবে তারা ভগবানের সান্নিধ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে, ঠিক যেমন আগুনের স্ফুলিঙ্গ, যদিও আগুনের সঙ্গে তা গুণগতভাবে এক ও অভিন্ন, কিন্তু আগুনের থেকে বেরিয়ে এলেই তা নিভে যায় এবং তখন আর তার মধ্যে আগুনের বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায় না। তেমনই পরমাণুসদৃশ জীবাত্মা ভগবৎ-বিমুখ হয়ে পড়লে মায়াশক্তির দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে এবং তার প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে পড়ার ফলে নানা রকম দুঃখকষ্ট ভোগ করতে থাকে। *বরাহ পুরাণে* বলা হয়েছে, জীবাত্মা পরমাত্মার বিভিন্নাংশ। *ভগবদ্গীতাতেও* বলা হয়েছে, জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার এই সম্পর্ক নিত্য শাশ্বত। সুতরাং, মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হবার পরও জীবাত্মা স্বতন্ত্র স্বরূপেই বিদ্যমান থাকে, যা অর্জুনের প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশেই সুস্পষ্ট উপলব্ধি হয়। ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার পর অর্জুন মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তা বলে তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এক হয়ে যাননি।

শ্লোক ২৪

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪ ॥

অচ্ছেদ্যঃ—অচ্ছেদ্য; **অয়ম্**—এই আত্মা; **অদাহ্যঃ**—পোড়ানো যায় না; **অয়ম্**—এই আত্মাকে; **অক্লেদ্যঃ**—ভিজানো যায় না; **অশোষ্যঃ**—শুকানো যায় না; **এব**—অবশ্যই; **চ**—এবং; **নিত্যঃ**—চিরস্থায়ী; **সর্বগতঃ**—সর্বব্যাপ্ত; **স্থাণুঃ**—অপরিবর্তনীয়; **অচলঃ**—নিশ্চল; **অয়ম্**—এই আত্মা; **সনাতনঃ**—নিত্য বর্তমান।

গীতার গান

অচ্ছেদ্য যে আত্মা হয় অক্লেদ্য অশোষ্য।
চিদানন্দ আত্মা নহে জড়ের সে পোষ্য ॥
সর্বত্র আত্মার গতি স্থির সনাতন।
অচল অটল আত্মা নিত্য সে নূতন ॥

অনুবাদ

এই আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অশোষ্য। তিনি চিরস্থায়ী, সর্বব্যাপ্ত, অপরিবর্তনীয়, অচল ও সনাতন।

তাৎপর্য

পারমাণবিক আত্মার এই সমস্ত গুণাবলী নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, সে অবশ্যই পরমাত্মার পরমাণুসদৃশ অংশ এবং সে নিত্যকাল অপরিবর্তিত ভাবে একই পরমাণুরূপে চিরকাল বর্তমান থাকে। অদ্বৈতবাদীরা যে বলে থাকেন, মায়ামুক্ত হলে জীবাত্মা পরমাত্মায় পরিণত হয়, সেই তত্ত্ব এই শ্লোকে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়। মায়ামুক্ত হবার পর জীবাত্মা ইচ্ছা করলে ভগবানের দেহনির্গত ব্রহ্মজ্যোতিতে চিৎকণারূপে বিরাজ করতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিমান জীবাত্মারা ভগবৎ-ধামে প্রবেশ করে ভগবানের সাহচর্য লাভ করে।

এখানে *সর্বগত* ('সর্বব্যাপ্ত') শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কেন না কোন সন্দেহ নেই যে, ঈশ্বরের সৃষ্টির সর্বত্রই আত্মা বিরাজ করছে। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, এমন কি আগুনেও জীবাত্মা রয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় আগুনে আত্মা নেই, কিন্তু এই শ্লোকে আমরা বুঝতে পারি, সেই ধারণাটি ভ্রান্ত, কারণ এখানে স্পষ্টভাবে বলা হচ্ছে, আগুন আত্মাকে দহন করতে পারে না। এর থেকে বোঝা যায়, সূর্যলোকেও সেখানকার উপযোগী দেহ ধারণ করে জীবাত্মা রয়েছে। সূর্যলোকে যদি জীব না থাকত, তা হলে *সর্বগত*, অর্থাৎ 'সর্বত্র আত্মার গতি' কথাটি ব্যবহার করা হত না।

শ্লোক ২৫

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫ ॥

অব্যক্তঃ—ইন্দ্রিয়াদির অগোচর; **অয়ম্**—এই আত্মা; **অচিন্ত্যঃ**—চিন্তার অতীত; **অয়ম্**—এই আত্মা; **অবিকার্যঃ**—অপরিবর্তনীয়; **অয়ম্**—এই আত্মা; **উচ্যতে**—বলা হয়; **তস্মাৎ**—অতএব; **এবম্**—এভাবে; **বিদিত্বা**—ভালভাবে জেনে; **এনম্**—এই আত্মাকে; **ন**—নয়; **অনুশোচিতুম্**—শোক করা; **অর্হসি**—উচিত।

গীতার গান

কাটা জ্বালা ভিজা শুকা জড়ের লক্ষণ।
জড়ের দ্বারা ব্যক্ত নহে অব্যক্ত কখন ॥

মন দ্বারা চিন্ত্য হয় জড়ের লক্ষণ ।
আত্মা জড় বস্তু নহে অচিন্ত্য কথন ॥
জড়ের বিকার হয় আত্মা অবিকার ।
জড় আত্মা বিভিন্নতা শুন বার বার ॥
যথাযথ আত্মতত্ত্ব করহ বিচার ।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥

অনুবাদ

এই আত্মা অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকারী বলে শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে। অতএব এই সনাতন স্বরূপ অবগত হয়ে দেহের জন্য তোমার শোক করা উচিত নয়।

তাৎপর্য

পূর্বে বলা হয়েছে, জড়-জাগতিক বিচারে আত্মার আয়তন এত সূক্ষ্ম যে, সবচেয়ে শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও তাকে দেখা যায় না, তাই সে অদৃশ্য। আত্মার অস্তিত্বকে পরীক্ষামূলকভাবে বা বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা প্রমাণ করা যায় না, এর একমাত্র প্রমাণ হচ্ছে *শ্রুতি-প্রমাণ* বা বৈদিক জ্ঞান। আত্মার অস্তিত্ব আমরা সব সময়েই অনুভব করতে পারি। আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কারও মনেই কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়। তাই এই বৈদিক সত্যকে আমাদের গ্রহণ করতেই হবে, কারণ এ ছাড়া আর কোন উপায়েই আত্মার অস্তিত্বের এই নিগূঢ় তত্ত্বকে জানতে পারা যায় না। উচ্চতর কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভর করে আমাদের অনেক কিছুকেই স্বীকার করতে হয়। আমাদের পিতৃপরিচয় যেমন মায়ের কাছ থেকে জানা ছাড়া আর কোন উপায়েই জানতে পারা যায় না এবং মায়ের প্রদত্ত পিতৃপরিচয়কে যেমন আমরা অস্বীকার করতে পারি না, আত্মা সম্বন্ধেও তেমন বৈদিক জ্ঞান বা *শ্রুতি-প্রমাণ* ছাড়া আর কোন উপায়েই জানা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে বলা যায়, মানুষের সীমিত ইন্দ্রিয়লব্ধ জড় জ্ঞানের দ্বারা কখনই আত্মার তত্ত্ব উপলব্ধি করা যায় না। *বেদে* বলা হয়েছে আত্মা হচ্ছে চেতন। আত্মার থেকেই সমস্ত চেতনের প্রকাশ হয়। এই সত্যকে আমরা অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারি। তাই যাঁরা বুদ্ধিমান, তাঁরা এই বৈদিক সত্যকে স্বীকার করেন। দেহের পরিবর্তন হলেও আত্মার কখনও কোন পরিবর্তন হয় না। চির-অপরিবর্তনীয় আত্মা চিরকালই বিভুচৈতন্য পরমাত্মার পরমাণুসদৃশ অংশরূপেই বিদ্যমান থাকে। পরমাত্মা অসীম—অনন্ত এবং আত্মা পরমাণুসদৃশ। আত্মার কখনও কোন রকম পরিবর্তন হয় না, তাই সে চিরকালই

পরমাণুসদৃশই থাকে। তার পক্ষে বিভুচৈতন্য-বিশিষ্ট পরমাত্মা বা ভগবান হওয়া কখনই সম্ভব নয়। *বেদে* নানা রকমভাবে বারবার এই কথার উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে আমরা আত্মার অস্তিত্বকে উপলব্ধি করতে পারি। কোনও তত্ত্বকে নির্ভুলভাবে ও সম্যক্‌রূপে বুঝতে হলে, সেই জন্য তার পুনরাবৃত্তি দরকার।

শ্লোক ২৬

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্ ।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬ ॥

অথ—আর যদি; **চ**—ও; **এনম্**—এই আত্মাকে; **নিত্যজাতম্**—সর্বদা জন্মশীল; **নিত্যম্**—নিত্য; **বা**—অথবা; **মন্যসে**—মনে কর; **মৃতম্**—মৃত; **তথাপি**—তবুও; **ত্বম্**—তুমি; **মহাবাহো**—হে মহাবীর; **ন**—না; **এনম্**—এই আত্মার জন্য; **শোচিতুম্**—শোক করা; **অর্হসি**—উচিত নয়।

গীতার গান

বিচার করিবে যবে শোক নাহি রবে ।
আত্মার নিত্যত্ব জানি নিত্যানন্দ পাবে ॥
যদি তাই মান তুমি দেহই সর্বস্ব ।
পরিচয় নাহি কিছু আত্মার নিজস্ব ॥
নিত্যজন্ম নিত্যমৃত্যু দেহ মাত্র হয় ।
তবুও তোমার দুঃখ নাহি তবু তায় ॥

অনুবাদ

হে মহাবাহো! আর যদি তুমি মনে কর যে, আত্মার বারবার জন্ম হয় এবং মৃত্যু হয়, তা হলেও তোমার শোক করার কোন কারণ নেই।

তাৎপর্য

প্রায় বৌদ্ধদের মতো কিছু দার্শনিক আছে, যারা আত্মার দেহাতীত স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা মানতে চায় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন *ভগবদ্গীতা* বলেন, সেই যুগেও এই ধরনের নাস্তিক ছিল, তাদের বলা হত *লোকায়তিক* ও *বৈভাষিক*। এই সমস্ত দার্শনিকদের মতবাদ হচ্ছে, জড় পদার্থের সমন্বয়ের কোন এক বিশেষ পরিণত

অবস্থায় প্রাণের উদ্ভব হয়। আধুনিক জড় বিজ্ঞানী ও জড়বাদী দার্শনিকেরাও এই মতবাদ পোষণ করে। তাদের মতে, দেহটি হচ্ছে কতকগুলি জড় উপাদানের সমন্বয় মাত্র এবং কোনও এক পর্যায়ে জড় উপাদান ও রাসায়নিক উপাদানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে প্রাণের লক্ষণ বিকশিত হয়। এনথ্রোপোলজি বা নৃবিজ্ঞান এই মতবাদের ভিত্তিতে প্রচলিত হয়েছে। আধুনিক যুগে, বিশেষ করে আমেরিকাতে এই মতবাদ ও বৌদ্ধধর্মের নিরীশ্বরবাদের ভিত্তির উপর অনেক নকল ধর্ম গজিয়ে উঠছে।

বৈভাষিক দার্শনিকদের মতো অর্জুন যদি আত্মার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করতেন, তা হলেও তাঁর শোক করার কোন কারণ ছিল না। কিছু পরিমাণ রাসায়নিক পদার্থের বিনাশের জন্য কেউ শোক করে না এবং তার কর্তব্যকর্ম থেকে বিরত হয় না। পক্ষান্তরে, আধুনিক বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক যুদ্ধবিগ্রহে শত্রু জয় করার উদ্দেশ্যে কত টন টন রাসায়নিক উপাদান তো নষ্টই হচ্ছে। বৈভাষিক দর্শন অনুসারে, দেহের সঙ্গে সঙ্গে তথাকথিত আত্মার বিনাশ হয়। সুতরাং, অর্জুন যদি বৈদিক মতবাদকে অস্বীকার করে আত্মাকে নশ্বর বলে মনে করতেন অর্থাৎ দেহের সঙ্গে সঙ্গে আত্মাও বিনাশপ্রাপ্ত হয় বলে মনে করতেন, তা হলেও তাঁর অনুশোচনা করার কোনই কারণ ছিল না। এই মতবাদ অনুযায়ী, যেহেতু ঘটনাচক্রে জড় পদার্থ থেকে প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য জীবের উদ্ভব হচ্ছে এবং প্রতি মুহূর্তেই এই রকম অসংখ্য জীব বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে পুনরায় জড় পদার্থে পরিণত হচ্ছে, তাই এর জন্য দুঃখ করার কোনই কারণ নেই। এই মতবাদের ফলে যেহেতু পুনর্জন্মের কোন প্রশ্নই ওঠে না, তাই অর্জুনের পিতামহ, আচার্য আদি আত্মীয়-পরিজনদের হত্যাজনিত পাপের ফল ভোগ করারও কোন ভয় নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিদ্রূপ সহকারে অর্জুনকে *মহাবাহু* অর্থাৎ যাঁর বাহুদ্বয় মহাশক্তি-সম্পন্ন বলে সম্বোধন করেছেন, কারণ, অন্ততপক্ষে তিনি বৈদিক জ্ঞানের বিরোধী বৈভাষিকদের মতবাদ স্বীকার করেননি এবং তার ফলে তাঁকে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি ক্ষত্রিয়, এই বর্ণ-বিভাগ বৈদিক সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং যে এই বৈদিক বর্ণাশ্রম-ধর্ম মেনে চলে, সে বৈদিক নির্দেশ অনুযায়ী আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে।

শ্লোক ২৭

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ ।
তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭ ॥

জাতস্য—যার জন্ম হয়েছে; **হি**—যেহেতু; **ধ্রুবঃ**—নিশ্চিত; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **ধ্রুবম্**—নিশ্চিত; **জন্ম**—জন্ম; **মৃতস্য**—মৃতের; **চ**—এবং; **তস্মাৎ**—অতএব; **অপরিহার্যে**—অবশ্যম্ভাবী; **অর্থে**—বিষয়ে; **ন**—নয়; **ত্বম্**—তুমি; **শোচিতুম্**—শোক করা; **অর্হসি**—উচিত।

গীতার গান

জড় দেহ উপজয় অনিবার্য ক্ষয় ।
ক্ষয় হয়ে জড় দ্রব্য পুনঃ উপজয় ॥
জড় দ্রব্য রূপ ছাড়ি অন্য রূপ হয় ।
নূতন রূপের জন্য অন্য রূপ কয় ॥
এই জড় বিজ্ঞ যদি করয়ে বিচার ।
তথাপি শোকের কথা নহে তিলধার ॥

অনুবাদ

যার জন্ম হয়েছে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এবং যার মৃত্যু হয়েছে তার জন্মও অবশ্যম্ভাবী। অতএব অপরিহার্য কর্তব্য সম্পাদন করার সময় তোমার শোক করা উচিত নয়।

তাৎপর্য

পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে কোন বিশেষ দেহপ্রাপ্ত হয়ে আত্মা জন্মগ্রহণ করে। আর সেই দেহের মাধ্যমে কিছুকাল জড় জগতে অবস্থান করার পর, সেই দেহের বিনাশ হয় এবং তার কর্মের ফল অনুযায়ী সে আবার আর একটি নতুন দেহ ধারণ করে জন্মগ্রহণ করে। এভাবেই আত্মা জড় বন্ধন থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে থাকে। সে যাই হোক, এই জন্ম-মৃত্যুর চক্র অনর্থক যুদ্ধ, হত্যা ও হিংসাকে কোন প্রকারেই অনুমোদন করে না। কিন্তু তবুও মানব-সমাজে নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য হিংসা, হত্যা ও যুদ্ধ অপরিহার্য হয়ে পড়ে এবং তা যখন সমাজের মঙ্গলের জন্য সাধিত হয়, তখন তা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত।

ভগবানের ইচ্ছার ফলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আয়োজিত হয়েছিল বলে তা সম্পূর্ণ অবশ্যম্ভাবী ছিল এবং ন্যায়সঙ্গত কারণে যুদ্ধ করাটা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। যেহেতু তিনি সঠিকভাবে কর্তব্যকর্মের অনুষ্ঠান করছিলেন, তাই তাঁর আত্মীয়-স্বজনের বিয়োগে কেন তিনি ভীত অথবা শোকান্বিত হবেন? কর্তব্যকর্ম থেকে ভ্রষ্ট হলে পাপ হয়

এবং অর্জুন যে স্বজন-হত্যার পাপের ভয়ে ভীত হচ্ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে সেই পাপ তাঁর হত যদি তিনি যুদ্ধে বিমুখ হয়ে রণাঙ্গন পরিত্যাগ করতেন। এই ধর্মযুদ্ধ থেকে বিরত থাকলেও মৃত্যুর হাত থেকে তিনি তাঁর তথাকথিত আত্মীয়-স্বজনদের রক্ষা করতে পারতেন না। প্রকৃতির বিধান অনুসারে একদিন না একদিন তাদের মৃত্যু অবধারিত, কিন্তু অর্জুন যদি তাঁর কর্তব্যকর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়তেন, তা হলে তাঁর মান, মর্যাদা ধূলিসাৎ হত।

শ্লোক ২৮

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮ ॥

অব্যক্তাদীনি—পূর্বে অপ্রকাশিত; **ভূতানি**—প্রাণীসমূহ; **ব্যক্ত**—প্রকাশিত; **মধ্যানি**—মাঝখানে; **ভারত**—হে ভরতবংশজ; **অব্যক্ত**—অপ্রকাশিত; **নিধনানি**—বিনাশের পর; **এব**—এমনই; **তত্র**—সুতরাং; **কা**—কি; **পরিদেবনা**—শোক।

গীতার গান

জড়ের রূপাদি নাহি পরেও থাকে না।
মধ্যে মাত্র রূপ গুণ সকলি ভাবনা ॥
অতএব নিরাকার যদি নিরাকার।
তাহাতে তোমার দুঃখ কিসের আবার ॥

অনুবাদ

হে ভারত! সমস্ত সৃষ্ট জীব উৎপন্ন হওয়ার আগে অপ্রকাশিত ছিল, তাদের স্থিতিকালে প্রকাশিত থাকে এবং বিনাশের পর আবার অপ্রকাশিত হয়ে যায়। সুতরাং, সেই জন্য শোক করার কি কারণ?

তাৎপর্য

আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী উভয় মতবাদকে মেনে নিলেও শোকের কোন কারণ নেই। যারা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না, বৈদিক মতাবলম্বীরা তাদের নাস্তিক বলে অভিহিত করে। তবুও এমন কি যদি তর্কের খাতিরে এই

নাস্তিক মতবাদকে সত্য বলে গ্রহণ করা হয়, তা হলেও অনুশোচনা করার কোনই কারণ নেই। কারণ, জড়ের মধ্য থেকে প্রাণের উদ্ভব হয়ে যদি তা আবার জড়ের মধ্যেই বিলীন হয়ে যায়, তবে সেই অনিত্য বস্তুর জন্য শোক করা নিতান্তই নিরর্থক। আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা ছেড়ে দিলেও সৃষ্টির পূর্বে জড় উপাদানগুলি থাকে অব্যক্ত। এই সূক্ষ্ম অব্যক্ত থেকে আকারের প্রকাশ হয়, যেমন আকাশ থেকে বায়ুর উদ্ভব হয়, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল এবং জল থেকে মাটির উদ্ভব হয়। এই মাটি থেকে নানা রূপের উদ্ভব হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—ইট, সিমেন্ট, চুন, বালি, লোহা আদি সবই মাটি। সেই মাটি থেকে যখন একটি প্রাসাদ তৈরি হয়, তখন তা রূপ ও আকার প্রাপ্ত হয়। তারপর এক সময় সেই প্রাসাদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে মাটিতে মিশে যায়। যে বস্তু দিয়ে প্রাসাদটি গড়া হয়েছিল, তার অণু-পরমাণুগুলির কোন পরিবর্তন হয় না। শক্তি সংরক্ষণের নীতি বর্তমানই থাকে, কেবল সময়ের প্রভাবে তার রূপের প্রকাশ হয় এবং অন্তর্ধান হয়—সেটিই হচ্ছে পার্থক্য। সুতরাং, এই আবির্ভাব ও অন্তর্ধানের জন্য শোক করার কি কারণ থাকতে পারে? যে-কোনভাবেই হোক না কেন, এমন কি অব্যক্ত অবস্থাতেও বস্তুর বিনাশ হয় না। আদিতে ও অন্তে জড়ের রূপ থাকে না, কেবল মধ্যে তার রূপ ও গুণের প্রকাশ হয়ে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়। সুতরাং, এর ফলে কোন জড়-জাগতিক পার্থক্য সূচিত হয় না।

আর আমরা যদি *ভগবদ্গীতায়* উক্ত বৈদিক সিদ্ধান্তকে মেনে নিই, অর্থাৎ *অন্তবন্ত ইমে দেহাঃ*—এই জড় দেহটি কালের প্রভাবে বিনষ্ট হবে, *নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ*—কিন্তু আত্মা চিরশাশ্বত, তা হলে আমাদের আর বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, দেহটি একটি পোশাকের মতো। তাই এই পোশাকটির পরিবর্তনের জন্য কেন আমরা শোক করব? আত্মার নিত্যতার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখলে সহজেই বুঝতে পারা যায়, জড় দেহের যথার্থই কোন অস্তিত্ব নেই—এটি অনেকটা স্বপ্নের মতো। স্বপ্নে যেমন কখনও আমরা দেখি, আকাশে উড়ছি অথবা রাজা হয়ে সিংহাসনে বসে আছি, কিন্তু যখন ঘুম ভেঙে যায়, তখন বুঝতে পারি, আমরা আকাশেও উড়িনি অথবা রাজা হয়ে সিংহাসনেও বসিনি। আমাদের জড় অস্তিত্বটিও তেমনই আমাদের মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের বিকার। বৈদিক জ্ঞান আমাদের দেহের অনিত্যতার পরিপ্রেক্ষিতে আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করতে অনুপ্রাণিত করে। সুতরাং, কেউ আত্মার অস্তিত্ব বিশ্বাস করুক অথবা আত্মার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করুক না কেন, যে-কোন অবস্থাতেই জড় দেহ বিনাশের জন্য শোক করার কারণ নেই।

শ্লোক ২৯

আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্
আশ্চর্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ ।
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯ ॥

আশ্চর্যবৎ—বিস্ময়জনক ভাবে; **পশ্যতি**—দেখেন; **কশ্চিৎ**—কেউ; **এনম্**—এই আত্মাকে; **আশ্চর্যবৎ**—আশ্চর্যভাবে; **বদতি**—বলেন; **তথা**—সেভাবে; **এব**—নিশ্চিত; **চ**—ও; **অন্যঃ**—অপরে; **আশ্চর্যবৎ**—তেমনই আশ্চর্যরূপে; **চ**—ও; **এনম্**—এই আত্মাকে; **অন্যঃ**—অন্য কেউ; **শৃণোতি**—শ্রবণ করেন; **শ্রুত্বা**—শুনেও; **অপি**—এমন কি; **এনম্**—এই আত্মাকে; **বেদ**—জানতে পারেন; **ন**—না; **চ**—এবং; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **কশ্চিৎ**—কেউ।

গীতার গান

আশ্চর্য আত্মার কথা, না বুঝয়ে যথা তথা
আশ্চর্য তাহার দেখাশুনা ।
আশ্চর্য কেহবা বলে, আশ্চর্য কেহবা ছলে
আশ্চর্য তাহার অধ্যাপনা ॥
আশ্চর্য হইয়া শুনে, তথাপি বা নাহি মানে
আশ্চর্য যে আশ্চর্যের কথা ।
আশ্চর্য হইয়া রহে, আশ্চর্য বুঝিতে নহে
আশ্চর্য অতি দুর্লভতা ॥

অনুবাদ

কেউ এই আত্মাকে আশ্চর্যবৎ দর্শন করেন, কেউ আশ্চর্যভাবে বর্ণনা করেন এবং কেউ আশ্চর্য জ্ঞানে শ্রবণ করেন, আর কেউ শুনেও তাকে বুঝতে পারেন না।

তাৎপর্য

উপনিষদের তত্ত্বজ্ঞানের ভিত্তির উপর *গীতোপনিষদ* অধিষ্ঠিত, তাই এই শ্লোকের ভাব *কঠ উপনিষদের* (১/২/৭) শ্লোকটিতেও দেখা যায়—

শ্রবণয়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ ।
আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধাশ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥

সত্য ঘটনা হচ্ছে যে, পারমাণবিক আত্মা বিশালকায় পশুর দেহে, বিশাল বটবৃক্ষে, আবার অতি ক্ষুদ্র জীবাণু যারা লক্ষ কোটি সংখ্যায় মাত্র এক ইঞ্চি পরিমাণ জায়গাতেও থাকতে পারে, তাদের দেহেও অবস্থান করে, এটি অতি আশ্চর্যের কথা। যে সমস্ত মানুষ সীমিত জ্ঞানসম্পন্ন এবং যাদের চিন্তাধারা সংযম ও তপশ্চর্যার প্রভাবে পবিত্র হয়নি, তারা কখনই পারমাণবিক জীবাত্মার বিস্ময়কর স্ফুলিঙ্গ রহস্য উপলব্ধি করতে পারে না। এমন কি বৈদিক জ্ঞানের মহান প্রবক্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মাকে পর্যন্ত ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান দান করেছিলেন, তিনি নিজে এসে সেই জ্ঞান দান করার পরেও তার মর্ম তারা উপলব্ধি করতে পারে না। স্থূল জড় পদার্থের দ্বারা অতি মাত্রায় প্রভাবিত হয়ে পড়ার ফলে বর্তমান যুগের অধিকাংশ মানুষ কল্পনা করতে পারে না, পরমাণুর চাইতেও অনেক ছোট যে আত্মা, তা কি করে তিমি মাছের মতো বৃহৎ জন্তুর দেহে, আবার জীবাণুর মতো অতি ক্ষুদ্র প্রাণীর দেহে উপস্থিত থেকে তাতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারে। তাই, মানুষ আত্মার কথা শুনে অথবা আত্মার কথা অনুমান করে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়। মায়াশক্তির প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ার ফলে, মানুষ তাদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করতে এতই ব্যস্ত যে, আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন রকম চিন্তা করার সময় পর্যন্ত তাদের নেই। এমন কি যদিও এই কথাটি সত্য যে, এই আত্ম-উপলব্ধি ছাড়া জীবন-সংগ্রামে তাদের সমস্ত প্রচেষ্টাই শোচনীয় পরাজয়ে পর্যবসিত হবে। অনেকেই হয়ত আত্মজ্ঞান লাভ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে না, ফলে জড়-জাগতিক ক্লেশের পীড়নে তারা অহরহ নির্যাতিত হয় এবং তার থেকে মুক্ত হবার কোন উপায় খুঁজে পায় না।

অনেক সময় কিছু মানুষ আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার প্রয়াসী হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সাধুসঙ্গ বলে মনে করে একদল মূর্খের সঙ্গ লাভ করে ভাবতে শেখে যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই—মায়ামুক্ত হলেই জীবাত্মা পরমাত্মাতে পরিণত হয়। এমন মানুষ খুবই বিরল যিনি জীবাত্মা, পরমাত্মা, তাঁদের নিজ নিজ কার্যকলাপ ও পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক এবং অন্যান্য পুঙ্খানুপুঙ্খ তত্ত্ব বুঝতে পারেন। আরও বিরল হচ্ছে সেই মানুষকে খুঁজে পাওয়া, যিনি এই তত্ত্বকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং যিনি বিভিন্ন রূপের মধ্যে আত্মার অবস্থানের বর্ণনা দিতে সক্ষম। যদি কেউ আত্মার এই জ্ঞানকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারে, তা হলেই তার জন্ম সার্থক হয়।

মানবজন্ম লাভ করার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করে মায়ামুক্ত হয়ে চিৎ-জগতে ফিরে যাওয়া। এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে অন্যান্য মতবাদের দ্বারা বিপথগামী না হয়ে মহত্তম প্রবক্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ-নিঃসৃত *ভগবদ্‌গীতার* বাণীর যথাযথ মর্ম উপলব্ধি করা এবং তাঁর শিক্ষা অনুযায়ী জীবনযাপন করা। বহু জন্মের পুণ্যের ফলে এবং বহু তপস্যার বলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মানুষ সর্ব কারণের কারণ পরমেশ্বর রূপে উপলব্ধি করতে পারে এবং তাঁর চরণে আত্মনিবেদন করতে সমর্থ হয়। অনেক সৌভাগ্যের ফলে মানুষ সদ্‌গুরুর সন্ধান পায়, যাঁর অহৈতুকী কৃপার ফলে সে ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারে।

শ্লোক ৩০

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্বস্য ভারত ।
তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০ ॥

দেহী—জড় দেহের মালিক; **নিত্যম্**—নিত্য; **অবধ্যঃ**—অবধ্য; **অয়ম্**—এই আত্মা; **দেহে**—দেহে; **সর্বস্য**—সকলের; **ভারত**—হে ভরতবংশীয়; **তস্মাৎ**—অতএব; **সর্বাণি**—সমস্ত; **ভূতানি**—জীবসমূহ (যাদের জন্ম হয়েছে); **ন**—না; **ত্বম্**—তুমি; **শোচিতুম্**—শোক করা; **অর্হসি**—উচিত।

গীতার গান

সিদ্ধান্ত আত্মার কথা শুন হে ভারত ।
বেদান্ত আমার কথা শুন সেই মত ॥
দেহী নিত্য মরে নাহি সকল দেহের ।
দেহের বিনাশ তাই নহে ত শোকের ॥

অনুবাদ

হে ভারত! প্রাণীদের দেহে অবস্থিত আত্মা সর্বদাই অবধ্য। অতএব কোন জীবের জন্য তোমার শোক করা উচিত নয়।

তাৎপর্য

আত্মার অবিনশ্বরতার কথা প্রতিপন্ন করে ভগবান আবার উপসংহারে অর্জুনকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে, দেহের বিনাশ হলেও আত্মার বিনাশ হয় না। দেহ অনিত্য,

কিন্তু আত্মা নিত্য, তাই দেহের বিনাশ হলে তা নিয়ে শোক করবার কোন কারণ থাকতে পারে না। অতএব পিতামহ ভীষ্ম ও আচার্য দ্রোণ নিহত হবেন বলে ভয়ে ও শোকে যুদ্ধ করতে বিমুখ হয়ে স্বধর্ম পরিত্যাগ করা ক্ষত্রিয় বীর অর্জুনের উচিত নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্ভরযোগ্য প্রামাণিক উপদেশামৃতের উপর আস্থা রেখে, প্রত্যেকের বিশ্বাস করতে হবে যে, জড় দেহ থেকে ভিন্ন আত্মার অস্তিত্ব রয়েছে, এই নয় যে, আত্মা বলে কোন বস্তু নেই, অথবা রাসায়নিক পদার্থের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে জাগতিক পরিপক্কতার কোন এক বিশেষ অবস্থায় চেতনার লক্ষণগুলির বিকাশ ঘটে। অবিনশ্বর আত্মার মৃত্যু হয় না বলে নিজের ইচ্ছামতো হিংসার আচরণ করাকে কখনই প্রশ্রয় দেওয়া যায় না, কিন্তু যুদ্ধের সময় হিংসার আশ্রয় নেওয়াতে কোন অন্যায় নেই, কারণ সেখানে তার যথার্থ প্রয়োজনীয়তা আছে। এই প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আমাদের খেয়ালখুশি অনুযায়ী বিবেচিত হয় না—তা হয় ভগবানের বিধান অনুসারে।

শ্লোক ৩১

স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি ।
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ৩১ ॥

স্বধর্মম্—স্বধর্মের প্রতি; **অপি চ**—আরও; **অবেক্ষ্য**—বিবেচনা করে; **ন**—না; **বিকম্পিতুম্**—দ্বিধা করতে; **অর্হসি**—উচিত; **ধর্ম্যাৎ**—ধর্মের জন্য; **হি**—যেহেতু; **যুদ্ধাৎ**—যুদ্ধ অপেক্ষা; **শ্রেয়ঃ**—শ্রেয়স্কর কর্ম; **অন্যৎ**—অন্য কিছু; **ক্ষত্রিয়স্য**—ক্ষত্রিয়ের; **ন বিদ্যতে**—নেই।

গীতার গান

নিজ ধর্ম দেখি পুনঃ না হও বিকল ।
ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ করা ধর্ম যে সকল ॥

অনুবাদ

ক্ষত্রিয়রূপে তোমার স্বধর্ম বিবেচনা করে তোমার জানা উচিত যে, ধর্ম রক্ষার্থে যুদ্ধ করার থেকে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মঙ্গলকর আর কিছুই নেই। তাই, তোমার দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়।

তাৎপর্য

চতুর্বর্ণের দ্বিতীয় বর্ণকে বলা হয় ক্ষত্রিয়। এদের কাজ হচ্ছে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করা। ক্ষৎ কথাটির অর্থ হচ্ছে আঘাত। আঘাত বা বিপদ থেকে (*ত্রায়তে*—ত্রাণ করে) যে ত্রাণ করে, সে হচ্ছে ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়েরা অস্ত্রচালনা শিক্ষালাভ করে তাতে পারদর্শিতা লাভ করত। তাদের এই শিক্ষার একটি অঙ্গ হচ্ছে, বনে গিয়ে হিংস্র পশু শিকার করা। এভাবে অস্ত্রশিক্ষা সমাপ্ত হলে ক্ষত্রিয় সন্তান বনে গিয়ে হিংস্র বাঘকে যুদ্ধে আহ্বান করত এবং শুধু তলোয়ার হাতে সেই বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে নিধন করত। তারপর সেই বাঘকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদার সঙ্গে সৎকার করা হত। এই প্রথা আজও জয়পুরের ক্ষত্রিয় রাজপরিবারে প্রচলিত আছে। ক্ষত্রিয়েরা শত্রুকে যুদ্ধে আহ্বান করে তার প্রাণ সংহার করতে দ্বিধা করে না। রাজ্যশাসন ও প্রজাপালনের জন্য এই প্রথার প্রয়োজন অপরিহার্য। তাই, ক্ষত্রিয়েরা সরাসরিভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারে না। রাজনীতির ক্ষেত্রে অহিংসার পথ অবলম্বন করা কূটনীতি হতে পারে, কিন্তু তা কখনই নীতিগত পন্থা নয়। *নীতিশাস্ত্রে* আছে—

আহবেষু মিথোহন্যোন্যং জিঘাংসন্তো মহীক্ষিতঃ
যুদ্ধমানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গং যান্ত্যপরাঙ্মুখাঃ ।
যজ্ঞেষু পশবো ব্রহ্মন্ হন্যন্তে সততং দ্বিজৈঃ
সংস্কৃতাঃ কিল মন্ত্রৈশ্চ তেঽপি স্বর্গমবাপ্নুবন্ ॥

"কোন রাজা অথবা ক্ষত্রিয় যখন যুদ্ধক্ষেত্রে ঈর্ষান্বিত শত্রুর সঙ্গে সংগ্রামে রত হন, মৃত্যুর পর তিনি স্বর্গলোকে গমন করেন, তেমনই ব্রাহ্মণ যজ্ঞে পশুবলি দিলে স্বর্গ লাভ করেন।" তাই, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুকে হত্যা করা এবং যজ্ঞে পশু বলি দেওয়াকে হিংসাত্মক কার্য বলে গণ্য করা হয় না, কারণ এই ধর্ম অনুষ্ঠানের ফলে সকলেই লাভবান হয়। যজ্ঞে উৎসর্গীকৃত পশু জৈব বিবর্তনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে উন্নত থেকে উন্নততর জীব দেহ ধারণ না করে, সরাসরিভাবে মনুষ্যশরীর প্রাপ্ত হয় এবং সেই যজ্ঞের ফলে দেবতারা তুষ্ট হয়ে মর্ত্যবাসীদের ধনৈশ্বর্য দান করেন। সুতরাং, ধর্মাচরণ করলে এভাবে সকলেই লাভবান হয়।

স্বধর্ম দুই রকমের। জড় বন্ধনমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত জীবকে শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী তার দেহের ধর্ম পালন করতে হয় এবং তার ফলে সে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। মুক্ত অবস্থায় জীব তার অপ্রাকৃত স্বরূপে অধিষ্ঠিত থাকে। তখন আর তার দেহাত্মবুদ্ধি থাকে না, তাই তখন তাকে জড়-জাগতিক অথবা দেহগত আচার অনুষ্ঠান করতে হয় না। শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী, বদ্ধ অবস্থায় দেহাত্মবুদ্ধির

স্তরে জীবের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারটি স্তর থাকে এবং তাদের স্ব-স্ব ধর্ম থাকে এবং এই ধর্ম আচরণ করা অবশ্য কর্তব্য। ভগবান নিজেই গুণ ও কর্ম অনুসারে এই স্বধর্ম নির্ধারিত করেছেন এবং এই সম্বন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। দেহগত স্বধর্মকে বলা হয় বর্ণাশ্রম-ধর্ম অথবা মানুষের পারমার্থিক উন্নতি লাভের উপায়। বর্ণাশ্রম-ধর্ম অথবা জড়া প্রকৃতির নির্দিষ্ট গুণ অনুসারে প্রাপ্ত দেহটির দ্বারা অনুষ্ঠিত বিশেষ কর্তব্যকর্মের স্তর থেকে মানব-সভ্যতা শুরু হয়। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উচ্চ-কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুসারে এই বর্ণাশ্রম-ধর্ম আচরণ করার ফলে মানুষ ক্রমে ক্রমে উচ্চ থেকে উচ্চতর জীবন প্রাপ্ত হয়ে অবশেষে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়।

শ্লোক ৩২

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্ ।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২ ॥

যদৃচ্ছয়া—আপনা থেকেই; **চ**—এবং; **উপপন্নম্**—উপস্থিত হয়েছে; **স্বর্গদ্বারম্**—স্বর্গদ্বার; **অপাবৃতম্**—উন্মুক্ত; **সুখিনঃ**—সুখী; **ক্ষত্রিয়াঃ**—ক্ষত্রিয়েরা; **পার্থ**—হে পৃথাপুত্র; **লভন্তে**—লাভ করেন; **যুদ্ধম্**—যুদ্ধ; **ঈদৃশম্**—এই রকম।

গীতার গান

অনায়াসে পাইয়াছ স্বর্গদ্বার খোলা ।
সে যুদ্ধ কার্যেতে নাহি কর অবহেলা ॥
ভাগ্যবান বীর সেই হেন যুদ্ধ পায় ।
যুদ্ধ করি যজ্ঞফল ক্ষত্রিয় লভয় ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! স্বর্গদ্বার উন্মোচনকারী এই প্রকার ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সুযোগ না চাইতেই যে সব ক্ষত্রিয়ের কাছে আসে, তাঁরা সুখী হন।

তাৎপর্য

অর্জুন যখন বলেছিলেন, "এই যুদ্ধে কোন লাভ নেই। এই পাপের ফলে আমাকে অনন্তকাল ধরে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।" তখন সমস্ত জগতের পরম

শিক্ষাগুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে তিরস্কার করে বলেছিলেন যে, তাঁর এই উক্তি তাঁর মূর্খতার পরিচায়ক। তাঁর স্বধর্ম—ক্ষাত্রধর্ম ত্যাগ করে অহিংস নীতি অবলম্বন করা তাঁর পক্ষে অনুচিত। যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষত্রিয় যদি অহিংস নীতি অবলম্বন করে, তবে তাকে একটি মস্ত বড় মূর্খ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। *পরাশর-স্মৃতিতে* ব্যাসদেবের পিতা পরাশর মুনি বর্ণনা করেছেন—

ক্ষত্রিয়ো হি প্রজা রক্ষন্ শস্ত্রপাণিঃ প্রদণ্ডয়ন্ ।
নির্জিত্য পরসৈন্যাদি ক্ষিতিং ধর্মেণ পালয়েৎ ॥

"সব রকম দুঃখ-দুর্দশা থেকে রক্ষা করে প্রজা-পালন করাই হচ্ছে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম এবং সেই কারণে নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্য তাঁকে অস্ত্রধারণপূর্বক দণ্ডদান করতে হয়। তাই তাঁকে বিরোধী ভাবাপন্ন রাজার সৈন্যদের বলপূর্বক পরাজিত করতে হয় এবং এভাবেই ধর্মের দ্বারা তাঁর পৃথিবী পালন করা উচিত।"

সব দিক দিয়ে বিবেচনা করে দেখলে দেখা যায়, অর্জুনের যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার কোনই কারণ ছিল না। যুদ্ধে যদি তিনি জয়লাভ করতেন, তবে তিনি রাজ্যসুখ ভোগ করতেন, আর যদি যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু হত, তবে তিনি স্বর্গলোকে উন্নীত হতেন—যেখানে তাঁর জন্য দ্বার ছিল অবারিত। যুদ্ধ করলে উভয় ক্ষেত্রেই তিনি লাভবান হতেন।

শ্লোক ৩৩

অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি ।
ততঃ স্বধর্মং কীর্তিং চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩ ॥

অথ—সুতরাং; **চেৎ**—যদি; **ত্বম্**—তুমি; **ইমম্**—এই; **ধর্ম্যম্**—ধর্ম; **সংগ্রামম্**—যুদ্ধ; **ন**—না; **করিষ্যসি**—কর; **ততঃ**—তা হলে; **স্বধর্মম্**—তোমার স্বীয় ধর্ম; **কীর্তিম্**—কীর্তি; **চ**—এবং; **হিত্বা**—হারিয়ে; **পাপম্**—পাপ; **অবাপ্স্যসি**—লাভ করবে।

গীতার গান

অতএব তুমি পার্থ যদি যুদ্ধ ছাড় ।
স্বধর্ম স্বকীর্তি সব একত্রে উগার ॥

অনুবাদ

কিন্তু, তুমি যদি এই ধর্মযুদ্ধ না কর, তা হলে তোমার স্বীয় ধর্ম এবং কীর্তি থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পাপ ভোগ করবে।

তাৎপর্য

অর্জুনের বীরত্বের খ্যাতি ছিল সর্বজনবিদিত। তিনি মহাদেবের মতো দেবতাদেরও যুদ্ধে পরাস্ত করেছেন। কিরাতরূপী মহাদেবকে যুদ্ধে পরাস্ত করলে, সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব তাঁকে পাশুপত নামক এক ভয়ঙ্কর অস্ত্র দান করেন। তাঁর অস্ত্রশিক্ষা-গুরু দ্রোণাচার্যও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করেন এবং এমন একটি অস্ত্র দান করেন, যার দ্বারা তিনি দ্রোণাচার্যকেও পর্যন্ত হত্যা করতে পারতেন। তাঁর ধর্মপিতা দেবরাজ ইন্দ্রও তাঁকে তাঁর বীরত্বের জন্য পুরস্কৃত করেন। এভাবে অর্জুনের বীরত্বের খ্যাতি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সুবিদিত ছিল। তাই তিনি যদি যুদ্ধবিমুখ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করতেন, তবে তিনি কেবল তাঁর ক্ষাত্রধর্মেরই যে অবহেলা করতেন তা নয়, সেই সঙ্গে তাঁর বীরত্বের গৌরবও নষ্ট হত এবং তাঁকে নরকগামী হতে হত। পক্ষান্তরে, যুদ্ধ করার জন্য অর্জুনকে নরকে যেতে হত না, বরং যুদ্ধ না করার জন্যই তাঁকে নরকে যেতে হত।

শ্লোক ৩৪

অকীর্তিং চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্ ।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪ ॥

অকীর্তিম্—কীর্তিহীনতা; **চ**—এবং; **অপি**—তা ছাড়া; **ভূতানি**—সমস্ত লোক; **কথয়িষ্যন্তি**—বলবে; **তে**—তোমার সম্পর্কে; **অব্যয়াম্**—চিরকাল; **সম্ভাবিতস্য**—কোনও মর্যাদাবান লোকের পক্ষে; **চ**—আরও; **অকীর্তিঃ**—অসম্মান; **মরণাৎ**—মৃত্যু অপেক্ষা; **অতিরিচ্যতে**—অধিক হয়।

গীতার গান

তোমার অকীর্তি লোক নিশ্চয়ই গাহিবে ।
বাঁচিয়া মরণ তব বিঘোষিত হবে ॥

অনুবাদ

সমস্ত লোক তোমার কীর্তিহীনতার কথা বলবে এবং যে-কোন মর্যাদাবান লোকের পক্ষেই এই অসম্মান মৃত্যু অপেক্ষাও অধিকতর মন্দ।

তাৎপর্য

অর্জুনের বন্ধু ও উপদেষ্টারূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে জানিয়ে দিচ্ছেন, যুদ্ধ না করলে তার ফলাফল কি হবে। ভগবান বলেছেন, "অর্জুন! যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বেই যদি তুমি যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ কর, তবে সকলে বলবে—তুমি কাপুরুষ। তোমার মতো যশস্বী ও মহানুভব বীরের পক্ষে এই কুখ্যাতির চাইতে মৃত্যুবরণ করা শ্রেয়। তাই, প্রাণরক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করার চাইতে যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করা অনেক ভাল। তার ফলে, তুমি আমার বন্ধুত্বের মর্যাদা রক্ষা করবে এবং সমাজে তোমার সুনামও অক্ষুণ্ণ থাকবে।"

এভাবেই ভগবান অর্জুনকে বোঝালেন, যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করার চাইতে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ ত্যাগ করা অনেক শ্রেয়।

শ্লোক ৩৫

ভয়াদ্ রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ ।
যেষাং চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্ ॥ ৩৫ ॥

ভয়াৎ—ভয়বশত; **রণাৎ**—রণক্ষেত্র থেকে; **উপরতম্**—নিবৃত্ত; **মংস্যন্তে**—মনে করবে; **ত্বাম্**—তোমাকে; **মহারথাঃ**—মহারথীরা; **যেষাম্**—যাদের কাছে; **চ**—এবং; **ত্বম্**—তুমি; **বহুমতঃ**—অত্যন্ত সম্মানিত; **ভূত্বা**—হয়ে; **যাস্যসি**—প্রাপ্ত হবে; **লাঘবম্**—লঘুতা।

গীতার গান

মহারথ যারা সব নিন্দা যে করিবে ।
ভয় পেয়ে ছাড়ে রণ তারা যে বলিবে ॥
যাহাদের গণ্যমান্য তুমি যে এখন ।
সকলের চক্ষে ছোট হইবে তখন ॥

অনুবাদ

সমস্ত মহারথীরা মনে করবেন যে, তুমি ভয় পেয়ে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করেছ এবং তুমি যাদের কাছে সম্মানিত ছিলে, তারাই তোমাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য জ্ঞান করবে।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর মতামত ব্যক্ত করে বললেন, "অর্জুন! তুমি মনে করো না যে, দুর্যোধন, কর্ণ আদি রথী-মহারথীরা মনে করবে, তুমি করুণার বশবর্তী হয়ে যুদ্ধ করতে বিমুখ হয়েছ। তারা বলবে, তুমি প্রাণভয়ে ভীত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছ। ফলে, তোমার প্রতি তাদের যে উচ্চ ধারণা আছে, তা নস্যাৎ হবে।"

শ্লোক ৩৬

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥ ৩৬ ॥

অবাচ্য—অকথ্য; **বাদান্**—বাক্য; **চ**—এবং; **বহূন্**—বহু; **বদিষ্যন্তি**—বলবে; **তব**—তোমার; **অহিতাঃ**—শত্রুরা; **নিন্দন্তঃ**—নিন্দা করে; **তব**—তোমার; **সামর্থ্যম্**—সামর্থ্য; **ততঃ**—তার চেয়ে; **দুঃখতরম্**—অধিক দুঃখদায়ক; **নু**—অবশ্য; **কিম্**—আর কি আছে।

গীতার গান

কত গালাগালি দিবে অকথ্য কথন ।
ভাবি দেখ তব হিত কি হবে তখন ॥
নিজ নিন্দা শুনি তুমি নীরবে রহিবে ।
বল পার্থ সেই নিন্দা কেমনে সহিবে ॥

অনুবাদ

তোমার শত্রুরা তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করে বহু অকথ্য কথা বলবে। তার চেয়ে অধিকতর দুঃখদায়ক তোমার পক্ষে আর কি হতে পারে?

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের অভাবনীয় হৃদয়-দৌর্বল্য দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, এই ধরনের মনোভাব কেবল অনার্যদেরই শোভা পায়। অর্জুনের মতো ক্ষত্রিয়-বীরের পক্ষে তা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। তাই তিনি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে অর্জুনকে বোঝালেন, অর্জুনের মতো ক্ষত্রিয়ের হৃদয়ে এই অনার্যোচিত দৌর্বল্যের কোন স্থান নেই।

শ্লোক ৩৭

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্ ।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

হতঃ—নিহত হলে; **বা**—অথবা; **প্রাপ্স্যসি**—লাভ করবে; **স্বর্গম্**—স্বর্গ; **জিত্বা**—জয় লাভ করলে; **বা**—অথবা; **ভোক্ষ্যসে**—ভোগ করবে; **মহীম্**—পৃথিবী; **তস্মাৎ**——অতএব; **উত্তিষ্ঠ**—উত্থিত হও; **কৌন্তেয়**—হে কুন্তীপুত্র; **যুদ্ধায়**—যুদ্ধের জন্য; **কৃত**—দৃঢ়সঙ্কল্প; **নিশ্চয়ঃ**—নিশ্চিত হয়ে।

গীতার গান

মরে যদি স্বর্গ পাও সেও ভাল কথা ।
বাঁচিয়া পাইবে ভোগ নহে সে অন্যথা ॥
বাঁচা মরা দুই ভাল যুদ্ধেতে নিশ্চয় ।
হেন যুদ্ধ ছাড় তুমি আশ্চর্য বিষয় ॥
হে কৌন্তেয় উঠ তুমি নাহি কর হেলা ।
যুদ্ধ করিবারে নিশ্চয় কর এই বেলা ॥

অনুবাদ

হে কুন্তীপুত্র! এই যুদ্ধে নিহত হলে তুমি স্বর্গ লাভ করবে, আর জয়ী হলে পৃথিবী ভোগ করবে। অতএব যুদ্ধের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে উত্থিত হও।

তাৎপর্য

যুদ্ধে যদি অর্জুনের জয় সুনিশ্চিত না-ও হত, তবু সেই যুদ্ধ তাঁকে করতেই হত। কারণ, সেই যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হলেও, তিনি স্বর্গলোকেই উন্নীত হতেন।

শ্লোক ৩৮

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮ ॥

সুখ—সুখ; **দুঃখে**—দুঃখে; **সমে**—সমানভাবে; **কৃত্বা**—করে; **লাভালাভৌ**—লাভ ও ক্ষতিকে; **জয়াজয়ৌ**—জয় ও পরাজয়কে; **ততঃ**—তারপর; **যুদ্ধায়**—যুদ্ধার্থে; **যুজ্যস্ব**—যুদ্ধ কর; **ন**—না; **এবম্**—এভাবে; **পাপম্**—পাপ; **অবাপ্স্যসি**—লাভ হবে।

গীতার গান

সুখদুঃখ সমকর নাহি লাভ সব ।
জয়াজয় নাহি ভয় কর্তব্য বলিব ॥
যুদ্ধের লাগিয়া তুমি শুধু যুদ্ধ কর ।
নাহি তাতে পাপ ভয় এই সত্য বড় ॥

অনুবাদ

সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি ও জয়-পরাজয়কে সমান জ্ঞান করে তুমি যুদ্ধের নিমিত্ত যুদ্ধ কর, তা হলে তোমাকে পাপভাগী হতে হবে না।

তাৎপর্য

ভগবান এখানে স্পষ্টভাবে অর্জুনকে বলেছেন, জয়-পরাজয়ের বিবেচনা না করে কেবল কর্তব্যের খাতিরে যুদ্ধ করার জন্য যুদ্ধ করতে হবে। কারণ, ভগবানের ইচ্ছা অনুসারেই এই যুদ্ধ আয়োজিত হয়েছে। কৃষ্ণভাবনাময় কার্যকলাপের সময় সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয় আদি জাগতিক ফলাফলের বিবেচনা করা নিরর্থক। কারণ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্য যে কর্মই করা হোক না কেন, তা জাগতিক ফলাফলের অতীত—সে সমস্ত কর্মই অপ্রাকৃত কর্ম। যে মানুষ তার ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করবার জন্য কর্ম করে, তার সেই কর্মের জন্য তাকে শুভ অথবা অশুভ ফল ভোগ করতে হয়। কিন্তু যে মানুষ ভগবানের সেবায় নিজেকে সর্বতোভাবে উৎসর্গ করেছেন, তাঁর কারও প্রতি কোন কর্তব্য আর বাকি থাকে না এবং কারও প্রতি তাঁর আর কোন ঋণও থাকে না। স্বয়ং ভগবান ছাড়া আর কেউ তাঁর কর্মের ফলাফল নির্ধারণ করতে পারে না। সাধারণ অবস্থায় প্রতিটি কর্মের জন্য মানুষকে কারও না কারও কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হয়, কিন্তু ভগবানের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে কর্ম করলে আর সেই সমস্ত বন্ধন থাকে না। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্ ।
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্ ॥

"যিনি শ্রীকৃষ্ণ বা মুকুন্দের চরণে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, অন্যান্য সমস্ত কর্তব্যকর্ম

পরিত্যাগ করলেও তিনি দেবতা, ঋষি, জনসাধারণ, আত্মীয়স্বজন বা পিতৃপুরুষ, কারও কাছেই ঋণী নন।" (ভাঃ ১১/৫/৪১) কোন রকম ফলাফলের বিচার না করে শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মনিবেদন করাটাই যে মানব-জীবনের পরম কর্তব্য, সেই কথা ভগবান সংক্ষেপে অর্জুনকে জানিয়ে দিলেন। এই শ্লোকে অর্জুনের প্রতি এটিই পরোক্ষ ইঙ্গিত এবং পরবর্তী শ্লোকে ভগবান এই বিষয়ে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করবেন।

শ্লোক ৩৯

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু ।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯ ॥

এষা—এই সমস্ত; **তে**—তোমাকে; **অভিহিতা**—বলা হল; **সাংখ্যে**—বিশ্লেষণ-মূলক জ্ঞান বিষয়ে; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **যোগে**—নিষ্কাম কর্মে; **তু**—কিন্তু; **ইমাম্**—এই; **শৃণু**—শ্রবণ কর; **বুদ্ধ্যা**—বুদ্ধির দ্বারা; **যুক্তঃ**—যুক্ত হলে; **যয়া**—যার দ্বারা; **পার্থ**—হে পৃথাপুত্র; **কর্মবন্ধম্**—কর্মের বন্ধন; **প্রহাস্যসি**—তুমি মুক্ত হতে পারবে।

গীতার গান

জ্ঞানের বিচারে সব বলিনু তোমাকে ।
এবে শুন বুদ্ধিযোগে জ্ঞান পরিপাক ॥
জ্ঞানীর যোগ্যতা যদি পরিপাক হয় ।
ভক্তি দ্বারা বুদ্ধিযোগ তবে সে বুঝয় ॥
ভক্তিযুক্ত কর্ম হয় কর্মযোগ নাম ।
যাহার সাধনে কর্ম বন্ধন বিরাম ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! আমি তোমাকে সাংখ্য-যোগের কথা বললাম। এখন ভক্তিযোগ সম্বন্ধিনী বুদ্ধির কথা শ্রবণ কর, যার দ্বারা তুমি কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে।

তাৎপর্য

নিরুক্তি বা বৈদিক অভিধান অনুযায়ী *সংখ্যা* কথাটির অর্থ হচ্ছে, যা কোন কিছুর বিশদ বিবরণ দেয় এবং *সাংখ্য* বলতে সেই দর্শনকে বোঝায় যা আত্মার স্বরূপ

বর্ণনা করে। আর 'যোগ' হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করার পন্থা। অর্জুনের যুদ্ধ না করার কারণ ছিল ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের ইচ্ছা। তাঁর পরম কর্তব্যের কথা ভুলে গিয়ে অর্জুন যুদ্ধ করতে নারাজ হলেন, কারণ তিনি মনে করেছিলেন, ধৃতরাষ্ট্রের সন্তান এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের হত্যা করে রাজ্যসুখ ভোগ করার চাইতে অহিংসার পথ অবলম্বন করা অধিকতর সুখদায়ক হবে। উভয় ক্ষেত্রেই অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের ইচ্ছা। আত্মীয়-স্বজনদের পরাজিত করে রাজ্যসুখ ভোগ করা এবং তাদের জীবিত দেখে তাদের সান্নিধ্যে সুখ লাভ করা, এই দুই ক্ষেত্রেই ইন্দ্রিয়ের সুখভোগই হচ্ছে একমাত্র কারণ। এভাবেই অর্জুন তাঁর জ্ঞান ও কর্তব্য বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে এই চিন্তাধারা অবলম্বন করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাই অর্জুনকে বুঝাতে চেয়েছিলেন, তাঁর পিতামহকে হত্যা করলেও, তিনি তাঁর পিতামহের আত্মাকে কখনই বিনাশ করতে পারবেন না, কারণ প্রতিটি জীব এবং ভগবান সনাতন ও স্বতন্ত্র । পূর্বেও এরা সকলেই এদের স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে বর্তমান ছিল, বর্তমানেও এরা আছে এবং ভবিষ্যতেও এরা থাকবে। প্রতিটি স্বতন্ত্র জীবের স্বরূপ হচ্ছে তার চিরশাশ্বত আত্মা। বিভিন্ন সময়ে সে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের দেহ ধারণ করে, যা হচ্ছে পোশাকের মতো। তাই, জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হবার পরেও জীবের স্বাতন্ত্র্য বর্তমান থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে আত্মা ও দেহ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে স্পষ্ট ব্যাখ্যা করেছেন। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে আত্মা ও দেহ সম্বন্ধে এই বর্ণনামূলক জ্ঞানকে *নিরুক্তি* অভিধান অনুসারে সাংখ্য নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই সাংখ্যের সঙ্গে নিরীশ্বরবাদী কপিলের সাংখ্য-দর্শনের কোন যোগাযোগ নেই। ভণ্ড কপিলের সাংখ্য-দর্শনের বহু পূর্বে *শ্রীমদ্ভাগবতে* প্রকৃত সাংখ্য-দর্শনের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভগবানের অবতার কপিলদেব (ইনি নিরীশ্বরবাদী কপিল নন) তাঁর মাতা দেবহূতিকে এই দর্শনের ব্যাখ্যা করে শোনান। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, *পুরুষ* অথবা পরমেশ্বর ভগবান সক্রিয় এবং প্রকৃতির প্রতি তাঁর দৃষ্টিপাতের ফলে জড় জগতের উদ্ভব হয়। *বেদে* এবং *ভগবদ্গীতাতেও* এই কথা স্বীকৃত হয়েছে। *বেদে* বলা হয়েছে, ভগবান যখন প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখন তাঁর সেই দৃষ্টিপাতের ফলে প্রকৃতিতে অসংখ্য পারমাণবিক আত্মার সঞ্চার হয়। জড়া প্রকৃতিতে এই সমস্ত আত্মা তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে এবং মায়ার প্রভাবের ফলে তারা মনে করছে, তারা ভোক্তা। এই বিকৃত মনোবৃত্তির সবচেয়ে অধঃপতিত অবস্থার প্রকাশ হয়, যখন তারা ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাবার বাসনায় মুক্তি কামনা করে এবং তার পরিণতিতে নিজেদেরই ভগবান বলে জাহির করতে চেষ্টা

করে। এটিই হচ্ছে মায়ার সবচেয়ে কঠিন ফাঁদ, কারণ তথাকথিত মুক্তিকামীরা মায়ামুক্ত হতে গিয়ে মায়ার সবচেয়ে জটিল ফাঁদে আটকে যায়। বহু বহু জন্ম এভাবে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করবার বাসনায় মায়ার দ্বারা ভবসমুদ্রে নাকানি-চোবানি খাবার পর, যখন জীবের অন্তরে শুভ বুদ্ধির উদয় হয়, তখন সে বুঝতে পারে, বাসুদেব বা শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করাই হচ্ছে জীবের চরম উদ্দেশ্য এবং ভবসমুদ্র থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র পথ। তখন সে পরম সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে।

অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করে তাঁকে গুরুরূপে গ্রহণ করেছেন—*শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।* ফলস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ এখন তাঁকে 'বুদ্ধিযোগ' বা 'কর্মযোগ' অথবা নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করার পরিবর্তে ভগবানের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য ভক্তিযোগ অনুশীলনের পন্থা বর্ণনা করবেন। এই বুদ্ধিযোগকে দশম অধ্যায়ের দশম শ্লোকে সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে, ভগবানের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন, যিনি পরমাত্মারূপে সকলের অন্তরেই বিরাজ করছেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত সেই রকম যোগাযোগ স্থাপন হয় না। তাই যিনি ভগবানে অপ্রাকৃত প্রেমভক্তির স্তরে অবস্থিত, পক্ষান্তরে যিনি কৃষ্ণভাবনাময়, তিনিই ভগবানের বিশেষ কৃপায় এই বুদ্ধিযোগের স্তর লাভ করেন। তাই ভগবান বলেছেন যে, যাঁরা প্রীতিপূর্বক ভগবৎ-সেবায় নিয়োজিত, কেবল তাঁদেরই তিনি প্রেমভক্তির শুদ্ধ জ্ঞান প্রদান করবেন। এভাবে ভগবদ্ভক্ত চির-আনন্দময় ভগবানের রাজ্যে তাঁর কাছে পৌঁছাতে পারেন।

এভাবে এই শ্লোকে বুদ্ধিযোগ বলতে ভক্তিযোগকে বোঝানো হয়েছে এবং এখানে সাংখ্য অর্থে নিরীশ্বরবাদী কপিলের 'সাংখ্য-যোগ'কে বোঝানো হয়নি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে সময়ে *ভগবদ্‌গীতা* বলেছিলেন, তখন সেই সাংখ্য-যোগের কোন প্রভাব ছিল না, আর তা ছাড়া কপিলের মতো নাস্তিকের কল্পনাপ্রসূত এই ভ্রান্তিবিলাস নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজনই ভগবানের ছিল না। পূর্বেই বলা হয়েছে, ভগবানের অবতার কপিলদেব প্রকৃত সাংখ্য *শ্রীমদ্ভাগবতে* ব্যাখ্যা করে গেছেন। কিন্তু এখানে সেই সাংখ্যের কথাও ভগবান বলেননি। সাংখ্য বলতে এখানে দেহ ও আত্মার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণের বিবরণের কথা বলা হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে অর্জুনকে আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে বিশদভাবে বর্ণনা করে শোনালেন যাতে তিনি বুদ্ধিযোগ বা ভক্তিযোগের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারেন। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে সাংখ্যের কথা বলেছেন এবং *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণিত ভগবান কপিলদেবের সাংখ্যের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই, কারণ উভয়

সাংখ্যই হচ্ছে ভক্তিযোগ। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরাই কেবল সাংখ্য-যোগ ও ভক্তিযোগকে ভিন্ন বলে মনে করে (*সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ*)।

নাস্তিক কপিলের যে সাংখ্য-যোগ তার সঙ্গে ভক্তিযোগের অবশ্যই কোন সম্পর্ক নেই, তবুও কিছু বুদ্ধিহীন লোক দাবি করে থাকে, *ভগবদ্‌গীতায়* নাকি নাস্তিক সাংখ্য-যোগের উল্লেখ আছে।

ভগবদ্‌গীতার মূল তত্ত্ব এখানে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এই শ্লোকের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি, বুদ্ধিযোগের অর্থ হচ্ছে কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হয়ে ভগবানের সেবা করা। ভগবানের তৃপ্তিসাধন করার জন্য ভগবদ্ভক্ত যখন বুদ্ধিযোগের মাধ্যমে কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করেন, সেই কর্তব্যকর্ম যতই কষ্টকর হোক না কেন, ভগবৎ-ভাবনায় মগ্ন হয়ে থাকার ফলে তিনি তখন অপ্রাকৃত আনন্দে মগ্ন থাকেন। ভগবানের এই সেবার ফলে অনায়াসে অপ্রাকৃত অনুভূতির আস্বাদ পাওয়া যায় এবং ভগবানের কৃপার ফলে কোন রকম বাহ্যিক প্রচেষ্টা ছাড়াই হৃদয়ে দিব্যজ্ঞানের প্রকাশ হয় এবং এভাবে তিনি মুক্তিলাভ করে পূর্ণতা প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম ও সকাম কর্মের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ রয়েছে, বিশেষ করে পারিবারিক ও জাগতিক সুখলাভের নিমিত্ত ইন্দ্রিয়-তর্পণের বিষয়ে। তাই বুদ্ধিযোগ হচ্ছে অপ্রাকৃত গুণসম্পন্ন কর্ম, যা আমাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

শ্লোক ৪০

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০ ॥

ন—নেই; **ইহ**—এই যোগে; **অভিক্রম**—প্রচেষ্টা; **নাশ**—বিনাশ; **অস্তি**—আছে; **প্রত্যবায়ঃ**—হ্রাস; **ন বিদ্যতে**—হয় না; **স্বল্পম্**—অল্প; **অপি**—যদিও; **অস্য**—এই; **ধর্মস্য**—ধর্মের; **ত্রায়তে**—ত্রাণ করে; **মহতঃ**—মহা; **ভয়াৎ**—ভয় থেকে।

গীতার গান

ক্ষয় ব্যয় নাহি নাশ সে কার্য সাধনে।
যাহা পার করে যাও সঞ্চয় এ ধনে ॥
স্বল্প মাত্র হয় যদি সে ধর্ম সাধন।
মহাভয় হতে রক্ষা পাইবে তখন ॥

অনুবাদ

ভক্তিযোগের অনুশীলন কখনও ব্যর্থ হয় না এবং তার কোনও ক্ষয় নেই। তার স্বল্প অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠাতাকে সংসাররূপ মহাভয় থেকে পরিত্রাণ করে।

তাৎপর্য

নিজের সুখ-সুবিধার কথা বিবেচনা না করে কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম বা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাই হচ্ছে সবচেয়ে মহৎ কাজ। কেউ যদি একটু একটু করেও ভগবানের সেবা করতে শুরু করে, তাতেও কোন ক্ষতি নেই এবং ভগবানের এই সেবা যত নগণ্যই হোক না কেন, কোন অবস্থাতেই তা বিফলে যায় না। জড়-জাগতিক স্তরে যে কোন কাজকর্ম যতক্ষণ পর্যন্ত সুসম্পন্ন না হচ্ছে, ততক্ষণ তার কোন তাৎপর্যই থাকে না। কিন্তু অপ্রাকৃত কর্ম বা ভগবৎ-সেবা সুসম্পন্ন না হলেও, বিফলে যায় না—তার সুফল চিরস্থায়ী হয়ে থাকে। ভগবানের সেবা একবার যে শুরু করেছে, তার আর বিপথগামী হবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। এক জন্মে যদি তার ভগবদ্ভক্তি সম্পূর্ণ নাও হয়, তবে তার পরের জন্মে সে যেখানে শেষ করেছিল, সেখান থেকে আবার শুরু করবে। এভাবেই ভগবদ্ভক্তির ফল চিরস্থায়ী থাকে বলে ক্রমান্বয়ে জীবকে মায়ামুক্ত করে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* অজামিলের কাহিনীর মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, খানিকটা ভগবদ্ভক্তি সাধন করে, অধঃপতিত হওয়া সত্ত্বেও সে ভগবানের অহৈতুকী কৃপা লাভ করে উদ্ধার পেয়ে যায়। এই সম্পর্কে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/৫/১৭) একটি সুন্দর শ্লোক আছে—

ত্যক্ত্বা স্বধর্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি ।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্মতঃ ॥

"যদি কেউ তার স্বীয় কর্তব্যকর্ম ত্যাগ করে ভগবানের শ্রীচরণাম্বুজের সেবা করে এবং সেই ভগবৎ-সেবা সম্পূর্ণ না করে অধঃপতিত হয়, তাতে ক্ষতি কি? আর যদি কেউ জড়-জাগতিক সমস্ত কর্তব্যকর্ম সুসম্পন্ন করে তাতে তার কি লাভ?" কিংবা, যেমন খ্রিস্টধর্মীরা বলে থাকেন, "কোনও মানুষ সমগ্র পৃথিবী লাভ করেও যদি তার শাশ্বত আত্মাকেই হারিয়ে ফেলে, তবে তার কি লাভ?"

জড় দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে সব রকম জড়-জাগতিক প্রচেষ্টা এবং সেই সমস্ত প্রচেষ্টালব্ধ ফল, সব কিছুরই বিনাশ ঘটে। কিন্তু ভগবানের সেবায় মানুষ

যে সব কাজকর্ম করে, তার ফলে সে আবার আরও ভালভাবে ভগবানের সেবা করবার সুযোগ পায়, এমন কি দেহের বিনাশ হলেও। ভগবানের সেবাকার্য সম্পূর্ণ না করে যদি কেউ দেহত্যাগ করে, তবে পরজন্মে সে আবার মনুষ্যজন্ম লাভ করে। সৎ ব্রাহ্মণ অথবা প্রতিপত্তিশালী সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম লাভ করে সে আবার তার অসম্পূর্ণ ভগবদ্ভক্তিকে সম্পূর্ণ করে ভগবানের কাছে ফিরে যাবার সুযোগ পায়। কৃষ্ণভাবনাময় কর্মে আত্মনিয়োগ করার এই হচ্ছে অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য।

শ্লোক ৪১

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন ।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১ ॥

ব্যবসায়াত্মিকা—নিশ্চয়াত্মিকা কৃষ্ণভক্তি; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **একা**—একটি মাত্র; **ইহ**—এই জগতে; **কুরুনন্দন**—হে কুরুবংশীয়; **বহুশাখা**—বহু শাখায় বিভক্ত; **হি**—যেহেতু; **অনন্তাঃ**—অনন্ত; **চ**—এবং; **বুদ্ধয়ঃ**—বুদ্ধি; **অব্যবসায়িনাম্**—কৃষ্ণভক্তিবিহীন ব্যক্তিদের।

গীতার গান

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি হে কুরুনন্দন ।
একমাত্র হয় তাহা বহু না কখন ॥
অনন্ত অপার সে অব্যবসায়ী হয় ।
বহু শাখা বিস্তারিত কে করে নির্ণয় ॥

অনুবাদ

যারা এই পথ অবলম্বন করেছে তাদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একনিষ্ঠ। হে কুরুনন্দন, অস্থিরচিত্ত সকাম ব্যক্তিদের বুদ্ধি বহু শাখাবিশিষ্ট ও বহুমুখী।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত নিঃশঙ্কচিত্তে বিশ্বাস করেন যে, ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করলে, ভগবান তাঁকে এই জড় জগতের বন্ধনমুক্ত করে ভগবৎ-ধামে তাঁর নিজের

কাছে নিয়ে যাবেন। এই বিশ্বাসকে বলা হয় ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (মধ্য ২২/৬২) বলা হয়েছে—

'শ্রদ্ধা'-শব্দে—বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয়॥

বিশ্বাস মানে কোনও সুমহান বিষয়ে অবিচল আস্থা। সাধারণ অবস্থায় মানুষের নানা রকম দায়-দায়িত্ব থাকে। তার পরিবারের কাছে, সমাজের কাছে, দেশের কাছে, তার কোন না কোন রকম কর্তব্য থাকে। এভাবে মনুষ্য-সমাজ সকলের কাছ থেকেই কোন না কোন রকম কর্তব্য দাবি করে থাকে। আর মানুষও তার পূর্বকৃত ভাল-মন্দ কর্মের ফল অনুসারে জীবন অতিবাহিত করতে থাকে। কিন্তু যখন মানুষ ভগবৎ-সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে, তখন আর তাকে সৎ কর্ম করে শুভ ফল লাভের প্রত্যাশী হতে হয় না, অথবা অসৎ কর্ম করে তার অশুভ ফল ভোগ করার ভয়ে ভীত হতে হয় না। কারণ, ভগবৎ-সেবা হচ্ছে অপ্রাকৃত কর্ম, তা ভাল-মন্দ, শুভ-অশুভ, এই সব দ্বন্দ্বের অতীত। ভক্তিযোগের সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হলে জড় জগতের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক থাকে না—একেই বলে বৈরাগ্য। ভগবদ্ভক্তির বিকাশ হতে থাকলে, ভগবানের কৃপার ফলেই এক সময় এই স্তরে উপনীত হওয়া যায়।

কৃষ্ণভাবনায় কোন ব্যক্তির নিশ্চয়াত্মিকা কৃষ্ণভক্তির ভিত্তি হচ্ছে জ্ঞান। পরম তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করার পরই ভক্ত ভগবানের চরণে নিজেকে সমর্পণ করেন। *বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ*—একজন কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তি দুর্লভ মহাত্মা এবং তিনি জ্ঞানের মাধ্যমে বুঝতে পারেন, বাসুদেব বা শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সর্ব কারণের মূল। কারণ, তিনিই হচ্ছেন সমস্ত কিছুর উৎস। গাছের গোড়ায় জল দিলে যেমন সারা গাছকেই জল দেওয়া হয়, তেমনই, সব কিছুর উৎস ভগবানের সেবা করলে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সমাজ, জাতি আদি সকলেরই সেবা করা হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদি তুষ্ট হন, তা হলে সকলেই সন্তুষ্ট হবেন।

সদ্‌গুরুর সুদক্ষ তত্ত্বাবধানে এবং তাঁর নির্দেশ অনুসারে ভক্তিযোগের অনুশীলন করাই হচ্ছে মানব-জীবনের পরম কর্তব্যকর্ম। সদ্‌গুরু হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সুযোগ্য প্রতিনিধি। তিনি তাঁর শিষ্যের মনোভাব বুঝতে পারেন এবং সেই অনুযায়ী তিনি তাকে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করেন। তাই, সুষ্ঠুভাবে ভক্তিযোগ সাধন করতে হলে ভগবানের প্রতিনিধি গুরুদেবের নির্দেশ শিরোধার্য করে এবং তাঁর আদেশকে জীবনের একমাত্র কর্তব্য বলে মনে করে তা পালন করতে হবে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর শ্রীগুর্বষ্টকে বলেছেন—

যস্য প্রসাদাদ্ভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

"গুরুদেব সন্তুষ্ট হলে ভগবান সন্তুষ্ট হন এবং গুরুদেবকে সন্তুষ্ট না করতে পারলে কখনই ভগবদ্ভক্তি লাভ করা যায় না। তাই ত্রিসন্ধ্যায় আমি আমার পরমারাধ্য গুরুদেবের কীর্তিসমূহ ধ্যান করি, স্তব করি এবং তাঁর শ্রীচরণারবিন্দের বন্দনা করি।"

দেহাত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করে আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার ফলে ভক্তের হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির উন্মেষ হয় এবং তখন তিনি সর্বান্তঃকরণে ভগবানের সেবায় ব্রতী হন। এই আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান জানলেই কেবল শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত হওয়া যায় না—পূর্ণরূপে তার উপলব্ধি এবং আচরণ করার মাধ্যমেই কেবল শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির বিকাশ হয়। যে মানুষের মন চঞ্চল ও বুদ্ধি অপরিণত, তার পক্ষে ভগবদ্ভক্তি সাধন করা সম্ভব নয়। কারণ, সে সকাম কর্মের দ্বারা অতিমাত্রায় প্রভাবিত থাকার ফলে সম্পূর্ণ নিষ্কাম ভগবদ্ভক্তির মর্ম উপলব্ধি করতে পারে না।

শ্লোক ৪২-৪৩

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥ ৪২॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি॥ ৪৩॥

যাম্ ইমাম্—এই সমস্ত; **পুষ্পিতাম্**—পুষ্পিত; **বাচম্**—বাক্য; **প্রবদন্তি**—বলে; **অবিপশ্চিতঃ**—অবিবেকী মানুষ; **বেদবাদরতাঃ**—বেদের তথাকথিত অনুগামী; **পার্থ**—হে পৃথাপুত্র; **ন**—না; **অন্যৎ**—অন্য কিছু; **অস্তি**—আছে; **ইতি**—এভাবে; **বাদিনঃ**—মতবাদী; **কামাত্মানঃ**—কামনাযুক্ত; **স্বর্গপরাঃ**—স্বর্গ লাভই যাদের প্রধান উদ্দেশ্য; **জন্মকর্মফলপ্রদাম্**—জন্মরূপ কর্মফলপ্রদ; **ক্রিয়াবিশেষ**—আড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ; **বহুলাম্**—বিবিধ; **ভোগ**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ; **ঐশ্বর্য**—ঐশ্বর্য; **গতিম্**—প্রগতি; **প্রতি**—প্রতি।

গীতার গান

পুষ্পের সাজনে যাহা ইষ্ট মিষ্ট কথা।
কর্মীর হৃদয় তাহা করে প্রফুল্লিতা॥

সেই বেদ বাদী সব ভোগের কারণ ।
যথাসর্ব সেই কথা করয়ে বরণ ॥
মূর্খ সেই ভোগবাদী আপাত মধুর ।
দত্তচিত্ত হয়ে যায় আসলে ফতুর ॥
কামাত্মনা লোক সব স্বর্গভোগ চায় ।
কর্মফল ভোগলিপ্সা আর না বুঝয় ॥
আড়ম্বরে ভুলে যায় ভোগৈশ্বর্য চায় ।
বুদ্ধিযোগ এক লক্ষ্য তাহা না মানয় ॥

অনুবাদ

বিবেকবর্জিত লোকেরাই বেদের পুষ্পিত বাক্যে আসক্ত হয়ে স্বর্গসুখ ভোগ, উচ্চকুলে জন্ম, ক্ষমতা লাভ আদি সকাম কর্মকেই জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলে মনে করে। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ ও ঐশ্বর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তারা বলে যে, তার উর্ধ্বে আর কিছুই নেই।

তাৎপর্য

সাধারণত মানুষ অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন এবং তাদের মূর্খতার ফলে তারা *বেদের* কর্মকাণ্ডে বর্ণিত সকাম কর্মের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। ভোগ ও ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ স্বর্গলোকে গিয়ে ইন্দ্রিয়ের চরম তৃপ্তিসাধন করাই হচ্ছে তাদের পরম কাম্য। *বেদে* স্বর্গলোকে যাবার জন্য নানা রকম যজ্ঞের বিধান দেওয়া আছে, তার মধ্যে 'জ্যোতিষ্টোম' যজ্ঞ বিশেষভাবে ফলপ্রদ। বাস্তবিকই যে মানুষ স্বর্গলোকে যেতে চায়, তার পক্ষে এই সমস্ত যজ্ঞগুলি সম্পাদন করা অবশ্য কর্তব্য। তাই অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা মনে করে, এটিই হচ্ছে বৈদিক জ্ঞানের চরম শিক্ষা। এই প্রকার অনভিজ্ঞ লোকদের পক্ষে একাগ্রচিত্তে ভগবদ্ভক্তি সাধন করা সম্ভবপর হয় না। মূর্খ যেমন বিষ-বৃক্ষের ফল দেখে লালায়িত হয়, তেমনই অপরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা স্বর্গলোকের ঐশ্বর্যের দ্বারা প্রলোভিত হয়ে তা ভোগ করবার বাসনায় লালায়িত হয়।

বেদের কর্মকাণ্ডে উল্লেখ আছে—*অপাম সোমমমৃতা অভূম।* এ ছাড়া আরও উল্লেখ আছে—*অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি।* এর মানে, চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করলে মানুষ স্বর্গলোকে গিয়ে সোমরস পান করে অমরত্ব লাভ করে এবং চিরকালের জন্য সুখী হতে পারে। এমন কি এই পৃথিবীতেও বহু লোক

আছে, যারা সোমরস পান করার জন্য নিতান্ত উৎসুক। কারণ, সোমরস পান করে বল ও বীর্য বর্ধন করে কিভাবে আরও বেশি করে ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করতে পারবে, সেটিই তাদের একমাত্র কাম্য। এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে এরা ভগবানের কাছে ফিরে যেতে চায় না। এদের সীমিত বুদ্ধিতে এরা উপলব্ধি করতে পারে না যে, ভগবৎ-ধামে ফিরে যাওয়ার যে আনন্দ, তার তুলনায় স্বর্গসুখ নিতান্তই তুচ্ছ। তাই, তারা আড়ম্বরপূর্ণ বৈদিক যাগযজ্ঞের প্রতি বিশেষভাবে আসক্ত। এই ধরনের লোকেরা অত্যন্ত ইন্দ্রিয়-পরায়ণ, তাই তারা ইন্দ্রিয়-সুখের চরম স্তর স্বর্গলোকের অতীত যে আর কিছু থাকতে পারে, তা বুঝতে পারে না। মনে করে, স্বর্গের নন্দন-কাননে সোমরস পান করে অপরূপ রূপসী অপ্সরাদের সঙ্গ করে ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগই হচ্ছে চরম প্রাপ্তি। এই প্রকার দৈহিক সুখ নিঃসন্দেহে ইন্দ্রিয়জাত; তাই যারা এই প্রকার জাগতিক অস্থায়ী সুখের প্রতি আসক্ত, তারা নিজেদেরকে পার্থিব জগতের প্রভু বলে মনে করে।

শ্লোক ৪৪

ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্ ।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥

ভোগ—জড় সুখভোগে; **ঐশ্বর্য**—ঐশ্বর্যে; **প্রসক্তানাম্**—যারা গভীরভাবে আসক্ত; **তয়া**—তাদের দ্বারা; **অপহৃতচেতসাম্**—বিমূঢ়চিত্ত; **ব্যবসায়াত্মিকা**—দৃঢ়চিত্ত, নিশ্চয়াত্মিকা; **বুদ্ধিঃ**—ভগবানের ভক্তিযুক্ত সেবা; **সমাধৌ**—সংযতচিত্ত; **ন**—না; **বিধীয়তে**—হয় না।

গীতার গান

ভোগৈশ্বর্যে আসক্ত যে পাগলের মত ।
নিজেকে হারিয়া বসে আশা শত শত ॥
তারা নাহি বুঝে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি ।
আসক্তি তাদের শুধু ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি ॥

অনুবাদ

যারা ভোগ ও ঐশ্বর্যসুখে একান্ত আসক্ত, সেই সমস্ত বিবেকবর্জিত মূঢ় ব্যক্তিদের বুদ্ধি সমাধি অর্থাৎ ভগবানে একনিষ্ঠতা লাভ হয় না।

তাৎপর্য

চিত্ত যখন একাগ্র হয়, তখন তাকে বলা হয় সমাধি। বৈদিক অভিধান *নিরুক্তিতে* বলা হয়েছে, *সম্যগাধীয়তেঽস্মিন্নাত্মতত্ত্বযাথাত্ম্যম্*—"মন যখন আত্মাকে উপলব্ধি করার জন্য একাগ্র হয়, তাকে তখন বলা হয় *সমাধি*।" যে মানুষ ইন্দ্রিয়সুখ উপলব্ধি করতে উৎসুক এবং যারা অনিত্য জড় জগতের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন, তাদের পক্ষে একাগ্রচিত্তে আত্ম-উপলব্ধি বা সমাধি লাভ করা অসম্ভব। মায়া তাদের এত গভীরভাবে বেঁধে রেখেছে যে, তাদের পক্ষে সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া দুষ্কর।

শ্লোক ৪৫

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন ।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ৪৫ ॥

ত্রৈগুণ্য—প্রকৃতির তিনটি গুণ সম্পর্কিত; **বিষয়াঃ**—বিষয়ে; **বেদাঃ**—বৈদিক শাস্ত্রসমূহ; **নিস্ত্রৈগুণ্যঃ**—জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণের অতীত; **ভব**—হও; **অর্জুন**—হে অর্জুন; **নির্দ্বন্দ্বঃ**—দ্বন্দ্বরহিত; **নিত্যসত্ত্বস্থঃ**—শুদ্ধ সত্ত্ব চিন্ময় অস্তিত্বে; **নির্যোগক্ষেমঃ**—অলব্ধ বস্তুর লাভ এবং তার রক্ষার চিন্তা থেকে মুক্ত; **আত্মবান্**—অধ্যাত্ম চেতনায় অবস্থিত।

গীতার গান

ত্রিগুণের মধ্যে বেদ সত্ত্ব রজস্তম ।
তাহার উপরে উঠ তবে সে উত্তম ॥
তখনই দ্বন্দ্বভাব ঘুচিবে তোমার ।
নিত্য শুদ্ধ সত্ত্বভাব হবে আবিষ্কার ॥
আত্মবান হয় সদা নির্যোগ নিক্ষেম ।
যে ধনে সে ধনী তাহা ভগবদ্ প্রেম ॥

অনুবাদ

বেদে প্রধানত জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ সম্বন্ধেই আলোচনা করা হয়েছে। হে অর্জুন! তুমি সেই গুণগুলিকে অতিক্রম করে নির্গুণ স্তরে অধিষ্ঠিত হও। সমস্ত দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হও এবং লাভ-ক্ষতি ও আত্মরক্ষার দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে অধ্যাত্ম চেতনায় অধিষ্ঠিত হও।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রভাবে জড় জগতের প্রতিটি ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এই প্রতিক্রিয়া বা কর্মফল জীবকে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে। *বেদ* সাধারণত সকাম কর্ম করার শিক্ষা দান করে, যার ফলে সাধারণ মানুষ জড় সুখ উপভোগ ও জড় ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধনের স্তর থেকে ক্রমশ অধোক্ষজ স্তরে উত্তীর্ণ হতে পারে। ভগবান তাঁর প্রিয় সখা ও প্রিয় শিষ্য অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন, *বেদান্ত* দর্শনের মর্ম উপলব্ধি করে পরা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হতে। এই *বেদান্ত* দর্শনের প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে—*ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা*, অর্থাৎ পরব্রহ্মের অনুসন্ধান করা। জড় জগতে প্রতিটি জীবই বেঁচে থাকার জন্য কঠোর সংগ্রাম করছে। এই সমস্ত মায়াবদ্ধ জীবকে উদ্ধার করার জন্য ভগবান সৃষ্টির আদিতে বৈদিক জ্ঞান দান করেন, যাতে তারা বুঝতে পারে, কি রকম জীবনযাপন করলে তারা এই জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে এবং তাদের প্রকৃত আলয় ভগবৎ-ধামে ফিরে যেতে পারবে। *বেদের* কর্মকাণ্ড নামক অধ্যায়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিভাবে যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে জাগতিক কামনা-বাসনার তৃপ্তিসাধন করা যায়। এভাবে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি জনিত নানা রকম সুখভোগ করার পর জীব যখন বুঝতে পারে, জড় জগতের সমস্ত সুখই অনিত্য ও নিরর্থক, তখন তার মন পারমার্থিক তত্ত্ব অনুসন্ধানে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। তাই *বেদে* কর্মকাণ্ডের পর *উপনিষদে* ভগবৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন *উপনিষদগুলি* হচ্ছে বিভিন্ন *বেদের* মর্মার্থ, যেমন *গীতোপনিষদ* বা *ভগবদ্‌গীতা* হচ্ছে পঞ্চম বেদ *মহাভারতের* সারাংশ। এই *উপনিষদগুলির* মাধ্যমে মানুষের পারমার্থিক জীবন শুরু হয়।

যতক্ষণ আমাদের জড় দেহ আছে, ততক্ষণ প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের প্রভাবে আমাদের কর্ম করতে হয় এবং তার ফল ভোগ করতে হয়। এটিই হচ্ছে কর্মবন্ধন। কিন্তু অপ্রাকৃত জগতে উত্তীর্ণ হতে হলে এই যে সুখ-দুঃখ, শীত-উষ্ণের দ্বন্দ্বভাব, তাতে অবিচলিত থেকে তার প্রভাবমুক্ত হতে হয় এবং তখন আর লাভ-ক্ষতির বিচারবোধ থাকে না। মন তখন আর অনুশোচনা ও অহঙ্কার দ্বারা বিমোহিত হয় না। এভাবেই জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে জীব যখন ভগবানের ইচ্ছার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে, তখনই সে পরা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে তার সৎ, চিৎ ও আনন্দময় স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারে।

শ্লোক ৪৬

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে ।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ ৪৬ ॥

যাবান্—যে সমস্ত; **অর্থঃ**—প্রয়োজন; **উদপানে**—ক্ষুদ্র জলাশয়ে; **সর্বতঃ**—সর্বতোভাবে; **সংপ্লুতোদকে**—অতি বৃহৎ জলাশয়ে; **তাবান্**—তেমনই; **সর্বেষু**—সমস্ত; **বেদেষু**—বৈদিক শাস্ত্রে; **ব্রাহ্মণস্য**—পরব্রহ্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তির; **বিজানতঃ**—পূর্ণ জ্ঞানবান।

গীতার গান

সেই প্রেমে ভাসমান সর্বলাভ পায় ।
কূপ জল নদী জল যথা যথা হয় ॥
এক কূপে হয় এক কার্যের সাধন ।
নদীর জলেতে হয় একত্রে ভাজন ॥
বেদের তাৎপর্য সেই এক লক্ষ্য হয় ।
ব্রাহ্মণ যে হয় সেই সমস্ত বুঝয় ॥

অনুবাদ

ক্ষুদ্র জলাশয়ে যে সমস্ত প্রয়োজন সাধিত হয়, সেগুলি বৃহৎ জলাশয় থেকে আপনা হতেই সাধিত হয়ে যায়। তেমনই, ভগবানের উপাসনার মাধ্যমে যিনি পরব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করে সব কিছুর উদ্দেশ্য উপলব্ধি করেছেন, তাঁর কাছে সমস্ত বেদের উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে।

তাৎপর্য

বেদের কর্মকাণ্ডে যে-সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান ও যাগ-যজ্ঞের বিধান দেওয়া আছে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবকে ক্রমশ আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে উৎসাহিত করা। *ভগবদ্গীতার* পঞ্চদশ অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে (১৫/১৫) স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে, *বেদ* অধ্যয়ন করার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্ব কারণের কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানা। এভাবে আমরা দেখতে পাই, আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার অর্থ হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে আমাদের নিত্য সম্পর্ক উপলব্ধি করা। *ভগবদ্গীতার* পঞ্চদশ অধ্যায়ে (১৫/৭) ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্কের ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে,

জীব হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য অংশ; তাই, জীবের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে, ভগবানের সেবা করা—তার অন্তরের শাশ্বত কৃষ্ণভাবনা জাগিয়ে তোলা। এটিই হচ্ছে বৈদিক জ্ঞানের চরম সত্য। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৩/৩৩/৭) তার সমর্থনে বলা হয়েছে—

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্ ।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥

"হে ভগবান, নিরন্তর যিনি আপনার নাম কীর্তন করেন, তিনি যদি চণ্ডালের মতো নীচকুলেও জন্মগ্রহণ করেন, তবুও তিনি অধ্যাত্ম-মার্গের অতি উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত। এই প্রকার মানুষ বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে বহু তপশ্চর্যা করেছেন এবং সমস্ত পুণ্যতীর্থে বহু স্নান করে তিনি বহুবার বেদ অধ্যয়ন করেছেন। এমন মানুষকে আর্যকুলে শ্রেষ্ঠ বলেই বিবেচনা করা হয়।"

সুতরাং *বেদ* থেকে আমরা বুঝতে পারি, যাগ-যজ্ঞ ও আচার-অনুষ্ঠান করে স্বর্গলোকে উন্নততর ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার শিক্ষা বৈদিক শাস্ত্র আমাদের দিচ্ছে না। বৈদিক শাস্ত্রের প্রকৃত শিক্ষা হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি লাভ করা। বৈদিক শাস্ত্র-নির্দেশিত বিভিন্ন যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা, সমস্ত *বেদ, বেদান্ত* ও *উপনিষদ* পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুশীলন করা এই যুগের মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এই সমস্ত করার জন্য যে শক্তি, জ্ঞান, ঐশ্বর্য ও নিষ্ঠার প্রয়োজন, তা এই যুগের মানুষের নেই। তাই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই কলিযুগের অধঃপতিত মানুষদের উদ্ধার করার জন্য ভগবানের দিব্য নামের সংকীর্তন করার পথ প্রদর্শন করে গেছেন। মহাপণ্ডিত প্রকাশানন্দ সরস্বতী যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে জিজ্ঞেস করেন, যদিও তাঁকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলে মনে হয়, তবু *বেদান্ত* দর্শন পাঠ না করে তিনি কেন ভাবুকের মতো ভগবানের নাম কীর্তন করছেন। এর উত্তরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেন, তাঁর গুরুদেব বুঝতে পারেন যে, তিনি অত্যন্ত মূর্খ, তাই তিনি তাঁকে শাসন করে উপদেশ দিলেন যে, *বেদান্ত* শাস্ত্র অধ্যয়নে তাঁর অধিকার নেই। এই বলে তিনি তাঁকে কৃষ্ণমন্ত্র জপ করার নির্দেশ দিলেন। এই নাম জপ করতে করতে তিনি ভগবদ্ভক্তির ভাবে উন্মাদ হয়ে উঠলেন। এই কলিযুগে অধিকাংশ মানুষই মূর্খ। *বেদান্ত* দর্শন বোঝার মতো ক্ষমতা তাদের নেই, তাই ভগবান *বেদান্ত* দর্শনের সারমর্ম ভগবদ্ভক্তির বার্তা বহন করে এনে, এই ভক্তি লাভ করার পথ প্রদর্শন করে গেলেন। নিষ্কলুষ চিত্তে নিরপরাধে ভগবানের নাম জপ করার মাধ্যমে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হবার আশীর্বাদ

দিয়ে গেলেন। বৈদিক জ্ঞানের শেষ কথা হচ্ছে *বেদান্ত*। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই *বেদান্ত* দর্শনের প্রবক্তা। যে মহাত্মা নিরন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তন করে অসীম আনন্দ উপভোগ করেন, তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত *বেদান্ত*-তত্ত্ববেত্তা। কারণ, সেটিই হচ্ছে বৈদিক অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের চরম উদ্দেশ্য।

শ্লোক ৪৭

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ॥ ৪৭ ॥

কর্মণি—নির্ধারিত কর্মে; **এব**—কেবলমাত্র; **অধিকারঃ**—অধিকার; **তে**—তোমার; **মা**—না; **ফলেষু**—কর্মফলে; **কদাচন**—কখনও; **মা**—না; **কর্মফল**—কর্মফলের; **হেতুঃ**—কারণ; **ভূঃ**—হয়ো; **মা**—না; **তে**—তোমার; **সঙ্গঃ**—আসক্তি; **অস্তু**—হোক; **অকর্মণি**—স্বধর্ম অনুষ্ঠান না করায়।

গীতার গান

নিজ অধিকার মাত্র কর্ম করে যাও।
কর্মফল নাহি চাও আসক্তি ঘুচাও ॥
কর্মফল হেতু সদা না হইবে তুমি।
অনুকূল কর্ম যেই সেই কর্ম ভূমি ॥

অনুবাদ

স্বধর্ম বিহিত কর্মে তোমার অধিকার আছে, কিন্তু কোন কর্মফলে তোমার অধিকার নেই। কখনও নিজেকে কর্মফলের হেতু বলে মনে করো না, এবং কখনও স্বধর্ম আচরণ না করার প্রতিও আসক্ত হয়ো না।

তাৎপর্য

এখানে আমাদের তিনটি জিনিস সম্বন্ধে বিবেচনা করতে হবে—(১) কর্তব্যকর্ম, (২) খেয়ালখুশি মতো কর্ম এবং (৩) নৈষ্কর্ম্য। কর্তব্যকর্ম হচ্ছে প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা বদ্ধ অবস্থায় জাগতিক কর্ম। খেয়ালখুশি মতো কর্ম হচ্ছে শাস্ত্র অথবা গুরুদেবের অনুমোদন ব্যতীত কর্ম এবং কর্তব্যকর্ম সম্পাদন না করাকে বলা হয় নৈষ্কর্ম্য। ভগবান অর্জুনকে নিষ্কর্মা না হতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে

বলেছিলেন, কর্মফলের প্রতি আসক্ত না হয়ে তাঁর কর্তব্যকর্ম করে যেতে। কারণ, মানুষ যখন তার কর্মফলের প্রত্যাশা করে, তখন সে কার্য-কারণে জড়িত হয়ে জড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এভাবেই সে কর্মের ফলস্বরূপ সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করে।

কর্তব্যকর্মকে আবার তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—বিধিবদ্ধ কর্ম, সঙ্কটকালীন কর্ম ও আকাঙ্ক্ষিত কর্ম। কোনও রকম ফলের প্রত্যাশা না করে শাস্ত্রের অনুশাসন অনুসারে বিধিবদ্ধ কর্তব্যকর্ম হচ্ছে সত্ত্বগুণের কর্ম। ফলের প্রত্যাশা করে যে কর্ম করা হয়, তা সত্ত্ব, রজ অথবা তম, যে গুণের প্রভাবেই করা হোক না কেন, তা অশুভ। কারণ, ফলের প্রত্যাশা করা মানেই কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। কর্তব্যকর্ম সকলকেই করতে হয়, কিন্তু কোন রকম ফলের প্রত্যাশা না করে নিরাসক্তভাবে সেই কর্ম করতে হয়; এই প্রকার ফলের আশাহীন কর্তব্যকর্ম নিঃসন্দেহে মুক্তির পথে চালিত করে।

ভগবান তাই অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছিলেন, ফলাফল না ভেবে নিরাসক্ত ভাবে যুদ্ধ করে তাঁর কর্তব্যকর্ম করে যেতে। তাঁর যুদ্ধে যোগ না দেওয়াও ছিল অন্য এক প্রকারের আসক্তি। এই প্রকার আসক্তি কাউকে মুক্তির পথে চালিত করে না। হ্যাঁ বাচক অথবা না বাচক, যে-কোন প্রকার আসক্তিই বন্ধনের কারণ। কর্তব্যকর্ম থেকে নিষ্কর্মার মতো বিরত থাকা পাপ, তাই কর্তব্যবোধে যুদ্ধ করাই ছিল অর্জুনের পক্ষে মুক্তির একমাত্র শুভ পথ।

শ্লোক ৪৮

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

যোগস্থঃ—যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে; **কুরু**—কর; **কর্মাণি**—তোমার কর্তব্যকর্ম; **সঙ্গম্**—আসক্তি; **ত্যক্ত্বা**—পরিত্যাগ করে; **ধনঞ্জয়**—হে অর্জুন; **সিদ্ধি-অসিদ্ধ্যোঃ**—সাফল্য ও ব্যর্থতায়; **সমঃ**—সমভাবে; **ভূত্বা**—হয়ে; **সমত্বম্**—সমতা; **যোগঃ**—যোগ; **উচ্যতে**—বলা হয়।

গীতার গান

যোগী হয়ে কর কর্ম আসক্তি রহিত।
আসক্তি রহিত কর্ম ভগবানে প্রীত ॥

ধনঞ্জয়! সঙ্গ ত্যজি কর্ম করে যাও ।
সিদ্ধি বা অসিদ্ধি সম বৈষম্য ঘুচাও ॥
এই সমভাব হয় যোগসিদ্ধি নাম ।
সেই সিদ্ধিলাভে পূর্ণ সর্ব মনস্কাম ॥

অনুবাদ

হে অর্জুন! ফলভোগের কামনা পরিত্যাগ করে ভক্তিযোগস্থ হয়ে স্বধর্ম-বিহিত কর্ম আচরণ কর। কর্মের সিদ্ধি ও অসিদ্ধি সম্বন্ধে যে সমবুদ্ধি, তাকেই যোগ বলা হয়।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যোগে যুক্ত হয়ে কর্ম করার নির্দেশ দিচ্ছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যোগ বলতে কি বোঝায়? যোগের অর্থ হচ্ছে, সদা চিত্তচাঞ্চল্যকারী ইন্দ্রিয়াদি সংযম করে একাগ্রচিত্তে পরমেশ্বরের ধ্যান করা। পরমেশ্বর কে? সর্ব কারণের কারণ পরমেশ্বর হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। এখানে যেহেতু তিনি নিজেই অর্জুনকে যুদ্ধ করতে আদেশ করছেন, সুতরাং সেই যুদ্ধের ফলাফলের প্রতি তাঁর আসক্ত হওয়া উচিত নয়। আর তার লাভ অথবা জয় নির্ভর করছে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছার উপর। অর্জুনের কর্তব্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে যুদ্ধ করা। ভগবানের আদেশ পালন করাই হচ্ছে প্রকৃত যোগ এবং কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে এই যোগের অনুশীলন করা হয়। ভগবদ্ভক্তির প্রভাবেই কেবল অহঙ্কারমুক্ত হওয়া সম্ভব। ভগবানের দাসত্ব বা ভগবানের দাসের দাসত্ব বরণ করার ফলে অন্তরে ভগবদ্ভক্তির বিকাশ হয় এবং তখন বিজিতেন্দ্রিয় হয়ে যোগের সাধন করা সম্ভব হয়।

অর্জুন ছিলেন ক্ষত্রিয় এবং সেই হেতু শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে তিনি বর্ণাশ্রম-ধর্মের আচরণ করতেন। *বিষ্ণু পুরাণে* বলা হয়েছে, বর্ণাশ্রম-ধর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীবিষ্ণুকে তুষ্ট করা। জড় জগতের নীতি হচ্ছে যে, কারওই নিজেকে সন্তুষ্ট করা উচিত নয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করা উচিত। তাই কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট না করে, তবে সে বর্ণাশ্রম-ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান যথাযথভাবে পালন করতে পারে না। এভাবে ভগবান অর্জুনকে বার বার মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে, তাঁর নির্দেশ অনুসারে কর্ম করাই হচ্ছে তাঁর একমাত্র কর্তব্য।

শ্লোক ৪৯

দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয় ।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ ॥

দূরেণ—দূরে পরিত্যাগ করে; **হি**—যেহেতু; **অবরম্**—নিকৃষ্ট; **কর্ম**—কর্ম; **বুদ্ধি-যোগাৎ**—ভগবদ্ভক্তির বলে; **ধনঞ্জয়**—হে ধনঞ্জয়; **বুদ্ধৌ**—সেই প্রকার চেতনায়; **শরণম্**—পূর্ণ শরণাগতি; **অন্বিচ্ছ**—চেষ্টা কর; **কৃপণাঃ**—কৃপণেরা; **ফলহেতবঃ**—ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ।

গীতার গান

বুদ্ধিযোগ দ্বারা ছাড়া কর্ম অবরাদি ।
কাম কৃষ্ণ কর্মার্পণে না হও বিষাদী ॥
অনুক্ষণ সেই বুদ্ধে শরণাগতি যার ।
কৃপণের ফল হেতু ইচ্ছা নহে তার ॥

অনুবাদ

হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধিযোগ দ্বারা ভক্তির অনুশীলন করে সকাম কর্ম থেকে দূরে থাক এবং সেই চেতনায় অধিষ্ঠিত হয়ে ভগবানের শরণাগত হও। যারা তাদের কর্মের ফল ভোগ করতে চায়, তারা কৃপণ।

তাৎপর্য

যে মানুষ বুঝতে পেরেছেন, তিনি ভগবানের নিত্যদাস, তিনি তখন তাঁর সমস্ত কর্ম ত্যাগ করে ভক্তি সহকারে ভগবৎ-সেবায় ব্রতী হন। পূর্বে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে যে, বুদ্ধিযোগ হচ্ছে ভগবানের অপ্রাকৃত সেবা। এই সেবাই হচ্ছে সমস্ত জীবের যথার্থ কর্তব্যকর্ম। একমাত্র কৃপণেরাই তাদের স্বকর্মফল ভোগের বাসনা করে, ফলে তারা পুনরায় জাগতিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ভক্তিযুক্ত কর্ম ছাড়া আর সমস্ত কাজকর্মই ঘৃণ্য, কারণ সেই সমস্ত কাজকর্ম মানুষকে নিরন্তর জন্ম ও মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত করে। তাই কখনই কর্মফলের প্রত্যাশা করা উচিত নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তুষ্ট করার জন্য কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে সমস্ত প্রকার কাজকর্ম করা উচিত। বহু কষ্ট স্বীকার করে অথবা অসীম সৌভাগ্যের ফলে অর্জিত সম্পদ কিভাবে তার ব্যয় করতে হয়, কৃপণ তা জানে না।

সকলেরই উচিত, কৃষ্ণভাবনাময় কাজকর্মে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করা। তাতেই জীবনের সার্থকতা আসবে। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত হতভাগ্য মানুষেরা এই অমূল্য সম্পদ পাওয়া সত্ত্বেও ভগবানের সেবায় ব্রতী না হয়ে, কৃপণের মতো এই অমূল্য সম্পদের অপচয় করে।

শ্লোক ৫০

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে ।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্ ॥ ৫০ ॥

বুদ্ধিযুক্তঃ—যিনি ভগবানের সেবায় যুক্ত; **জহাতি**—মুক্ত হতে পারে; **ইহ**—এই জীবনে; **উভে**—উভয়; **সুকৃত-দুষ্কৃতে**—পুণ্য ও পাপ; **তস্মাৎ**—সেই জন্য; **যোগায়**—নিষ্কাম কর্মযোগের জন্য; **যুজ্যস্ব**—যুক্ত হও; **যোগঃ**—কৃষ্ণভক্তি; **কর্মসু**—সমস্ত কর্মের; **কৌশলম্**—কৌশল।

গীতার গান

বুদ্ধিযোগ দ্বারা কর্ম সুকৃতি যে ফল ।
দুষ্কৃতি বা ফলে যাহা করয়ে নির্মল ॥
অতএব তুমি সেই যোগে যুদ্ধ কর ।
কর্মের কৌশল এই বুদ্ধিযোগ ধর ॥

অনুবাদ

যিনি ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করেন, তিনি এই জীবনেই পাপ ও পুণ্য উভয় থেকেই মুক্ত হন। অতএব, তুমি নিষ্কাম কর্মযোগের অনুষ্ঠান কর। সেটিই হচ্ছে সর্বাঙ্গীণ কর্মকৌশল।

তাৎপর্য

স্মরণাতীত কাল ধরে প্রতিটি জীব তার শুভ ও অশুভ কর্মের ফল সঞ্চয় করছে। এই কর্মফলের জন্যই সে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হচ্ছে এবং জড়-জাগতিক ক্লেশের দ্বারা জর্জরিত হচ্ছে। অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ার ফলেই জীব তার স্বরূপ ভুলে গেছে। এই দুঃখদায়ক অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় হচ্ছে,

গীতায় নির্দেশিত ভগবানের উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করে তাঁর সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করা। তা হলে আমাদের অজ্ঞতার আবরণ উন্মোচিত হবে এবং জন্ম-জন্মান্তরে কর্ম ও কর্মফলের শৃঙ্খলায়িত শাস্তিভোগের কবল থেকে আমরা মুক্ত হতে পারব। সেই জন্য, সকল কর্মফলের প্রক্রিয়াকে পরিশুদ্ধ করে তোলার পন্থাস্বরূপ কৃষ্ণভাবনাময় কর্মে নিযুক্ত থাকতে অর্জুনকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ৫১

কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ ।
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১ ॥

কর্মজম্—কর্মজাত; **বুদ্ধিযুক্তাঃ**—ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়ে; **হি**—নিশ্চয়ই; **ফলম্**—ফল; **ত্যক্ত্বা**—ত্যাগ করে; **মনীষিণঃ**—মহর্ষিগণ অথবা ভগবদ্ভক্তগণ; **জন্মবন্ধ**—জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে; **বিনির্মুক্তাঃ**—মুক্ত হয়ে; **পদম্**—পদ; **গচ্ছন্তি**—লাভ করেন; **অনাময়ম্**—দুঃখ-দুর্দশা রহিত।

গীতার গান

মনীষী যেই সে কর্ম বুদ্ধিযোগ দ্বারা ।
ত্যাগেতে সমর্থ হয় কর্মফল সারা ॥
জন্মবন্ধ বিনির্মুক্ত সেই কর্মযোগী ।
অনাময় পদ প্রাপ্ত হয় সেই ত্যাগী ॥

অনুবাদ

মনীষিগণ ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে কর্মজাত ফল ত্যাগ করে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হন। এভাবে তাঁরা সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার অতীত অবস্থা লাভ করেন।

তাৎপর্য

জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা যেখানে নেই, মুক্ত পুরুষেরা সেখানেই অবস্থান করেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/১৪/৫৮) বলা হয়েছে—

সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং
মহৎপদং পুণ্যযশো মুরারেঃ ।

ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং
পদং পদং যদ্ বিপদাং ন তেষাম্ ॥

"পরমেশ্বর ভগবান, যিনি সব কিছুর আশ্রয় এবং যিনি মুক্তিদাতা মুকুন্দ নামে খ্যাত, তাঁর পদপল্লবরূপ তরণীর আশ্রয় যিনি গ্রহণ করেছেন, তিনি অনায়াসে এই ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হন। তাঁর কাছে এই ভবসমুদ্র গোষ্পদতুল্য। *পরং পদ* বা যেখানে জড়-জাগতিক ক্লেশ নেই, অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ হচ্ছে তাঁর গন্তব্যস্থল। যে জগতে প্রতি পদক্ষেপে বিপদ, সেখানে তিনি আবদ্ধ থাকতে চান না।"

আমাদের অজ্ঞতার জন্য আমরা বুঝতে পারি না যে, এই জড় জগৎ প্রতি পদক্ষেপে দুঃখ-দুর্দশায় পরিপূর্ণ। এখানে প্রতি পদক্ষেপেই বিপদ। কিন্তু অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা মনে করে, নানা রকম জাগতিক প্রচেষ্টার দ্বারা প্রকৃতির প্রতিকূলতার নিরসন করে তারা সুখী হবে। তারা জানে না, এই জড় জগতে কোন জীবই জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি আদি ক্লেশের থেকে রেহাই পেতে পারে না। কিন্তু যে মানুষ তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরে বুঝতে পেরেছেন যে, তিনি ভগবানের নিত্যদাস, তিনি তখন ভক্তিযোগের পথ অবলম্বন করে ভগবানের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। তার ফলে তিনি বৈকুণ্ঠলোকে উত্তীর্ণ হবার যোগ্যতা অর্জন করেন, যেখানে জড়-জাগতিক ক্লেশ এবং মৃত্যু ও কালের প্রভাব নেই। আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ভগবানের মহিমান্বিত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি। ভ্রান্তিবশত যে মানুষ মনে করে, ভগবান ও সে একই স্তরে অবস্থিত, অর্থাৎ যে মানুষ মনে করে, সে-ই ভগবান, তার পক্ষে ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করা কখনই সম্ভব নয়। অহঙ্কারের দ্বারা বিমূঢ় হয়ে সে নিজেকে সর্ব কারণের কারণ বলে মনে করে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে আরও গভীরভাবে নিমজ্জিত হয়। ভক্তিযুক্ত ভগবৎ-সেবা ছাড়া আর কোন উপায়েই জড় বন্ধন মুক্ত হয়ে বৈকুণ্ঠে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। এই ভগবৎ-সেবাকে বলা হয় কর্মযোগ বা বুদ্ধিযোগ, অথবা সরল ভাষায় একে বলা হয় ভক্তিযোগ।

শ্লোক ৫২

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি ।
তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ৫২ ॥

যদা—যখন; **তে**—তোমার; **মোহ**—মোহ; **কলিলম্**—গভীর অরণ্য; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **ব্যতিতরিষ্যতি**—অতিক্রম করে; **তদা**—সেই সময়; **গন্তাসি**—প্রাপ্ত হবে; **নির্বেদম্**—বিতৃষ্ণা; **শ্রোতব্যস্য**—শ্রোতব্য; **শ্রুতস্য**—ইতিপূর্বে যা শোনা হয়ে গেছে; **চ**—এবং।

গীতার গান

যখন তোমার মন বুদ্ধিযোগ দ্বারা ।
মোহরূপ কর্দমাক্ত হয়ে যাবে পারা ॥
তখন নির্বেদ সব হয়ে যাবে কাম ।
শ্রুতির শ্রোতব্য তব নাহি রবে ধাম ॥

অনুবাদ

এভাবে পরমেশ্বর ভগবানে অর্পিত নিষ্কাম কর্ম অভ্যাস করতে করতে যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ গভীর অরণ্যকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করবে, তখন তুমি যা কিছু শুনেছ এবং যা কিছু শ্রবণীয়, সেই সবের প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ হতে পারবে।

তাৎপর্য

ভগবানের মহান ভক্তদের অনেক সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে, যাঁরা কেবলমাত্র ভগবদ্ভক্তি গ্রহণ করার ফলে বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি উদাসীন হয়ে ওঠেন। যখন কোনও ব্যক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পেরে তাঁর সঙ্গে চিরশাশ্বত সম্পর্ক সম্বন্ধে অবগত হয়, সে স্বাভাবিক ভাবেই বৈদিক কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানের প্রতি সম্পূর্ণরূপে উদাসীন হয়, এমন কি সে যদি অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণও হয়। মহাভাগবত ও গুরুপরম্পরা ধারায় আচার্য শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী বলেছেন—

সন্ধ্যাবন্দন ভদ্রমস্তু ভবতো ভোঃ স্নান তুভ্যং নমো
ভো দেবাঃ পিতরশ্চ তর্পণবিধৌ নাহং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাম্ ।
যত্র ক্বাপি নিষদ্য যাদবকুলোত্তমস্য কংসদ্বিষঃ
স্মারং স্মারং অঘং হরামি তদলং মন্যে কিমন্যেন মে ॥

"হে ভগবান! ত্রিসন্ধ্যায় আমি তোমাকে বন্দনা করি, তোমার জয় হোক। হে দেবতাগণ! হে পিতৃগণ। স্নানান্তে আমি আর তোমাদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করতে

পারি না। আমার এই অক্ষমতা তোমরা ক্ষমা করো। এখন আমি যেখানেই অবস্থান করি না কেন, আমি যদুকুলশ্রেষ্ঠ কংসারি শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে পারি এবং তার ফলে আমি সমস্ত পাপবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারি। আমার মনে হয়, এটিই আমার পক্ষে যথেষ্ট।'

পারমার্থিক মার্গে যাঁরা কনিষ্ঠ অধিকারী, তাঁদের পক্ষে *বেদের* নির্দেশ অনুযায়ী বিবিধ আচার-অনুষ্ঠান পালন করা একান্ত প্রয়োজন; যেমন—খুব সকালে স্নান করা, পিতৃ-পুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ করা, ত্রিসন্ধ্যায় মন্ত্র উচ্চারণ করা আদি। কিন্তু কৃষ্ণগত প্রাণ হয়ে যিনি ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করেন, তাঁকে আর কোন আচার-অনুষ্ঠানের বিধি পালন করতে হয় না, কারণ তিনি ইতিমধ্যেই সমস্ত সাধনার পরম সিদ্ধি লাভ করেছেন। শাস্ত্রে যে-সমস্ত তপশ্চর্যা, যাগযজ্ঞ, বিধি-নিষেধের আচরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের কৃপা লাভ করে তাঁর পদারবিন্দে সম্পূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গ করা। তাই, ভগবানের সেবায় যিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, তাঁকে আর সেই সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানের শরণ নিতে হয় না। সেই রকম, *বেদের* উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি লাভ করা, সেই কথা না জেনে যারা অন্ধের মতো আচার-অনুষ্ঠান আদিতে নিয়োজিত হয়, তারা অনর্থক তাদের সময় নষ্ট করে চলেছে। যে মানুষ ভগবদ্ভক্তি লাভ করেছেন, তিনি শব্দব্রহ্মের স্তর উত্তীর্ণ হয়েছেন, অর্থাৎ তাঁর কাছে *বেদ, উপনিষদের* আর কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।

শ্লোক ৫৩

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা ।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥

শ্রুতি—বৈদিক জ্ঞান; **বিপ্রতিপন্না**—বেদের কর্মকাণ্ডের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে; **তে**—তোমার; **যদা**—যখন; **স্থাস্যতি**—থাকবে; **নিশ্চলা**—অবিচলিত; **সমাধৌ**—চিন্ময় চেতনায় বা কৃষ্ণভাবনায়; **অচলা**—স্থির; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **তদা**—তখন; **যোগম্**—আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান; **অবাপ্স্যসি**—লাভ করবে।

গীতার গান

শ্রুতির গৃহীত জ্ঞান যখন নিশ্চলা ।
কর্ম জ্ঞান যোগ আদি তখনি সফলা ॥
সমাধি তখন হয় কর্মযোগে স্থিতি ।
স্থিতপ্রজ্ঞ তার নাম যোগারূঢ় গতি ॥

অনুবাদ

তোমার বুদ্ধি যখন বেদের বিচিত্র ভাষার দ্বারা আর বিচলিত হবে না এবং আত্ম-উপলব্ধির সমাধিতে স্থির হবে, তখন তুমি দিব্যজ্ঞান লাভ করে ভক্তিযোগে অধিষ্ঠিত হবে।

তাৎপর্য

জীব যখন সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদন করে, তখন তার সেই অবস্থাকে বলা হয় সমাধি; যিনি পূর্ণ সমাধিমগ্ন হয়েছেন, তিনি ব্রহ্ম-উপলব্ধি ও পরমাত্মা উপলব্ধির স্তর অতিক্রম করে সর্ব কারণের কারণ পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। অধ্যাত্ম-জ্ঞানের চরম পূর্ণতা হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে জীবের নিত্য দাসত্ব সম্পর্কের উপলব্ধি করা, তাই ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করাই হচ্ছে জীবের একমাত্র কর্তব্য। সেই জন্য, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত *বেদের* সুন্দর বর্ণনার দ্বারা মোহিত হয়ে স্বর্গসুখ ভোগ করার জন্য যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন না। ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করলে ভগবানের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং তার ফলে ভগবানের প্রতিটি উপদেশের মর্ম যথাযথভাবে উপলব্ধি করা যায়। শ্রীকৃষ্ণ অথবা তাঁর প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেবের আদেশে ভগবানের সেবা করলে, অচিরেই তার ফল পাওয়া যায় এবং ভগবদ্ভক্তির মাধুর্য আস্বাদন করা যায়।

শ্লোক ৫৪

অর্জুন উবাচ
স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব ।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥ ৫৪ ॥

অর্জুন উবাচ—অর্জুন বললেন; **স্থিতপ্রজ্ঞস্য**—অচলা বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তির; **কা**—কি; **ভাষা**—লক্ষণ; **সমাধিস্থস্য**—সমাধিস্থ ব্যক্তির; **কেশব**—হে কৃষ্ণ; **স্থিতধীঃ**—কৃষ্ণভাবনায় স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি; **কিম্**—কি; **প্রভাষেত**—বলেন; **কিম্**—কিভাবে; **আসীত**—অবস্থান করেন; **ব্রজেত**—বিচরণ করেন; **কিম্**—কিভাবে।

গীতার গান

অর্জুন কহিলেন ঃ

কি লক্ষণ স্থিতপ্রজ্ঞ কিবা তাঁর ভাষা ।
হে কেশব! কহ মোরে সমাধিস্থ আশা ॥
স্থিতধী কি বলে কিংবা উঠাবসা করে ।
কিভাবে গমন করে কহত বিস্তারে ॥

অনুবাদ

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—হে কেশব! স্থিতপ্রজ্ঞ অর্থাৎ অচলা বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের লক্ষণ কি? তিনি কিভাবে কথা বলেন, কিভাবে অবস্থান করেন এবং কিভাবেই বা তিনি বিচরণ করেন?

তাৎপর্য

বিশেষ অবস্থা অনুযায়ী প্রতিটি মানুষেরই যেমন কোন না কোন লক্ষণ থাকে, কৃষ্ণভাবনাময় মানুষেরও সেই রকম চলা, বলা, চিন্তাভাবনায় কতকগুলি প্রকৃতগত লক্ষণ থাকে। একজন ধনীর কতকগুলি লক্ষণ দেখে যেমন বোঝা যায় সে ধনী, একজন রোগীর কতকগুলি লক্ষণ দেখে যেমন বোঝা যায় সে রোগী, একজন জ্ঞানীর লক্ষণ দেখে যেমন বোঝা যায় সে জ্ঞানী, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত ভাবনায় মগ্ন কোনও ভগবদ্ভক্তের কথা বলবার ধরন, চলার ভঙ্গি, চিন্তাধারা, মনোবৃত্তি আদি দেখে বোঝা যায়, তিনি হচ্ছেন ভগবদ্ভক্ত। ভগবদ্ভক্তের এই সমস্ত লক্ষণের বর্ণনা *ভগবদ্গীতাতে* পাওয়া যায়। এই লক্ষণগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, তিনি কিভাবে কথা বলেন; কারণ, কথার মধ্যে দিয়েই সবচেয়ে গভীরভাবে মানুষের অন্তরের ভাবের প্রকাশ হয়। প্রবাদ আছে, মূর্খ যতক্ষণ পর্যন্ত তার মুখ না খুলছে, ততক্ষণ তার মূর্খতা প্রকাশ পায় না। বিশেষ করে ভাল পোশাকে সজ্জিত মূর্খ যতক্ষণ তার মুখ না খুলছে, তাকে চেনার উপায় নেই, কিন্তু যখনই সে মুখ খোলে, তখনই তার পরিচয় প্রকাশ পায়। কৃষ্ণভাবনাময় মানুষের প্রাথমিক লক্ষণ হচ্ছে, তিনি শ্রীকৃষ্ণ অথবা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিষয় ছাড়া আর কোন কথাই বলেন না। অন্যান্য লক্ষণ তখন স্বাভাবিকভাবে তাঁর মধ্যে প্রকাশিত হয় এবং তা নীচে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৫৫

শ্রীভগবানুবাচ

**প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্ ।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫ ॥**

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **প্রজহাতি**—ত্যাগ করেন; **যদা**—যখন; **কামান্**—কামনাসমূহ; **সর্বান্**—সর্ব প্রকার; **পার্থ**—হে পৃথাপুত্র; **মনোগতান্**—মনের জল্পনা-কল্পনা; **আত্মনি**—আত্মার নির্মল অবস্থায়; **এব**—অবশ্যই; **আত্মনা**—বিশুদ্ধ চেতনার দ্বারা; **তুষ্টঃ**—সন্তুষ্ট; **স্থিতপ্রজ্ঞঃ**—চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত; **তদা**—তখন; **উচ্যতে**—বলা হয়।

গীতার গান

শ্রীভগবান কহিলেন ঃ

নিজের ইন্দ্রিয় সুখে যত কাম আছে ।
বদ্ধ জীব মনোধর্মে ধায় পাছে পাছে ॥
সে সব কামনা ত্যজি আত্ম-ভগবানে ।
সম্বন্ধ জানিয়া ক্রমে হয় আগুয়ানে ॥
তখন জানিবে তুষ্ট স্থিতপ্রজ্ঞ সুখী ।
এ ছাড়া আর যে লোক সকলেই দুঃখী ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে পার্থ! জীব যখন মানসিক জল্পনা-কল্পনা থেকে উদ্ভূত সমস্ত মনোগত কাম পরিত্যাগ করে এবং তার মন যখন এভাবে পবিত্র হয়ে আত্মাতেই পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করে, তখনই তাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে দৃঢ়ভাবে বলা হয়েছে, সম্পূর্ণ কৃষ্ণভাবনাময় মানুষ অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের মধ্যে মহৎ মুনি-ঋষিদের সমস্ত গুণাবলী পরিলক্ষিত হয়; আর যারা ভগবদ্ভক্ত নয়, তাদের মধ্যে কোন গুণই দেখা যায় না। কারণ, তারা তাদের সীমিত মনের জল্পনা-কল্পনার কাছে আত্মসমর্পণ করে নিজেদের ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করে থাকে।

সুতরাং, এখানে যথার্থই বলা হয়েছে যে, জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে সৃষ্ট ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের সব রকমের ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে হবে। কৃত্রিমভাবে এই ইচ্ছাকে কখনই সংবরণ করা যায় না। কিন্তু মানুষ যখন কৃষ্ণভাবনায় নিজেকে নিয়োজিত করে, তখন কোন রকম বাহ্যিক প্রচেষ্টা ছাড়া আপনা থেকেই এই সমস্ত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা প্রশমিত হয়। তাই মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য হচ্ছে দ্বিধাহীনভাবে ভক্তিযোগের পথ অবলম্বন করা, কেন না এই পথ অবলম্বন করার ফলে সে অচিরেই অপ্রাকৃত চেতনায় অধিষ্ঠিত হতে পারে। যিনি মহাত্মা তিনি জানেন, তিনি হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকালের দাস এবং এই সত্য উপলব্ধির ফলে তিনি নিত্যানন্দ অনুভব করেন। জড় জগৎকে ভোগ করার তুচ্ছ কোন বাসনাই তখন আর তাঁর থাকে না। তিনি তাঁর প্রকৃত স্বরূপে পরমেশ্বরের নিত্য সেবায় মগ্ন থেকে সদাই সুখে থাকেন।

শ্লোক ৫৬

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

দুঃখেষু—ত্রিতাপ দুঃখে; **অনুদ্বিগ্নমনাঃ**—উদ্বেগশূন্য চিত্ত; **সুখেষু**—সুখে; **বিগতস্পৃহঃ**—স্পৃহাশূন্য; **বীত**—মুক্ত; **রাগ**—আসক্তি; **ভয়**—ভয়; **ক্রোধঃ**—ক্রোধ; **স্থিতধীঃ**—স্থিতপ্রজ্ঞ; **মুনিঃ**—মননশীল ব্যক্তি; **উচ্যতে**—বলা হয়।

গীতার গান

দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা সুখে নাহি স্পৃহা ।
নিজ সেবাকার্যে যাঁর একমাত্র ঈহা ॥
বীতরাগ শোক ভয় ক্রোধ নাহি যাঁর ।
সে জন স্থিতধী মুনি বিদিত সবার ॥

অনুবাদ

ত্রিতাপ দুঃখ উপস্থিত হলেও যাঁর মন উদ্বিগ্ন হয় না, সুখ উপস্থিত হলেও যাঁর স্পৃহা হয় না এবং যিনি রাগ, ভয় ও ক্রোধ থেকে মুক্ত, তিনিই স্থিতধী অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ।

তাৎপর্য

'মুনি' তাঁকে বলা হয়, যিনি কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়ে নানা রকম অনুমান করবার জন্য মনকে নানাভাবে আলোড়িত করতে পারেন। তাই বলা হয় যে, 'নানা মুনির নানা মত।' কোন মুনির মত যদি অন্য মুনির থেকে স্বতন্ত্র না হয়, তবে তাঁকে যথার্থ মুনি বলা যায় না। *নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্* (*মহাভারত, বনপর্ব* ৩১৩/১১৭)। কিন্তু ভগবান এখানে বলেছেন, *স্থিতধীমুনি* সাধারণ মুনিদের থেকে ভিন্ন। *স্থিতধীমুনি* সর্বদাই কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন, কেন না তিনি জল্পনা-কল্পনামূলক সমস্ত কার্যকলাপের পরিসমাপ্তি করেছেন। তাঁকে বলা হয় *প্রশান্ত-নিঃশেষ-মনোরথান্তর* (*স্তোত্ররত্ন*, ৪৩), অথবা যিনি জল্পনা-কল্পনার স্তর অতিক্রম করে উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, বসুদেব-তনয় ভগবান বাসুদেব বা শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সবকিছু (*বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ*)। তাঁকে বলা হয় মুনি, যাঁর মন একনিষ্ঠ। এই ধরনের কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্তকে জড় জগতের ত্রিতাপ ক্লেশের কোন আক্রমণই আর বিচলিত করতে পারে না। কারণ, তিনি সব রকমের দুঃখ-দুর্দশাকে ভগবানের আশীর্বাদ বলে মনে করেন। তিনি মনে করেন, তাঁর পূর্বকৃত অসৎ কর্মের ফলস্বরূপ আরও দুঃখ-দুর্দশা তাঁর একমাত্র প্রাপ্য, কিন্তু ভগবানের অহৈতুকী করুণার ফলে তাঁর সেই সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার ভার অনেক লাঘব হয়ে গেছে। তেমনই, যখন তাঁর সুখানুভূতি হয়, তখন তিনি নিজেকে সেই সুখের অযোগ্য বলেই মনে করেন; তিনি ভাবেন, ভগবানের কৃপাতেই তিনি ঐ রকম সুখপ্রদ অবস্থায় রয়েছেন এবং ভগবানের সেবায় তাই আরও বেশি করে আত্মনিয়োগ করতে পারছেন। ভগবানের সেবা করবার জন্য তিনি সব সময়ই সৎসাহসী ও তৎপর এবং কোন রকম আসক্তি বা বিরক্তি তাঁকে সেই সেবা থেকে বিরত করতে পারে না। নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করার আকাঙ্ক্ষাকে বলা হয় আসক্তি এবং এই ধরনের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা না থাকলে বলা হয় বিরক্তি। কিন্তু যিনি কৃষ্ণভাবনায় অবিচলিত, তাঁর কোন কিছুর প্রতি আসক্তিও নেই, বিরক্তিও নেই, কেন না ভগবানের সেবায় তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করেছেন। তাই তাঁর কোন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে তিনি ক্রোধান্বিত হন না। সফল হন বা ব্যর্থই হন, তিনি তাঁর সংকল্পে সর্বদাই একনিষ্ঠ।

শ্লোক ৫৭

যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্ ।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭ ॥

যঃ—যিনি; সর্বত্র—সর্বত্র; অনভিস্নেহঃ—আসক্তি বর্জিত; তৎ তৎ—সেই সেই; প্রাপ্য—লাভ করে; শুভ—ভাল; অশুভম্—খারাপ; ন—না; অভিনন্দতি—প্রশংসা করেন; ন—না; দ্বেষ্টি—দ্বেষ করেন; তস্য—তাঁর; প্রজ্ঞা—পূর্ণ জ্ঞান; প্রতিষ্ঠিতা—প্রতিষ্ঠিত।

গীতার গান

দেহস্মৃতি নাহি যাঁর শুভাশুভ কিবা তাঁর ।
সর্বত্র অনভিস্নেহ লোক ব্যবহার ॥
অভিনন্দ দ্বেষ নাই সর্ব হিতে রত ।
তাঁহার জানিও প্রজ্ঞা স্থির প্রতিষ্ঠিত ॥

অনুবাদ

জড় জগতে যিনি সমস্ত জড় বিষয়ে আসক্তি রহিত, যিনি প্রিয় বস্তু লাভে আনন্দিত হন না এবং অপ্রিয় বিষয় উপস্থিত হলে দ্বেষ করেন না, তিনি পূর্ণ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

তাৎপর্য

জড় জগতে সব সময়ই নানা রকম উত্থান-পতন ঘটে চলেছে, সেগুলি কখনও শুভ বা অশুভ হতে পারে। যিনি এই ধরনের উত্থান-পতনে বিচলিত হন না, যিনি ভাল-মন্দে প্রভাবিত হন না, তাঁকেই কৃষ্ণভাবনায় অবিচলিত বলে বিবেচনা করতে হবে। মানুষ জড় জগতে থাকলে সব সময়েই শুভ-অশুভ সম্ভাবনা থাকে, কারণ জড় জগৎটাই এই দ্বন্দ্বভাবের দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু কৃষ্ণভাবনায় একনিষ্ঠ ভক্ত কখনই এই শুভ-অশুভ দ্বন্দ্বের দ্বারা প্রভাবিত হন না, কারণ তিনি সর্বদাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় মগ্ন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই অনুরাগের ফলে তিনি জড় ইন্দ্রিয়ের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে বিশুদ্ধ অপ্রাকৃত অবস্থায় অধিষ্ঠিত হন, যাকে পরিভাষায় বলা হয় 'সমাধি'।

শ্লোক ৫৮

যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥

যদা—যখন; সংহরতে—প্রত্যাহার করেন; চ—এবং; অয়ম্—তিনি; কূর্মঃ—কচ্ছপ; অঙ্গানি—অঙ্গসমূহ; ইব—যেমন; সর্বশঃ—সর্বতোভাবে; ইন্দ্রিয়াণি—ইন্দ্রিয়সমূহ; ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় থেকে; তস্য—তাঁর; প্রজ্ঞা—চেতনা; প্রতিষ্ঠিতা—প্রতিষ্ঠিত।

গীতার গান

গোদাস ইন্দ্রিয়সুখে বিচলিত সদা ।
গোস্বামী হয়েছে ধীর আত্মাতে সর্বদা ॥
তাই সে ইন্দ্রিয় সব কূর্ম অঙ্গ মত ।
ইন্দ্রিয় ভোগার্থ সদা বিষয়ে বিরত ॥
অতএব জানি তাঁর প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ।
সে জন উপাধিমুক্ত গোস্বামী বিদিত ॥

অনুবাদ

কূর্ম যেমন তার অঙ্গসমূহ তার কঠিন বহিরাবরণের মধ্যে সঙ্কুচিত করে, তেমনই যে ব্যক্তি তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে প্রত্যাহার করে নিতে পারেন, তাঁর চেতনা চিন্ময় জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত।

তাৎপর্য

আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানী, যোগী অথবা ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ হচ্ছে, তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করতে পারেন। অধিকাংশ মানুষই তাদের ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করে অর্থাৎ তাদের ইন্দ্রিয়ের নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। প্রকৃত যোগীকে এভাবে চিনতে পারা যায়। ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষধর সর্পের সঙ্গে তুলনা করা হয়। সাধারণ অবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলি স্বেচ্ছাচারী, উচ্ছৃঙ্খল, কিন্তু সাপুড়ে যেমন সাপকে পোষ মানায়, যোগী বা ভগবদ্ভক্ত ঠিক তেমনভাবে তাঁদের ইন্দ্রিয়গুলিকে নিজের ইচ্ছা অনুসারে পরিচালিত করেন। তিনি তাদের কখনই স্বাধীনভাবে কোন কাজ করতে দেন না। শাস্ত্রে কর্তব্য-অকর্তব্য, বিধি-নিষেধ সম্বন্ধে নানা রকম নির্দেশ দেওয়া আছে। এই সমস্ত বিধি-নিষেধের নির্দেশগুলি আচরণ করার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত না করতে পারলে, ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে ভগবদ্ভক্তি সাধন করা যায় না। এই সম্বন্ধে এখানে খুব সুন্দরভাবে কূর্মের উদাহরণ দেওয়া আছে। কূর্ম যে-কোন সময় তার হাত, পা, মাথা আদি অঙ্গগুলি তার খোলসের মধ্যে গুটিয়ে নিতে পারে, আবার প্রয়োজন হলে তাদের বার করে আনতে পারে। ঠিক

তেমনই, কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্ত ভগবানের বিশেষ প্রয়োজনেই তার ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রয়োগ করেন, আর অন্য সময় তাদের গুটিয়ে রাখেন। এভাবেই ইন্দ্রিয়-দমন করার মাধ্যমে একাগ্রচিত্তে ভগবানের সেবা করা যায়। অর্জুনকে এখানে সেভাবেই নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, যাতে তিনি নিজের তৃপ্তি-সাধনের জন্য তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে কাজে না লাগিয়ে ভগবানের সেবায় তা নিয়োগ করেন। ভগবানের সেবায় কিভাবে সর্বদা ইন্দ্রিয়াদি নিয়োজিত রাখতে হয়, কূর্মের দৃষ্টান্ত দিয়ে তা বোঝানো হয়েছে। কূর্মের মতো ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার।

শ্লোক ৫৯

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে ॥ ৫৯ ॥

বিষয়াঃ—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বিষয়সমূহ; **বিনিবর্তন্তে**—নিবৃত্ত হয়; **নিরাহারস্য**—কৃত্রিমভাবে বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিবৃত্ত করে; **দেহিনঃ**—দেহীর; **রসবর্জম্**—বিষয়রস বর্জন করে; **রসঃ**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ; **অপি**—যদিও; **অস্য**—তাঁর; **পরম্**—উৎকৃষ্ট বস্তু; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **নিবর্ততে**—নিবৃত্ত হন।

গীতার গান

বৈরাগ্য করিয়া হয় বিষয়-নিবৃত্তি।
তাহা নহে স্থিতপ্রজ্ঞা স্বাভাবিক বৃত্তি ॥
পরমানন্দ জানি যেবা জড়ানন্দ ছাড়ে।
স্থিতপ্রজ্ঞ সেই বীর বিষয়ে বিহারে ॥

অনুবাদ

দেহবিশিষ্ট জীব ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ থেকে নিবৃত্ত হতে পারে, কিন্তু তবুও ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের আসক্তি থেকে যায়। কিন্তু উচ্চতর স্বাদ আস্বাদন করার ফলে তিনি সেই বিষয়তৃষ্ণা থেকে চিরতরে নিবৃত্ত হন।

তাৎপর্য

অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত না হলে মানুষ ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ পরিত্যাগ করতে পারে না। বিধি-নিষেধের দ্বারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ থেকে নিবৃত্ত হওয়ার পন্থা অনেকটা

রোগীর বিশেষ ধরনের খাদ্যের প্রতি নিষেধাজ্ঞার মতো। রোগী সাধারণত এই সমস্ত বিধি-নিষেধ মানতে চায় না এবং তার রোগের জন্য এই সমস্ত খাদ্যদ্রব্য খেতে সাময়িকভাবে বিরত থাকলেও তার খাওয়ার লালসা কোনও অংশে কমে না। তেমনই, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান আদি সমন্বিত অষ্টাঙ্গ-যোগের মতো কিছু পারমার্থিক পদ্ধতির দ্বারা যে ইন্দ্রিয় সংযম, তা উন্নত জ্ঞানহীন, অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য অনুমোদিত হয়েছে। কিন্তু যিনি কৃষ্ণভাবনায় প্রগতি সাধনের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কন্দর্প-কোটি কমনীয় রূপকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তাঁর আর নিষ্প্রাণ জড় বস্তুর প্রতি কোন রকম রুচি থাকে না। তাই, অধ্যাত্ম-মার্গের প্রাথমিক স্তরেই কেবল বিধি-নিষেধের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করতে হয়, কিন্তু কৃষ্ণভাবনায় যতক্ষণ রুচি না হয়, ততক্ষণ এই বিধি-নিষেধ মঙ্গলজনক হয়। যখন কেউ প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণভাবনায় অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি আপনা থেকেই ইতর বস্তুর প্রতি তাঁর রুচি হারিয়ে ফেলেন।

শ্লোক ৬০

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০ ॥

যততঃ—যত্নশীল; **হি**—যেহেতু; **অপি**—সত্ত্বেও; **কৌন্তেয়**—হে কুন্তীপুত্র; **পুরুষস্য**—মানুষের; **বিপশ্চিতঃ**—বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **প্রমাথীনি**—চিত্ত বিক্ষেপকারী; **হরন্তি**—হরণ করে; **প্রসভম্**—বলপূর্বক; **মনঃ**—মনকে।

গীতার গান

আত্মার সম্পর্ক নাই বৈরাগ্যের যতন।
পণ্ডিত হলেও তার প্রসভিত মন ॥
প্রমাথী ইন্দ্রিয় তাকে বিষয়েতে ফেলে।
শুষ্ক বৈরাগীর লাগে আগুন কপালে ॥

অনুবাদ

হে কৌন্তেয়! ইন্দ্রিয়সমূহ এতই বলবান এবং ক্ষোভকারী যে, তারা অতি যত্নশীল বিবেকসম্পন্ন পুরুষের মনকেও বলপূর্বক বিষয়াভিমুখে আকর্ষণ করে।

তাৎপর্য

অনেক ঋষি, মুনি ও অধ্যাত্মবাদী আছেন, যাঁরা ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও অনেক সময় তাঁদের সংযমের বাঁধ ভেঙে যায় এবং তাঁরা ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে পড়েন। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের মতো যোগী, যিনি তাঁর মন ও ইন্দ্রিয়কে সংযত করবার জন্য গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে কঠোর তপস্যায় রত ছিলেন, তিনিও স্বর্গের অপ্সরা মেনকার রূপে মুগ্ধ হয়ে কামান্ধ হয়ে অধঃপতিত হন। পৃথিবীর ইতিহাসে এই রকম অনেক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। এর থেকে বোঝা যায়, কৃষ্ণভক্তি ছাড়া মন ও ইন্দ্রিয়কে সংযত করা অত্যন্ত কঠিন। মনকে শ্রীকৃষ্ণে নিয়োজিত না করে, কেউই এই প্রকার জাগতিক কার্যকলাপ থেকে বিরত হতে পারে না। একটি কার্যকর দৃষ্টান্তের মাধ্যমে মহাসাধক ও ভগবদ্ভক্ত শ্রীযামুনাচার্য বলেছেন—

যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপদারবিন্দে
নবনবরসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ ।
তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্যমাণে
ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনং চ ॥

"আমার মন এখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দের সেবায় নিয়োজিত হয়েছে এবং আমি প্রতিনিয়তই নব নব অপ্রাকৃত রসের আস্বাদন করছি। এখন কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে যৌন সম্পর্কের কথা মনে হলেই আমার মন বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে এবং আমি সেই চিন্তার উদ্দেশ্যে থুথু ফেলি।"

কৃষ্ণভক্তি এমনই এক অপ্রাকৃত আনন্দে পরিপূর্ণ যে, এর স্বাদ একবার পেলে জড় সুখভোগের প্রতি আর কোন আকর্ষণ থাকে না। নানা রকম সুস্বাদু খাবার খেয়ে ক্ষুধার নিবৃত্তি হলে যেমন আর আজেবাজে জিনিস খাবার ইচ্ছা থাকে না, তেমনই কৃষ্ণভক্তির স্বাদে পরিতৃপ্ত মন আর কিছুই চায় না। কৃষ্ণভক্তি আস্বাদন করার পর মন আপনা থেকেই শান্ত হয়ে যায় এবং কোন অবস্থাতেই তা আর বিচলিত হয় না। তাই আমরা দেখতে পাই, মহারাজ অম্বরীষকে বিনাশ করতে উদ্যত হলে, মহা-তেজস্বী মুনি দুর্বাসার প্রাণ বিপন্ন হয়ে পড়ে এবং অবশেষে তিনি মহারাজ অম্বরীষের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে প্রাণ রক্ষা করেন। কারণ, মহারাজ অম্বরীষের মন কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন ছিল (*স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে*)।

শ্লোক ৬১

তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ ॥

তানি—সেই ইন্দ্রিয়সমূহ; **সর্বাণি**—সমস্ত; **সংযম্য**—সংযত করে; **যুক্তঃ**—যুক্ত হয়ে; **আসীত**—অবস্থিত হয়ে; **মৎপরঃ**—আমার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত; **বশে**—সম্পূর্ণরূপে বশীভূত; **হি**—অবশ্যই; **যস্য**—যাঁর; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **তস্য**—তাঁর; **প্রজ্ঞা**—জ্ঞান; **প্রতিষ্ঠিতা**—প্রতিষ্ঠিত।

গীতার গান

কৃষ্ণসেবা যুক্ত হয় ইন্দ্রিয় সংযত ।
ইন্দ্রিয় সে বশ হয় প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ॥

অনুবাদ

যিনি তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণরূপে সংযত করে আমার প্রতি উত্তমা ভক্তিপরায়ণ হয়ে তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করেছেন, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ।

তাৎপর্য

ভক্তিযোগই যে শ্রেষ্ঠ যোগ তা এখানে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কৃষ্ণভক্তি ছাড়া ইন্দ্রিয়কে সংযত করা যায় না। ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, মহা-তেজস্বী দুর্বাসা মুনি অকারণে মহারাজ অম্বরীষের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর ইন্দ্রিয়-সংযম হারিয়ে ফেলেছিলেন। পক্ষান্তরে, মহারাজ অম্বরীষ দুর্বাসার মতো শক্তিশালী তপস্বী ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন কৃষ্ণভক্ত। অন্তরে ভগবানের ধ্যানে মগ্ন থেকে তিনি দুর্বাসার সমস্ত অত্যাচার ও অপমান নীরবে সহ্য করেছিলেন এবং তার ফলে তাঁর জয় হয়েছিল। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৯/৪/১৮-২০) বর্ণিত নিম্নোক্ত গুণাবলীর অধিকারী হবার ফলেই মহারাজ অম্বরীষ তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে ।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জনাদিষু
শ্রুতিং চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে ॥

মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ
তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্ ।
ঘ্রাণং চ তৎপাদসরোজসৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে ॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে ।
কামং চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া
যথোত্তমশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ ॥

"মহারাজ অম্বরীষ তাঁর মনকে শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দের ধ্যানে, তাঁর বাণী দিয়ে বৈকুণ্ঠের গুণ বর্ণনায়, তাঁর হাত দিয়ে তিনি ভগবানের মন্দির মার্জনে, তাঁর কান দিয়ে ভগবানের লীলা শ্রবণে, তাঁর চোখ দিয়ে ভগবানের সচ্চিদানন্দময় রূপ দর্শনে, তাঁর দেহ দিয়ে ভক্তদেহ স্পর্শনে, তাঁর নাক দিয়ে ভগবানের শ্রীচরণে অর্পিত ফুলের ঘ্রাণ গ্রহণে, তাঁর জিহ্বা দিয়ে ভগবানকে অর্পিত তুলসীর স্বাদ আস্বাদনে, তাঁর পদদ্বয় দ্বারা যেখানে ভগবানের মন্দির বিরাজমান সেই সব তীর্থস্থানে ভ্রমণে, তাঁর মস্তক দিয়ে ভগবানকে প্রণতি নিবেদনে এবং তাঁর কামনা দিয়ে ভগবানের কামনা সম্পাদনে নিয়োজিত করেছিলেন। এই সমস্ত গুণাবলী তাঁকে ভগবানের *মৎপর* ভক্ত করে তোলে।"

এখানে *মৎপর* শব্দটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। কিভাবে *মৎপর* হওয়া যায়, তা মহারাজ অম্বরীষের আচরণের মাধ্যমে আমরা উপলব্ধি করতে পারি। *মৎপর* পরম্পরায় আচার্য মহাপণ্ডিত শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ মন্তব্য করেছেন, *মদ্ভক্তিপ্রভাবেন সর্বেন্দ্রিয়বিজয়পূর্বিকা স্বাত্মদৃষ্টিঃ সুলভেতি ভাবঃ ।* "ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার মাধ্যমেই কেবল ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণভাবে সংযত করা যায়।" তা ছাড়া, কখনও কখনও আগুনের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়—"একটি আগুনের শিখা যেমন একটি ঘরের মধ্যে সব কিছু পুড়িয়ে ফেলতে পারে, তেমনই যোগীর হৃদয়ে অবস্থিত ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর অন্তর থেকে সব রকমের কলুষতা দহন করেন।" *যোগসূত্রেও* ধ্যানের প্রণালী বর্ণনা করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে ধ্যান করতে। শূন্যকে ধ্যান করার কোন কথাই বলা হয়নি। যে সমস্ত তথাকথিত যোগী শ্রীবিষ্ণু ছাড়া অন্য কিছুর ধ্যান করে, তারা কোন অলীক ছায়ামূর্তির দর্শন করার আশায় অনর্থক সময় নষ্ট করে থাকে। কিন্তু যাঁরা পরমার্থ সাধনের প্রয়াসী, তাঁরা কেবল ভগবদ্ভক্তিই আকাঙ্ক্ষা করেন—সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করেন। এটিই হচ্ছে যোগের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

শ্লোক ৬২-৬৩

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে ।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥ ৬২ ॥
ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩ ॥

ধ্যায়তঃ—ধ্যান করতে করতে; **বিষয়ান্**—ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ; **পুংসঃ**—মানুষের; **সঙ্গঃ**—আসক্তি; **তেষু**—ইন্দ্রিয়-বিষয়ে; **উপজায়তে**—উৎপন্ন হয়; **সঙ্গাৎ**—আসক্তি থেকে; **সঞ্জায়তে**—সঞ্জাত হয়; **কামঃ**—কাম; **কামাৎ**—কাম থেকে; **ক্রোধঃ**—ক্রোধ; **অভিজায়তে**—জন্মায়; **ক্রোধাৎ**—ক্রোধ থেকে; **ভবতি**—হয়; **সম্মোহঃ**—পূর্ণ মোহ; **সম্মোহাৎ**—সম্মোহ থেকে; **স্মৃতি**—স্মৃতির; **বিভ্রমঃ**—বিভ্রান্তি; **স্মৃতিভ্রংশাৎ**—স্মৃতিভ্রংশ হওয়ার ফলে; **বুদ্ধিনাশঃ**—সৎ-অসৎ বিচারবুদ্ধির বিনাশ; **বুদ্ধিনাশাৎ**—বুদ্ধিনাশ হওয়ার ফলে; **প্রণশ্যতি**—অধঃপতিত হয়।

গীতার গান

শুষ্ক বৈরাগ্য যে আর বিষয়েতে ধ্যান ।
ক্রমে ক্রমে সঙ্গ সেই হয় আগুয়ান ॥
সঙ্গ ক্রমে কাম হয় কামে ক্রোধ হয় ।
ক্রোধে সম্মোহন পরে বিভ্রম বাড়ায় ॥
স্মৃতি ভ্রষ্ট হলে পরে বুদ্ধিনাশ হয় ।
বৈরাগীর সর্বনাশ সেই সে পর্যায় ॥

অনুবাদ

ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতে মানুষের তাতে আসক্তি জন্মায়, আসক্তি থেকে কাম উৎপন্ন হয় এবং কামনা থেকে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। ক্রোধ থেকে সম্মোহ, সম্মোহ থেকে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিবিভ্রম থেকে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হওয়ার ফলে সর্বনাশ হয়। অর্থাৎ, মানুষ পুনরায় জড় জগতের অন্ধকূপে অধঃপতিত হয়।

তাৎপর্য

যার অন্তরে ভগবদ্ভক্তির উদয় হয়নি, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করা মাত্রই তার মনে আসক্তি জন্মায়। ইন্দ্রিয়গুলিকে সঠিকভাবে নিযুক্ত করা দরকার, তাই

সেগুলিকে যখন ভগবানের প্রেমময় সেবায় নিয়োজিত করা না হয়, তখন সেই ইন্দ্রিয়গুলি জড়-জাগতিক বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। জড়-জগতের সকলেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়, এমন কি ব্রহ্মা এবং শিবও এর দ্বারা প্রভাবিত—স্বর্গলোকের অন্যান্য দেব-দেবীদের তো কোন কথাই নেই। জড় জগতের এই গোলক-ধাঁধা থেকে বেরিয়ে আসবার একমাত্র উপায় হচ্ছে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হওয়া। এক সময় মহাদেব গভীর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন, পার্বতী যখন কামার্ত হয়ে তাঁর সঙ্গ কামনা করেন, তখন তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হয় এবং তিনি পার্বতীর সঙ্গে মিলিত হন, ফলে কার্তিকের জন্ম হয়। ভগবানের একনিষ্ঠ ভক্ত ঠাকুর হরিদাসও এভাবে স্বয়ং মায়াদেবীর দ্বারা প্রলুব্ধ হন, কিন্তু ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তির প্রভাবে তিনি অনায়াসে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শ্রীযামুনাচার্যের লেখা পূর্বোক্ত শ্লোকের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি যে, নিষ্ঠাবান ভক্ত ভগবানের দিব্য সাহচর্য লাভ করে এক অপ্রাকৃত আনন্দের স্বাদ লাভ করেন, যার ফলে তিনি জড় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ পরিহার করতে পারেন। ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে মন আপনা থেকেই আসক্তি রহিত হয়ে পড়ে এবং হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হয়। সেটিই হচ্ছে সাফল্যের রহস্য। পক্ষান্তরে, ভগবদ্ভক্তি ছাড়া জোর করে ইন্দ্রিয়-দমন করার চেষ্টা করলে তা কখনই ফলপ্রসূ হয় না, কারণ ইন্দ্রিয় সম্ভোগের সামান্য চিন্তার ফলে সংযমের বাঁধ ভেঙে গিয়ে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনায় মন উন্মত্ত হয়ে ওঠে।

শ্রীল রূপ গোস্বামী আমাদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছেন—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

(*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ১/২/২৫৬)

ভগবদ্ভক্তির বিকাশ হলে ভক্ত বুঝতে পারেন, সব কিছু দিয়েই ভগবানের সেবা করা যায়। যারা ভগবৎ-তত্ত্ব জানে না, তারা কৃত্রিম উপায়ে জড় বিষয়বস্তু পরিহার করার চেষ্টা করে এবং ফলস্বরূপ, যদিও তারা জড় বন্ধন থেকে মুক্তির কামনা করে, কিন্তু এই রকম শত চেষ্টা করেও তাদের হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হয় না। তাদের তথাকথিত বৈরাগ্যকে বলা হয় ফল্গু অর্থাৎ অসার। পক্ষান্তরে, ভগবদ্ভক্ত জানেন কিভাবে সব কিছু ভগবানের সেবায় ব্যবহার করতে হয়; তাই তিনি আর জড় চেতনার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নির্বিশেষবাদীদের মতে,

ভগবান অথবা পরমতত্ত্ব হচ্ছেন নিরাকার, তাই তিনি খেতে পারেন না, ভোগও করতে পারেন না। সেই জন্য নির্বিশেষবাদীরা জোর করে ইন্দ্রিয়-দমন করবার অভিপ্রায়ে ভাল খাবার আদি সব রকমের ভোগ পরিত্যাগ করার চেষ্টা করে। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম ভোক্তা এবং ভক্তিভরে যা কিছু নৈবেদ্য তাঁকে নিবেদন করা হয়, তা তিনি ভোজন করেন। তাই, ভক্ত উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য ভগবানের ভোগের জন্য নিবেদন করে, সেই নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করেন। ভক্তকে তাই জোর করে ইন্দ্রিয়-দমন করতে হয় না। এভাবেই ভগবানকে নিবেদন করার ফলে সব কিছু পবিত্র হয়ে ওঠে এবং সেই ভগবৎ-প্রসাদ গ্রহণ করার ফলে অধঃপতনের আর কোন সম্ভাবনা থাকে না। পক্ষান্তরে, নির্বিশেষবাদীরা জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হবার প্রয়াসে সব কিছুই পার্থিব বলে পরিত্যাগ করতে সচেষ্ট হয়, কিন্তু এই ধরনের কৃত্রিম বৈরাগ্যের ফলে তারা জীবনকে উপভোগ করতে পারে না। সামান্য উত্তেজনাতেই তাই তাদের সংযমের বাঁধ ভেঙে যায় এবং তারা জড় জগতের আবর্তে পতিত হয়। সেই জন্যই এই সমস্ত মুক্তিকামীরা জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হবার পরেও, ভগবদ্ভক্তির অবলম্বন না থাকার ফলে, আবার জড়া প্রকৃতিতে পতিত হয়।

শ্লোক ৬৪

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্ ।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥

রাগ—আসক্তি; **দ্বেষ**—বিদ্বেষ; **বিমুক্তৈঃ**—যিনি মুক্ত হয়েছেন; **তু**—কিন্তু; **বিষয়ান্**—ইন্দ্রিয়ের বিষয়; **ইন্দ্রিয়ৈঃ**—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; **চরন্**—আচরণ করে; **আত্মবশ্যৈঃ**—স্বীয় বশীভূত; **বিধেয়াত্মা**—সংযতচিত্ত মানুষ, **প্রসাদম্**—ভগবানের কৃপা; **অধিগচ্ছতি**—লাভ করেন।

গীতার গান

অতএব রাগ দ্বেষ নাহি যাঁর অতি ।
মুক্ত যেবা হইয়াছে বিষয়ের গতি ॥
চিত্ত প্রসাদে সে হয় কৃষ্ণার্পিত মন ।
বিষয়ে থাকিয়া তিনি জীবন্মুক্ত হন ॥

অনুবাদ

সংযতচিত্ত মানুষ প্রিয় বস্তুতে স্বাভাবিক আসক্তি এবং অপ্রিয় বস্তুতে স্বাভাবিক বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হয়ে, তাঁর বশীভূত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করে ভগবানের কৃপা লাভ করেন।

তাৎপর্য

ইতিপূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, অষ্টাঙ্গ-যোগ, হঠযোগ আদি কৃত্রিম উপায়ে সাময়িকভাবে ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করা সম্ভব হলেও, ভগবানের সেবায় তাদের নিযুক্ত না করলে, প্রতি মুহূর্তে মায়ার দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। অনেক সময় ভগবানের ভক্তকে আপাতদৃষ্টিতে ইন্দ্রিয়াসক্ত বলে মনে হলেও, ভগবানের প্রতি নির্মল ভক্তি লাভ করার ফলে ইন্দ্রিয়-পরায়ণ কার্যকলাপের প্রতি তাঁর কোন আসক্তি থাকে না। ভগবানের প্রতি ভালবাসা এতই গভীর যে, আর কোন কিছুর প্রতি তাঁর কোন রকম মোহ থাকে না। ভগবানের প্রেমামৃতের আস্বাদন অর্জন করার ফলে বিষয়-বিষের প্রতি তাঁর আর আসক্তি থাকে না। ভগবানের ভক্তের একমাত্র চিন্তা হচ্ছে, কিভাবে তিনি ভগবানের সেবা করবেন, কিভাবে ভগবানকে তুষ্ট করবেন, এ ছাড়া আর কোন বিষয়েই তিনি চিন্তা করেন না। তাই তিনি সমস্ত রকমের আসক্তি ও নিরাসক্তির অতীত। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা অনুসারে কেবল তিনি তাঁর সমস্ত কর্তব্যকর্ম করেন। শ্রীকৃষ্ণ যদি চান, তবে তিনি এমন কাজও করেন, যার জন্য সারা জগৎ তাঁকে নিন্দা করতে পারে। আবার শ্রীকৃষ্ণ না চাইলে তিনি তাঁর অবশ্য করণীয় কর্মও পরিত্যাগ করেন। কর্তব্যকর্ম সাধন সাধারণত নির্ভর করে আমাদের ইচ্ছার উপরে, কিন্তু কৃষ্ণভক্ত কেবল ভগবানের নির্দেশ অনুসারে তাঁর কর্তব্যকর্ম করে চলেন। ভগবানের অহৈতুকী কৃপার ফলে ভক্ত এই ধরনের শুদ্ধ চেতনা লাভ করেন, যার ফলে কোন রকম জড় কলুষময় পরিবেশে তিনি সংশ্লিষ্ট থাকলেও কোন কলুষতা আর তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।

শ্লোক ৬৫

প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে ।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ॥

প্রসাদে—ভগবানের অহৈতুকী কৃপা লাভ করার ফলে; **সর্ব**—সমস্ত; **দুঃখানাম্**—জড় দুঃখের; **হানিঃ**—বিনাশ; **অস্য**—তাঁর; **উপজায়তে**—হয়; **প্রসন্নচেতসঃ**—প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির; **হি**—অবশ্যই; **আশু**—অতি শীঘ্র; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **পরি**—সর্বতোভাবে; **অবতিষ্ঠতে**—স্থির হয়।

গীতার গান

পরমানন্দ সুখ যেই প্রসাদ তার নাম ।
যাহার প্রাপ্তিতে দুঃখ হয় অন্তর্ধান ॥
সে প্রসাদে প্রতিষ্ঠিত যে হয় নিশ্চিত ।
আত্মনিষ্ঠা বুদ্ধি তার জগতে বিদিত ॥

অনুবাদ

চিন্ময় চেতনায় অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে তখন আর জড় জগতের ত্রিতাপ দুঃখ থাকে না; এভাবে প্রসন্নতা লাভ করার ফলে বুদ্ধি শীঘ্রই স্থির হয়।

শ্লোক ৬৬

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা ।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥ ৬৬ ॥

ন অস্তি—থাকতে পারে না; **বুদ্ধিঃ**—চিন্ময় বুদ্ধি; **অযুক্তস্য**—যে কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত নয়; **ন**—না; **চ**—এবং; **অযুক্তস্য**—কৃষ্ণভক্তিবিহীন ব্যক্তির; **ভাবনা**—সুখের চিন্তায় মগ্নচিত্ত; **ন**—না; **চ**—এবং; **অভাবয়তঃ**—পরমার্থ চিন্তাশূন্য ব্যক্তির; **শান্তিঃ**—শান্তি, **অশান্তস্য**—শান্তিরহিত ব্যক্তির; **কুতঃ**—কোথায়; **সুখম্**—সুখ।

গীতার গান

জীবের স্বরূপ হয় আনন্দেতে মতি ।
বুদ্ধিযোগ বিনা তার কোথায় বা গতি ॥
অতএব সে ভাবনা নাহি যার স্থিতি ।
কোথা শান্তি তার বল সুখের প্রগতি ॥

অনুবাদ

যে ব্যক্তি কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত নয়, তার চিত্ত সংযত নয় এবং তার পারমার্থিক বুদ্ধি থাকতে পারে না। আর পরমার্থ চিন্তাশূন্য ব্যক্তির শান্তি লাভের কোন সম্ভাবনা নেই। এই রকম শান্তিহীন ব্যক্তির প্রকৃত সুখ কোথায়?

তাৎপর্য

ভগবানের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত না করলে কোন মতেই শান্তি পাওয়া যেতে পারে না। ভগবান নিজেই পঞ্চম অধ্যায়ে (৫/২৯) প্রতিপন্ন করেছেন যে, যখন কেউ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, কৃষ্ণই হচ্ছে সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার একমাত্র ভোক্তা, তিনিই সমস্ত বিশ্ব-চরাচরের অধীশ্বর এবং তিনিই সমস্ত জীবের প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু, তবেই সে প্রকৃত শান্তি লাভ করতে পারে। তাই, যে কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত নয়, তার জীবনের কোন চরম উদ্দেশ্যই থাকে না। জীবনের চরম উদ্দেশ্য কি, তা না জানাই তার সমগ্র অশান্তির কারণ। কিন্তু কেউ যখন বুঝতে পারে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম ভোক্তা, অধীশ্বর ও সর্বভূতের পরম সুহৃদ্, তখন তার মন শ্রীকৃষ্ণের সেবায় একাগ্র হয়ে ওঠে এবং তার ফলে সে প্রকৃত শান্তি লাভ করে। তাই, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ রহিত হয়ে যে তার সময় অতিবাহিত করে, সে যতই লোক দেখানো তথাকথিত শান্তি ও পারমার্থিক প্রগতির বুলি আওড়াক না কেন, সে সর্বদাই দুঃখ-দুর্দশায় পীড়িত ও অশান্ত। কৃষ্ণভাবনামৃত হচ্ছে একটি স্বয়ং-প্রকাশিত শান্তিপূর্ণ পরিবেশ, যা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একমাত্র সম্বন্ধ গড়ে তোলার মাধ্যমেই লাভ করা যায়।

শ্লোক ৬৭

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে ।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৬৭ ॥

ইন্দ্রিয়াণাম্—ইন্দ্রিয়সমূহের; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **চরতাম্**—বিচরণকালে; **যৎ**—যার দ্বারা; **মনঃ**—মন; **অনুবিধীয়তে**—সদা অনুসরণ করে; **তৎ**—তা; **অস্য**—তার; **হরতি**—হরণ করে; **প্রজ্ঞাম্**—বুদ্ধিকে; **বায়ুঃ**—বায়ু; **নাবম্**—নৌকা; **ইব**—মতো; **অম্ভসি**—জলে।

গীতার গান

ইন্দ্রিয় চালিত করি মনোধর্মে স্থিতি ।
বায়ুর মধ্যেতে যথা নৌকার প্রগতি ॥
সে নৌকা যেমন সদা টলমল করে ।
অযুক্ত ব্যক্তির প্রজ্ঞা সেইরূপ হরে ॥

অনুবাদ

প্রতিকূল বায়ু নৌকাকে যেমন অস্থির করে, তেমনই সদা বিচরণকারী যে কোন একটি মাত্র ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণেও মন অসংযত ব্যক্তির প্রজ্ঞাকে হরণ করতে পারে।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্ত যদি তাঁর সব কয়টি ইন্দ্রিয়কে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত না করেন, যদি তাঁর কোন একটি ইন্দ্রিয়ও জড় সুখ উপভোগ করার প্রয়াসী হয়, তা হলেও তাঁর মন ভগবানের শ্রীচরণকমল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে, ফলে তাঁর পারমার্থিক উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হবে। মহারাজ অম্বরীষের ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে আমরা শিক্ষা পাই, তাঁর মতো আমাদেরও সব কয়টি ইন্দ্রিয়কে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করতে হবে। তা হলেই মন একাগ্র হয়ে ভগবানের শ্রীচরণে সমাধিস্থ হবে, কেন না সেটিই হচ্ছে মনকে নিয়ন্ত্রণ করার যথার্থ কৌশল।

শ্লোক ৬৮

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **যস্য**—যাঁর; **মহাবাহো**—হে মহাবীর; **নিগৃহীতানি**—নিবৃত্ত হওয়ার ফলে; **সর্বশঃ**—সর্ব প্রকারে; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ**—ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে; **তস্য**—তাঁর; **প্রজ্ঞা**—প্রজ্ঞা; **প্রতিষ্ঠিতা**—স্থির।

গীতার গান

অতএব মহাবাহো শুন মন দিয়া ।
নিগৃহীত মন যাঁর আমারে সঁপিয়া ॥

তাঁহার ইন্দ্রিয় বশ মোরে সমর্পিত ।
তাঁহারই প্রজ্ঞা হয় পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত ॥

অনুবাদ

সুতরাং, হে মহাবাহো! যাঁর ইন্দ্রিয়গুলি ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে সর্বপ্রকারে নিবৃত্ত হয়েছে, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ।

তাৎপর্য

কেবলমাত্র কৃষ্ণভাবনা অথবা ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়োজিত করার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়-তর্পণের বেগগুলিকে দমন করা যায়। যেমন উচ্চতর শক্তি প্রয়োগ করে শত্রুদের দমন করা যায়, ইন্দ্রিয়গুলিকে তেমনই উপায়ে দমন করতে হয়—কোনও মানবিক প্রচেষ্টায় তা হয় না। সেগুলিকে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত রাখার মাধ্যমেই তা সম্ভব। এই সত্য যিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, কৃষ্ণভাবনাই মানুষকে পরিশুদ্ধ বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা এনে দেয় এবং কোন সদ্‌গুরুর পথনির্দেশ মতোই সেই পদ্ধতির অনুশীলন করতে হয়, তাঁকেই বলা হয় সাধক, অর্থাৎ তিনি জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হবার যোগ্য পাত্র।

শ্লোক ৬৯

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী ।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ ৬৯ ॥

যা—যা; নিশা—রাত্রি; সর্ব—সমস্ত; ভূতানাম্—জীবদের; তস্যাম্—তাতে; জাগর্তি—জাগ্রত থাকেন; সংযমী—আত্মসংযমী; যস্যাম্—যাতে; জাগ্রতি—জাগ্রত থাকেন; ভূতানি—সমস্ত জীব; সা—তা; নিশা—রাত্রি; পশ্যতঃ—তত্ত্বদর্শী; মুনেঃ—মননশীল ব্যক্তির পক্ষে।

গীতার গান

বিষয়ী বিষয়ে নিষ্ঠা করে সে প্রচুর ।
সর্বদা জাগ্রত সেই সদা ভরপুর ॥

সংযমীর সেই চেষ্টা নিশার সমান ।
সংযমী জাগ্রত থাকে আত্মবিষয়ান ॥
বিষয়ীর সেই আত্মা রাত্রির সমান ।
উভয়ের কার্য হয় বহু ব্যবধান ॥

অনুবাদ

সমস্ত জীবের পক্ষে যা রাত্রিস্বরূপ, স্থিতপ্রজ্ঞ সেই রাত্রিতে জাগরিত থেকে আত্ম-বুদ্ধিনিষ্ঠ আনন্দকে সাক্ষাৎ অনুভব করেন। আর যখন সমস্ত জীবেরা জেগে থাকে, তখন তত্ত্বদর্শী মুনির নিকট তা রাত্রিস্বরূপ।

তাৎপর্য

এই জগতে দুই রকমের বুদ্ধিমান লোক আছে। এক ধরনের বুদ্ধিমান লোক ইন্দ্রিয় ভোগতৃপ্তির উদ্দেশ্যে বৈষয়িক ব্যাপারে খুব উন্নতি লাভ করে, আর অন্য ধরনের বুদ্ধিমানেরা আত্মানুসন্ধানী এবং আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভের চেষ্টায় সদা জাগ্রত। আত্মানুসন্ধানী সাধু বা চিন্তাশীল মানুষের কাজকর্ম জড়-জাগতিক ভাবে আচ্ছন্ন মানুষদের কাছে যেন রাত্রির অন্ধকার বলে মনে হয়। আত্ম-উপলব্ধি সম্পর্কে অজ্ঞতার জন্যই জড়-জাগতিক মানুষেরা তেমন রাত্রির অন্ধকারে ঘুমিয়ে থাকে। কিন্তু তত্ত্বদর্শী মুনি জড়-জাগতিক মানুষদের রাত্রিতে সজাগ থাকেন। সেই সময় সাধুজন আধ্যাত্মিক চর্চায় ক্রমশ অগ্রগতির পথে অপ্রাকৃত আনন্দ উপলব্ধি করেন, আর তখন সংসারী লোক রাত্রিতে ঘুমিয়ে থেকে নানা রকম ইন্দ্রিয় উপভোগের স্বপ্ন দেখে এবং সেই স্বপ্নে সে কখনও নিজেকে সুখী মনে করে, কখনও ঘুমের ঘোরে দুঃখীও মনে করে। এই সমস্ত জড়-জাগতিক সুখ-দুঃখের প্রতি আত্মানুসন্ধানী ব্যক্তি সর্বদাই উদাসীন থাকেন। তিনি জড়-জাগতিক প্রতিক্রিয়ায় সম্পূর্ণ নিস্পৃহ থেকে আত্ম-উপলব্ধির কাজে সচেষ্ট থাকেন।

শ্লোক ৭০

আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০ ॥

আপূর্যমাণম্—সর্বদা পূর্ণ; **অচলপ্রতিষ্ঠম্**—স্থির; **সমুদ্রম্**—সমুদ্রে; **আপঃ**—জলরাশি; **প্রবিশন্তি**—প্রবেশ করে; **যদ্বৎ**—যেমন; **তদ্বৎ**—তেমন; **কামাঃ**—কামনাসমূহ; **যম্**—যার মধ্যে; **প্রবিশন্তি**—প্রবেশ করে; **সর্বে**—সমস্ত; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **শান্তিম্**—শান্তি; **আপ্নোতি**—লাভ করেন; **ন**—না; **কামকামী**—বিষয়কামী ব্যক্তি।

গীতার গান

সমুদ্রে নদীর জল যেমন প্রবেশ।
বিচলিত নহে সেই সদা নির্বিশেষ ॥
সেইভাবে মনে যার কামের চালনা।
সে শান্তি পাইবে ফল শান্তির সাধনা ॥

অনুবাদ

বিষয়কামী ব্যক্তি কখনও শান্তি লাভ করে না। জলরাশি যেমন সদা পরিপূর্ণ এবং স্থির সমুদ্রে প্রবেশ করেও তাকে ক্ষোভিত করতে পারে না, কামসমূহও তেমন স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিতে প্রবিষ্ট হয়েও তাঁকে বিক্ষুব্ধ করতে পারে না, অতএব তিনিই শান্তি লাভ করেন।

তাৎপর্য

যদিও মহাসমুদ্র সব সময় জলে পূর্ণ থাকে এবং বর্ষার সময় নদীবাহিত হয়ে আরও জল সমুদ্রে প্রবেশ করে, কিন্তু সমুদ্রের কোনও পরিবর্তন হয় না—স্থির থাকে; সমুদ্র তখনও বিক্ষুব্ধ হয় না, এমন কি বেলাভূমি অতিক্রম করে প্লাবিত হয় না। কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন কৃষ্ণভক্তও সর্ব অবস্থাতেই তেমনই অবিচল থাকেন। যতক্ষণ মানুষ জড় দেহ নিয়ে আছে, ততক্ষণ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য দেহের চাহিদাও থাকবেই। কিন্তু ভগবানের ভক্ত তাঁর পূর্ণতার জন্য এই সমস্ত কামনা-বাসনার দ্বারা কখনই বিচলিত হন না। কারণ, কৃষ্ণভক্তের কোন কিছুরই অভাব নেই, ভগবান তাঁর সমস্ত অভাব মোচন করেছেন। তাই তিনি সমুদ্রের মতো—নিজের মধ্যেই সর্বদা পরিপূর্ণ। ইন্দ্রিয়ের নদী বেয়ে কামনা-বাসনার যত জলই তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করুক, তাঁর হৃদয় সমুদ্রের মতোই অবিচলভাবে পরিপূর্ণ থাকে। এটিই হচ্ছে ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ—জড় জগতের ভোগবাসনার প্রতি তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন, যদিও বাসনাগুলি তাঁর মধ্যে রয়েছে। ভগবানের সেবায় গভীরভাবে মগ্ন থাকার ফলে তিনি যে শান্তি লাভ করেছেন, তা সমুদ্রের মতোই অতলস্পর্শী। কোন কিছুই তাঁকে আর

বিচলিত করতে পারে না। পক্ষান্তরে, অন্যেরা, এমন কি যারা মুক্তির আকাঙ্ক্ষী—জাগতিক সাফল্যের আকাঙ্ক্ষীদের কি আর কথা, তারাও সর্বদাই অশান্ত। সকাম কর্মী, মুক্তিকামী ও সিদ্ধিকামী যোগী—সকলেই অশান্ত, যেহেতু তাদের অপূর্ণ বাসনা। কিন্তু কৃষ্ণভক্ত ভগবানের সেবায় সর্বতোভাবে পরম শান্তি লাভ করে থাকেন, তাঁর কোন বাসনাই অপূর্ণ থাকে না। বাস্তবিকপক্ষে, তিনি এমন কি জড় জগতের তথাকথিত বন্ধন থেকে মুক্তির কামনাও করেন না। কৃষ্ণভক্তদের কোন জড় কামনা থাকে না, তাই তাঁরা সম্পূর্ণরূপে শান্ত।

শ্লোক ৭১

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ ॥

বিহায়—ত্যাগ করে; **কামান্**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনাসমূহ; **যঃ**—যে ব্যক্তি; **সর্বান্**—সমস্ত; **পুমান্**—পুরুষ; **চরতি**—বিচরণ করেন; **নিঃস্পৃহঃ**—স্পৃহাশূন্য; **নির্মমঃ**—মমত্ববোধ রহিত; **নিরহঙ্কারঃ**—অহঙ্কারশূন্য; **সঃ**—তিনি; **শান্তিম্**—প্রকৃত শান্তি; **অধিগচ্ছতি**—প্রাপ্ত হন।

গীতার গান

কাম ছাড়ি সব যেবা নিস্পৃহ ধীমান্।
সর্বত্র ভ্রমণ করে নারদীয় গান ॥
মমতাবিহীন আর অহঙ্কার নাই।
তার শান্তি বিনিশ্চিত সেইত গোঁসাই ॥

অনুবাদ

যে ব্যক্তি সমস্ত কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করে জড় বিষয়ের প্রতি নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার ও মমত্ববোধ রহিত হয়ে বিচরণ করেন, তিনিই প্রকৃত শান্তি লাভ করেন।

তাৎপর্য

নিষ্কাম হওয়ার অর্থ হচ্ছে নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য কোন কিছু কামনা না করা। পক্ষান্তরে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করার কামনাই হচ্ছে নিষ্কামনা। এই জড়

দেহটিকে বৃথাই আমাদের প্রকৃত সত্তা বলে না ভেবে এবং জগতের কোনও কিছুর উপরে বৃথা মালিকানা দাবি না করে, শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস রূপে নিজের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করাটাই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনার পরিশুদ্ধ পর্যায়। এই পরিশুদ্ধ পর্যায়ে যে উন্নীত হতে পারে, সে বুঝতে পারে, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সব কিছুর অধীশ্বর, তাই তাঁকে সন্তুষ্ট করবার জন্য সব কিছুই তাঁর সেবায় উৎসর্গ করা উচিত। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রারম্ভে অর্জুন নিজের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করতে নারাজ হয়েছিলেন, কিন্তু ভগবানের কৃপার ফলে তিনি যখন পরিপূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনাময় হলেন, তখন ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে তিনি যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হলেন। নিজের জন্য যুদ্ধ করার ইচ্ছা অর্জুনের ছিল না, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছার কথা জেনে সেই একই অর্জুন যথাসাধ্য বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। ভগবানকে সন্তুষ্ট করার বাসনাই হচ্ছে বাসনা রহিত হওয়ার একমাত্র উপায়। কোন রকম কৃত্রিম উপায়ে কামনা-বাসনাগুলিকে জয় করা যায় না। জীব কখনই ইন্দ্রিয়ানুভূতিশূন্য অথবা বাসনা রহিত হতে পারে না। তবে ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও কামনা-বাসনার বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্য সে তাদের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারে। জড়-জাগতিক বাসনাশূন্য মানুষ অবশ্যই বোঝেন যে, সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের *(ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্)* এবং সেই জন্য তিনি কোন কিছুর উপরেই মালিকানা দাবি করেন না। এই পারমার্থিক জ্ঞান আত্ম-উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ, তখন যথাযথভাবে বোঝা যায় যে, চিন্ময় স্বরূপে প্রত্যেকটি জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্য অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তাই জীবের নিত্য স্থিতি কখনই শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ বা তাঁর চেয়ে বড় নয়। কৃষ্ণভাবনামৃতের এই সত্য উপলব্ধি করাই হচ্ছে প্রকৃত শান্তি লাভের মূল নীতি।

শ্লোক ৭২

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি ।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২ ॥

এষা—এই; **ব্রাহ্মী**—চিন্ময়; **স্থিতিঃ**—স্থিতি; **পার্থ**—হে পৃথাপুত্র; **ন**—না; **এনাম্**—এই; **প্রাপ্য**—লাভ করে; **বিমুহ্যতি**—বিমোহিত হন; **স্থিত্বা**—স্থিত হয়ে; **অস্যাম্**—এতে; **অন্তকালে**—জীবনের অন্তিম সময়ে; **অপি**—ও; **ব্রহ্মনির্বাণম্**—জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময় স্তর; **ঋচ্ছতি**—লাভ করেন।

গীতার গান

সেই সে স্মৃতির নাম ব্রাহ্মীস্থিতি হয় ।
যাঁর প্রাপ্তি হয় তাঁর মোহন কোথায় ॥
সেই স্থিতি যদি হয় মরণের কালে ।
ব্রহ্মস্থিতি ভাব নহে কালের কবলে ॥

অনুবাদ

এই প্রকার স্থিতিকেই ব্রাহ্মীস্থিতি বলে। হে পার্থ! যিনি এই স্থিতি লাভ করেন, তিনি মোহপ্রাপ্ত হন না । জীবনের অন্তিম সময়ে এই স্থিতি লাভ করে, তিনি এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবৎ-ধামে প্রবেশ করেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনামৃত অর্থাৎ ভগবৎ-পরায়ণ দিব্য জীবন এক মুহূর্তের মধ্যে লাভ করা সম্ভব, আবার লক্ষ-কোটি জীবনেও তার নাগাল পাওয়া সম্ভব না হতেও পারে। এই জীবন লাভ করতে হলে কেবল পরম সত্যকে উপলব্ধি করে তাকে গ্রহণ করতে হবে। খট্টাঙ্গ মহারাজ তাঁর মৃত্যুর মাত্র কয়েক মুহূর্ত পূর্বে ভগবানের চরণারবিন্দে আত্মোৎসর্গ করার ফলে জীবনের সেই পর্যায়ে উপনীত হয়েছিলেন। *নির্বাণ* কথাটির অর্থ হচ্ছে জড় জীবনের সমাপ্তি। বৌদ্ধদের মতে জড় জীবনের সমাপ্তি হলে আত্মা অসীম শূন্যতায় বিলীন হয়ে যায়। *ভগবদ্গীতা* কিন্তু আমাদের সেই শিক্ষা দেয় না। এই জড় জীবনের সমাপ্তি হবার পরে আমাদের প্রকৃত জীবন শুরু হয়। এই জড়-জাগতিক জীবনধারা পরিসমাপ্ত করতে হবে, সেই কথাটি জানাই স্থূল জড়বাদীর পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু যিনি পারমার্থিক জ্ঞান অর্জন করেছেন তিনি জানেন যে, এই জড় জীবনের পরেও আর একটি জীবন আছে। এই জীবনের পরিসমাপ্তির পূর্বে, সৌভাগ্যক্রমে কেউ যদি কৃষ্ণভাবনাময় হয়, তবে সে তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মনির্বাণ স্তর লাভ করে। ভগবৎ-ধাম ও ভগবৎ-সেবার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। যেহেতু উভয়ই চিন্ময়, তাই ভক্তিযোগে ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত হওয়াই হচ্ছে ভগবৎ-ধাম প্রাপ্তি। জড় জগতের সমস্ত কর্মই ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য সাধিত হয়, কিন্তু চিন্ময় জগতের সমস্ত কর্মই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য সাধিত হয়। এমন কি এই জীবনে কৃষ্ণভাবনায় উদ্বুদ্ধ হলে সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় এবং যিনি কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন, তিনি নিঃসন্দেহে ইতিমধ্যেই ভগবৎ-ধামে প্রবেশ করেছেন।

ব্রহ্ম হচ্ছে জড় বস্তুর ঠিক বিপরীত। তাই *ব্রাহ্মী স্থিতি* বলতে বোঝায় 'জড়-জাগতিক স্তরের অতীত'। ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা নিবেদনকে *ভগবদ্গীতায়* মুক্ত স্তররূপে স্বীকার করা হয়েছে (*স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে*)। তাই, জড় বন্ধন থেকে মুক্তিই হচ্ছে *ব্রাহ্মী স্থিতি*।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর *ভগবদ্গীতার* দ্বিতীয় অধ্যায়কে সমগ্র *ভগবদ্গীতার* সারাংশ বলে বর্ণনা করেছেন। *ভগবদ্গীতার* বিষয়বস্তু হচ্ছে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে এবং সমগ্র *গীতার* সারমর্ম-স্বরূপ ভক্তিযোগের আভাস দেওয়া হয়েছে।

ভক্তিবেদান্ত কহে শ্রীগীতার গান।
শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগতপ্রাণ ॥

ইতি—গীতার বিষয়বস্তুর সারমর্ম পরিবেশিত বিষয়ক 'সাংখ্য-যোগ' নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়

কর্মযোগ

শ্লোক ১

অর্জুন উবাচ

জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন।
তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১ ॥

অর্জুনঃ উবাচ—অর্জুন বললেন; **জ্যায়সী**—শ্রেয়তর; **চেৎ**—যদি; **কর্মণঃ**—সকাম কর্ম অপেক্ষা; **তে**—তোমার; **মতা**—মতে; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **জনার্দন**—হে শ্রীকৃষ্ণ; **তৎ**—তা হলে; **কিম্**—কেন; **কর্মণি**—কর্মে; **ঘোরে**—ভয়ানক; **মাম্**—আমাকে; **নিয়োজয়সি**—নিযুক্ত করছ; **কেশব**—হে শ্রীকৃষ্ণ।

গীতার গান

অর্জুন কহিলেন ঃ

যদি বুদ্ধিযোগ শ্রেষ্ঠ ওহে জনার্দন।
ঘোর যুদ্ধে নিয়োজিত কর কি কারণ ॥

অনুবাদ

অর্জুন বললেন—হে জনার্দন! হে কেশব! যদি তোমার মতে কর্ম অপেক্ষা ভক্তি-বিষয়িনী বুদ্ধি শ্রেয়তর হয়, তা হলে এই ভয়ানক যুদ্ধে নিযুক্ত হওয়ার জন্য কেন আমাকে প্ররোচিত করছ?

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয় সখা অর্জুনকে জড় জগতের দুঃখার্ণব থেকে উদ্ধার করবার জন্য আত্মার স্বরূপ বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন এবং সেই সঙ্গে তিনি আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করার পন্থাও বর্ণনা করেছেন—সেই পথ হচ্ছে বুদ্ধিযোগ অর্থাৎ কৃষ্ণভাবনা। কখনও কখনও এই বুদ্ধিযোগের কদর্থ করে একদল নিষ্কর্মা লোক কর্ম-বিমুখতার আশ্রয় গ্রহণ করে। কৃষ্ণভাবনার নাম করে তারা নির্জনে বসে কেবল হরিনাম জপ করেই কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ওঠার দুরাশা করে। কিন্তু যথাযথভাবে ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞানের শিক্ষা লাভ না করে নির্জনে বসে কৃষ্ণনাম জপ করলে নিরীহ, অজ্ঞ লোকের সস্তা বাহবা পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তাতে কোন লাভ হয় না। অর্জুনও প্রথমে বুদ্ধিযোগ বা ভক্তিযোগকে কর্মজীবন থেকে অবসর নেবার নামান্তর বলে বিবেচনা করেছিলেন এবং মনে করেছিলেন, নির্জন অরণ্যে কৃচ্ছ্রসাধনা ও তপশ্চর্যার জীবনযাপন করবেন। পক্ষান্তরে, তিনি কৃষ্ণভাবনার অজুহাত দেখিয়ে সুকৌশলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ থেকে নিরস্ত হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নিষ্ঠাবান শিষ্যের মতো যখন তিনি তাঁর গুরুদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই তৃতীয় অধ্যায়ে তাঁকে কর্মযোগ বা কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করে শোনান।

শ্লোক ২

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে ।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥ ২ ॥

ব্যামিশ্রেণ—দ্ব্যর্থবোধক; **ইব**—যেন; **বাক্যেন**—বাক্যের দ্বারা; **বুদ্ধিম্**—বুদ্ধি; **মোহয়সি**—মোহিত করছ; **ইব**—মতো; **মে**—আমার; **তৎ**—অতএব; **একম্**—একমাত্র; **বদ**—দয়া করে বল; **নিশ্চিত্য**—নিশ্চিতভাবে; **যেন**—যার দ্বারা; **শ্রেয়ঃ**—প্রকৃত কল্যাণ; **অহম্**—আমি; **আপ্নুয়াম্**—লাভ করতে পারি।

গীতার গান

দ্ব্যর্থক কথায় বুদ্ধি মোহিত যে হয় ।
নিশ্চিত যা হয় কহ শ্রেয় উপজয় ॥

অনুবাদ

তুমি যেন দ্ব্যর্থবোধক বাক্যের দ্বারা আমার বুদ্ধি বিভ্রান্ত করছ। তাই, দয়া করে আমাকে নিশ্চিতভাবে বল কোন্‌টি আমার পক্ষে সবচেয়ে শ্রেয়স্কর।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার ভূমিকাস্বরূপ পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সাংখ্য-যোগ, বুদ্ধিযোগ, ইন্দ্রিয়-সংযম, নিষ্কাম কর্ম, কনিষ্ঠ ভক্তের স্থিতি আদি বিভিন্ন পন্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেগুলি সবই অসম্বদ্ধভাবে পরিবেশিত হয়েছিল। কর্মোদ্যোগ গ্রহণ এবং উপলব্ধির জন্য যথাযথ পন্থা-প্রণালী সম্পর্কিত বিশেষভাবে সুবিন্যস্ত নির্দেশাবলী একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং, ভগবানেরই ইচ্ছার ফলে অর্জুন সাধারণ মানুষের মতো কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তাঁকে নানা রকম প্রশ্ন করেছেন, যাতে সাধারণ মোহাচ্ছন্ন মানুষেরাও ভগবানের উপদেশাত্মক বাণীর যথাযথ অর্থ উপলব্ধি করতে পারে। ভগবৎ-তত্ত্বের যথার্থ অর্থ না বুঝতে পেরে অর্জুন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কুতার্কিকদের মতো কথার জাল বিস্তার করে ভগবান অর্জুনকে বিভ্রান্ত করতে চাননি। নিষ্ক্রিয়তা অথবা সক্রিয় সেবা—কোনভাবেই অর্জুন কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা অনুসরণ করতে পারছিলেন না। পক্ষান্তরে, কৃষ্ণভাবনাময় পথ সুগম করে তোলার উদ্দেশ্যে ভগবানের অনুপ্রেরণায় অর্জুন নানা রকম প্রশ্নের অবতারণা করেছেন, যাতে *ভগবদ্গীতার* রহস্য উপলব্ধি করার জন্য যাঁরা গভীরভাবে আগ্রহী, তাঁদের সুবিধা হয়।

শ্লোক ৩

শ্রীভগবানুবাচ
লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **লোকে**—জগতে; **অস্মিন্**—এই; **দ্বিবিধা**—দুই প্রকার; **নিষ্ঠা**—নিষ্ঠা; **পুরা**—ইতিপূর্বে; **প্রোক্তা**—উক্ত হয়েছে; **ময়া**—আমার দ্বারা; **অনঘ**—হে নিষ্পাপ; **জ্ঞানযোগেন**—জ্ঞানযোগের দ্বারা; **সাংখ্যানাম্**—অভিজ্ঞতালব্ধ দার্শনিকদের; **কর্মযোগেন**—ভগবানে অর্পিত নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা; **যোগিনাম্**—ভক্তদের।

গীতার গান

শ্রীভগবান কহিলেন ঃ

দ্বিবিধ লোকের নিষ্ঠা বলেছি তোমারে ।
সাংখ্য আর জ্ঞানযোগ যোগ্য অধিকারে ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে নিষ্পাপ অর্জুন! আমি ইতিপূর্বে ব্যাখ্যা করেছি যে, দুই প্রকার মানুষ আত্ম-উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে। কিছু লোক অভিজ্ঞতালব্ধ দার্শনিক জ্ঞানের আলোচনার মাধ্যমে নিজেকে জানতে চান এবং অন্যেরা আবার তা ভক্তির মাধ্যমে জানতে চান।

তাৎপর্য

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৯তম শ্লোকে ভগবান সাংখ্য-যোগ ও কর্মযোগ বা বুদ্ধিযোগ—এই দুটি পন্থার ব্যাখ্যা করেছেন। এই শ্লোকে ভগবান তারই বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। সাংখ্য-যোগ চেতন ও জড়ের প্রকৃতির বিশ্লেষণমূলক বিষয়বস্তু। যে সমস্ত মানুষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দার্শনিক তত্ত্বের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করতে চায়, তাদের বিষয়বস্তু হচ্ছে এই সাংখ্য-যোগ। অন্য পন্থাটি হচ্ছে কৃষ্ণভাবনা বা বুদ্ধিযোগ, যা দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬১তম শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভগবান ৩৯তম শ্লোকেও ব্যাখ্যা করেছেন যে, এই বুদ্ধিযোগ বা কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করলে অতি সহজেই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় এবং অধিকন্তু এই পন্থায় কোন দোষ-ত্রুটি নেই। ৬১তম শ্লোকে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করাই হচ্ছে বুদ্ধিযোগ এবং তার ফলে দুর্দমনীয় ইন্দ্রিয়গুলি অতি সহজেই সংযত হয়। তাই, এই দুটি যোগই ধর্ম ও দর্শনরূপে একে অপরের উপর নির্ভরশীল। দর্শনবিহীন ধর্ম হচ্ছে ভাবপ্রবণতা বা অন্ধ গোঁড়ামি, আর ধর্মবিহীন দর্শন হচ্ছে মানসিক জল্পনা-কল্পনা। অন্তিম লক্ষ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, কারণ যে সমস্ত দার্শনিকেরা বা জ্ঞানীরা গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে পরম সত্যকে জানবার সাধনা করছেন, তাঁরাও অবশেষে কৃষ্ণভাবনায় এসে উপনীত হন। *ভগবদ্গীতায়*ও এই কথা বলা হয়েছে। সমগ্র পন্থাটি হচ্ছে পরমাত্মার সঙ্গে সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে আত্মার স্থিতি হৃদয়ঙ্গম করা। পরোক্ষ পন্থাটি হচ্ছে দার্শনিক জল্পনা-কল্পনা, যার দ্বারা ক্রমান্বয়ে সে কৃষ্ণভাবনামৃতের স্তরে উপনীত হতে পারে; আর অন্য পন্থাটি হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পরম সত্য, পরমেশ্বর বলে উপলব্ধি করে তাঁর সঙ্গে

আমাদের সনাতন সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা করা। এই দুটির মধ্যে কৃষ্ণভাবনার পন্থাই শ্রেয়, কেন না এই পন্থা দার্শনিক জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়গুলির শুদ্ধিকরণের উপর নির্ভরশীল নয়। কৃষ্ণভাবনামৃত স্বয়ং শুদ্ধিকরণের পন্থা এবং কৃষ্ণভাবনার অমৃত প্রবাহ স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে অন্তরকে কলুষমুক্ত করে। ভক্তি নিবেদনের প্রত্যক্ষ পন্থারূপে এই পথ সহজ ও উচ্চস্তরের।

শ্লোক ৪

ন কর্মণামনারম্ভান্ নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে ।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥

ন—না; **কর্মণাম্**—শাস্ত্রীয় কর্মের; **অনারম্ভাৎ**—অনুষ্ঠান না করে; **নৈষ্কর্ম্যম্**—কর্মফল থেকে মুক্তি; **পুরুষঃ**—মানুষ; **অশ্নুতে**—লাভ করে; **ন**—না; **চ**—ও; **সন্ন্যসনাৎ**—কর্মত্যাগের দ্বারা; **এব**—কেবল; **সিদ্ধিম্**—সাফল্য; **সমধিগচ্ছতি**—লাভ করে।

গীতার গান

বিহিত কর্মের নিষ্ঠা না করি আরম্ভ ।
নৈষ্কর্ম জ্ঞান যে চর্চা হয় এক দম্ভ ॥
বিহিত কর্মের ত্যাগে চিত্তশুদ্ধি নয় ।
কেবল সন্ন্যাসে কার্যসিদ্ধি নাহি হয় ॥

অনুবাদ

কেবল কর্মের অনুষ্ঠান না করার মাধ্যমে কর্মফল থেকে মুক্ত হওয়া যায় না, আবার কর্মত্যাগের মাধ্যমেও সিদ্ধি লাভ করা যায় না।

তাৎপর্য

শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী বিধি-নিষেধের আচরণ করার ফলে যখন অন্তর পবিত্র হয় এবং জড় বন্ধনগুলি শিথিল হয়ে যায়, তখন মানুষ সর্বত্যাগী জীবনধারায় সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করার যোগ্য হয়। অন্তর পবিত্র না হলে—সম্পূর্ণভাবে কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত না হলে, সন্ন্যাস গ্রহণ করার কোন মানেই হয় না। মায়াবাদী জ্ঞানীরা মনে করে, সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করা মাত্রই অথবা সকাম কর্ম পরিহার করা মাত্রই তারা তৎক্ষণাৎ নারায়ণের মতো ভগবান হয়ে যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

কিন্তু তা অনুমোদন করছেন না। অন্তর পবিত্র না করে, জড় বন্ধন মুক্ত না হয়ে সন্ন্যাস নিলে, তা কেবল সমাজ-ব্যবস্থায় উৎপাতেরই সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে, যদি কেউ ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করেন, তবে তাঁর বর্ণ ও আশ্রমজনিত ধর্ম নির্বিশেষে তিনি ভগবানের কৃপা লাভ করেন, ভগবান নিজেই সেই কথা বলেছেন। *স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।* এই ধর্মের স্বল্প আচরণ করলেও জড় জগতের মহাভয় থেকে ত্রাণ পাওয়া যায়।

শ্লোক ৫

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫ ॥

ন—না; **হি**—অবশ্যই; **কশ্চিৎ**—কেউ; **ক্ষণম্**—ক্ষণ মাত্রও; **অপি**—ও; **জাতু**—কখনও; **তিষ্ঠতি**—থাকতে পারে; **অকর্মকৃৎ**—কর্ম না করে; **কার্যতে**—করতে বাধ্য হয়; **হি**—অবশ্যই; **অবশঃ**—অসহায়ভাবে; **কর্ম**—কর্ম; **সর্বঃ**—সকলে; **প্রকৃতিজৈঃ**—প্রকৃতিজাত; **গুণৈঃ**—গুণসমূহের দ্বারা।

গীতার গান

ক্ষণেক সময় মাত্র না করিয়া কর্ম ।
থাকিতে পারে না কেহ স্বাভাবিক ধর্ম ॥
প্রকৃতির গুণ যথা সবার নির্বন্ধ ।
সেই কার্য করে যাতে করমের বন্ধ ॥

অনুবাদ

সকলেই মায়াজাত গুণসমূহের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অসহায়ভাবে কর্ম করতে বাধ্য হয়; তাই কর্ম না করে কেউই ক্ষণকালও থাকতে পারে না।

তাৎপর্য

কর্তব্যকর্ম না করে কেউই থাকতে পারে না। আত্মার ধর্মই হচ্ছে সর্বক্ষণ কর্মরত থাকা। আত্মার উপস্থিতি না থাকলে জড় দেহ চলাফেরা করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে জড় দেহটি একটি নিষ্প্রাণ গাড়ি মাত্র, কিন্তু সেই দেহে অবস্থান করে আত্মা সর্বক্ষণ তাকে সক্রিয় রাখার কর্তব্যকর্ম করে যাচ্ছে এবং এই কর্তব্যকর্ম

থেকে সে এক মুহূর্তের জন্যও বিরত হতে পারে না। সেই হেতু, জীবাত্মাকে কৃষ্ণভাবনার মঙ্গলময় কর্মে নিয়োজিত করতে হয়, তা না হলে মায়ার প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে জীবাত্মা অনিত্য জড়-জাগতিক কর্মে ব্যাপৃত থাকে। জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে আসার ফলে আত্মা জড় গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে, তাই এই জড় গুণের কলুষ থেকে মুক্ত হবার জন্য শাস্ত্র-নির্ধারিত কর্মের আচরণ করতে হয়। কিন্তু আত্মা যখন শ্রীকৃষ্ণের সেবায় স্বাভাবিকভাবে নিযুক্ত হয়, তখন সে যা করে, তার পক্ষে তা মঙ্গলময় হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/৫/১৭) বলা হয়েছে—

ত্যক্ত্বা স্বধর্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি ।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্মতঃ ॥

"যদি কেউ কৃষ্ণভাবনা গ্রহণ করে এবং তখন সে যদি শাস্ত্র-নির্দেশিত বিধি-নিষেধগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে না মেনেও চলে অথবা তার স্বধর্ম পালনও না করে, এমন কি সে যদি অধঃপতিত হয়, তা হলেও তার কোন রকম ক্ষতি বা অমঙ্গল হয় না। কিন্তু সে যদি পবিত্র হবার জন্য শাস্ত্র-নির্দেশিত সমস্ত আচার-আচরণ পালনও করে, তাতে তার কি লাভ, যদি সে কৃষ্ণভাবনাময় না হয়?" সুতরাং কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করার জন্যই শুদ্ধিকরণের পন্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। তাই, সন্ন্যাস আশ্রমের অথবা যে-কোন চিত্তশুদ্ধি করণ পন্থার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃতের চরম লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করা। তা না হলে সব কিছুই নিরর্থক।

শ্লোক ৬

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্ ।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬ ॥

কর্মেন্দ্রিয়াণি—পঞ্চ-কর্মেন্দ্রিয়; **সংযম্য**—সংযত করে; **যঃ**—যে; **আস্তে**—অবস্থান করে; **মনসা**—মনের দ্বারা; **স্মরন্**—স্মরণ করে; **ইন্দ্রিয়ার্থান্**—ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ; **বিমূঢ়**—মূঢ়; **আত্মা**—আত্মা; **মিথ্যাচারঃ**—কপটাচার; **সঃ**—তাকে; **উচ্যতে**—বলা হয়।

গীতার গান

কর্মেন্দ্রিয় রোধ করি মনেতে স্মরণ ।
ইহা নাহি চিত্তশুদ্ধি নৈষ্কর্ম কারণ ॥
অতএব সেই ব্যক্তি বিমূঢ়াত্মা হয় ।
ইন্দ্রিয়ার্থ মিথ্যাচারী শাস্ত্রেতে কহয় ॥

অনুবাদ

যে ব্যক্তি পঞ্চ-কর্মেন্দ্রিয় সংযত করেও মনে মনে শব্দ, রস আদি ইন্দ্রিয় বিষয়গুলি স্মরণ করে, সেই মূঢ় অবশ্যই নিজেকে বিভ্রান্ত করে এবং তাকে মিথ্যাচারী ভণ্ড বলা হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

অনেক মিথ্যাচারী আছে, যারা কৃষ্ণভাবনাময় সেবাকার্য করতে চায় না, কেবল ধ্যান করার ভান করে। কিন্তু এতে কোন কাজ হয় না। কারণ, তারা তাদের কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে রোধ করলেও মন তাদের সংযত হয় না। পক্ষান্তরে, মন অত্যন্ত তীব্রভাবে ইন্দ্রিয়-সুখের জল্পনা-কল্পনা করতে থাকে। তারা লোক ঠকানোর জন্য দুই-একটি তত্ত্বকথাও বলে। কিন্তু এই শ্লোকে আমরা জানতে পারছি যে, তারা হচ্ছে সব চাইতে বড় প্রতারক। বর্ণাশ্রম ধর্মের আচরণ করেও মানুষ ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে পারে, কিন্তু বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুসারে মানুষ যখন তার স্বধর্ম পালন করে, তখন ক্রমে ক্রমে তার চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং সে ভগবদ্ভক্তি লাভ করে। কিন্তু যে ব্যক্তি যোগী সেজে লোক ঠকায়, সে আসলে ত্যাগীর বেশ ধারণ করে ভোগের চিন্তায় মগ্ন থাকে, সে হচ্ছে সব চাইতে নিকৃষ্ট স্তরের প্রতারক। মাঝে মাঝে দুই-একটি তত্ত্বকথা বলে সরলচিত্ত সাধারণ মানুষের কাছে তার তত্ত্বজ্ঞান জাহির করতে চায়, কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, সেগুলি তোতাপাখির মতো মুখস্থ করা বুলি ছাড়া আর কিছুই নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মায়াশক্তির প্রভাবে ঐ ধরনের পাপাচারী প্রতারকদের সমস্ত জ্ঞান অপহরণ করে নেন। এই প্রকার প্রতারকের মন সর্বদাই অপবিত্র এবং সেই জন্য তার তথাকথিত লোকদেখানো ধ্যান নিরর্থক।

শ্লোক ৭

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন ।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭ ॥

যঃ—যিনি; **তু**—কিন্তু; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **মনসা**—মনের দ্বারা; **নিয়ম্য**—সংযত করে; **আরভতে**—আরম্ভ করেন; **অর্জুন**—হে অর্জুন; **কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ**—কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা; **কর্মযোগম্**—কর্মযোগ; **অসক্তঃ**—আসক্তি রহিত; **সঃ**—তিনি; **বিশিষ্যতে**—বিশিষ্ট হন।

গীতার গান

কিন্তু যদি নিজেন্দ্রিয় সংযত নিয়মে ।
কর্মের আরম্ভ করে যথা যথা ক্রমে ॥
বাতুল না হয় মর্কট বৈরাগ্য করি ।
অন্তর্নিষ্ঠা হলে হয় সহায় শ্রীহরি ॥
সেই হয় কর্মযোগ কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা ।
আসক্তিরহিত কর্ম বিশেষ প্রকারা ॥

অনুবাদ

কিন্তু যিনি মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে অনাসক্তভাবে কর্মযোগের অনুষ্ঠান করেন, তিনি পূর্বোক্ত মিথ্যাচারী অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ।

তাৎপর্য

সাধুর বেশ ধরে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন ও ভোগতৃপ্তির জন্য লোক ঠকানোর চাইতে স্বকর্মে নিযুক্ত থেকে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন করা শত-সহস্র গুণে ভাল। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়া। *স্বার্থগতি* অর্থাৎ জীবনের প্রকৃত স্বার্থ হচ্ছে শ্রীবিষ্ণুর শ্রীচরণারবিন্দের আশ্রয় লাভ করা। সমগ্র বর্ণাশ্রম ধর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে সেই চরম গন্তব্যের দিকে নিয়ে যাওয়া। কৃষ্ণভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কর্তব্যকর্ম করার ফলে একজন গৃহস্থও ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারে। আত্ম-উপলব্ধির জন্য শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে সংযত জীবনযাপন করে কেউ যখন কর্তব্যকর্ম করে, তখন আর তার কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ার কোন আশঙ্কা থাকে না, কারণ সে তখন আসক্তিরহিত হয়ে সম্পূর্ণ নিঃস্পৃহভাবে তার কর্তব্যকর্ম করে চলে। এভাবে সংযত ও নিঃস্পৃহ থাকার

ফলে তার অন্তর পবিত্র হয় এবং ভগবানের সান্নিধ্য লাভ হয়। অজ্ঞ জনসাধারণের প্রতারণাকারী মর্কট বৈরাগী হবার চাইতে একজন ঐকান্তিক ব্যক্তি যে এই পদ্ধতি অনুসরণ করে, সে অনেক উন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত। যে-সমস্ত ভণ্ড সাধু লোক ঠকাবার জন্য ধ্যান করার ভান করে, তাদের থেকে একজন কর্তব্যনিষ্ঠ মেথরও অনেক মহৎ।

শ্লোক ৮

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্মণঃ ॥ ৮ ॥

নিয়তম্—শাস্ত্রোক্ত; **কুরু**—কর; **কর্ম**—কর্ম; **ত্বম্**—তুমি; **কর্ম**—কাজ; **জ্যায়ঃ**—শ্রেয়; **হি**—অবশ্যই; **অকর্মণঃ**—কর্মত্যাগ অপেক্ষা; **শরীরযাত্রা**—দেহধারণ; **অপি**—এমন কি; **চ**—ও; **তে**—তোমার; **ন**—না; **প্রসিদ্ধ্যেৎ**—সিদ্ধ হয়; **অকর্মণঃ**—কর্ম না করে।

গীতার গান

নিয়মিত কর্ম ভাল সেই অকর্ম অপেক্ষা।
অনধিকারীর কর্মত্যাগ, পরমুখাপেক্ষা ॥
শরীর নির্বাহ যার নহে কর্ম বিনা।
কর্মত্যাগ তার পক্ষে হয় বিড়ম্বনা ॥

অনুবাদ

তুমি শাস্ত্রোক্ত কর্মের অনুষ্ঠান কর, কেন না কর্মত্যাগ থেকে কর্মের অনুষ্ঠান শ্রেয়। কর্ম না করে কেউ দেহযাত্রাও নির্বাহ করতে পারে না।

তাৎপর্য

অনেক ভণ্ড সাধু আছে, যারা জনসমক্ষে প্রচার করে বেড়ায় যে, তারা অত্যন্ত উচ্চ বংশজাত এবং কর্ম-জীবনেও তারা অনেক সাফল্য লাভ করেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য তারা সব কিছু ত্যাগ করেছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই রকম ভণ্ড সাধু হতে নিষেধ করেছিলেন। পক্ষান্তরে, তিনি তাঁকে শাস্ত্র-নির্ধারিত ক্ষত্রিয় ধর্ম পালন করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। অর্জুন ছিলেন

গৃহস্থ ও সেনাপতি, তাই শাস্ত্র-নির্ধারিত গৃহস্থ-ক্ষত্রিয়ের ধর্ম পালন করাই ছিল তাঁর কর্তব্য। এই ধর্ম পালন করার ফলে জড় বন্ধনে আবদ্ধ মানুষের হৃদয় পবিত্র হয় এবং ফলে সে জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়। তথাকথিত ত্যাগীরা, যারা দেহ প্রতিপালন করবার জন্যই ত্যাগের অভিনয় করে, ভগবান তাদের কোন রকম স্বীকৃতি দেননি, শাস্ত্রেও তাদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। এমন কি দেহ প্রতিপালন করবার জন্যও মানুষকে কর্ম করতে হয়। তাই, জড়-জাগতিক প্রবৃত্তিগুলিকে শুদ্ধ না করে, নিজের খেয়ালখুশি মতো কর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়। এই জড় জগতে প্রত্যেকেরই অবশ্য জড়া প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব করবার কলুষময় প্রবৃত্তি আছে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনা আছে। সেই কলুষময় প্রবৃত্তিগুলিকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। শাস্ত্র-নির্দেশিত উপায়ে তা না করে, কর্তব্যকর্ম ত্যাগ করে এবং অন্যের সেবা নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে তথাকথিত অতীন্দ্রিয়বাদী যোগী হবার চেষ্টা করা কখনই উচিত নয়।

শ্লোক ৯

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯ ॥

যজ্ঞার্থাৎ—যজ্ঞ বা বিষ্ণুর জন্যই কেবল; **কর্মণঃ**—কর্ম; **অন্যত্র**—তা ছাড়া; **লোকঃ**—এই জগতে; **অয়ম্**—এই; **কর্মবন্ধনঃ**—কর্মবন্ধন; **তৎ**—তাঁর; **অর্থম্**—নিমিত্ত; **কর্ম**—কর্ম; **কৌন্তেয়**—হে কুন্তীপুত্র; **মুক্তসঙ্গঃ**—আসক্তি রহিত হয়ে; **সমাচর**—অনুষ্ঠান কর।

গীতার গান

যজ্ঞেশ্বর ভগবানের সন্তোষ লাগিয়া।
নিয়মিত কর্ম কর আসক্তি ত্যজিয়া ॥
আর যত কর্ম হয় বন্ধের কারণ।
অতএব সেই কার্য কর নিবারণ ॥
ভগবদ্ সন্তোষার্থ কর্মের প্রসঙ্গ।
যত কিছু আচরণ সব মুক্ত সঙ্গ ॥

অনুবাদ

বিষ্ণুর প্রীতি সম্পাদন করার জন্য কর্ম করা উচিত; তা না হলে কর্মই এই জড় জগতে বন্ধনের কারণ। তাই, হে কৌন্তেয়! ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই কেবল তুমি তোমার কর্তব্যকর্ম অনুষ্ঠান কর এবং এভাবেই তুমি সর্বদাই বন্ধন থেকে মুক্ত থাকতে পারবে।

তাৎপর্য

যেহেতু দেহ প্রতিপালন করবার জন্য প্রতিটি জীবকে কর্ম করতে হয়, তাই সমাজের বর্ণ ও আশ্রম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্তরের জীবের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কর্ম নির্ধারিত করা হয়েছে, যাতে তাদের উদ্দেশ্যগুলি যথাযথভাবে সাধিত হয়। যজ্ঞ বলতে ভগবান শ্রীবিষ্ণু অথবা যজ্ঞানুষ্ঠানকে বোঝায়। তাই তাঁকে প্রীতি করার জন্যই সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়। *বেদে* বলা হয়েছে—*যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ*। পক্ষান্তরে, নানা রকম আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যজ্ঞ করা আর সরাসরিভাবে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সেবা করার দ্বারা একই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। সুতরাং কৃষ্ণভাবনামৃত হচ্ছে যজ্ঞানুষ্ঠান, কেন না এই শ্লোকে তা প্রতিপন্ন হয়েছে। বর্ণাশ্রম ধর্মের উদ্দেশ্যও হচ্ছে ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করা। *বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ / বিষ্ণুরারাধ্যতে* (*বিষ্ণু পুরাণ* ৩/৮/৮)।

তাই বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করার জন্যই কেবল কর্ম করা উচিত। এ ছাড়া আর সমস্ত কর্মই আমাদের এই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে। সেই কর্ম ভালই হোক আর খারাপই হোক, সেই কর্মের ফল অনুষ্ঠাতাকে জড় বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে। তাই, শ্রীকৃষ্ণকে (অথবা শ্রীবিষ্ণুকে) সন্তুষ্ট করার জন্য কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে কর্ম করতে হয়। এভাবেই যে ভগবানের সেবাপরায়ণ হয়েছে, সে আর কখনও জড় বন্ধনে আবদ্ধ হয় না—মুক্ত স্তরে বিরাজিত। এটিই হচ্ছে কর্ম সম্পাদনের মহৎ কৌশল এবং এই পন্থার শুরুর প্রারম্ভে দক্ষ পথ-প্রদর্শকের প্রয়োজন হয়। ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞানী শুদ্ধ ভক্তের তত্ত্বাবধানে অথবা স্বয়ং ভগবানের তত্ত্বাবধানে (যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বাবধানে অর্জুন করেছিলেন) গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে এই যোগ সাধন করতে হয়। ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য কিছুই করা উচিত নয়, বরং সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য করা উচিত। এভাবেই অনুশীলনের ফলে শুধু যে কর্মফলের বন্ধন থেকেই মুক্ত থাকা যায়, তাই নয়—তা ছাড়া ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমভক্তির স্তরে ক্রমশ উন্নীত হওয়া যায়, যার ফলে তাঁর সচ্চিদানন্দময় পরম ধামে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়।

শ্লোক ১০

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ১০ ॥

সহ—সহ; যজ্ঞাঃ—যজ্ঞাদি; **প্রজাঃ**—প্রজাসকল; **সৃষ্ট্বা**—সৃষ্টি করে; **পুরা**—পুরাকালে; **উবাচ**—বলেছিলেন; **প্রজাপতিঃ**—সৃষ্টিকর্তা; **অনেন**—এর দ্বারা; **প্রসবিষ্যধ্বম্**—উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও; **এষঃ**—এই সকল; বঃ—তোমাদের; অস্তু—হোক; **ইষ্ট**—সমস্ত অভীষ্ট; **কামধুক্**—প্রদানকারী।

গীতার গান

প্রজাপতি সৃষ্টি করি যজ্ঞের সাধন ।
উপদেশ করেছিল শুনে প্রজাগণ ॥
যজ্ঞের সাধন করি সুখী হও সবে ।
যজ্ঞদ্বারা ভোগ পাবে ইন্দ্রিয় বৈভবে ॥

অনুবাদ

সৃষ্টির প্রারম্ভে সৃষ্টিকর্তা যজ্ঞাদি সহ প্রজাসকল সৃষ্টি করে বলেছিলেন—"এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হও। এই যজ্ঞ তোমাদের সমস্ত অভীষ্ট পূর্ণ করবে।"

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীবিষ্ণু এই জড় জগৎ সৃষ্টি করে মায়াবদ্ধ জীবদের ভগবৎ-ধামে ফিরে যাবার সুযোগ করে দিয়েছেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাদের যে নিত্য সম্পর্ক রয়েছে, সেই সম্পর্কের কথা ভুলে যাবার ফলেই জীবসকল এই জড়া প্রকৃতিতে পতিত হয়ে জড় বন্ধনের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। *বেদের* বাণী আমাদের এই শাশ্বত সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দেয়। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন—*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*। ভগবান বলছেন যে, *বেদের* উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁকে জানা। বৈদিক মন্ত্রে বলা হয়েছে—*পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বরম্*। তাই, সমস্ত জীবের ঈশ্বর হচ্ছেন ভগবান শ্রীবিষ্ণু। *শ্রীমদ্ভাগবতেও* (২/৪/২০) শ্রীশুকদেব গোস্বামী নানাভাবে বর্ণনা করেছেন যে, ভগবানই হচ্ছেন সব কিছুর *পতি*—

শ্রিয়ঃ পতির্যজ্ঞপতিঃ প্রজাপতি-
র্ধিয়াং পতির্লোকপতির্ধরাপতিঃ ।
পতির্গতিশ্চান্ধকবৃষ্ণিসাত্বতাং
প্রসীদতাং মে ভগবান্ সতাং পতিঃ ॥

ভগবান বিষ্ণু হচ্ছেন *প্রজাপতি*, তিনি সমস্ত জীবের পতি, তিনি সমস্ত বিশ্ব-চরাচরের পতি, তিনি সমস্ত সৌন্দর্যের পতি এবং তিনি সকলের ত্রাণকর্তা। তিনি এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন যাতে জীব যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে তাঁকে তুষ্ট করতে পারে এবং তার ফলে তারা এই জড় জগতে নিরুদ্বিগ্নভাবে সুখে ও শান্তিতে বসবাস করতে পারে। তারপর এই জড় দেহ ত্যাগ করার পর তারা ভগবানের অপ্রাকৃত লোকে প্রবেশ করতে পারে। অপার করুণাময় ভগবান মায়াবদ্ধ জীবের জন্য এই সমস্ত আয়োজন করে রেখেছেন। যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে বদ্ধ জীব ক্রমশ কৃষ্ণচেতনা লাভ করে এবং সর্ব বিষয়ে ভগবানের দিব্য গুণাবলী অর্জন করে। বৈদিক শাস্ত্রে এই কলিযুগে সংকীর্তন যজ্ঞ অর্থাৎ সংঘবদ্ধভাবে উচ্চস্বরে ভগবানের নাম-কীর্তন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই সংকীর্তন যজ্ঞের প্রবর্তন করে গেছেন যাতে এই যুগের সব জীবই এই জড় বন্ধনমুক্ত হয়ে ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারে। সংকীর্তন যজ্ঞ এবং কৃষ্ণভাবনা একই সঙ্গে চলবে। কলিযুগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতরণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে সংকীর্তন যজ্ঞের প্রবর্তন করবেন, সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/৫/৩২) বলা হয়েছে—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥

"এই কলিযুগে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন মনীষিরা সংকীর্তন যজ্ঞের দ্বারা পার্ষদযুক্ত ভগবান শ্রীগৌরহরির আরাধনা করবেন।" বৈদিক শাস্ত্রে আর যে সমস্ত যাগযজ্ঞের কথা বলা হয়েছে, সেগুলির অনুষ্ঠান করা এই কলিযুগে সম্ভব নয়, কিন্তু সংকীর্তন যজ্ঞ এত সহজ ও উচ্চস্তরের যে, সকল উদ্দেশ্যে অনায়াসে যে কেউ এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে পারে এবং *ভগবদ্গীতায়ও* (৯/১৪) তা প্রতিপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ১১

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১ ॥

দেবান্—দেবতারা; **ভাবয়তা**—সন্তুষ্ট হয়ে; **অনেন**—এই যজ্ঞের দ্বারা; **তে**—সেই; **দেবাঃ**—দেবতারা; **ভাবয়ন্তু**—প্রীতি সাধন করবেন; **বঃ**—তোমাদের; **পরস্পরম্**—পরস্পর; **ভাবয়ন্তঃ**—প্রীতি সাধন করে; **শ্রেয়ঃ**—মঙ্গল; **পরম্**—পরম; **অবাপ্স্যথ**—লাভ করবে।

গীতার গান

অধিকারী দেবগণ যজ্ঞের প্রভাবে ।
যজ্ঞ অনুষ্ঠান দেখি সবে প্রীত হবে ॥
পরস্পর প্রীতিভাব হলে সম্পাদন ।
ভোগের সামগ্রী শ্রেয় নহে অনটন ॥

অনুবাদ

তোমাদের যজ্ঞ অনুষ্ঠানে প্রীত হয়ে দেবতারা তোমাদের প্রীতি সাধন করবেন। এভাবেই পরস্পরের প্রীতি সম্পাদন করার মাধ্যমে তোমরা পরম মঙ্গল লাভ করবে।

তাৎপর্য

ভগবান জড় জগতের দেখাশোনার ভার ন্যস্ত করেছেন বিভিন্ন দেব-দেবীর উপর। এই জড় জগতে প্রতিটি জীবের জীবন ধারণের জন্য আলো, বাতাস, জল আদির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। ভগবান তাই এই সমস্ত অকাতরে দান করেছেন এবং এই সমস্ত বিভিন্ন শক্তির তত্ত্বাবধান করার ভার তিনি দিয়েছেন বিভিন্ন দেব-দেবীর উপর, যাঁরা হচ্ছেন তাঁর দেহের বিভিন্ন অংশস্বরূপ। এই সমস্ত দেব-দেবীর প্রসন্নতা ও অপ্রসন্নতা নির্ভর করে মানুষের যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার উপর। ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞ ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবীর তুষ্টি সাধনের জন্য অনুষ্ঠিত হয়; কিন্তু তা হলেও সমস্ত যজ্ঞের যজ্ঞপতি এবং পরম ভোক্তারূপে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করা হয়। *ভগবদ্গীতাতেও* বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা—*ভোক্তারং যজ্ঞতপসাম্*। তাই যজ্ঞপতির চরম তুষ্টিবিধান করাই হচ্ছে সমস্ত যজ্ঞের প্রধান উদ্দেশ্য। এই সমস্ত যজ্ঞগুলি যখন সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হয়, তখন বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধান দেব-দেবীরা সন্তুষ্ট হয়ে প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য দান করেন এবং মানুষের তখন আর কোন অভাব থাকে না।

এভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করলে ধন-ঐশ্বর্য লাভ হয় ঠিকই, কিন্তু এই লাভগুলি যজ্ঞের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। যজ্ঞের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া।

যজ্ঞপতি বিষ্ণু যখন প্রীত হন, তখন তিনি জীবকে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করেন। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে সব রকমের কার্যকলাপ পরিশুদ্ধ হয়, তাই *বেদে* বলা হয়েছে—*আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতিলম্ভে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ।* যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে খাদ্যসামগ্রী শুদ্ধ হয় এবং তা আহার করার ফলে জীবের সত্তা শুদ্ধ হয়। সত্তা শুদ্ধ হবার ফলে স্মৃতি শুদ্ধ হয় এবং তখন সে মোক্ষ লাভের পথ খুঁজে পায়। এভাবেই জীবের চেতনা কলুষমুক্ত হয়ে কৃষ্ণভাবনার পথে অগ্রসর হয়। এই শুদ্ধ চেতনা সুপ্ত হয়ে গেছে বলেই আজকের জগৎ এই রকম বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

শ্লোক ১২

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২ ॥

ইষ্টান্—বাঞ্ছিত; **ভোগান্**—ভোগ্যবস্তু; **হি**—অবশ্যই; **বঃ**—তোমাদের; **দেবাঃ**—দেবতারা; **দাস্যন্তে**—দান করবেন; **যজ্ঞভাবিতাঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে সন্তুষ্ট হয়ে; **তৈঃ**—তাঁদের দ্বারা; **দত্তান্**—প্রদত্ত বস্তুসকল; **অপ্রদায়**—নিবেদন না করে; **এভ্যঃ**—দেবতাদেরকে; **যঃ**—যে; **ভুঙ্ক্তে**—ভোগ করে; **স্তেনঃ**—চোর; **এব**—অবশ্যই; **সঃ**—সে।

গীতার গান

যজ্ঞেতে সন্তুষ্ট হয়ে অভীষ্ট যে ভোগ ।
দেবতারা দেয় সব প্রচুর প্রয়োগ ॥
সেই দত্ত অন্ন যাহা দেবতারা দেয় ।
তাঁহাদের না দিয়া খায় চোর সেই হয় ॥

অনুবাদ

যজ্ঞের ফলে সন্তুষ্ট হয়ে দেবতারা তোমাদের বাঞ্ছিত ভোগ্যবস্তু প্রদান করবেন। কিন্তু দেবতাদের প্রদত্ত বস্তু তাঁদের নিবেদন না করে যে ভোগ করে, সে নিশ্চয়ই চোর।

তাৎপর্য

জীবের জীবন ধারণ করার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তা সবই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর নির্দেশ অনুসারে বিভিন্ন দেব-দেবীরা সরবরাহ করছেন। তাই, যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে

এই সমস্ত দেব-দেবীদের তুষ্ট করতে শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। *বেদে* বিভিন্ন দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন যজ্ঞ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সমস্ত যজ্ঞের পরম ভোক্তা হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। যাদের ভগবান সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই, যারা অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন, বিভিন্ন দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে তাদের যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে বলা হয়েছে। মানুষেরা যে বিভিন্ন জড় গুণের দ্বারা প্রভাবিত, সেই অনুসারে *বেদে* বিভিন্ন ধরনের যজ্ঞ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একইভাবে বিভিন্ন গুণ অনুসারে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন, যারা মাংসাশী তাদের জড়া প্রকৃতির বীভৎস-রূপী কালীর পূজা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং কালীর কাছে পশুবলি দেওয়ার বিধান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যাঁরা সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত, তাঁদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করতে। সমস্ত যজ্ঞের উদ্দেশ্যই হচ্ছে ধীরে ধীরে জড় স্তর অতিক্রম করে অপ্রাকৃত স্তরে উন্নীত হওয়া। সাধারণ লোকদের অন্তত পঞ্চমহাযজ্ঞ নামক পাঁচটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্তব্য।

আমাদের বোঝা উচিত যে, মনুষ্য-সমাজে যা কিছু প্রয়োজন, তা সবই আসছে ভগবানের প্রতিনিধি বিভিন্ন দেব-দেবীদের কাছ থেকে। কোন কিছু তৈরি করার ক্ষমতা আমাদের নেই। যেমন, মানব-সমাজের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য—ফল-মূল, শাক-সবজি, দুধ, চিনি, এগুলির কোনটাই আমরা তৈরি করতে পারি না। তেমনই আবার, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি—যেমন উত্তাপ, আলো, বাতাস, জল আদিও কেউ তৈরি করতে পারে না। ভগবানের ইচ্ছার ফলেই সূর্য কিরণ দান করে, চন্দ্র জ্যোৎস্না বিতরণ করে, বায়ু প্রবাহিত হয়, বৃষ্টির ধারায় ধরণী রসসিক্ত হয়। এগুলি ছাড়া কেউই বাঁচতে পারে না। এভাবেই আমরা দেখতে পাই, আমাদের জীবন ধারণ করার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তা সবই ভগবান আমাদের দিচ্ছেন। এমন কি, কলকারখানায় আমরা যে সমস্ত জিনিস বানাচ্ছি, তাও তৈরি হচ্ছে ভগবানেরই দেওয়া বিভিন্ন ধাতু, গন্ধক, পারদ, ম্যাঙ্গানীজ আদি প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি দিয়ে। আমাদের অগোচরে ভগবান আমাদের সমস্ত প্রয়োজনগুলি মিটিয়ে দিয়েছেন, যাতে আমরা আত্ম-উপলব্ধির জন্য স্বচ্ছল জীবন যাপন করে জীবনের পরম লক্ষ্যে পরিচালিত হতে পারি, অর্থাৎ যাকে বলা হয় জড়-জাগতিক জীবন-সংগ্রাম থেকে চিরতরে মুক্তি। জীবনের এই উদ্দেশ্য সাধিত হয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে। আমরা যদি জীবনের উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে ভগবানের দেওয়া সম্পদগুলি কেবল ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য ব্যবহার করি এবং তার বিনিময়ে ভগবানকে এবং তাঁর প্রতিনিধিদের কিছুই না দিই, তবে তা চুরি করারই সামিল

এবং তা যদি আমরা করি, তা হলে প্রকৃতির আইনে আমাদের শাস্তিভোগ করতেই হবে। যে সমাজ চোরের সমাজ, তা কখনই সুখী হতে পারে না, কেন না তাদের জীবনের কোন উদ্দেশ্য নেই। স্থূল জড়বাদী যে সমস্ত চোরেরা ভগবানের সম্পদ চুরি করে জড় জগৎকে ভোগ করতে উন্মত্ত, তাদের জীবনের কোন উদ্দেশ্য নেই। তাদের একমাত্র বাসনা হচ্ছে জড় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করা; যজ্ঞ করে কিভাবে ভগবানের ইন্দ্রিয়কে তুষ্ট করতে হয়, তা তারা জানে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সব চাইতে সহজ যজ্ঞ—সংকীর্তন যজ্ঞের প্রবর্তন করে গেছেন। এই যজ্ঞ যে কেউ অনুষ্ঠান করতে পারে এবং তার ফলে কৃষ্ণভাবনার অমৃত পান করতে পারে।

শ্লোক ১৩

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩ ॥

যজ্ঞশিষ্ট—যজ্ঞাবশেষ; **অশিনঃ**—ভোজনকারী; **সন্তঃ**—ভক্তগণ; **মুচ্যন্তে**—মুক্ত হন; **সর্ব**—সর্ব প্রকার; **কিল্বিষৈঃ**—পাপ থেকে; **ভুঞ্জতে**—ভোগ করে; **তে**—তারা; **তু**—কিন্তু; **অঘম্**—পাপ; **পাপাঃ**—পাপীরা; **যে**—যারা; **পচন্তি**—পাক করে; **আত্মকারণাৎ**—নিজের জন্য।

গীতার গান

যজ্ঞের সাধন করি অন্ন যেবা খায় ।
মুক্তির পথেতে চলে পাপ নাহি হয় ॥
আর যেবা অন্ন পাক নিজ স্বার্থে করে ।
পাপের বোঝা ক্রমে বাড়ে দুঃখভোগ তরে ॥

অনুবাদ

ভগবদ্ভক্তেরা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন, কারণ তাঁরা যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নাদি গ্রহণ করেন। যারা কেবল স্বার্থপর হয়ে নিজেদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য অন্নাদি পাক করে, তারা কেবল পাপই ভোজন করে।

তাৎপর্য

যে ভগবদ্ভক্ত কৃষ্ণভাবনামৃত পান করেছেন, তাঁকে বলা হয় সন্ত। তিনি সব সময় ভগবানের চিন্তায় মগ্ন। *ব্রহ্মসংহিতাতে* (৫/৩৮) তার বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি। যেহেতু সন্তগণ সদাসর্বদাই পরম পুরুষোত্তম ভগবান গোবিন্দ (আনন্দ প্রদানকারী) অথবা মুকুন্দ (মুক্তিদাতা) অথবা শ্রীকৃষ্ণ (সর্বাকর্ষক পুরুষ)-এর প্রেমে মগ্ন থাকেন, সেই জন্য তাঁরা ভগবানকে প্রথমে অর্পণ না করে কোন কিছুই গ্রহণ করেন না। তাই, এই ধরনের ভক্তেরা শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, অর্চন আদি বিবিধ ভক্তির অঙ্গের দ্বারা সর্বক্ষণই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছেন এবং এই সমস্ত অনুষ্ঠানের ফলে তাঁরা কখনই জড় জগতের কলুষতার দ্বারা প্রভাবিত হন না। অন্য সমস্ত লোকেরা, যারা আত্মতৃপ্তির জন্য নানা রকম উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করে খায়, শাস্ত্রে তাদের চোর বলে গণ্য করা হয়েছে এবং তাদের সেই খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে তারা প্রতি গ্রাসে গ্রাসে পাপও গ্রহণ করে। যে মানুষ চোর ও পাপী সে কি করে সুখী হতে পারে? তা কখনই সম্ভব নয়। তাই, সর্বতোভাবে সুখী হবার জন্য তাদের কৃষ্ণভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সংকীর্তন যজ্ঞ করার শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে, এই পৃথিবীতে সুখ ও শান্তি লাভের কোন আশাই নেই।

শ্লোক ১৪

অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪ ॥

অন্নাৎ—অন্ন থেকে; **ভবন্তি**—উৎপন্ন হয়; **ভূতানি**—জড় দেহ; **পর্জন্যাৎ**—বৃষ্টি থেকে; **অন্ন**—অন্ন; **সম্ভবঃ**—উৎপন্ন হয়; **যজ্ঞাৎ**—যজ্ঞ থেকে; **ভবতি**—সম্ভব হয়; **পর্জন্যঃ**—বৃষ্টি; **যজ্ঞঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠান; **কর্ম**—শাস্ত্রোক্ত কর্ম; **সমুদ্ভবঃ**—উদ্ভব হয়।

গীতার গান

অন্ন খেয়ে জীব বাঁচে অন্ন যে জীবন ।
সেই অন্ন উৎপাদনে বৃষ্টি যে কারণ ॥
সেই বৃষ্টি হয় যদি যজ্ঞ কার্যে হয় ।
সেই যজ্ঞ সাধ্য হয় কর্মের কারণ ॥

অনুবাদ

অন্ন খেয়ে প্রাণীগণ জীবন ধারণ করে। বৃষ্টি হওয়ার ফলে অন্ন উৎপন্ন হয়। যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে বৃষ্টি উৎপন্ন হয় এবং শাস্ত্রোক্ত কর্ম থেকে যজ্ঞ উৎপন্ন হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ *ভগবদ্গীতার* ভাষ্যে লিখেছেন—*যে ইন্দ্রাদ্যঙ্গতয়াবস্থিতং যজ্ঞং সর্বেশ্বরং বিষ্ণুমভ্যর্চ্য তচ্ছেষমশ্নন্তি তেন তদ্দেহযাত্রাং সম্পাদয়ন্তি. তে সন্তঃ সর্বেশ্বরস্য যজ্ঞপুরুষস্য ভক্তাঃ সর্বকিল্বিষৈরনাদিকালবিবৃদ্ধৈরাত্মানুভব-প্রতিবন্ধকৈর্নিখিলৈঃ পাপৈর্বিমুচ্যন্তে।* পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন যজ্ঞপুরুষ, অর্থাৎ সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা হচ্ছেন তিনিই। তিনি হচ্ছেন সমস্ত দেব-দেবীরও ঈশ্বর। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন সারা দেহের সেবা করে, ভগবানের অঙ্গস্বরূপ বিভিন্ন দেব-দেবীরাও তেমন ভগবানের সেবা করেন। ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ আদি দেবতাদের ভগবান নিযুক্ত করেছেন জড় জগৎকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য এবং বেদে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিভাবে যজ্ঞ করার মাধ্যমে এই সমস্ত দেবতাদের সন্তুষ্ট করা যায়। এভাবে সন্তুষ্ট হলে তাঁরা আলো, বাতাস, জল আদি দান করেন, যার ফলে প্রচুর পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করা হলে ভগবানের অংশ-বিশেষ দেব-দেবীরাও সেই সঙ্গে পূজিত হন; তাই তাদের আর আলাদা করে পূজা করার কোন প্রয়োজন হয় না। এই কারণে, কৃষ্ণভাবনাময় ভগবানের ভক্তেরা ভগবানকে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য নিবেদন করে তারপর তা গ্রহণ করেন। তার ফলে দেহ চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। এভাবে খাদ্য গ্রহণ করার ফলে শুধু যে দেহের মধ্যে সঞ্চিত বিগত সমস্ত পাপ-কর্মফল নষ্ট হয়ে যায় তাই নয়, জড়া প্রকৃতির সকল কলুষ থেকেও দেহ বিমুক্ত হয়। যখন কোন সংক্রামক ব্যাধি মহামারীরূপে ছড়িয়ে পড়ে, তখন রোগ-প্রতিষেধক টীকা নিলে মানুষ তা থেকে রক্ষা পায়। সেই রকম, ভগবান বিষ্ণুকে অর্পণ করার পরে সেই আহার্য প্রসাদরূপে গ্রহণ করলে জাগতিক কলুষতার প্রভাব থেকে যথেষ্ট রক্ষা পাওয়া যায় এবং যাঁরা এভাবে অনুশীলন করেন, তাঁদের ভগবদ্ভক্ত বলা হয়। তাই, কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তি, যিনি কেবল কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করে জীবন ধারণ করেন, তিনি বিগত জড় সংক্রমণগুলিকে প্রতিরোধ করতে পারেন এবং এই সংক্রমণগুলি আত্ম-উপলব্ধির উন্নতির পথে বাধাস্বরূপ। পক্ষান্তরে, যে ভগবানকে নিবেদন না করে কেবল নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি লাভের জন্য খাদ্য গ্রহণ করে, তার পাপের বোঝা বাড়তে থাকে এবং তার মনোবৃত্তি অনুসারে সে পরবর্তী জীবনে শূকর ও কুকুরের মতো নিকৃষ্ট পশুদেহ ধারণ করে, যাতে সমস্ত পাপকর্মের ফল ভোগ করতে পারে। এই জড় জগৎ কলুষতাপূর্ণ, কিন্তু কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করলে সে কলুষমুক্ত হয় এবং সে তার শুদ্ধ সত্তায় অধিষ্ঠিত হয়। তাই যে তা করে না, সে ভব-রোগের কলুষতার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে যন্ত্রণা ভোগ করে।

খাদ্য-শস্য, শাক-সবজি, ফল-মূলই হচ্ছে মানুষের প্রকৃত আহার্য, আর পশুরা মানুষের উচ্ছিষ্ট ও ঘাস-পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করে। যে সমস্ত মানুষ আমিষ আহার করে, তাদেরও প্রকৃতপক্ষে গাছপালার উপরই নির্ভর করতে হয়, কারণ যে পশুমাংস তারা আহার করে, সেই পশুগুলি গাছপালা ও অন্যান্য উদ্ভিদের দ্বারাই পুষ্ট। এভাবেই আমরা বুঝতে পারি যে, প্রকৃতির দান মাঠের ফসলের উপর নির্ভর করেই আমরা প্রকৃতপক্ষে জীবন ধারণ করি, বড় বড় কলকারখানায় তৈরি জিনিসের উপরে নির্ভর করে নয়। আকাশ থেকে বৃষ্টি হবার ফলে ক্ষেতে ফসল হয়। এই বৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করেন ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য আদি দেবতারা। এঁরা সকলেই হচ্ছেন ভগবানের আজ্ঞাবাহক ভৃত্য। তাই, যজ্ঞ করে ভগবানকে তুষ্ট করলেই তাঁর ভৃত্যেরাও তুষ্ট হন এবং তাঁরা তখন সমস্ত অভাব মোচন করেন। এই যুগের জন্য নির্ধারিত যজ্ঞ হচ্ছে সংকীর্তন যজ্ঞ, তাই অন্ততপক্ষে খাদ্য সরবরাহের অভাব-অনটন থেকে রেহাই পেতে গেলে, সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা। এই সংকীর্তন যজ্ঞ করলে মানুষের খাওয়া-পরার আর কোন অভাব থাকবে না।

শ্লোক ১৫

কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্ ।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫ ॥

কর্ম—কর্ম; **ব্রহ্ম**—বেদ থেকে; **উদ্ভবম্**—উদ্ভূত; **বিদ্ধি**—জানবে; **ব্রহ্ম**—বেদ; **অক্ষর**—পরব্রহ্ম (পরমেশ্বর ভগবান) থেকে; **সমুদ্ভবম্**—সম্যকরূপে উদ্ভূত; **তস্মাৎ**—অতএব; **সর্বগতম্**—সর্বব্যাপক; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্ম; **নিত্যম্**—নিত্য; **যজ্ঞে**—যজ্ঞে; **প্রতিষ্ঠিতম্**—প্রতিষ্ঠিত।

গীতার গান

কর্ম যাহা বেদবাণী নহে মনোধর্ম ।
বেদবাণী ভগবদুক্তি অক্ষরের কারণ ॥
অতএব কর্ম হয় ঈশ্বরসাধনা ।
সর্বগত ব্রহ্মনিত্য যজ্ঞেতে স্থাপনা ॥

অনুবাদ

যজ্ঞাদি কর্ম বেদ থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং বেদ অক্ষর বা পরমেশ্বর ভগবান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। অতএব সর্বব্যাপক ব্রহ্ম সর্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

তাৎপর্য

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণঃ অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তুষ্ট করার জন্যই যে কর্ম করা প্রয়োজন, সেই কথা এই শ্লোকটিতে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যজ্ঞপুরুষ শ্রীবিষ্ণুর সন্তুষ্টির জন্যই যখন আমাদের কর্ম করতে হয়, তখন আমাদের কর্তব্য হচ্ছে *বেদের* নির্দেশ অনুসারে সমস্ত কর্ম সাধন করা। *বেদে* সমস্ত কর্মপদ্ধতির বর্ণনা করা হয়েছে। যে কর্ম *বেদে* অনুমোদিত হয়নি, তাকে বলা হয় বিকর্ম বা পাপকর্ম। তাই, *বেদের* নির্দেশ অনুসারে সমস্ত কর্ম করাটাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ, তাতে কর্মফলের বন্ধন থেকে মুক্ত থাকা যায়। সাধারণ অবস্থায় যেমন মানুষকে রাষ্ট্রের নির্দেশ অনুসারে চলতে হয়, তেমনই ভগবানের নির্দেশে তাঁর পরম রাষ্ট্রব্যবস্থায় পরিচালিত হওয়াই মানুষের কর্তব্য। *বেদের* সমস্ত নির্দেশগুলি সরাসরি ভগবানের নিঃশ্বাস থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে—*অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরসঃ।* "*ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ* ও *অথর্ববেদ*—এই সব কয়টি *বেদই* ভগবানের নিঃশ্বাস থেকে উদ্ভূত হয়েছে।" (*বৃহদারণ্যক উপনিষদ* ৪/৫/১১) ভগবান সর্বশক্তিমান, তিনি নিঃশ্বাসের দ্বারাও কথা বলতে পারেন। *ব্রহ্মসংহিতাতে* বলা হয়েছে, সর্ব শক্তিমান ভগবান তাঁর যে কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সব কয়টি ইন্দ্রিয়ের কাজ করতে পারেন। অর্থাৎ, ভগবান তাঁর নিঃশ্বাসের দ্বারা কথা বলতে পারেন, তাঁর দৃষ্টির দ্বারা গর্ভসঞ্চার করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে, ভগবান জড়া প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং তার ফলে সমস্ত বিশ্ব-চরাচরে প্রাণের সঞ্চার হয়। জড়া প্রকৃতির গর্ভে জীব সৃষ্টি করার পর, এই সমস্ত বদ্ধ জীবেরা যাতে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর কাছে ফিরে আসতে পারে, সেই জন্যই তিনি বৈদিক জ্ঞান দান করেন। আমাদের মনে রাখা উচিত, এই জড় জগতে প্রতিটি বদ্ধ জীবই জড় সুখভোগ করতে চায়। কিন্তু বৈদিক নির্দেশাবলী এমনভাবে রচিত হয়েছে যে, আমরা যেন আমাদের বিকৃত বাসনাগুলিকে পরিতৃপ্ত করতে পারি, তারপর তথাকথিত সুখভোগ পরিসমাপ্ত করে ভগবৎ-ধামে ফিরে যেতে পারি। জড় জগতের দুঃখময় বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্য ভগবান জীবকে এভাবে করুণা করেছেন। তাই, প্রতিটি জীবের কর্তব্য হচ্ছে

কৃষ্ণভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সংকীর্তন যজ্ঞ করা। যারা বৈদিক নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করতে পারে না, তারা যদি কৃষ্ণচেতনা বা কৃষ্ণভক্তি লাভ করতে পারে, তবে তারাও বৈদিক যজ্ঞের সমস্ত সুফলগুলি প্রাপ্ত হয়।

শ্লোক ১৬

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬ ॥

এবম্—এই প্রকারে; **প্রবর্তিতম্**—বেদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত; **চক্রম্**—চক্র; **ন**—করে না; **অনুবর্তয়তি**—গ্রহণ; **ইহ**—এই জীবনে; **যঃ**—যিনি; **অঘায়ুঃ**—পাপপূর্ণ জীবন; **ইন্দ্রিয়ারামঃ**—ইন্দ্রিয়াসক্ত; **মোঘম্**—বৃথা; **পার্থ**—হে পৃথাপুত্র (অর্জুন); **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **জীবতি**—জীবন ধারণ করে।

গীতার গান

সেই সে ব্রহ্মের চক্র আছে প্রবর্তিত ।
সে চক্রে যে নাহি হয় বিশেষ বর্তিত ॥
পাপের জীবন তার অতি ভয়ঙ্কর ।
ইন্দ্রিয় প্রীতয়ে করে পাপ পরস্পর ॥

অনুবাদ

হে অর্জুন! যে ব্যক্তি এই জীবনে বেদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পন্থা অনুসরণ করে না, সেই ইন্দ্রিয়সুখ-পরায়ণ পাপী ব্যক্তি বৃথা জীবন ধারণ করে।

তাৎপর্য

বৈষয়িক জীবন-দর্শন অনুযায়ী, অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা অর্থ উপার্জন করে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার যে অর্থহীন প্রচেষ্টা, তা অতি ভয়ংকর পাপের জীবন বলে ভগবান তা পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাই, যারা জড়-জাগতিক সুখভোগ করতে চায়, তাদের এই সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্তব্য। যারা তা করে না, তারা অত্যন্ত জঘন্য জীবন যাপন করছে, কারণ তাদের পাপের বোঝা ক্রমশই বেড়ে চলেছে এবং তারা ক্রমশই অধঃপতিত হচ্ছে। প্রকৃতির নিয়মে এই মনুষ্য-জীবন পাওয়ার বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের মধ্যে

একটিকে অবলম্বন করে আত্ম-উপলব্ধি করা। পাপ-পুণ্যের অতীত পরমার্থবাদীদের কঠোরভাবে শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার কোন আবশ্যকতা নেই; কিন্তু যারা জড় বিষয়ভোগে লিপ্ত, তাদের এই সমস্ত যজ্ঞ করার মাধ্যমে পবিত্র হওয়া প্রয়োজন। মানুষ নানা ধরনের কর্মে লিপ্ত থাকতে পারে। কিন্তু ভগবানের সেবায় কর্ম না করা হলে সমস্ত কর্মই সাধিত হয় ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য; তাই পুণ্যকর্ম করে তাদের পাপের ভার লাঘব করতে হয়। যে সমস্ত মানুষ কামনা-বাসনার বন্ধনে আবদ্ধ, তারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে চায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই তাদের জন্য যজ্ঞের প্রবর্তন করেছেন, যাতে তারা তাদের আকাঙ্ক্ষিত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে পারে, অথচ সেই কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে পড়ে। এই জগতের উন্নতি আমাদের প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে না, তা নির্ভর করে অলক্ষ্যে ভগবানের ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ তাঁর আজ্ঞাবাহক দেব-দেবীর উপর। তাই *বেদের* নির্দেশ অনুসারে যজ্ঞ করে দেব-দেবীদের তুষ্ট করা হলে পৃথিবীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, বিভিন্ন দেব-দেবীদের তুষ্ট করার জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যজ্ঞ-অনুষ্ঠান করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তুষ্ট করা এবং এভাবেই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে করতে জীবের অন্তরে কৃষ্ণভক্তির বিকাশ হয়। কিন্তু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা সত্ত্বেও যদি অন্তরে কৃষ্ণভক্তির উদয় না হয়, তবে বুঝতে হবে, তা কেবল উদ্দেশ্যহীন নৈতিক আচার-অনুষ্ঠান ছাড়া আর কিছু নয়। তাই মানুষের কর্তব্য হচ্ছে, *বেদের* নির্দেশগুলিকে কেবল নৈতিক আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমিত না রেখে, তার মাধ্যমে কৃষ্ণভক্তি লাভের চেষ্টা করা।

শ্লোক ১৭

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭ ॥

যঃ—যে; **তু**—কিন্তু; **আত্মরতিঃ**—আত্মারাম; **এব**—অবশ্যই; **স্যাৎ**—থাকেন; **আত্মতৃপ্তঃ**—আত্মতৃপ্ত; **চ**—এবং; **মানবঃ**—মানুষ; **আত্মনি**—আত্মাতে; **এব**—কেবল; **চ**—এবং; **সন্তুষ্টঃ**—সন্তুষ্ট; **তস্য**—তাঁর; **কার্যম্**—কর্তব্যকর্ম; **ন**—নেই; **বিদ্যতে**—বিদ্যমান।

গীতার গান

আর যে বুঝিয়াছে আত্মতত্ত্বসার ।
কার্য কর্ম কিছু নাই করিবার তার ॥

পূর্ণজ্ঞানে ভগবানে ভক্তি করে যেই ।
আত্মতৃপ্ত আত্মজ্ঞানী তুষ্ট আত্মাতেই ॥

অনুবাদ

কিন্তু যে ব্যক্তি আত্মাতেই প্রীত, আত্মাতেই তৃপ্ত তৃপ্ত এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁর কোন কর্তব্যকর্ম নেই।

তাৎপর্য

যিনি সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনাময় এবং কৃষ্ণসেবায় যিনি সম্পূর্ণভাবে মগ্ন, তাঁর অন্য কোন কর্তব্য নেই। কৃষ্ণভক্তি লাভ করার ফলে তাঁর অন্তর সম্পূর্ণভাবে কলুষমুক্ত হয়ে পবিত্র হয়েছে। হাজার হাজার যজ্ঞ অনুষ্ঠানেও যে ফল লাভ করা যায় না, কৃষ্ণভক্তির প্রভাবে তা মুহূর্তের মধ্যে সাধিত হয়। এভাবে চেতনা শুদ্ধ হলে জীব পরমেশ্বরের সঙ্গে তাঁর নিত্যকালের সম্পর্ক উপলব্ধিই করতে পারেন। তখন ভগবানের কৃপায় তাঁর কর্তব্যকর্ম স্বয়ং জ্ঞানালোকিত হয় এবং তাই তিনি আর বৈদিক নির্দেশ অনুসারে কর্তব্য-অকর্তব্যের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকেন না। এই রকম কৃষ্ণভক্ত জীবের আর জড় বিষয়াসক্তি থাকে না এবং কামিনী-কাঞ্চনের প্রতি তাঁর আর কোন মোহ থাকে না।

শ্লোক ১৮

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন ।
ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥

ন—নেই; **এব**—অবশ্যই; **তস্য**—তাঁর; **কৃতেন**—কর্তব্যকর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা; **অর্থঃ**—প্রয়োজন; **ন**—নেই; **অকৃতেন**—কর্তব্যকর্ম না করলেও; **ইহ**—এই জগতে; **কশ্চন**—কোন কারণ; **ন**—নেই; **চ**—ও; **অস্য**—এর; **সর্বভূতেষু**—সমস্ত প্রাণীর মধ্যে; **কশ্চিৎ**—কেউই; **অর্থ**—প্রয়োজন; **ব্যপাশ্রয়ঃ**—আশ্রয় গ্রহণ।

গীতার গান

অর্থানর্থ বিচারাদি আত্মতৃপ্ত নহে ।
কর্তব্যাকর্তব্য যাহা কিছু নহে বেদশাস্ত্র কহে ॥

সে নহে কাহার ঋণী নিজার্থ সাধনে ।
সর্বস্ব হয়েছে পূর্ণ শরণ্য শরণে ॥

অনুবাদ

আত্মানন্দ অনুভবকারী ব্যক্তির এই জগতে ধর্ম অনুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন নেই এবং এই প্রকার কর্ম না করারও কোন কারণ নেই। তাকে অন্য কোন প্রাণীর উপর নির্ভর করতেও হয় না।

তাৎপর্য

যে মানুষ তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করে জানতে পেরেছেন যে, তিনি হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, তিনি আর সামাজিক কর্তব্য-অকর্তব্যের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকেন না। কারণ, তিনি তখন বুঝতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাটাই হচ্ছে একমাত্র কর্তব্যকর্ম। অনেকে আত্মজ্ঞান লাভ করার নাম করে কর্মবিহীন আলস্যপূর্ণ জীবন যাপন করে। কিন্তু পরবর্তী শ্লোকে ভগবান আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন, নিষ্কর্মা, অলস লোকেরা কৃষ্ণভক্তি লাভ করতে পারে না। কারণ, কৃষ্ণভক্তি মানে হচ্ছে কৃষ্ণসেবা, শ্রীকৃষ্ণের দাসত্ব করা, তাই কৃষ্ণভক্ত একটি মুহূর্তকেও নষ্ট হতে দেন না। তিনি প্রতিটি মহূর্তকে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করেন। অন্যান্য দেব-দেবীদের পূজা করাটাও কর্তব্য বলে ভগবানের ভক্ত মনে করেন না। কারণ, তিনি জানেন, কেবল ভগবানের সেবা করলেই সকলের সেবা করা হয়।

শ্লোক ১৯

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর ।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥ ১৯ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **অসক্তঃ**—আসক্তি রহিত হয়ে; **সততম্**—সর্বদা; **কার্যম্**—কর্তব্য; **কর্ম**—কর্ম; **সমাচর**—অনুষ্ঠান কর; **অসক্তঃ**—অনাসক্ত হয়ে; **হি**—অবশ্যই; **আচরন্**—অনুষ্ঠান করলে; **কর্ম**—কর্ম; **পরম্**—পরতত্ত্ব; **আপ্নোতি**—প্রাপ্ত হয়; **পুরুষঃ**—মানুষ।

গীতার গান

অতএব অনাসক্ত হয়ে কার্য কর ।
যুক্ত বৈরাগ্য সেই তাতে হও দৃঢ় ॥

অনাসক্ত কার্য করে পরম পদেতে ।
যোগ্য হয় ক্রমে ক্রমে সে পদ লভিতে ॥

অনুবাদ

অতএব, কর্মফলের প্রতি আসক্তি রহিত হয়ে কর্তব্যকর্ম সম্পাদন কর। অনাসক্ত হয়ে কর্ম করার ফলেই মানুষ পরতত্ত্বকে লাভ করতে পারে।

তাৎপর্য

নির্বিশেষবাদী জ্ঞানী মুক্তি চান, কিন্তু ভক্ত কেবল পরম পুরুষ ভগবানকে চান। তাই, সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে যখন কেউ ভগবানের সেবা করেন, তখন মানব-জীবনের পরম উদ্দেশ্য সাধিত হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধ করতে বললেন, কারণ সেটি ছিল তাঁর ইচ্ছা। সৎ কর্ম করে, অহিংসা ব্রত পালন করে ভাল মানুষ হওয়াটাই স্বার্থপর কর্ম, কিন্তু সৎ-অসৎ, ভাল-মন্দ, ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিচার না করে ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে কর্ম করাটাই হচ্ছে বৈরাগ্য। এটিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম; ভগবান নিজেই সেই উপদেশ দিয়ে গেছেন।

বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান, যাগ-যজ্ঞ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইন্দ্রিয় উপভোগ জনিত অসৎ কর্মের কুফল থেকে মুক্ত হওয়া। কিন্তু ভগবানের সেবায় যে কর্ম সাধিত হয়, তা অপ্রাকৃত কর্ম এবং তা শুভ ও অশুভ কর্মবন্ধনের অতীত। কৃষ্ণভক্ত যখন কোন কর্ম করেন, তা তিনি তাঁর ফলভোগ করার জন্য করেন না, তা তিনি করেন কেবল শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার জন্য। ভগবানের সেবা করার জন্য তিনি সব রকম কর্ম করেন, কিন্তু সেই সমস্ত কর্ম থেকে তিনি সম্পূর্ণ নিঃস্পৃহ থাকেন।

শ্লোক ২০

কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি ॥ ২০ ॥

কর্মণা—কর্মের দ্বারা; **এব**—কেবল; **হি**—অবশ্যই; **সংসিদ্ধিম্**—সিদ্ধি; **আস্থিতাঃ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **জনকাদয়ঃ**—জনক আদি রাজারা; **লোকসংগ্রহম্**—জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য; **এব অপি**—ও; **সংপশ্যন্**—বিবেচনা করে; **কর্তুম্**—কর্ম করা; **অর্হসি**—উচিত।

গীতার গান

জনকাদি মহাজন কর্ম সাধ্য করি ।
সিদ্ধিলাভ করেছিল আপনি আচরি ॥
তুমিও সেরূপ কর লোকশিক্ষা লাগি ।
লাভ নাই কিছুমাত্র মর্কট বৈরাগী ॥

অনুবাদ

জনক আদি রাজারাও কর্ম দ্বারাই সংসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অতএব, জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তোমার কর্ম করা উচিত।

তাৎপর্য

জনক রাজা আদি মহাজনেরা ছিলেন ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞানী, তাই *বেদের* নির্দেশ অনুসারে নানা রকম যাগ-যজ্ঞ করার কোন বাধ্যবাধকতা তাঁদের ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও লোকশিক্ষার জন্য তাঁরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমস্ত বৈদিক আচার অনুষ্ঠান করতেন। জনক রাজা ছিলেন সীতাদেবীর পিতা এবং শ্রীরামচন্দ্রের শ্বশুর। ভগবানের অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত হবার ফলে তিনি চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু যেহেতু তিনি মিথিলার (ভারতবর্ষের অন্তর্গত বিহার প্রদেশের একটি অঞ্চলের) রাজা ছিলেন, তাই তাঁর প্রজাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি শাস্ত্রোক্ত কর্মের অনুষ্ঠান করেছিলেন। তেমনই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর চিরন্তন সখা অর্জুনের পক্ষে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করার কোনও দরকার ছিল না, কিন্তু সদুপদেশ ব্যর্থ হলে হিংসা অবলম্বনেরও প্রয়োজন আছে, এই কথা সাধারণ মানুষকে বোঝাবার জন্যই তাঁরা যুদ্ধে নেমেছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে, শান্তি স্থাপন করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করা হয়েছিল, এমন কি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেও বহু চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু দুরাত্মারা যুদ্ধ করতেই বদ্ধপরিকর। এই রকম অবস্থায় যথার্থ কারণে হিংসার আশ্রয় নিয়ে তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়াটা অবশ্যই কর্তব্য। যদিও কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্তের জড় জগতের প্রতি কোন রকম স্পৃহা নেই, কিন্তু তবুও তিনি সাধারণ মানুষকে শিক্ষা দেবার জন্য কর্তব্যকর্মগুলি সম্পাদন করেন। অভিজ্ঞ কৃষ্ণভক্ত এমনভাবে কর্ম করেন, যাতে সকলে তাঁর অনুগামী হয়ে ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে পারে। সেই কথা পরবর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে।

শ্লোক ২১

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ ২১ ॥

যৎ যৎ—যেভাবে যেভাবে; **আচরতি**—আচরণ করেন; **শ্রেষ্ঠঃ**—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; **তৎ তৎ**—সেই সেভাবেই; **এব**—অবশ্যই; **ইতরঃ**—সাধারণ; **জনঃ**—মানুষ; **সঃ**—তিনি; **যৎ**—যা; **প্রমাণম্**—প্রমাণ; **কুরুতে**—স্বীকার করেন; **লোকঃ**—সারা পৃথিবী; **তৎ**—তা; **অনুবর্ততে**—অনুসরণ করে।

গীতার গান

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা করে লোকের আদর্শ ।
ইতর জনতা যাহা করে হয় হর্ষ ॥
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা কিছু প্রামাণ্য স্বীকারে ।
তাহাই স্বীকার্য হয় প্রতি ঘরে ঘরে ॥

অনুবাদ

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেভাবে আচরণ করেন, সাধারণ মানুষেরা তার অনুকরণ করে। তিনি যা প্রমাণ বলে স্বীকার করেন, সমগ্র পৃথিবী তারই অনুসরণ করে।

তাৎপর্য

সাধারণ মানুষদের এমনই একজন নেতার প্রয়োজন হয়, যিনি নিজের আচরণের মাধ্যমে তাদেরকে শিক্ষা দিতে পারেন। যে নেতা নিজেই ধূমপানের প্রতি আসক্ত, তিনি জনসাধারণকে ধূমপান থেকে বিরত হতে শিক্ষা দিতে পারেন না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, শিক্ষা দেওয়া শুরু করার আগে থেকেই শিক্ষকের সঠিকভাবে আচরণ করা উচিত। এভাবেই যিনি শিক্ষা দেন, তাঁকে বলা হয় আচার্য অথবা আদর্শ শিক্ষক। তাই, জনসাধারণকে শিক্ষা দিতে হলে শিক্ষককে অবশ্যই শাস্ত্রের আদর্শ অনুসরণ করে চলতে হয়। কেউ যদি শাস্ত্র-বহির্ভূত মনগড়া কথা শিক্ষা দিয়ে শিক্ষক হতে চায়, তাতে কোন লাভ তো হয়ই না, বরং ক্ষতি হয়। *মনুসংহিতা* ও এই ধরনের শাস্ত্রে ভগবান নিখুঁত সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার শিক্ষা দিয়ে গেছেন এবং এই সমস্ত শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে সমাজকে গড়ে তোলাই হচ্ছে মানুষের কর্তব্য। এভাবেই নেতাদের শিক্ষা এই ধরনের আদর্শ শাস্ত্র অনুযায়ী

হওয়া উচিত। যিনি নিজের উন্নতি কামনা করেন, তাঁর আদর্শ নীতি অনুসরণ করা উচিত, যা মহান আচার্যেরা অনুশীলন করে থাকেন। *শ্রীমদ্ভাগবতেও* বলা হয়েছে, পূর্বতন মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জীবনযাপন করা উচিত, তা হলেই পারমার্থিক জীবনে উন্নতি লাভ করা যায়। রাজা, রাষ্ট্রপ্রধান, পিতা ও শিক্ষক হচ্ছেন স্বাভাবিকভাবেই নিরীহ জনগণের পথপ্রদর্শক। জনসাধারণকে পরিচালনা করার মহৎ দায়িত্ব তাঁদের উপর ন্যস্ত হয়েছে। তাই তাঁদের উচিত, শাস্ত্রের বাণী উপলব্ধি করে, শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে জনসাধারণকে পরিচালিত করে, এক আদর্শ সমাজ গড়ে তোলা। এটি কোন কঠিন কাজ নয়, কিন্তু এর ফলে যে সমাজ গড়ে উঠবে, তাতে প্রতিটি মানুষের জীবন সার্থক হবে।

শ্লোক ২২

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন ।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি ॥ ২২ ॥

ন—না; **মে**—আমার; **পার্থ**—হে পৃথাপুত্র; **অস্তি**—আছে; **কর্তব্যম্**—কর্তব্য; **ত্রিষু**—তিন; **লোকেষু**—জগতে; **কিঞ্চন**—কোন; **ন**—না; **অনবাপ্তম্**—অপ্রাপ্ত; **অবাপ্তব্যম্**—প্রাপ্তব্য; **বর্তে**—যুক্ত আছি; **এব**—অবশ্যই; **চ**—ও; **কর্মণি**—শাস্ত্রোক্ত কর্মে।

গীতার গান

আমার কর্তব্য নাহি ত্রিভুবন মাঝে ।
পার্থ তুমি জান কেবা সমতুল্য আছে ॥
প্রাপ্তব্য বলিয়া কিছু কোথা নাহি মোর ।
তথাপি দেখহ আমি কর্তব্যে বিভোর ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! এই ত্রিজগতে আমার কিছুই কর্তব্য নেই। আমার অপ্রাপ্ত কিছু নেই এবং প্রাপ্তব্যও কিছু নেই। তবুও আমি কর্মে ব্যাপৃত আছি।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্রে পুরুষোত্তম ভগবানের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমং চ দৈবতম্ ।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥
ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥

"ভগবান হচ্ছেন ঈশ্বরদেরও পরম ঈশ্বর এবং দেবতাদেরও পরম দেবতা। সকলেই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনিই সকলকে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি দান করেন; তাঁরা কেউ পরমেশ্বর নয়। তিনি সমস্ত দেবতাদের পূজ্য এবং তিনি হচ্ছেন সমস্ত পতিদের পরম পতি। তিনি হচ্ছেন এই জড় জগতের সমস্ত অধিপতি ও নিয়ন্তার অতীত, সকলের পূজ্য। তাঁর থেকে বড় আর কিছুই নেই, তিনি হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ।

"তাঁর দেহ সাধারণ জীবের মতো নয়। তাঁর দেহ এবং তাঁর আত্মার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তিনি হচ্ছেন পূর্ণ, তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি অপ্রাকৃত। তাঁর প্রতিটি ইন্দ্রিয়ই যে-কোন ইন্দ্রিয়ের কর্ম সাধন করতে পারে। তাই তাঁর থেকে মহৎ আর কেউ নেই, তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই। তাঁর শক্তি অসীম ও বহুমুখী, তাই তাঁর সমস্ত কর্ম স্বাভাবিকভাবেই সাধিত হয়ে যায়।" (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* ৬/৭-৮)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত ঐশ্বর্যের অধীশ্বর এবং তিনিই হচ্ছেন পরমতত্ত্ব, তাই তাঁর কোন কর্তব্য নেই। কর্মের ফল যাদের ভোগ করতে হয়, তাদের জন্যই কর্তব্যকর্ম করার নির্দেশ দেওয়া আছে। কিন্তু এই ত্রিভুবনে যাঁর কোন কিছুই কাম্য নেই, তাঁর কোন কর্তব্যকর্মও নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভগবান কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন করেছেন, কেন না দুর্বলদের রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য। যদিও তিনি শাস্ত্রের বিধি-নিষেধের অতীত, কিন্তু তবুও তিনি শাস্ত্রের নির্দেশ লংঘন করেন না।

শ্লোক ২৩

যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ২৩ ॥

যদি—যদি; **হি**—অবশ্যই; **অহম্**—আমি; **ন**—না; **বর্তেয়ম্**—প্রবৃত্ত হই; **জাতু**—কখনও; **কর্মণি**—শাস্ত্রোক্ত কর্মে; **অতন্দ্রিতঃ**—অনলস হয়ে; **মম**—আমার; **বর্ত্ম**—পথ; **অনুবর্তন্তে**—অনুসরণ করবে; **মনুষ্যাঃ**—সমস্ত মানুষ; **পার্থ**—হে পৃথাপুত্র; **সর্বশঃ**—সর্বতোভাবে।

গীতার গান

আমি যদি কর্ম ত্যজি অতন্দ্রিত হয়ে ।
মম বর্ত্ম সবে অনুগমন করয়ে ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! আমি যদি অনলস হয়ে কর্তব্যকর্মে প্রবৃত্ত না হই, তবে আমার অনুবর্তী হয়ে সমস্ত মানুষই কর্ম ত্যাগ করবে।

তাৎপর্য

পারমার্থিক উন্নতি লাভের জন্য সুশৃঙ্খল সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হয় এবং এভাবে সমাজকে গড়ে তোলবার জন্য প্রতিটি সভ্য মানুষকে নিয়ম ও শৃঙ্খলা অনুসরণ করে সুসংযত জীবন যাপন করতে হয়। এই সমস্ত নিয়মকানুনের বিধি-নিষেধ কেবল বদ্ধ জীবেদের জন্য, ভগবানের জন্য নয়। যেহেতু তিনি ধর্মনীতি প্রবর্তনের জন্য অবতরণ করেছিলেন, তাই তিনি শাস্ত্র-নির্দেশিত সমস্ত বিধির অনুষ্ঠান করেছিলেন। ভগবান এখানে বলছেন, যদি তিনি এই সমস্ত বিধি-নিষেধের আচরণ না করেন; তবে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে সকলেই যথেচ্ছাচারী হয়ে উঠবে। *শ্রীমদ্ভাগবত* থেকে আমরা জানতে পারি, এই পৃথিবীতে অবস্থান করার সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঘরে-বাইরে সর্বত্র গৃহস্থোচিত সমস্ত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্ ।
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ ॥

উৎসীদেয়ুঃ—উৎসন্ন হবে; **ইমে**—এই সমস্ত; **লোকাঃ**—সমস্ত লোক; **ন**—না; **কুর্যাম্**—করি; **কর্ম**—শাস্ত্রোক্ত কর্ম; **চেৎ**—যদি; **অহম্**—আমি; **সঙ্করস্য**—

বর্ণসঙ্করের; **চ**—এবং; **কর্তা**—কর্তা; **স্যাম্**—হব; **উপহন্যাম্**—বিনষ্ট হবে; **ইমাঃ**—এই সমস্ত; **প্রজাঃ**—জীব।

গীতার গান

ফল এই হবে সবাই উচ্ছন্ন যাবে ।
আমার দর্শিত পথ দেখার অভাবে ॥
বিধি আর কিছু নাহি রবে ধরাতলে ।
বিনষ্ট হইবে এই প্রজারা সকলে ॥

অনুবাদ

আমি যদি কর্ম না করি, তা হলে এই সমস্ত লোক উৎসন্ন হবে। আমি বর্ণসঙ্কর সৃষ্টির কারণ হব এবং তার ফলে আমার দ্বারা সমস্ত প্রজা বিনষ্ট হবে।

তাৎপর্য

বর্ণসঙ্কর হবার ফলে অবাঞ্ছিত মানুষে সমাজ ভরে ওঠে এবং তার ফলে সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা ব্যাহত হয়। এই ধরনের সামাজিক উপদ্রব রোধ করবার জন্য শাস্ত্রে নানা রকমের বিধি-নিষেধের নির্দেশ দেওয়া আছে, যা অনুসরণ করার ফলে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই শান্তিপ্রিয় এবং সুস্থ মনোভাবাপন্ন হয়ে ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে পারে। ভগবান যখন এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন তিনি জীবের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধনের জন্য এই সমস্ত শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের তাৎপর্য ও তাদের একান্ত প্রয়োজনীয়তার কথা মানুষকে বুঝিয়ে দেন। ভগবান হচ্ছেন সমস্ত জগতের পিতা, তাই জীব যদি বিপথগামী হয়ে পথভ্রষ্ট হয়, পক্ষান্তরে ভগবানই তার জন্য দায়ী হন। তাই, মানুষ যখন শাস্ত্রের অনুশাসন না মেনে যথেচ্ছাচার করতে শুরু করে, তখন ভগবান নিজে অবতরণ করে পুনরায় সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। তেমনই আমাদের মনে রাখতে হবে, ভগবানের পদাঙ্ক অনুসরণ করাই আমাদের কর্তব্য, ভগবানকে অনুকরণ করা কোন অবস্থাতেই আমাদের উচিত নয়। অনুসরণ করা আর অনুকরণ করা এক পর্যায়ভুক্ত নয়। ভগবান তাঁর শৈশবে গোবর্ধন পর্বত তুলে ধরেছিলেন, কিন্তু তাঁকে অনুকরণ করে আমরা গোবর্ধন পর্বত তুলতে পারি না। কোন মানুষের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। ভগবানের সমস্ত লীলাই অসাধারণ, তাঁর লীলা অনুকরণ করে ভগবান হবার চেষ্টা করা মূর্খতারই নামান্তর। তাই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, তাঁকে অনুসরণ করে আমাদের জীবনের

প্রকৃত উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া, কোন অবস্থাতেই তাঁর অস্বাভাবিক লীলার অনুকরণ করা আমাদের কর্তব্য নয়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/৩৩/৩০-৩১) বলা হয়েছে—

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্ ॥
ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচরেৎ ॥

"ভগবান এবং তাঁর শক্তিতে শক্তিমান ভক্তদের নির্দেশ সকলের অনুসরণ করা কর্তব্য। তাঁদের দেওয়া উপদেশ আমাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করে এবং যে মানুষ বুদ্ধিমান, সে যথাযথভাবে এই সমস্ত উপদেশগুলিকে পালন করে। কিন্তু আমাদের সব সময় সতর্ক থাকা উচিত যাতে আমরা কখনও তাঁদের অনুকরণ না করি। দেবাদিদেব মহাদেবকে অনুকরণ করে বিষ পান করা আমাদের কখনই উচিত নয়।"

আমাদের সর্বদা ঈশ্বরের পদ বিবেচনা করা উচিত, অথবা যাঁরা অসীম ক্ষমতাশালীরূপে চন্দ্র ও সূর্যের গতি প্রকৃতপক্ষে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। এই প্রকার শক্তি ছাড়া, কারও অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ঈশ্বরদের অনুকরণ করা উচিত নয়। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে তাঁদের অনুসরণ করা। সমুদ্র-মন্থনের সময় যে বিষ উঠেছিল, তা পান করে মহাদেব জগৎকে রক্ষা করেছিলেন, কিন্তু কোন সাধারণ মানুষ যদি তার এক কণা বিষও পান করে, তবে তার মৃত্যু অবধারিত। কিছু মূর্খ লোক আছে, যারা নিজেদের মহাদেবের ভক্ত বলে প্রচার করে এবং মহাদেবের বিষ খাওয়ার অনুকরণ করে গাঁজা আদি মাদকদ্রব্য পান করে। তারা জানে না, এর মাধ্যমে তাদের মৃত্যুকে তারা ডেকে আনছে। তেমনই, কিছু ভণ্ড কৃষ্ণভক্তও দেখা যায়, যারা নিজেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করবার জন্য ভগবানের অতি অন্তরঙ্গ লীলা—রাসলীলার অনুকরণ করে। তারা ভেবেও দেখে না, ভগবানের মতো গোবর্ধন পর্বত তোলবার ক্ষমতা তাদের নেই। তাই শক্তিমানকে অনুকরণ না করে তাঁকে অনুসরণ করাটাই হচ্ছে আমাদের কর্তব্য। আমাদের শিক্ষা দেবার জন্য ভগবান যে সমস্ত উপদেশ দিয়ে গেছেন, তা পালন করলেই আমাদের পরমার্থ সাধিত হবে। কিন্তু তা না করে, যদি আমরা নিজেরাই ভগবান সাজতে চাই, তা হলে আমাদের অধঃপতন অবধারিত। আজকের জগতে বহু অবতারের দেখা মেলে—লোক ঠকাবার জন্য অনেক ভণ্ড নিজেদের ভগবানের অবতার বলে প্রচার করে, কিন্তু সর্ব শক্তিমান ভগবানের সর্ব শক্তিমত্তার কোন চিহ্নই তাদের মধ্যে দেখা যায় না।

শ্লোক ২৫

সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।
কুর্যাদ্ বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫ ॥

সক্তাঃ—আসক্ত হয়ে; **কর্মণি**—শাস্ত্রোক্ত কর্মে; **অবিদ্বাংসঃ**—অজ্ঞান মানুষেরা; **যথা**—যেমন; **কুর্বন্তি**—করে; **ভারত**—হে ভরতবংশীয়; **কুর্যাৎ**—কর্ম করবেন; **বিদ্বান্**—জ্ঞানী ব্যক্তি; **তথা**—তেমন; **অসক্তঃ**—আসক্তি রহিত হয়ে; **চিকীর্ষুঃ**—পরিচালিত করতে ইচ্ছা করে; **লোকসংগ্রহম্**—জনসাধারণকে।

গীতার গান

বিদ্বানের যে কর্তব্য অবিদ্বান সম।
বাহ্যত আসক্ত হয়ে কর্ম সমাগম ॥
অন্তরে আসক্তি নাই লোকের সংগ্রহ।
বিদ্বানের হয় সেই কর্মেতে আগ্রহ ॥

অনুবাদ

হে ভারত! **অজ্ঞানীরা যেমন কর্মফলের প্রতি আসক্ত হয়ে তাদের কর্তব্যকর্ম করে, তেমনই জ্ঞানীরা অনাসক্ত হয়ে, মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য কর্ম করবেন।**

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত এবং কৃষ্ণভাবনা-বিমুখ অভক্তের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে তাদের মনোবৃত্তির পার্থক্য। কৃষ্ণভাবনার উন্নতি সাধনের পক্ষে যা সহায়ক নয়, কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত সেই সমস্ত কর্ম করেন না। অবিদ্যার অন্ধকারে আচ্ছন্ন মায়ামুগ্ধ জীবের কর্ম আর কৃষ্ণভাবনাময় মানুষের কর্মকে অনেক সময় আপাতদৃষ্টিতে একই রকম বলে মনে হয়, কিন্তু মায়াচ্ছন্ন মূর্খ মানুষ তার সমস্ত কর্ম করে নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করার জন্য, কিন্তু কৃষ্ণভাবনাময় মানুষ তার কর্ম করে শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তি সাধন করবার জন্য। তাই মানব-সমাজে কৃষ্ণভাবনাময় মানুষের অত্যন্ত প্রয়োজন, কেন না তাঁরাই মানুষকে জীবনের প্রকৃত গন্তব্যস্থলের দিকে পরিচালিত করতে পারেন। কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জীব জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির চক্রে পাক খাচ্ছে; সেই কর্মকে কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে অর্পণ করা যায়, তা কেবল তাঁরাই শেখাতে পারেন।

শ্লোক ২৬

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্ ।
জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬ ॥

ন—নয়; **বুদ্ধিভেদম্**—বুদ্ধিভ্রষ্ট; **জনয়েৎ**—জন্মানো উচিত; **অজ্ঞানাম্**—অজ্ঞ ব্যক্তিদের; **কর্মসঙ্গিনাম্**—কর্মফলের প্রতি আসক্ত; **জোষয়েৎ**—নিযুক্ত করা উচিত; **সর্ব**—সমস্ত; **কর্মাণি**—কর্ম; **বিদ্বান্**—জ্ঞানবান; **যুক্তঃ**—যুক্ত হয়ে; **সমাচরন্**—অনুষ্ঠান করে।

গীতার গান

বুদ্ধিভেদ নাহি করি মূঢ় কর্মীদের ।
অজ্ঞানী যে হয় তারা তাই হেরফের ॥
তাই সে সাজাতে হবে সর্বকর্ম মাঝে ।
আপনি আচরি সব অবিদ্যার সাজে ॥

অনুবাদ

জ্ঞানবান ব্যক্তিরা কর্মাসক্ত জ্ঞানহীন ব্যক্তিদের বুদ্ধি বিভ্রান্ত করবেন না। বরং, তাঁরা ভক্তিযুক্ত চিত্তে সমস্ত কর্ম অনুষ্ঠান করে জ্ঞানহীন ব্যক্তিদের কর্মে প্রবৃত্ত করবেন।

তাৎপর্য

বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ। সেটিই হচ্ছে *বেদের* শেষ কথা। *বেদের* সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান, যাগ-যজ্ঞ আদি, এমন কি জড় কার্যকলাপের সমস্ত নির্দেশাদির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানা। যেহেতু বদ্ধ জীবেরা তাদের জড় ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির অতীত কোন কিছু জানে না, তাই তারা সেই উদ্দেশ্যে *বেদ* অধ্যয়ন করে। কিন্তু বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের বিধি-নিষেধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে সকাম কর্ম ও ইন্দ্রিয়-তর্পণের মাধ্যমে মানুষ ক্রমান্বয়ে কৃষ্ণভাবনায় উন্নীত হয়। তাই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা কৃষ্ণভক্ত কখনই অপরের কার্যকলাপ ও বিশ্বাসে বাধা দেন না। পক্ষান্তরে, তিনি তাঁর কার্যকলাপের মাধ্যমে শিক্ষা দেন, কিভাবে সমস্ত কর্মের ফল শ্রীকৃষ্ণের সেবায় উৎসর্গ করা যেতে পারে। অভিজ্ঞ কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত এমনভাবে আচরণ করেন, যার ফলে ইন্দ্রিয়-তর্পণে রত দেহাত্ম-বুদ্ধিসম্পন্ন অজ্ঞ

লোকেরাও উপলব্ধি করতে পারে, তাদের কি করা কর্তব্য। যদিও কৃষ্ণভাবনাহীন অজ্ঞ লোকদের কাজে বাধা দেওয়া উচিত নয়, তবে অল্প উন্নতিপ্রাপ্ত কৃষ্ণভক্ত বৈদিক ধর্মানুষ্ঠানের বিধির অপেক্ষা না করে সরাসরি শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত হতে পারে। এই ধরনের ভাগ্যবান লোকের পক্ষে বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের আচরণ করার কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না, কারণ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করলে আর কোন কিছুই করার প্রয়োজনীয়তা থাকে না। ভগবৎ-তত্ত্ববেত্তা সদ্গুরুর নির্দেশ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করলে সর্বকর্ম সাধিত হয়।

শ্লোক ২৭

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭ ॥

প্রকৃতেঃ—জড়া প্রকৃতির; **ক্রিয়মাণানি**—ক্রিয়মাণ; **গুণৈঃ**—গুণের দ্বারা; **কর্মাণি**—সমস্ত কর্ম; **সর্বশঃ**—সর্বপ্রকার; **অহঙ্কার-বিমূঢ়**—অহঙ্কারের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন; **আত্মা**—আত্মা; **কর্তা**—কর্তা; **অহম্**—আমি; **ইতি**—এভাবে; **মন্যতে**—মনে করে।

গীতার গান

বিদ্বান মূর্খেতে হয় এই মাত্র ভেদ ।
প্রকৃতির বশ এক অন্য সে বিচ্ছেদ ॥
প্রকৃতির গুণে বশ কার্য করি যায় ।
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে নিজে কর্তা হয় ॥
আপনার পরিচয় প্রকৃতির মানে ।
দেহে আত্মবুদ্ধি করে অসত্যের ধ্যানে ॥

অনুবাদ

অহঙ্কারে মোহাচ্ছন্ন জীব জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ দ্বারা ক্রিয়মাণ সমস্ত কার্যকে স্বীয় কার্য বলে মনে করে 'আমি কর্তা'—এই রকম অভিমান করে।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত ও দেহাত্ম-বুদ্ধিসম্পন্ন বিষয়ী, এদের দুজনের কর্মকে আপাতদৃষ্টিতে একই পর্যায়ভুক্ত বলে মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের

মধ্যে এক অসীম ব্যবধান রয়েছে। যে দেহাত্ম-বুদ্ধিসম্পন্ন, সে অহঙ্কারে মত্ত হয়ে নিজেকেই সব কিছুর কর্তা বলে মনে করে। সে জানে না যে, তার দেহের মাধ্যমে যে সমস্ত কর্ম সাধিত হচ্ছে, তা সবই হচ্ছে প্রকৃতির পরিচালনায় এবং এই প্রকৃতি পরিচালিত হচ্ছে ভগবানেরই নির্দেশ অনুসারে। জড়-জাগতিক মানুষ বুঝতে পারে না যে, সে সর্বতোভাবে ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। অহঙ্কারের প্রভাবে বিমূঢ় যে আত্মা, সে নিজেকে কর্তা বলে মনে করে ভাবে, সে স্বাধীনভাবে কর্ম করে চলেছে, তাই সমস্ত কৃতিত্ব সে নিজেই গ্রহণ করে। এটিই হচ্ছে অজ্ঞানতার লক্ষণ। সে জানে না যে, এই স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহটি পরম পুরুষোত্তম ভগবানের নির্দেশে জড়া প্রকৃতির সৃষ্টি এবং সেই জন্যই কৃষ্ণভাবনায় অধিষ্ঠিত হয়ে তার দৈহিক ও মানসিক সমস্ত কাজই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োগ করতে হবে। দেহাত্ম-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ভুলে যায় যে, ভগবান হচ্ছেন হৃষীকেশ, অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা। বহুকাল ধরে তার ইন্দ্রিয়গুলি অপব্যবহারের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার ফলে মানুষ বাস্তবিকপক্ষে অহঙ্কারের দ্বারা বিমোহিত হয়ে পড়ে এবং তারই ফলে সে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্কের কথা ভুলে যায়।

শ্লোক ২৮

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ ।
গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮ ॥

তত্ত্ববিৎ—তত্ত্বজ্ঞ; **তু**—কিন্তু; **মহাবাহো**—হে মহাবীর; **গুণকর্ম**—প্রকৃতির প্রভাব জনিত কর্ম; **বিভাগয়োঃ**—পার্থক্য; **গুণাঃ**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **গুণেষু**—ইন্দ্রিয়-তর্পণে; **বর্তন্তে**—প্রবৃত্ত হন; **ইতি**—এভাবে; **মত্বা**—মনে করে; **ন**—না; **সজ্জতে**—আসক্ত হন।

গীতার গান

তত্ত্ববিৎ যে বিদ্বান বুঝে গুণকর্ম ।
গুণ দ্বারা কার্য হয় জানে সারমর্ম ॥
অতএব গুণকার্য না করে সজ্জন ।
প্রকৃতির গুণকার্য আসক্ত না হন ॥

অনুবাদ

হে মহাবাহো! তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তিমুখী কর্ম ও সকাম কর্মের পার্থক্য ভালভাবে অবগত হয়ে, কখনও ইন্দ্রিয়সুখ ভোগাত্মক কার্যে প্রবৃত্ত হন না।

তাৎপর্য

যিনি তত্ত্ববেত্তা, তিনি পূর্ণ উপলব্ধি করেন যে, জড়া প্রকৃতির সংস্রবে তিনি প্রতিনিয়ত বিব্রত হয়ে আছেন। তিনি জানেন যে, তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এই জড়া প্রকৃতি তার প্রকৃত আলয় নয়। সচ্চিদানন্দময় ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে তিনি তাঁর প্রকৃত স্বরূপও জানেন। তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছেন যে, কোন না কোন কারণে তিনি দেহাত্মবুদ্ধিতে আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন। তাঁর শুদ্ধ স্বরূপে তিনি হচ্ছেন ভগবানের নিত্যদাস এবং ভক্তি সহকারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় সমস্ত কর্ম করাই হচ্ছে তাঁর কর্তব্য। তাই তিনি কৃষ্ণভাবনাময় কার্যকলাপে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেন এবং তার ফলে স্বভাবতই তিনি আনুষঙ্গিক ও অনিত্য জড় ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপের প্রতি অনাসক্ত হয়ে পড়েন। তিনি জানেন যে, ভগবানের ইচ্ছার ফলেই তিনি জড় জগতে পতিত হয়েছেন, তাই এই দুঃখময় জড় জগতের কোন দুঃখকেই তিনি দুঃখ বলে মনে করেন না, পক্ষান্তরে তিনি তা ভগবানের আশীর্বাদ বলে মনে করেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে, যিনি ভগবানের তিনটি প্রকাশ—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান সম্বন্ধে জানেন, তাঁকে বলা হয় তত্ত্ববিদ্, কারণ ভগবানের সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্পর্কের কথা তিনি জানেন।

শ্লোক ২৯

প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু ।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯ ॥

প্রকৃতেঃ—জড়া প্রকৃতির; **গুণসংমূঢ়াঃ**—গুণের প্রভাবে বিমূঢ় ব্যক্তিরা; **সজ্জন্তে**—প্রবৃত্ত হয়; **গুণকর্মসু**—প্রাকৃত কার্যকলাপে; **তান্**—সেই সকল; **অকৃৎস্নবিদঃ**—অল্পজ্ঞ ব্যক্তিগণকে; **মন্দান্**—মন্দবুদ্ধি; **কৃৎস্নবিৎ**—তত্ত্বজ্ঞ; **ন**—না; **বিচালয়েৎ**—বিচলিত করেন।

গীতার গান

গুণকর্মে আসক্তি সে গুণেতে সংমূঢ় ।
প্রাকৃত নিজেকে মানে সেই কার্যে দৃঢ় ॥
ভবরোগী মূঢ় জনে না করি বঞ্চন ।
কর্মের যোজনা হতে ক্রমে জ্ঞান বল ॥

অনুবাদ

জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে, অজ্ঞান ব্যক্তিরা জাগতিক কার্যকলাপে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু তাদের কর্ম নিকৃষ্ট হলেও তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষেরা সেই মন্দবুদ্ধি ও অল্পজ্ঞ ব্যক্তিগণকে বিচলিত করেন না।

তাৎপর্য

যারা অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তারা তাদের জড় সত্তাকে তাদের স্বরূপ বলে মনে করে, তার ফলে তারা জড় উপাধির দ্বারা ভূষিত হয়। এই দেহটি জড়া প্রকৃতির উপহার। এই জড় দেহের সঙ্গে যারা গভীরভাবে আসক্ত, তাদের বলা হয় *মন্দ,* অর্থাৎ তারা হচ্ছে আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান রহিত অলস ব্যক্তি। মূর্খ লোকেরা তাদের জড় দেহটিকে তাদের আত্মা বলে মনে করে; এই দেহটিকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত মানুষের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তাদেরকে তারা আত্মীয় বলে স্বীকার করে, যে দেশে তারা জন্ম নিয়েছে অর্থাৎ যে দেশে তারা তাদের জড় দেহটি প্রাপ্ত হয়েছে, সেটি তাদের দেশ আর সেই দেশকে তারা পূজা করে এবং তাদের অনুকূলে কতকগুলি সংস্কারের অনুষ্ঠান করাকে তারা ধর্ম বলে মনে করে। সমাজসেবা, জাতীয়তাবাদ, পরমার্থবাদ আদি হচ্ছে এই ধরনের জড় উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তিদের কতকগুলি আদর্শ। এই সমস্ত আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তারা নানা রকম জাগতিক কাজে ব্যস্ত থাকে। তারা মনে করে, ভগবানের কথা হচ্ছে রূপকথা, তাই ভগবানকে নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো সময় তাদের নেই। এই ধরনের মোহাচ্ছন্ন মানুষেরা অহিংসা-নীতি আদি দেহগত হিতকর কার্যে ব্রতী হয়, কিন্তু তাতে কোন কাজ হয় না। পারমার্থিক জ্ঞান অর্জন করে যাঁরা তাঁদের প্রকৃত স্বরূপ আত্মাকে জানতে পেরেছেন, তাঁরা এই সমস্ত দেহসর্বস্ব মানুষদের কাজে কোন রকম বাধা দেন না, পক্ষান্তরে তাঁরা নিঃশব্দে তাঁদের পারমার্থিক কর্ম ভগবানের সেবা করে চলেন।

যারা অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন, তারা ভগবদ্ভক্তির মর্ম বোঝে না। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিয়েছেন, তাদের মনে ভগবদ্ভক্তির সঞ্চার করার চেষ্টা করে অনর্থক সময় নষ্ট না করতে। কিন্তু ভগবানের ভক্তেরা ভগবানের চাইতেও বেশি কৃপালু, তাই তাঁরা নানা রকম দুঃখকষ্ট সহ্য করে, সমস্ত বিপদকে অগ্রাহ্য করে, সকলের অন্তরে ভগবদ্ভক্তির সঞ্চার করতে চেষ্টা করেন। কারণ, তাঁরা জানেন যে, মনুষ্যজন্ম লাভ করে ভগবদ্ভক্তি সাধন না করলে, সেই জন্ম সম্পূর্ণ বৃথা।

শ্লোক ৩০

ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা ।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০ ॥

ময়ি—আমাকে; **সর্বাণি**—সর্বপ্রকার; **কর্মাণি**—কর্ম; **সংন্যস্য**—সমর্পণ করে; **অধ্যাত্ম**—আত্মনিষ্ঠ; **চেতসা**—চেতনার দ্বারা; **নিরাশীঃ**—নিষ্কাম; **নির্মমঃ**—মমতাশূন্য; **ভূত্বা**—হয়ে; **যুধ্যস্ব**—যুদ্ধ কর; **বিগতজ্বরঃ**—শোকশূন্য হয়ে।

গীতার গান

অতএব তুমি পার্থ ছাড় অভিমান ।
তোমার সমস্ত শক্তি কর মোরে দান ॥
কর্মফল আশা ছাড় নির্মম হইয়া ।
যুদ্ধ কর আশা ত্যজি মূঢ়তা ত্যজিয়া ॥

অনুবাদ

অতএব, হে অর্জুন! অধ্যাত্মচেতনা-সম্পন্ন হয়ে তোমার সমস্ত কর্ম আমাকে সমর্পণ কর এবং মমতাশূন্য, নিষ্কাম ও শোকশূন্য হয়ে তুমি যুদ্ধ কর।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে *ভগবদ্গীতার* উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে ভগবান আদেশ করছেন যে, সম্পূর্ণভাবে ভগবৎ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কর্তব্যকর্ম করে যেতে হবে। সৈনিকেরা যেমন গভীর নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলার সঙ্গে তাদের কর্তব্যকর্ম করে, মানুষের কর্তব্য হচ্ছে ঠিক তেমনভাবে ভগবানের সেবা করা। ভগবানের আদেশকে কখনও কখনও অত্যন্ত কঠোর বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তাঁর আদেশ পালন

করাই হচ্ছে মানুষের ধর্ম। তাই, শ্রীকৃষ্ণের উপর নির্ভরশীল হয়ে তা আমাদের পালন করতেই হবে, কেন না সেটিই হচ্ছে জীবের স্বরূপ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা না করে মানুষ যদি সুখী হতে চেষ্টা করে, তবে তার সে চেষ্টা কোন দিনই সফল হবে না। ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে কর্ম করাই হচ্ছে জীবের কর্তব্য এবং সেই জন্য তাকে যদি সব কিছু ত্যাগ করতেও হয়, তবে তা-ই বিধেয়। ভাল-মন্দ, লাভ-ক্ষতি, সুবিধা-অসুবিধার কথা বিবেচনা না করে ভগবানের আদেশ পালন করাই হচ্ছে আমাদের কর্তব্য। সেই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ যেন সামরিক নেতার মতোই অর্জুনকে যুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছিলেন। অর্জুনের পক্ষে সেই নির্দেশ যাচাই করার কোন পথ ছিল না; তাঁকে সেই নির্দেশ মানতেই হয়েছিল। ভগবান হচ্ছেন সমস্ত আত্মার আত্মা; তাই, নিজের সুখ-সুবিধার কথা বিবেচনা না করে যিনি সম্পূর্ণভাবে পরমাত্মার উপর নির্ভরশীল, অথবা পক্ষান্তরে, যিনি সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময়, তিনিই হচ্ছেন *অধ্যাত্মচেতা*। *নিরাশীঃ* মানে হচ্ছে, ভৃত্য যখন প্রভুর সেবা করে, তখন সে কোন কিছুর আশা করে না। খাজাঞ্চী লক্ষ লক্ষ টাকা গণনা করে, কিন্তু তার এক কপর্দকও সে নিজের বলে মনে করে না, কারণ সে জানে যে, সেই টাকা তার মালিকের। ঠিক তেমনই, এই জগতের সব কিছুই ভগবানের, তাই তাঁর সেবাতে সব কিছু অর্পণ করাই হচ্ছে আমাদের কর্তব্য। আমরা যদি তা করি, তা হলে আমরা ভগবানের যথার্থ ভৃত্য হতে পারি। তা হলেই আমাদের জন্ম সার্থক হয় এবং আমরা পরম শান্তি লাভ করতে পারি। সেটি হচ্ছে *ময়ি* অর্থাৎ 'আমাকে' কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য। কেউ যখন এই প্রকার কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে কর্ম করে, তখন নিঃসন্দেহে সে কোন কিছুর উপর মালিকানা দাবি করে না। এই মনোবৃত্তিকে বলা হয় *নির্মম,* অর্থাৎ 'কোন কিছুই আমার নয়।' ভগবানের এই কঠোর নির্দেশ পালন করতে যদি আমরা অনিচ্ছা প্রকাশ করি—যদি আমরা আমাদের তথাকথিত আত্মীয়-স্বজনের মায়ায় আবদ্ধ হয়ে ভগবানের নির্দেশকে অবজ্ঞা করি, তবে তা মূঢ়তারই নামান্তর। এই বিকৃত মনোবৃত্তি ত্যাগ করা অবশ্যই কর্তব্য। এভাবেই মানুষ *বিগতজ্বর* অর্থাৎ শোকশূন্য হতে পারে। গুণ ও কর্ম অনুসারে প্রত্যেকেরই কোন না কোন বিশেষ কর্তব্য আছে এবং কৃষ্ণভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সেই কর্তব্য সম্পাদন করা প্রত্যেকের কর্তব্য। এই ধর্ম আচরণ করার ফলে আমরা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারি।

শ্লোক ৩১

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্মভিঃ ॥ ৩১ ॥

যে—যাঁরা; মে—আমার; মতম্—নির্দেশাবলী; ইদম্—এই; নিত্যম্—সর্বদা; অনুতিষ্ঠন্তি—নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠান করেন; মানবাঃ—মানুষেরা; শ্রদ্ধাবন্তঃ—শ্রদ্ধাবান; অনসূয়ন্তঃ—মাৎসর্য রহিত; মুচ্যন্তে—মুক্ত হন; তে—তাঁরা সকলে; অপি—এমন কি; কর্মভিঃ—কর্মের বন্ধন থেকে।

গীতার গান

আমার এমত কার্য অনুষ্ঠান করি ।
সর্ব কর্ম করে শুধু ভজিতে শ্রীহরি ॥
শ্রদ্ধাবান মোর ভক্ত অসূয়াবিহীন ।
কর্মফল মুক্ত হয় ভক্তিতে বিলীন ॥

অনুবাদ

আমার নির্দেশ অনুসারে যে-সমস্ত মানুষ তাঁদের কর্তব্যকর্ম অনুষ্ঠান করেন এবং যাঁরা শ্রদ্ধাবান ও মাৎসর্য রহিত হয়ে এই উপদেশ অনুসরণ করেন, তাঁরাও কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে আদেশ করেছেন, তা বৈদিক জ্ঞানের সারমর্ম, তাই সন্দেহাতীতভাবে তা শাশ্বত সত্য। *বেদ* যেমন নিত্য, শাশ্বত, কৃষ্ণভাবনার এই তত্ত্বও তেমন নিত্য, শাশ্বত। ভগবানের প্রতি ঈর্ষান্বিত না হয়ে এই উপদেশের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত। তথাকথিত অনেক দার্শনিক *ভগবদ্গীতার* ভাষ্য লিখেছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের বিশ্বাস নেই। তাঁরা কোন দিনও *গীতার* মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন না এবং সকাম কর্মের বন্ধন থেকেও মুক্ত হতে পারবেন না। কিন্তু অতি সাধারণ কোন মানুষও যদি ভগবানের শাশ্বত নির্দেশের প্রতি দৃঢ় শ্রদ্ধাবান হয়, অথচ সমস্ত নির্দেশগুলিকে যথাযথভাবে পালন করতে অসমর্থ হয়, তবুও সে অবধারিতভাবে কর্মের অনুশাসনের বন্ধন থেকে মুক্ত হবে। ভক্তিযোগ সাধন করার প্রাথমিক পর্যায়ে কেউ হয়ত ভগবানের নির্দেশ ঠিক ঠিকভাবে পালন নাও করতে পারে, কিন্তু যেহেতু সে এই পন্থার প্রতি বিরক্ত নয় এবং যদি সে নৈরাশ্য ও ব্যর্থতা বিবেচনা না করে ঐকান্তিকতার সঙ্গে এই কার্যক্রমের অনুষ্ঠান করতে থাকে, তবে সে নিশ্চিতভাবে ধীরে ধীরে শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনার পর্যায়ে অবশ্যই উন্নীত হবে।

শ্লোক ৩২

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্ ।
সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২ ॥

যে—যারা; **তু**—কিন্তু; **এতৎ**—এই; **অভ্যসূয়ন্তঃ**—মাৎসর্যবশত; **ন**—না; **অনুতিষ্ঠন্তি**—নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠান করে; **মে**—আমার; **মতম্**—নির্দেশ; **সর্বজ্ঞান**—সর্বপ্রকার জ্ঞানে; **বিমূঢ়ান্**—বিমূঢ়; **তান্**—তাদেরকে, **বিদ্ধি**—জানবে; **নষ্টান্**—বিনষ্ট; **অচেতসঃ**—কৃষ্ণভক্তিহীন।

গীতার গান

প্রকৃতিসদৃশ চেষ্টা করে গুণবান ।
প্রকৃতির বশে সর্ব কার্য অনুষ্ঠান ॥

অনুবাদ

কিন্তু যারা অসূয়াপূর্বক আমার এই উপদেশ পালন করে না, তাদেরকে সমস্ত জ্ঞান থেকে বঞ্চিত, বিমূঢ় এবং পরমার্থ লাভের সকল প্রচেষ্টা থেকে ভ্রষ্ট বলে জানবে।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনাময় না হওয়ার ক্ষতি সম্পর্কে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে সর্বোচ্চ কর্মকর্তার নির্দেশ মানতে অবাধ্যতা করলে যেমন শাস্তি হয়, তেমনই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের নির্দেশ অমান্য করলেও নিশ্চয়ই শাস্তি আছে। অমান্যকারী লোক, তা সে যতই উচ্চ স্তরের হোক, তার কাণ্ডজ্ঞানহীন বুদ্ধি-বিবেচনার জন্য, তার নিজের স্বরূপ সম্পর্কে, এমন কি পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা ও পরম পুরুষোত্তম ভগবানের স্বরূপ সম্পর্কেও সে অজ্ঞ। সুতরাং তার জীবনের পূর্ণতা লাভের কোনই আশা নেই।

শ্লোক ৩৩

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি ।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥

সদৃশম্—অনুরূপভাবে; **চেষ্টতে**—চেষ্টা করে; **স্বস্যাঃ**—স্বীয়; **প্রকৃতেঃ**—প্রকৃতির গুণ; **জ্ঞানবান্**—জ্ঞানবান; **অপি**—যদিও; **প্রকৃতিম্**—স্বভাবকে; **যান্তি**—অনুগমন করেন; **ভূতানি**—সমস্ত জীব; **নিগ্রহঃ**—দমন; **কিম্**—কি; **করিষ্যতি**—করতে পারে।

গীতার গান

বহুকাল হতে যারা প্রকৃতির বশ ।
নিগ্রহ করিতে নারে হইয়া বিবশ ॥

অনুবাদ

জ্ঞানবান ব্যক্তিও তাঁর স্বভাব অনুসারে কার্য করেন, কারণ প্রত্যেকেই ত্রিগুণজাত তাঁর স্বীয় স্বভাবকে অনুগমন করেন। সুতরাং নিগ্রহ করে কি লাভ হবে?

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনার অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত না হতে পারলে জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। ভগবদ্‌গীতার সপ্তম অধ্যায়ে (৭/১৪) ভগবান সেই কথা প্রতিপন্ন করেছেন। তাই, এমন কি উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষেও কেবলমাত্র শাস্ত্রগত জ্ঞান অথবা দেহ থেকে আত্মাকে পৃথক করেও মায়ার বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসা অসম্ভব। বহু তথাকথিত তত্ত্ববিদ্ আছে, যারা ভগবৎ-তত্ত্বদর্শন লাভ করার অভিনয় করে, কিন্তু অন্তর তাদের সম্পূর্ণভাবে মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন। তারা সম্পূর্ণভাবে মায়ার গুণের দ্বারা আবদ্ধ। পুঁথিগত বিদ্যায় কেউ খুব পারদর্শী হতে পারে, কিন্তু বহুকাল ধরে মায়াজালে আবদ্ধ থাকার ফলে সে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না। জীব সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে কেবল মাত্র কৃষ্ণভাবনার প্রভাবে এবং এই কৃষ্ণচেতনা থাকলে সংসার-ধর্ম পালন করেও জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তাই, ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ না করে হঠাৎ ঘর-বাড়ি ছেড়ে, তথাকথিত যোগী অথবা কৃত্রিম পরমার্থবাদী সেজে বসলে কোনই লাভ হয় না। তার থেকে বরং নিজ নিজ আশ্রমে অবস্থান করে কোন তত্ত্ববেত্তার নির্দেশে কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করার চেষ্টা করা উচিত। এভাবেই ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার ফলে মানুষ মায়ামুক্ত হতে পারে।

শ্লোক ৩৪

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪ ॥

ইন্দ্রিয়স্য—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের; **ইন্দ্রিয়স্য অর্থে**—ইন্দ্রিয়-বিষয়সমূহে; **রাগ**—আসক্তি; **দ্বেষৌ**—বিদ্বেষ; **ব্যবস্থিতৌ**—বিশেষভাবে অবস্থিত; **তয়োঃ**—তাদের; **ন**—নয়; **বশম্**—বশীভূত; **আগচ্ছেৎ**—হওয়া উচিত ; **তৌ**—তাদের; **হি**—অবশ্যই; **অস্য**—তার; **পরিপন্থিনৌ**—প্রতিবন্ধক।

গীতার গান

অতএব ইন্দ্রিয়ার্থে রাগ দ্বেষ ছাড়ি ।
বিষয়েতে রাগ দ্বেষ কিছু নাহি করি ॥
তাহার বশেতে নিজে কভু না রহিবা ।
অনাসক্ত বিষয়েতে মাধবের সেবা ॥

অনুবাদ

সমস্ত জীবই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুতে আসক্তি অথবা বিরক্তি অনুভব করে, কিন্তু এভাবে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের বশীভূত হওয়া উচিত নয়, কারণ তা পারমার্থিক প্রগতির পথে প্রতিবন্ধক।

তাৎপর্য

যাদের মনে কৃষ্ণভাবনার উদয় হয়েছে, তাদের আর জড়-জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের বাসনা থাকে না। কিন্তু যাদের চেতনা শুদ্ধ হয়নি, তাদের কর্তব্য হচ্ছে শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করা। তা হলেই পরমার্থ সাধনের পথে অগ্রসর হওয়া যায়। উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে বিষয়ভোগ করার ফলে মানুষ জড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, কিন্তু শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করলে আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের দ্বারা আবদ্ধ হতে হয় না। যেমন, যোনিসম্ভোগ করার বাসনা প্রতিটি বদ্ধ জীবাত্মার মধ্যেই থাকে, তাই শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বিবাহ করে দাম্পত্য জীবন যাপন করতে। বিবাহিত স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে অবৈধ সঙ্গ করতে শাস্ত্রে নিষেধ করা হয়েছে এবং অন্য সমস্ত স্ত্রীলোককে মাতৃজ্ঞানে শ্রদ্ধা করতে বলা হয়েছে। কিন্তু শাস্ত্রে এই সমস্ত নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও মানুষ তা অনুসরণ করতে চায় না, ফলে সে জড় বন্ধনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে পারে না । এই ধরনের বিকৃত বাসনাগুলি দমন করতে হবে, তা না হলে সেগুলি আত্ম-উপলব্ধির পথে দুরতিক্রম্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। জড় দেহটি যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ তার প্রয়োজনগুলিও মেটাতে হবে, কিন্তু তা

করতে হবে শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ অনুসরণ করার মাধ্যমে। আর তা সত্ত্বেও আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, যাতে কোন রকম দুর্ঘটনা না ঘটে। রাজপথে যেমন দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে, তেমনই শাস্ত্রের বিধি-নিষেধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও পথভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে। বহুকাল ধরে এই জড়া প্রকৃতির সংসর্গের ফলে আমাদের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল। তাই, নিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করলেও প্রতি পদক্ষেপে অধঃপতিত হবার সম্ভাবনা থাকে। তাই নিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয় উপভোগের আসক্তিও সর্বতোভাবে বর্জনীয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভালবেসে তাঁর সেবায় ব্রতী হলে, অচিরেই আমরা জড় সুখভোগ করার বাসনা থেকে মুক্ত হতে পারি। তাই, কোন অবস্থাতেই ভগবানের সেবা থেকে বিরত হওয়া উচিত নয়। ইন্দ্রিয়সুখ বর্জন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করা, তাই কোন অবস্থাতেই তা পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

শ্লোক ৩৫

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫ ॥

শ্রেয়ান্—শ্রেষ্ঠ; **স্বধর্মঃ**—স্বধর্ম; **বিগুণঃ**—দোষযুক্ত; **পরধর্মাৎ**—অন্যের জন্য নির্দিষ্ট ধর্ম থেকে; **স্বনুষ্ঠিতাৎ**—উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত; **স্বধর্মে**—স্বধর্মে; **নিধনম্**—নিধন; **শ্রেয়ঃ**—ভাল; **পরধর্মঃ**—অন্যের ধর্ম; **ভয়াবহঃ**—বিপজ্জনক।

গীতার গান

নিজ ধর্ম শ্রেয় জান পরধর্মাপেক্ষা ।
ভগবদ্ সেবা লাগি কর্মযোগ শিক্ষা ॥
স্বধর্মে নিধন ভাল নহে পরধর্ম ।
ভাল করি বুঝ তুমি এই গূঢ় মর্ম ॥

অনুবাদ

স্বধর্মের অনুষ্ঠান দোষযুক্ত হলেও উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম থেকে উৎকৃষ্ট। স্বধর্ম সাধনে যদি মৃত্যু হয়, তাও মঙ্গলজনক, কিন্তু অন্যের ধর্মের অনুষ্ঠান করা বিপজ্জনক।

তাৎপর্য

পরধর্ম পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়ে, স্বধর্ম আচরণ করাই মানুষের কর্তব্য। জড়া প্রকৃতির গুণ অনুসারে শাস্ত্র-নির্দেশিত ধর্মাচরণগুলি মানুষের দেহমনের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নির্ধারিত হয়েছে। সদ্‌গুরু যে আদেশ দেন, তাই হচ্ছে পারমার্থিক কর্তব্য। এই কর্তব্য সম্পাদন করার মাধ্যমে আমরা শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত সেবা করে থাকি। কিন্তু জাগতিক অথবা পারমার্থিক যাই হোক না কেন, অন্যের ধর্ম অনুকরণ অপেক্ষা মৃত্যুকাল পর্যন্ত স্বধর্মে নিষ্ঠাবান থাকা প্রত্যেকের একান্ত কর্তব্য। জাগতিক স্তরের কর্তব্য এবং পারমার্থিক স্তরের কর্তব্য ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু সেগুলি সম্পাদন করা সব সময় মঙ্গলজনক। মানুষ যখন জড়া প্রকৃতির দ্বারা কবলিত থাকে, তখন তার কর্তব্য হচ্ছে, তার বিশেষ অবস্থার জন্য নির্দিষ্ট বিধান পালন করা এবং কোন অবস্থাতেই অপরকে অনুকরণ করা উচিত নয়। যেমন, সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত ব্রাহ্মণ হচ্ছেন অহিংসা-পরায়ণ, কিন্তু রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত ক্ষত্রিয় প্রয়োজন হলে হিংসার আশ্রয় নিতে পারেন। স্বধর্ম আচরণ করতে গিয়ে ক্ষত্রিয়কে যদি মৃত্যুবরণ করতে হয়, তাও ভাল, কিন্তু ব্রাহ্মণকে অনুকরণ করে অহিংসার আচরণ করা তার উচিত নয়। চিত্তবৃত্তির পরিশোধন করা সকলেরই কর্তব্য, কিন্তু তা সাধন করতে হয় ধীরে ধীরে—তাড়াহুড়ো করে নয়। তবে মানুষ যখন জড় গুণের প্রভাবমুক্ত হয়ে সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণচেতনা লাভ করেন, তখন তিনি যে কোন রকম আচরণ করতে পারেন, কিন্তু তাঁর সেই সমস্ত কর্ম অনুষ্ঠিত হয় সদ্‌গুরুর নির্দেশ অনুসারে। কৃষ্ণভাবনার সেই পূর্ণ স্তরে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মতো আচরণ করতে পারেন, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের মতো আচরণ করতে পারেন। অপ্রাকৃত স্তরে জড় জগতের গুণ অনুসারে স্তর-বিভাগ নেই। যেমন, ক্ষত্রিয় হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণের মতো আচরণ করেছিলেন; আবার ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও পরশুরাম ক্ষত্রিয়ের মতো আচরণ করেছিলেন। তাঁরা অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাই তাঁরা এভাবে আচরণ করতে পারতেন। কিন্তু মানুষ যখন প্রাকৃত স্তরে থাকে, তখন জড়া প্রকৃতির গুণ অনুসারে তাকে তার স্বধর্ম আচরণ করে সম্যক্‌ভাবে কৃষ্ণচেতনা লাভ করতে হয়।

শ্লোক ৩৬

অর্জুন উবাচ

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬ ॥

অর্জুনঃ উবাচ—অর্জুন বললেন; **অথ**—তবে; **কেন**—কার দ্বারা; **প্রযুক্তঃ**—প্রেরিত হয়ে; **অয়ম্**—এই; **পাপম্**—পাপ; **চরতি**—আচরণ করে; **পুরুষঃ**—মানুষ; **অনিচ্ছন্**—অনিচ্ছায়; **অপি**—যদিও; **বার্ষ্ণেয়**—হে বৃষ্ণি-বংশাবতংশ; **বলাৎ**—বলপূর্বক; **ইব**—যেন; **নিয়োজিতঃ**—নিয়োজিত।

গীতার গান

অর্জুন কহিলেন ঃ

হে বার্ষ্ণেয় কহ তুমি বুঝাইয়া মোরে ।
কি লাগি হয়েছে জীব যুক্ত পাপ ঘোরে ॥
অনিচ্ছা সত্ত্বেও হয় পাপে নিয়োজিত ।
অবশ হইয়া করে পাপ সে গর্হিত ॥

অনুবাদ

অর্জুন বললেন—হে বার্ষ্ণেয়! মানুষ কার দ্বারা চালিত হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন বলপূর্বক নিয়োজিত হয়েই পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়?

তাৎপর্য

ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ জীব মূলত চিন্ময়, পবিত্র ও সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত। তাই, সে জড় জগতের পাপের অধীন নয়। কিন্তু সে যখন জড় জগতের সংস্পর্শে আসে, তখন সে বিনা দ্বিধায় ইচ্ছাকৃতভাবে ও অনিচ্ছাকৃতভাবে নানা রকম পাপকার্যে লিপ্ত হয়। তাই, এখানে অর্জুন জীবদের এই বিকৃত স্বভাব সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণের কাছে যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, তা খুবই ন্যায়সঙ্গত। যদিও কখনও কখনও জীব পাপকর্ম করতে চায় না, তবুও সে পাপকর্ম করতে বাধ্য হয়। আমাদের দেহের মধ্যে অবস্থান করে পরমাত্মা কিন্তু আমাদের পাপকর্ম করতে অনুপ্রাণিত করেন না, কিন্তু তা সত্ত্বেও জীব পাপকার্যে লিপ্ত হয়। তার কারণ ভগবান পরবর্তী শ্লোকে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৩৭

শ্রীভগবানুবাচ

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **কামঃ**—কাম; **এষঃ**—এই; **ক্রোধঃ**—ক্রোধ; **এষঃ**—এই; **রজোগুণ**—রজোগুণ; **সমুদ্ভবঃ**—উদ্ভূত হয়; **মহাশনঃ**—সর্বগ্রাসী; **মহাপাপ্মা**— অত্যন্ত পাপী; **বিদ্ধি**—জানবে; **এনম্**—একে; **ইহ**—এই জড় জগতে; **বৈরিণম্**—প্রধান শত্রু।

গীতার গান

শ্রীভগবান কহিলেন ঃ
কাম আর ক্রোধ হয় রজোগুণ দ্বারা ।
অভিভূত বদ্ধজীব ত্রিজগতে সারা ॥
জ্ঞানী জীব এই দুই মহা শত্রু জানে ।
করে তাই গুণাতীত কার্য সাবধানে ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে অর্জুন! রজোগুণ থেকে সমুদ্ভূত কামই মানুষকে এই পাপে প্রবৃত্ত করে এবং এই কামই ক্রোধে পরিণত হয়। কাম সর্বগ্রাসী ও পাপাত্মক; কামকেই জীবের প্রধান শত্রু বলে জানবে।

তাৎপর্য

জীব যখন জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে আসে, তখন তার অন্তরের শাশ্বত কৃষ্ণপ্রেম রজোগুণের প্রভাবে কামে পর্যবসিত হয়। টক তেঁতুলের সংস্পর্শে দুধ যেমন দই হয়ে যায়, তেমনই ভগবানের প্রতি আমাদের অপ্রাকৃত প্রেম কামে রূপান্তরিত হয়। তারপর, কামের অতৃপ্তির ফলে হৃদয়ে ক্রোধের উদয় হয়; ক্রোধ থেকে মোহ এবং এভাবেই মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ার ফলে জীব জড় জগতের বন্ধনে স্থায়িভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাই, কাম হচ্ছে জীবের সব চাইতে বড় শত্রু। এই কামই শুদ্ধ জীবাত্মাকে এই জড় জগতে আবদ্ধ হয়ে থাকতে অনুপ্রাণিত করে। ক্রোধ হচ্ছে তমোগুণের প্রকাশ; এভাবে প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের প্রভাবে কাম, ক্রোধ আদি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ হয়। তাই, রজোগুণের প্রভাবকে তমোগুণে অধঃপতিত না হতে দিয়ে, যদি ধর্মাচরণ করার মাধ্যমে তাকে সত্ত্বগুণে উন্নীত করা যায়, তা হলে আমরা পারমার্থিক অনুশীলনের মাধ্যমে ক্রোধ আদি ষড় রিপুর হাত থেকে রক্ষা পেতে পারি।

ভগবান তাঁর নিত্য-বর্ধমান চিদানন্দের বিলাসের জন্য নিজেকে অসংখ্য মূর্তিতে বিস্তার করেন। জীব হচ্ছে এই চিন্ময় আনন্দের আংশিক প্রকাশ। ভগবান তাঁর অবিচ্ছেদ্য অংশ জীবকে আংশিক স্বাধীনতা দান করেছেন, কিন্তু যখন তারা সেই স্বাধীনতার অপব্যবহার করে এবং ভগবানের সেবা না করে নিজেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করতে শুরু করে, তখন তারা কামের কবলে পতিত হয়। ভগবান এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন যাতে বদ্ধ জীব তার এই কামোন্মুখী প্রবৃত্তিগুলিকে পূর্ণ করতে পারে। এভাবে তার সমস্ত কামনা-বাসনাগুলিকে চরিতার্থ করতে গিয়ে জীব যখন সম্পূর্ণভাবে দিশাহারা হয়ে পড়ে, তখন সে তার স্বরূপের অন্বেষণ করতে শুরু করে।

এই অন্বেষণ থেকেই *বেদান্ত-সূত্রের* সূচনা, যেখানে বলা হয়েছে, *অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা*—মানুষের কর্তব্য হচ্ছে পরমতত্ত্ব অনুসন্ধান করা। *শ্রীমদ্ভাগবতে* পরম-তত্ত্বকে বর্ণনা করে বলা হয়েছে—*জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চ*, অর্থাৎ "সব কিছুর উৎস হচ্ছেন পরমব্রহ্ম।" সুতরাং কামেরও উৎস হচ্ছেন ভগবান। তাই, যদি এই কামকে ভগবৎ-প্রেমে রূপান্তরিত করা যায়, অথবা কৃষ্ণভাবনায় উদ্বুদ্ধ করা যায়, কিংবা সব কিছু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত করা যায়, তা হলে কাম ও ক্রোধ উভয়ই অপ্রাকৃত চিন্ময়রূপ প্রাপ্ত হয়। এভাবেই কামের সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধও ভগবদ্ভক্তিতে রূপান্তরিত হয়। শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত হনুমান শ্রীরামচন্দ্রকে তুষ্ট করবার জন্য রাবণের স্বর্ণলঙ্কা দগ্ধ করেছিলেন এবং এভাবেই তিনি তাঁর ক্রোধকে শত্রুনিধন কার্যে প্রয়োগ করেছিলেন। এখানেও *ভগবদ্গীতায়*, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর সমস্ত ক্রোধ শত্রুবাহিনীর উপরে প্রয়োগ করে ভগবানেরই সন্তুষ্টি বিধানের কাজে লাগাতে উৎসাহ দিচ্ছেন। এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের কাম ও ক্রোধকে যখন আমরা ভগবানের সেবায় নিয়োগ করি, তখন তারা আর শত্রু থাকে না, আমাদের বন্ধুতে রূপান্তরিত হয়।

শ্লোক ৩৮

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

ধূমেন—ধূমের দ্বারা; **আব্রিয়তে**—আবৃত; **বহ্নিঃ**—আগুন; **যথা**—যেমন; **আদর্শঃ**—দর্পণ; **মলেন**—ময়লার দ্বারা; **চ**—ও; **যথা**—যেমন; **উল্বেন**—জরায়ুর দ্বারা; **আবৃতঃ**—আবৃত থাকে; **গর্ভঃ**—গর্ভ; **তথা**—তেমন; **তেন**—কামের দ্বারা; **ইদম্**—এই; **আবৃতম্**—আবৃত থাকে।

গীতার গান

ত্রিজগতে কাম মাত্র সর্ব আবরণ ।
আগুনেতে ধূম যথা ধূসর দর্শন ॥
অথবা জরায়ু যথা গর্ভ আবরণ ।
অল্পাধিক এই সব কামের কারণ ॥

অনুবাদ

অগ্নি যেমন ধূম দ্বারা আবৃত থাকে, দর্পণ যেমন ময়লার দ্বারা আবৃত থাকে অথবা গর্ভ যেমন জরায়ুর দ্বারা আবৃত থাকে, তেমনই জীবাত্মা বিভিন্ন মাত্রায় এই কামের দ্বারা আবৃত থাকে।

তাৎপর্য

জীবের শুদ্ধ চেতনা সাধারণত তিনটি আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে যায়। অগ্নি যেমন ধূমের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, দর্পণ যেমন ধুলোর দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে এবং গর্ভ যেমন জরায়ুর দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, জীবের শুদ্ধ চেতনাও তেমন কামের আবরণে আচ্ছাদিত থাকে। কামকে যখন ধূমের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তখন আমরা বুঝতে পারি যে, ধূম আগুনকে ঢেকে রাখলেও যেমন আগুনের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়, তেমনই কামের অন্তরালে শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনা উপলব্ধি করা যায়। পক্ষান্তরে বলা যায়, জীবের অন্তরে যখন অল্প-বিস্তর কৃষ্ণভাবনার প্রকাশ দেখা যায়, তখন আমরা বুঝতে পারি যে, ধূমাচ্ছাদিত অগ্নির মতো জীবের ভগবদ্ভক্তি কামের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে আছে। আগুনের প্রভাবেই ধূমের উৎপত্তি হয়, কিন্তু আগুন জ্বালাবার প্রথম পর্যায়ে আগুনকে দেখা যায় না। তেমনই, কৃষ্ণভাবনার প্রাথমিক পর্যায়েও বিশুদ্ধ, নির্মল ভগবৎ-প্রেম প্রকট হয়ে ওঠে না। দর্পণের ধুলো পরিষ্কার করার পর যেমন আবার তাতে সব কিছুর প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তেমনই, নানা রকম পারমার্থিক প্রচেষ্টার দ্বারা চিত্ত-দর্পণকে মার্জন করবার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে ভগবানের নাম সমন্বিত মহামন্ত্র উচ্চারণ করা। গর্ভের দ্বারা আচ্ছাদিত জরায়ুর সঙ্গে জীবের বদ্ধ অবস্থার তুলনার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে, এই অবস্থায় জীব কত অসহায়। জঠরস্থ শিশু নড়াচড়া পর্যন্ত করতে পারে না। জীবনের এই অবস্থাকে গাছের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। গাছেরাও জীব, কিন্তু প্রবল কামের বশবর্তী হয়ে পড়ার ফলে তারা এমন অবস্থায় পতিত হয়েছে যে, তাদের চেতনা প্রায় সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয়ে গেছে। ধুলোর দ্বারা আচ্ছাদিত দর্পণকে পশু-পক্ষীর সঙ্গে তুলনা করা যায়, আর ধূমাচ্ছাদিত অগ্নির সঙ্গে মানুষের তুলনা করা যায়। মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হলে জীব তার সুপ্ত কৃষ্ণচেতনাকে জাগিয়ে তুলতে পারে। ধূমাচ্ছাদিত আগুনকে খুব সাবধানতার সঙ্গে হাওয়া দিতে থাকলে, তা যেমন এক সময়ে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে, তেমনই খুব সন্তর্পণে ভক্তিযোগ অনুশীলন করার ফলে মানুষ তার অন্তরে ভগবদ্ভক্তির আগুন জ্বালিয়ে তুলতে পারে। এভাবেই মনুষ্য-জন্মের যথার্থ সদ্ব্যবহার করার ফলে জীব জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। মনুষ্যজন্ম লাভ করার ফলে জীব তার শত্রু কাম প্রবৃত্তিকে দমন করতে পারে আর তা সম্ভব হয় সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করার মাধ্যমে।

শ্লোক ৩৯

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা ।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯ ॥

আবৃতম্—আবৃত; **জ্ঞানম্**—শুদ্ধ চেতনা; **এতেন**—এর দ্বারা; **জ্ঞানিনঃ**—জ্ঞানীর; **নিত্যবৈরিণা**—চিরশত্রুর দ্বারা; **কামরূপেণ**—কামরূপ; **কৌন্তেয়**—হে কুন্তীপুত্র; **দুষ্পূরেণ**—অপূরণীয়; **অনলেন**—অগ্নির দ্বারা; **চ**—ও;

গীতার গান

এই নিত্য বৈরী করে জ্ঞান আবরণ ।
জীব তাহে বদ্ধ হয় নহে সাধারণ ॥
কাম হয় দুষ্পূরণ অগ্নির সমান ।
অতএব কাম লাগি হও সাবধান ॥

অনুবাদ

কামরূপী চির শত্রুর দ্বারা জীবের শুদ্ধ চেতনা আবৃত হয়। এই কাম দুর্বারিত অগ্নির মতো চিরঅতৃপ্ত।

তাৎপর্য

মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে যে, ঘি ঢেলে যেমন আগুনকে কখনও নেভানো যায় না, তেমনই কাম উপভোগের দ্বারা কখনই কামের নিবৃত্তি হয় না। জড় জগতে

সমস্ত কিছুর কেন্দ্র হচ্ছে যৌন আকর্ষণ, তাই জড় জগৎকে বলা হয় 'মৈথুনাগার' অথবা যৌন জীবনের শিকল। আমরা দেখেছি, অপরাধ করলে মানুষ কারাগারে আবদ্ধ হয়; তেমনই, যারা ভগবানের আইন অমান্য করে, তারাও যৌন জীবনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে এই মৈথুনাগারে পতিত হয়। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকে কেন্দ্র করে জড় সভ্যতার উন্নতি লাভের অর্থ হচ্ছে, বদ্ধ জীবদের জড় অস্তিত্বের বন্দীদশার মেয়াদ বৃদ্ধি করা। তাই, এই কাম হচ্ছে অজ্ঞানতার প্রতীক, যার দ্বারা জীবদের এই জড় জগতে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করার সময় সাময়িকভাবে সুখের অনুভূতি হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই তথাকথিত সুখই হচ্ছে জীবের পরম শত্রু।

শ্লোক ৪০

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে ।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০ ॥

ইন্দ্রিয়াণি—ইন্দ্রিয়গুলি; **মনঃ**—মন; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **অস্য**—এই কামের; **অধিষ্ঠানম্**—অধিষ্ঠান; **উচ্যতে**—বলা হয়; **এতৈঃ**—এদের দ্বারা; **বিমোহয়তি**—বিমোহিত হয়; **এষঃ**—এই কাম; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **আবৃত্য**—আবৃত করে; **দেহিনম্**—দেহাভিমানী জীবকে।

গীতার গান

সেই কাম অধিষ্ঠিত ইন্দ্রিয়াদি মনে ।
বুদ্ধিতে বসিয়া আঁকে নিখিল ভুবনে ॥
বদ্ধ জীব সে কারণ দেহ অভিমানী ।
স্বাতন্ত্র্যের ব্যবহার নাহি জানে জ্ঞানী ॥

অনুবাদ

ইন্দ্রিয়সমূহ, মন ও বুদ্ধি এই কামের আশ্রয়স্থল। এই ইন্দ্রিয় আদির দ্বারা কাম জীবের প্রকৃত জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে তাকে বিভ্রান্ত করে।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীবাত্মার দেহের ভিন্ন ভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশতে শত্রু অধিকার করে বসেছে, তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত অংশের কথা ইঙ্গিতে আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন, যাতে আমরা সেই শত্রুকে পরাভূত করতে পারি। ইন্দ্রিয় আদির সমস্ত কার্যকলাপের কেন্দ্র হচ্ছে মন, তাই মন হচ্ছে সমস্ত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার বাসনার কেন্দ্রস্থল। তাই যখন আমরা ইন্দ্রিয় উপভোগের কথা শুনি, তখন স্বভাবতই মন ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির সকল প্রকার চিন্তাভাবনার আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে; ও তারই ফলে মন ও ইন্দ্রিয়গুলি হয়ে ওঠে কামপ্রবৃত্তির আধার। এর পরে, বুদ্ধি বিভাগটি হয় এই সমস্ত কামপ্রবৃত্তির রাজধানী। বুদ্ধি হচ্ছে আত্মার সব চাইতে অন্তরঙ্গ প্রতিবেশী। এই বুদ্ধি যখন কামের দ্বারা উন্মত্ত হয়ে ওঠে, তখন সে আত্মাতে অহঙ্কারের সঞ্চার করে, যার ফলে আত্মা জড় ইন্দ্রিয় ও মনের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে জড়ের মাঝে তার স্বরূপ অন্বেষণ করে। জড় ইন্দ্রিয়-সুখকেই প্রকৃত সুখ বলে মনে করে আত্মা তখন তা উপভোগ করতে মত্ত হয়ে ওঠে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/৮৪/১৩) আত্মার এই আত্মবিস্মৃতিকে খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে—

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্
জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ ॥

"যে ত্রিধাতু সমন্বিত এই জড় দেহকে পরম প্রেমাস্পদ আত্মা, স্ত্রী-পুত্রাদিকে আত্মীয়, পার্থিব জন্মস্থানকে পূজনীয় মনে করে এবং তীর্থস্থানে গিয়ে কেবলমাত্র নদীতে স্নান সেরে চলে আসে, কিন্তু পারমার্থিক জ্ঞানসম্পন্ন সেখানকার মানুষদের সঙ্গে ভগবৎ-তত্ত্ব আলোচনা করে না, সে একটি গাধা অথবা গরু।"

শ্লোক ৪১

তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥ ৪১ ॥

তস্মাৎ—সেই হেতু; **ত্বম্**—তুমি; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়গুলি; **আদৌ**—প্রথমে; **নিয়ম্য**—নিয়ন্ত্রিত করে; **ভরতর্ষভ**—হে ভরতশ্রেষ্ঠ; **পাপ্মানম্**—পাপের প্রধান প্রতীক; **প্রজহি**—বিনাশ কর; **হি**—অবশ্যই; **এনম্**—এই; **জ্ঞান**—জ্ঞান; **বিজ্ঞান**—আত্মতত্ত্ববিজ্ঞান; **নাশনম্**—নাশক।

গীতার গান

অতএব হে ভারত! প্রথমেতে কাম ।
নিয়মিত করি হও সম্পূর্ণ নিষ্কাম ॥
ভক্তির ধারণ সেই কাম জয় জন্য ।
সে জ্ঞান বিজ্ঞাননাশী, নাহি পথ অন্য ॥

অনুবাদ

অতএব, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে জ্ঞান ও বিজ্ঞান-নাশক পাপের প্রতীকরূপ এই কামকে বিনাশ কর।

তাৎপর্য

ভগবান প্রথম থেকেই অর্জুনকে ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করবার উপদেশ দিয়েছেন যাতে তিনি পরম শত্রু কামকে জয় করতে পারেন, কারণ এই কামের প্রভাবে জীব আত্মজ্ঞান বিস্মৃত হয়ে তার স্বরূপ ভুলে যায়। এখানে জ্ঞান বলতে সেই জ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে, যে জ্ঞান আমাদের প্রকৃত স্বরূপের কথা মনে করিয়ে দেয়, অর্থাৎ যে জ্ঞান আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, আমাদের আত্মাই হচ্ছে আমাদের প্রকৃত স্বরূপ—আমাদের জড় দেহটি একটি আবরণ মাত্র। বিজ্ঞান বলতে সেই বিশেষ জ্ঞানকে বোঝায়, যা ভগবানের সঙ্গে আমাদের নিত্য সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দেয়। এর ব্যাখ্যা করে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/৯/৩১) বলা হয়েছে—

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্ বিজ্ঞানসমন্বিতম্ ।
সরহস্যং তদঙ্গং চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥

"আত্মজ্ঞান ও ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান পরম গোপনীয় ও গভীর রহস্যপূর্ণ, কিন্তু ভগবান যখন নিজে এই জ্ঞান বিশ্লেষণ করেন, তখন তা হৃদয়ঙ্গম করা যায়।" *ভগবদ্‌গীতা* আমাদেরকে আত্মতত্ত্ব সম্পর্কে সাধারণ ও বিশেষ জ্ঞান প্রদান করে। জীবেরা ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই তাদের ধর্ম হচ্ছে ভগবানের সেবা করা। এই উপলব্ধিকে বলা হয় কৃষ্ণভাবনামৃত। তাই, জীবনের শুরু থেকেই আমাদের উচিত কৃষ্ণভাবনায় উদ্বুদ্ধ হওয়া, যাতে আমরা সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণচেতনাময় হয়ে আমাদের জীবন সার্থক করে তুলতে পারি।

প্রতিটি জীবের অন্তরে যে ভগবৎ-প্রেম আছে, তারই বিকৃত প্রতিবিম্ব হচ্ছে কাম। কিন্তু জীবনের শুরু থেকেই যদি আমরা ভগবানকে ভালবাসতে শিখি, তা হলে আমাদের স্বাভাবিক ভগবৎ-প্রেম আর কামে পর্যবসিত হতে পারে না। ভগবৎ-প্রেম কামে বিকৃত হয়ে গেলে, তখন তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা অত্যন্ত কঠিন। তা সত্ত্বেও কৃষ্ণভাবনা এমনই শক্তিশালী যে, এমন কি জীবনের শেষ পর্যায়েও যদি কেউ গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে ভগবদ্ভক্তির বিধি-নিষেধগুলি অনুশীলন করে, তবে সে কৃষ্ণপ্রেম ফিরে পায়। তাই, জীবনের যে কোন পর্যায়ে কৃষ্ণভাবনার অনুশীলন শুরু করা যায়। যখন আমরা কৃষ্ণভাবনার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারি, ভগবদ্ভক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারি, জীবনের যে পর্যায়েই হোক, তখন থেকেই আমরা ভক্তিযোগের অনুশীলন করতে পারি এবং আমাদের পরম শত্রু কামকে কৃষ্ণপ্রেমে রূপান্তরিত করতে পারি। এটিই হচ্ছে মানব-জীবনের সর্বোত্তম পূর্ণতার স্তর।

শ্লোক ৪২

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥

ইন্দ্রিয়াণি—ইন্দ্রিয়সমূহ; **পরাণি**—শ্রেয়; **আহুঃ**—বলা হয়; **ইন্দ্রিয়েভ্যঃ**—ইন্দ্রিয়গুলি অপেক্ষা; **পরম্**—শ্রেয়; **মনঃ**—মন; **মনসঃ**—মনের থেকে; **তু**—ও; **পরা**—শ্রেয়; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **যঃ**—যিনি; **বুদ্ধেঃ**—বুদ্ধির থেকে; **পরতঃ**—শ্রেয়; **তু**—কিন্তু; **সঃ**—তিনি।

গীতার গান

বদ্ধজীব জড়বুদ্ধি ইন্দ্রিয় প্রধান ।
ইন্দ্রিয়াধিপতি মন কর্মের বিধান ॥
মন হতে পরবুদ্ধি তারপর আত্মা ।
অতএব কর সেবা সেই পরমাত্মা ॥

অনুবাদ

স্থূল জড় পদার্থ থেকে ইন্দ্রিয়গুলি শ্রেয়; ইন্দ্রিয়গুলি থেকে মন শ্রেয়; মন থেকে বুদ্ধি শ্রেয়; আর তিনি (আত্মা) সেই বুদ্ধি থেকেও শ্রেয়।

তাৎপর্য

কামের নানাবিধ কার্যকলাপের নির্গম পথ হচ্ছে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি। কামের সঞ্চয় হয় আমাদের দেহে, কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে তার বহিঃপ্রকাশ হয়। তাই, সামগ্রিকভাবে জড় দেহের থেকে ইন্দ্রিয়গুলি শ্রেয়। আমাদের অন্তরে যখন উচ্চস্তরের চেতনার বিকাশ হয় অথবা কৃষ্ণচেতনার বিকাশ হয়, তখন এই সমস্ত নির্গম পথগুলি বন্ধ হয়ে যায়। অন্তরে কৃষ্ণভাবনার উন্মেষ হলে পরমাত্মা বা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আত্মা তার নিত্য সম্পর্ক অনুভব করে, তাই তখন আর তার জড় দেহের অনুভূতি থাকে না। দেহগত কার্যকলাপগুলি হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ, তাই ইন্দ্রিয়গুলি নিষ্ক্রিয় হলে, দেহও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। কিন্তু সেই অবস্থায় মন সক্রিয় থাকে, যেমন নিদ্রিত অবস্থায় আমরা স্বপ্ন দেখি। কিন্তু মনেরও ঊর্ধ্বে হচ্ছে বুদ্ধি এবং বুদ্ধিরও ঊর্ধ্বে হচ্ছে আত্মা। তাই, আত্মা যখন পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়গুলি স্বাভাবিকভাবে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। ঠিক এভাবেই *কঠোপনিষদেও* বলা হয়েছে যে, ইন্দ্রিয় থেকে ইন্দ্রিয় উপভোগের সামগ্রীগুলি শ্রেয়, কিন্তু ইন্দ্রিয় উপভোগের সামগ্রীগুলি থেকে মন শ্রেয়। তাই, মন যদি সর্বতোভাবে নিরন্তর ভগবানের সেবায় নিয়োজিত থাকে, তখন ইন্দ্রিয়গুলির বিপদগামী হবার আর কোন সুযোগ থাকে না। এই মানসিক প্রবৃত্তির কথা পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। *পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে।* মন যদি ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় মগ্ন থাকে, তা হলে নিম্নগামী প্রবৃত্তিগুলিতে আকৃষ্ট হওয়ার কোন সম্ভাবনাই তার আর থাকে না। *কঠোপনিষদে* আত্মাকে *মহান্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই আত্মা হচ্ছে—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির ঊর্ধ্বে। তাই, আত্মার স্বরূপ সরাসরি উপলব্ধি করতে পারলে সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

বুদ্ধি দিয়ে আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হয়ে, মনকে কৃষ্ণচেতনায় নিযুক্ত করাই সকলের কর্তব্য। তা হলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। পরমার্থ সাধনে নবীন ভক্তকে সাধারণত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত বিষয় থেকে দূরে থাকতে উপদেশ দেওয়া হয়, কেন না তার ফলে ইন্দ্রিয়গুলি ধীরে ধীরে সংযত হয়। তা ছাড়া, বুদ্ধি দিয়েও মনকে তার সঙ্কল্পে দৃঢ় করতে হয়। বুদ্ধির দ্বারা যদি আমরা কৃষ্ণভাবনার মাধ্যমে ভগবানের চরণ-কমলে আত্মনিবেদন করি, তা হলে মন ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হয়ে একাগ্র হয়, তখন ইন্দ্রিয়ের প্রলোভনগুলি আর মনকে বিচলিত করতে পারে না। ইন্দ্রিয়গুলি তখন বিষদাঁতহীন সাপের মতো নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। কিন্তু আত্মা যদিও বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর, তবুও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ না করলে, যে কোন মুহূর্তে মনের প্রভাবে বিচলিত হয়ে আত্মা অধঃপতিত হতে পারে।

শ্লোক ৪৩

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা ।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৪৩ ॥

এবম্—এভাবে; **বুদ্ধেঃ**—বুদ্ধির; **পরম্**—পরতর; **বুদ্ধ্বা**—জেনে; **সংস্তভ্য**—স্থির করে; **আত্মানম্**—মনকে; **আত্মনা**—নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা; **জহি**—জয় করে; **শত্রুম্**—শত্রুকে; **মহাবাহো**—হে মহাবীর; **কামরূপম্**—কামরূপ; **দুরাসদম্**—দুর্জয়।

গীতার গান

অপ্রাকৃত বুদ্ধি দ্বারা কর দাস্য তার ।
ঘুচিবে সকল মোহ কাম ব্যবহার ॥
সেই সে উপায় এক শত্রু জিনিবার ।
কামরূপ দুরাসদ কেহ নাহি আর ॥

অনুবাদ

হে মহাবীর অর্জুন! নিজেকে জড় ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির অতীত জেনে, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা মনকে স্থির কর এবং এভাবেই চিৎ-শক্তির দ্বারা কামরূপ দুর্জয় শত্রুকে জয় কর।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার এই তৃতীয় অধ্যায়ে আমাদের স্বরূপ যে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের নিত্যকালের দাস, সেই সত্য উপলব্ধি করতে পেরে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই অধ্যায়ে ভগবান বিশদভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, নির্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হওয়া জীবনের চরম উদ্দেশ্য নয়। জড় জীবনে আমরা স্বাভাবিকভাবে কাম-প্রবৃত্তি ও জড়া প্রকৃতিকে ভোগ করবার প্রবৃত্তির দ্বারা প্রলোভিত হই। কিন্তু জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করা এবং জড় ইন্দ্রিয় উপভোগ করার বাসনা হচ্ছে বদ্ধ জীবের পরম শত্রু। কিন্তু কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করার ফলে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত রাখতে পারি। আমাদের প্রবৃত্তিগুলিকে মুহূর্তের মধ্যে সংযত করা সম্ভব নয়, কিন্তু আমাদের অন্তরে কৃষ্ণভাবনার বিকাশ হবার ফলে আমরা অপ্রাকৃত স্তরে উন্নীত হতে পারি, বুদ্ধির দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের শ্রীচরণারবিন্দে একাগ্র করতে পারি। এটিই

হচ্ছে এই অধ্যায়ের মর্মার্থ। জড় জীবনের অপরিণত অবস্থায়, নানা রকম দার্শনিক জল্পনা-কল্পনা এবং তথাকথিত যৌগিক ক্রিয়ার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়-সংযমের প্রচেষ্টার দ্বারা আমরা অপ্রাকৃত স্তরে উন্নীত হবার যতই চেষ্টা করি না কেন, পারমার্থিক জীবনধারার অগ্রগতির ক্ষেত্রে সেই সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। উন্নত বুদ্ধিযোগের দ্বারা কৃষ্ণভাবনার অমৃত লাভ করলেই পারমার্থিক উদ্দেশ্য সাধিত হবে।

ভক্তিবেদান্ত কহে শ্রীগীতার গান ।
শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ ॥

ইতি—কৃষ্ণভাবনাময় কর্তব্যকর্ম সম্পাদন বিষয়ক 'কর্মযোগ' নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়

জ্ঞানযোগ

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্ ।
বিবস্বান্মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ **উবাচ**—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **ইমম্**—এই; **বিবস্বতে**—সূর্যদেবকে; যোগম্—ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান; **প্রোক্তবান্**—বলেছিলাম; অহম্—আমি; **অব্যয়ম্**—অব্যয়; **বিবস্বান্**—বিবস্বান (সূর্যদেবের নাম); **মনবে**—মানবজাতির জনক বৈবস্বত মনুকে; **প্রাহ**—বলেছিলেন; **মনুঃ**—মনু; **ইক্ষ্বাকবে**—মহারাজ ইক্ষ্বাকুকে; **অব্রবীৎ**—বলেছিলেন।

গীতার গান

ভগবান কহিলেন ঃ

পূর্বে আমি বলেছিলাম, সূর্যকে প্রথম ।
এই সে নিষ্কাম কর্ম অপূর্ব কথন ॥
সূর্য বলেছিল পরে মনুকে স্বপুত্রে ।
ইক্ষ্বাকু শুনিল পরে পরম্পরা সূত্রে ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—আমি পূর্বে সূর্যদেব বিবস্বানকে এই অব্যয় নিষ্কাম কর্মসাধ্য জ্ঞানযোগ বলেছিলাম। সূর্য তা মানবজাতির জনক মনুকে বলেছিলেন এবং মনু তা ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে ভগবান *ভগবদ্গীতার* ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। বহু প্রাচীনকালে সূর্যলোক আদি বিভিন্ন গ্রহলোকের রাজাদের ভগবান এই জ্ঞান দান করেন। সমস্ত গ্রহলোকের রাজাদের বিশেষ কর্তব্য হচ্ছে প্রজাপালন করা এবং সেই জন্য তাঁদের সকলেরই *ভগবদ্গীতার* বিজ্ঞান সম্পর্কে পূর্ণভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন, যাতে তাঁদের প্রজাদের পারমার্থিক লক্ষ্যের দিকে তাঁরা পরিচালিত করতে পারেন। তাই ভগবানের কৃপায় এই জ্ঞান লাভ করে প্রাচীনকালের রাজারা মানুষকে কামনা-বাসনার জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হবার পথ প্রদর্শন করতেন। মানব-জীবনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে পারমার্থিক জ্ঞানের অনুশীলন করা এবং ভগবানের সঙ্গে তার যে নিত্য সম্পর্ক রয়েছে, সেই সম্বন্ধে অবগত হওয়া। তাই,. সকল গ্রহলোকের ও সকল রাষ্ট্রের শাসকবর্গের কর্তব্য হচ্ছে, শিক্ষার মাধ্যমে, সংস্কৃতির মাধ্যমে ও ভক্তির মাধ্যমে জনগণকে এই জ্ঞান বিতরণ করা। পক্ষান্তরে বলা যায়, সকল রাষ্ট্রের কর্ণধার এবং সমাজের নেতাদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে, কৃষ্ণভাবনার অমৃত বিজ্ঞান সকলের কাছে বিতরণ করা, যাতে প্রতিটি মানুষ এই মহাবিজ্ঞানের সুফল অর্জন করতে পারে এবং মানব-জীবনের সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগিয়ে সাফল্যের পথে অনুসরণ করতে পারে।

এই মহাকাল কল্পে সূর্যদেবের নাম বিবস্বান, তিনিই হচ্ছেন সূর্যলোকের অধীশ্বর। এই সূর্য থেকেই সৌরজগতের সমস্ত গ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। *ব্রহ্মসংহিতাতে* (৫/৫২) বলা হয়েছে—

যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহাণাং
রাজা সমস্তসুরমূর্তিরশেষতেজাঃ ।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভৃতকালচক্রো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

ব্রহ্মা বলেছেন, "সমস্ত গ্রহের রাজা, অশেষ তেজোবিশিষ্ট, সুরমূর্তি সবিতা বা সূর্য জগতের চক্ষুস্বরূপ। তিনি যাঁর আজ্ঞায় কালচক্রারূঢ় হয়ে ভ্রমণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে (শ্রীকৃষ্ণকে) আমি ভজন করি।"

সূর্য হচ্ছেন গ্রহগুলির রাজা এবং বর্তমানে সূর্যদেব বিবস্বান সূর্যগ্রহকে পরিচালনা করছেন। এই সূর্যগ্রহ সমস্ত গ্রহগুলিকে তাপ ও আলোক দান করে সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশ অনুসারে সূর্য তাঁর কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছেন। এই সূর্যদেবকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অহৈতুকী কৃপার ফলে প্রথম শিষ্যরূপে গ্রহণ করে *ভগবদ্গীতার* জ্ঞান দান করেন। এই থেকে আমরা বুঝতে পারি, *ভগবদ্গীতা* প্রাকৃত পণ্ডিতদের জল্পনা-কল্পনার সামগ্রী নয়, *গীতা* স্মরণাতীত কাল থেকে প্রবাহিত হয়ে আসা ভগবানের মুখ-নিঃসৃত বাণী।

মহাভারতের শান্তিপর্বে (৩৪৮/৫১-৫২) আমরা *ভগবদ্গীতার* ইতিহাসের উল্লেখ পাই—

ত্রেতাযুগাদৌ চ ততো বিবস্বান্ মনবে দদৌ ।
মনুশ্চ লোকভৃত্যর্থং সুতায়েক্ষ্বাকবে দদৌ ।
ইক্ষ্বাকুণা চ কথিতো ব্যাপ্য লোকানবস্থিতঃ ॥

"ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে বিবস্বান মনুকে ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান দান করেন। মানব-সমাজের পিতা মনু এই জ্ঞান তাঁর পুত্র সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর এবং রঘুবংশের জনক ইক্ষ্বাকুকে দান করেন। এই রঘুবংশে শ্রীরামচন্দ্র আবির্ভূত হন।" সুতরাং, *ভগবদ্গীতা* মহারাজ ইক্ষ্বাকুর সময় থেকেই মানব-সমাজে বর্তমান।

এই পৃথিবীতে এখন কলিযুগের পাঁচ হাজার বছর চলছে। কলিযুগের স্থায়িত্ব ৪,৩২,০০০ বছর। এর আগে ছিল দ্বাপরযুগ (৮,০০,০০০ বছর) এবং তার আগে ছিল ত্রেতাযুগ (১২,০০,০০০ বছর)। এভাবে প্রায় ২০,০৫,০০০ বছর আগে মনু তাঁর পুত্র এই পৃথিবীর অধীশ্বর ইক্ষ্বাকুকে এই *ভগবদ্গীতার* জ্ঞান দান করেন। বর্তমান মনুর আয়ু ৩০,৫৩,০০,০০০ বছর, তার মধ্যে ১২,০৪,০০,০০০ অতিবাহিত হয়েছে। আমরা যদি মনে করি, মনুর জন্মের সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিবস্বানকে *ভগবদ্গীতার* জ্ঞান দান করেছিলেন, তা হলেও *গীতা* প্রথমে বলা হয় ১২,০৪,০০,০০০ বছর আগে এবং মানব-সমাজে এই জ্ঞান প্রায় ২০,০০,০০০ বছর ধরে বর্তমান। পাঁচ হাজার বছর আগে ভগবান এই জ্ঞান পুনরায় অর্জুনকে দান করেন। *গীতার* বক্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা অনুযায়ী এই হচ্ছে *গীতার* ইতিহাস। ভগবান সর্বপ্রথম এই জ্ঞান বিবস্বানকে দান করেন, কারণ বিবস্বানও হচ্ছেন একজন ক্ষত্রিয় এবং সূর্যবংশজাত সমস্ত ক্ষত্রিয়ের তিনিই হচ্ছেন আদি পিতা। ভগবানের কাছ থেকে আমরা *ভগবদ্গীতা* প্রাপ্ত হয়েছি বলে *ভগবদ্গীতা* *বেদেরই* মতো পরম তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত—এই জ্ঞান অপৌরুষেয়। বৈদিক জ্ঞানকে যেমন যথানুরূপভাবে গ্রহণ করতে হয়, মানুষের কল্পনাপ্রসূত ব্যাখ্যা সেখানে প্রযোজ্য হয় না, *ভগবদ্গীতাও* তেমনই জড় বুদ্ধিপ্রসূত ব্যাখ্যার কলুষমুক্ত অবস্থায় গ্রহণ

করতে হবে। প্রাকৃত তার্কিকেরা ভগবানের দেওয়া *ভগবদ্গীতার* উপর তাদের পাণ্ডিত্য জাহির করার চেষ্টা করে, কিন্তু তা যথাযথ *ভগবদ্গীতা* নয়। *ভগবদ্গীতার* যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করতে হয় গুরু-পরম্পরার ধারায় এবং এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবান এই জ্ঞান প্রথমে বিবস্বানকে দান করেন। বিবস্বান তা দেন মনুকে, মনু ইক্ষ্বাকুকে—এভাবেই গুরু-শিষ্য পরম্পরাক্রমে এই জ্ঞান প্রবাহিত হয়ে আসছে।

শ্লোক ২

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২ ॥

এবম্—এভাবে; **পরম্পরা**—পরম্পরাক্রমে; **প্রাপ্তম্**—প্রাপ্ত; **ইমম্**—এই বিজ্ঞান; **রাজর্ষয়ঃ**—রাজর্ষিরা; **বিদুঃ**—বিদিত হয়েছিলেন; **সঃ**—সেই জ্ঞান; **কালেন**—কালের প্রভাবে; **ইহ**—এই জগতে; **মহতা**—সুদীর্ঘ; **যোগঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ জ্ঞান সমন্বিত বিজ্ঞান; **নষ্টঃ**—বিনষ্ট; **পরন্তপ**—হে শত্রু দমনকারী অর্জুন।

গীতার গান

সেই পরম্পরা দ্বারা রাজর্ষিগণ ।
একে একে শুনে সব গীতার বচন ॥
কালক্রমে পরম্পরা হয়েছে বিনষ্ট ।
পরম্পরা বিনা জ্ঞান সব অর্থ ভ্রষ্ট ॥

অনুবাদ

এভাবেই পরম্পরা মাধ্যমে প্রাপ্ত এই পরম বিজ্ঞান রাজর্ষিরা লাভ করেছিলেন। কিন্তু কালের প্রভাবে পরম্পরা ছিন্ন হয়েছিল এবং তাই সেই যোগ নষ্টপ্রায় হয়েছে।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, *গীতা* রাজর্ষিদের জন্যই বিশেষভাবে উদ্দিষ্ট হয়েছিল, কারণ প্রজাপালনের কাজে তাঁরা যথার্থভাবে এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য কার্যকরী করবেন। *ভগবদ্গীতার* অমৃতময় উপদেশ কখনই অসুরদের জন্য নয়। তারা

এই জ্ঞানকে গ্রহণ করতে অক্ষম এবং জনগণের সেবায় প্রয়োগ করতে অক্ষম। পক্ষান্তরে, তারা নিজেদের খেয়ালখুশি মতো ভগবানের দেওয়া এই দিব্য জ্ঞানের কদর্থ করে। এই সমস্ত মূঢ় দুরাচারীদের কদর্থ সমন্বিত মন্তব্যে *ভগবদ্গীতার* প্রকৃত উদ্দেশ্য যখন ব্যাহত হয়, তখন গুরু-শিষ্যের পরম্পরার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পাঁচ হাজার বছর আগে ভগবান স্বয়ং লক্ষ্য করেন যে, সেই গুরু-শিষ্য পরম্পরার ধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তাই তিনি ঘোষণা করেন যে, *গীতার* উদ্দেশ্যে হারিয়ে গেছে। আজকের জগতেও আমরা দেখতে পাই, *গীতার* অর্থ কিভাবে বিকৃত হয়ে গেছে—*গীতার* অনেক সংস্করণ আছে (বিশেষ করে ইংরেজী ভাষায়), কিন্তু তাদের মধ্যে প্রায় কোনটাই গুরু-পরম্পরার ধারা অনুযায়ী নয়। তথাকথিত সমস্ত পণ্ডিতেরা *গীতার* অসংখ্য ধরনের ব্যাখ্যা লিখে কৃষ্ণকথার নামে একটি ভাল ব্যবসা জাঁকিয়ে বসেছে, কিন্তু তাদের মধ্যে প্রায় কেউই পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্বীকার করে না। এটিই হচ্ছে আসুরিক প্রবৃত্তি। অসুরেরা কখনও ভগবানকে বিশ্বাস করে না, কিন্তু তারা কেবল ভগবানের সম্পত্তি ভোগ করার ব্যাপারে অত্যন্ত তৎপর। পরম্পরার ধারায় প্রাপ্ত *ভগবদ্গীতার* যথাযথ একটি ব্যাখ্যা প্রচার করার বিশেষ প্রয়োজন আছে, তা উপলব্ধি করে এই সংস্করণটি প্রকাশিত হয়েছে। *ভগবদ্গীতা* মানুষের প্রতি ভগবানের আশীর্বাদ, মানব-সমাজে এটি এক অমূল্য সম্পদ। এই গ্রন্থটিকে যথাযথভাবে গ্রহণ না করে, দার্শনিক জল্পনা-কল্পনামূলক নিবন্ধ মনে করলে, কেবল সময়েরই অপচয় করা হবে।

শ্লোক ৩

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩ ॥

সঃ—সেই; **এব**—অবশ্যই; **অয়ম্**—এই; **ময়া**—আমার দ্বারা; **তে**—তোমাকে; **অদ্য**—আজ; **যোগঃ**—যোগ-বিজ্ঞান; **প্রোক্তঃ**—বলা হল; **পুরাতনঃ**—অতি প্রাচীন; **ভক্তঃ**—ভক্ত; **অসি**—তুমি হও; **মে**—আমার; **সখা**—সখা; **চ**—ও; **ইতি**—অতএব; **রহস্যম্**—রহস্য; **হি**—অবশ্যই; **এতৎ**—এই; **উত্তমম্**—উত্তম।

গীতার গান

অতএব কহি পুনঃ সেই পুরাতন ।
পুনর্বার পরম্পরা করিতে স্থাপন ॥

ভক্তি বিনা কে বুঝিবে গীতার রহস্য ।
তুমি মোর প্রিয়সখা করহ বিমৃষ্য ॥

অনুবাদ

সেই সনাতন যোগ আজ আমি তোমাকে বললাম, কারণ তুমি আমার ভক্ত ও সখা এবং তাই তুমি এই বিজ্ঞানের অতি গূঢ় রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে।

তাৎপর্য

মানব-সমাজে দুই রকমের মানুষ আছে, তারা হচ্ছে ভক্ত ও অসুর। ভগবান অর্জুনকে *ভগবদ্গীতা* দান করতে মনস্থ করেছিলেন, কারণ অর্জুন ছিলেন তাঁর শুদ্ধ ভক্ত। অসুরেরা কখনই এই রহস্যাবৃত জ্ঞানের মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারে না। এই মহৎ শাস্ত্র *ভগবদ্গীতার* বহু সংস্করণ আছে, তাদের মধ্যে কোনটি ভক্তের মন্তব্য সমন্বিত, আর কোনটি অসুরের মন্তব্য সমন্বিত। ভক্তের মন্তব্য সমন্বিত *ভগবদ্গীতা* পড়লে অনায়াসে *গীতার* যথাযথ অর্থ উপলব্ধি করা যায় এবং তার ফলে ভগবানের মহত্ত্ব উপলব্ধি করতে পেরে হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হয়। কিন্তু অসুরের মন্তব্য পড়লে কোনই কাজ হয় না, উপরন্তু সর্বনাশ হয়। অর্জুন জানতেন, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান, তাই অর্জুনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব কারণের কারণ, পরমেশ্বর ভগবান বলে মেনে নিয়ে *ভগবদ্গীতাকে* হৃদয়ঙ্গম করলেই এই পরম বিজ্ঞানের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা অর্পণ করা হয়। অসুরেরা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে যথাযথভাবে গ্রহণ করে না। বরং তারা নানা রকম জল্পনা-কল্পনা করে শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় নির্ধারণ করতে চেষ্টা করে। তারা ভগবানের নানা রকম পরিচয়ও খুঁজে বার করে। এভাবেই তারা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে পথভ্রষ্ট করে এবং ভগবৎ-বিদ্বেষী করে তোলে। তাই আমাদের সাবধান হওয়া উচিত, যাতে এই সমস্ত অসুরেরা আমাদের আর অনিষ্ট না করতে পারে। আমাদের উচিত অর্জুনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে *ভগবদ্গীতার* মর্মার্থ উপলব্ধি করা এবং ভগবানের দেওয়া এই আশীর্বাদকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করে আমাদের মানবজন্ম সার্থক করে তোলা।

শ্লোক ৪

অর্জুন উবাচ

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ ।
কথমেতদ্ বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ ॥

অর্জুনঃ **উবাচ**—অর্জুন বললেন; **অপরম্**—পরবর্তী; **ভবতঃ**—তোমার; **জন্ম**—জন্ম; পরম্—পূর্বে; **জন্ম**—জন্ম; **বিবস্বতঃ**—সূর্যদেবের; **কথম্**—কিভাবে; **এতৎ**—এই; বিজানীয়াম্—আমি বুঝব; **ত্বম্**—তুমি; **আদৌ**—পুরাকালে; **প্রোক্তবান্**—বলেছিলে; ইতি—এভাবে।

গীতার গান

অর্জুন কহিলেন ঃ
তুমি ত নবীন সখা সেদিন জন্মিলে ।
কোটি কোটি বর্ষ পূর্বে সূর্য জন্ম নিলে ॥
এ কথা কি করে বুঝি পূর্ব এত দিনে ।
উপদেশ পুরাতন তুমি বলেছিলে ॥

অনুবাদ

অর্জুন বললেন—সূর্যদেব বিবস্বানের জন্ম হয়েছিল তোমার অনেক পূর্বে। তুমি যে পুরাকালে তাঁকে এই জ্ঞান উপদেশ করেছিলে, তা আমি কেমন করে বুঝব?

তাৎপর্য

অর্জুন হচ্ছেন ত্রিভুবন বিশ্রুত ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত; তা হলে এটি কি করে সম্ভব যে, তিনি ভগবানের কথা বিশ্বাস করছেন না? তার কারণ হচ্ছে, অর্জুন এই কথাগুলি তাঁর নিজের জন্য জিজ্ঞাসা করছেন না, কিন্তু যারা ভগবানকে বিশ্বাস করে না অথবা যে সমস্ত অসুরেরা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে মানতে চায় না, তাদের জন্য জিজ্ঞাসা করছেন। দশম অধ্যায়ে প্রমাণিত হবে যে, অর্জুন সব সময়ই জানতেন শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান, সব কিছুর উৎস এবং পরম-তত্ত্বের শেষ কথা। সাধারণ মানুষের পক্ষে এটি বুঝতে পারা খুবই কঠিন যে, বসুদেব ও দেবকীর সন্তান শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে অনন্ত শক্তির উৎস ও অনাদির আদিপুরুষ ভগবান হতে পারেন। তাই, অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন করছেন, যাতে তিনি নিজেই তাঁর পরিচয় দান করে সকলের সন্দেহের নিরসন করেন। শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান সেই কথা শুধু আজ নয়, পুরাকাল থেকে সমগ্র জগতের সকলেই বিশ্বাস করে আসছে, কিন্তু অসুরেরাই কেবল সেই সত্যকে মানতে চায় না। সে যাই হোক, শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু সর্বজনগ্রাহ্য প্রামাণ্য উৎস, সেই জন্য অর্জুন

এই প্রশ্নটি তাঁর কাছেই উপস্থাপন করেছিলেন যাতে তিনি নিজেই তার যথার্থ ব্যাখ্যা দিতে পারেন, অসুরদের কাছে ব্যাখ্যা শুনতে তিনি চাননি। কারণ, অসুরেরা সব সময়ে তাদের নিজেদের এবং অনুগামীদের বোধগম্য বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়েই শ্রীকৃষ্ণকে বোঝাতে চেয়েছে। প্রত্যেকেরই তার নিজের স্বার্থে শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কিত প্রকৃত তত্ত্ববিজ্ঞান জানা উচিত। তাই, ভগবান যখন নিজেই তাঁর অপ্রাকৃত পরিচয় দান করেন, তখন সমস্ত জগতের মঙ্গল হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেওয়া এই তত্ত্বজ্ঞান অসুরদের কাছে বিস্ময়কর বলে মনে হতে পারে, কারণ তারা অনাদি, অনন্ত ভগবৎ-তত্ত্বকে তাদের সীমিত মস্তিষ্কের পরিপ্রেক্ষিতে অনুমান করতে চায়; কিন্তু ভগবানের ভক্ত ভগবানের নিজের দেওয়া ভগবৎ-তত্ত্বকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করে কৃতার্থ হন। ভক্তবৃন্দ চিরকালই এই পরমতত্ত্ব গ্রহণে আগ্রহী, কারণ তাঁরা সর্বদা ভগবানের অনন্ত লীলা সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী। যারা নিরীশ্বরবাদী ভগবৎ-বিদ্বেষী, যারা মনে করে ভগবানও হচ্ছেন একজন সাধারণ মানুষ, তারাও এভাবেই শ্রীকৃষ্ণের লীলা শ্রবণ করে বুঝতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন অতি মানবিক, তাঁর রূপ সচ্চিদানন্দময়, তিনি অপ্রাকৃত, তিনি মায়াতীত ও গুণাতীত। ভগবানের ভক্ত মাত্রই অর্জুনের মতো সর্বান্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণকে বিশ্বাস করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর মনে কোন সন্দেহ থাকে না। অসুরেরা যে শ্রীকৃষ্ণকে জড়া প্রকৃতির গুণবৈশিষ্ট্যের অধীন একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে, তাদের সেই অবিশ্বাস জনিত যুক্তি খণ্ডন করার জন্যই অর্জুনের মতো শুদ্ধ ভক্তেরা ভগবানের কাছে তাঁর ভগবত্তা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তাঁদের মনে ভগবান সম্বন্ধে সন্দেহের কোন রকম অবকাশই থাকে না।

শ্লোক ৫

শ্রীভগবানুবাচ

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন ।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ ৫ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **বহূনি**—বহু; **মে**—আমার; **ব্যতীতানি**—অতীত হয়েছে; **জন্মানি**—জন্ম; **তব**—তোমার; **চ**—এবং; **অর্জুন**—হে অর্জুন; **তানি**—সেই সমস্ত; **অহম্**—আমি; **বেদ**—জানি; **সর্বাণি**—সমস্ত; **ন**—না; **ত্বম্**—তুমি; **বেত্থ**—জান; **পরন্তপ**—হে শত্রু দমনকারী।

গীতার গান

ভগবান কহিলেন ঃ

হে অর্জুন বহু জন্ম তোমার আমার ।
হয়েছে পূর্বকালে সে সব অপার ॥
ভুলি নাই আমি সেই তুমি ভুলে গেছ ।
আমি বিভু তুমি জীব এইভাবে আছ ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে পরন্তপ অর্জুন! আমার ও তোমার বহু জন্ম অতীত হয়েছে। আমি সেই সমস্ত জন্মের কথা স্মরণ করতে পারি, কিন্তু তুমি পার না।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতাতে (৫/৩৩) আমরা ভগবানের নানাবিধ অবতারের সম্বন্ধে জানতে পারি। সেখানে বলা হয়েছে—

অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপ-
মাদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ ।
বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি পরম পুরুষোত্তম ভগবান, আদিপুরুষ গোবিন্দের (শ্রীকৃষ্ণের) ভজনা করি, যিনি অদ্বৈত, অচ্যুত ও অনাদি। যদিও অনন্ত রূপে পরিব্যাপ্ত, তবুও তিনি সকলের আদি, পুরাণ-পুরুষ এবং তিনি সর্বদাই নব-যৌবনসম্পন্ন সুন্দর পুরুষ। যাঁরা শ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ, তাঁদের কাছেও ভগবানের সচ্চিদানন্দময় এই রূপ দুর্লভ, কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত সর্বক্ষণ ভগবানকে এই রূপে দর্শন করেন।"

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৯) আরও বলা হয়েছে—

রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু ।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি পরম পুরুষোত্তম ভগবান, আদিপুরুষ গোবিন্দের (শ্রীকৃষ্ণের) ভজনা করি,

যিনি শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীনৃসিংহদেব আদি বহুরূপে অবতরণ করেন, কিন্তু পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন তাঁর আদি স্বরূপ এবং তিনি স্বয়ং অবতরণও করেন।"

বেদেও বলা হয়েছে যে, যদিও ভগবান অদ্বৈত, তবুও তিনি অনন্ত রূপে প্রকাশিত হন। বৈদূর্যমণি থেকে যেমন নানা বর্ণ বিচ্ছুরিত হলেও তার নিজের কোন পরিবর্তন হয় না, ভগবানও তেমন নানারূপে প্রকাশিত হলেও তাঁর নিজের কোন পরিবর্তন হয় না। ভগবানের সেই অনন্ত রূপ *বেদ* অধ্যয়নের মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায় না, কিন্তু তাঁর শুদ্ধ ভক্তেরা তাঁর অনন্ত রূপের মর্ম উপলব্ধি করতে পারেন (*বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ*)। অর্জুনের মতো ভক্তেরা হচ্ছেন ভগবানের নিত্য সহচর। ভগবান যখন অবতরণ করেন, তখন তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তেরাও তাঁদের যোগ্যতা অনুযায়ী তাঁর সেবা করার জন্য তাঁর সঙ্গে অবতীর্ণ হন। অর্জুন হচ্ছেন সেই রকমই একজন ভক্ত। এই শ্লোকে বোঝা যায়, লক্ষ লক্ষ বছর আগে ভগবান যখন সূর্যদেব বিবস্বানকে *ভগবদ্‌গীতা* শোনান, তখন অর্জুনও অন্য কোন রূপে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ভগবানের সঙ্গে অর্জুনের পার্থক্য হচ্ছে যে, ভগবান তা ভোলেননি, কিন্তু অর্জুন তা ভুলে গেছেন। বিভুচৈতন্য ভগবানের সঙ্গে অণুচৈতন্য জীবের এটিই পার্থক্য। অর্জুন ছিলেন মহা শক্তিশালী বীর, তিনি ছিলেন পরন্তপ, কিন্তু তা হলেও বহু পূর্ব জন্মের কথা মনে রাখবার ক্ষমতা তাঁর নেই। তাই, ক্ষমতার মাপকাঠিতে জীব যত মহৎই হোক না কেন, সে কখনই ভগবানের সমতুল্য হতে পারে না। যিনি ভগবানের নিত্য সহচর, তিনি অবশ্যই একজন মুক্ত ব্যক্তি, কিন্তু তিনি কখনই ভগবানের সমকক্ষ হতে পারেন না। *ব্রহ্মসংহিতাতে* ভগবানকে অচ্যুত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, জড়-জগতে এলেও ভগবান মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কখনই আত্মবিস্মৃত হন না। তাই, জীব কখনই ভগবান হতে পারে না, এমন কি অর্জুনের মতো মুক্ত জীবও সকল বিষয়ে ভগবানের সমকক্ষ হতে পারেন না। অর্জুন যদিও ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, তবুও তিনি মাঝে মাঝে ভগবানের স্বরূপ বিস্মৃত হন, আবার ভগবানের দিব্য কৃপার ফলে ভক্ত মুহূর্তের মধ্যে ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করতে সমর্থ হন। কিন্তু অভক্ত বা অসুরেরা কখনই ভগবানের অপ্রাকৃত রূপ উপলব্ধি করতে পারে না। তারই ফলস্বরূপ *গীতায়* বর্ণিত ভগবানের এই দিব্য তত্ত্বকে আসুরিক বুদ্ধি দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর নিত্য সহচর অর্জুন উভয়েই নিত্য শাশ্বত, কিন্তু লক্ষ লক্ষ বছর আগে ভগবান যে লীলা প্রকট করেন, তা সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের মনে আছে, কিন্তু অর্জুনের মনে নেই। এই শ্লোকের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি, জীবের দেহান্তর হবার ফলে তার পূর্ণ বিস্মরণ ঘটে, কিন্তু ভগবান তাঁর সচ্চিদানন্দময় দেহ পরিবর্তন করেন না, তাই তিনি কিছুই ভোলেন না। তিনি অদ্বৈত অর্থাৎ তাঁর দেহ এবং তিনি স্বয়ং এক ও অভিন্ন। ভগবান সম্পর্কিত সব কিছুই চিন্ময়, কিন্তু জীবের স্বরূপ এবং তার জড় দেহ এক নয়। ভগবান যখন জড় জগতে অবতরণ করেন, তখনও তাঁর দেহ এবং তিনি স্বয়ং একই থাকেন। তাই, জড় জগতে অবতরণ করলেও তিনি জীবের থেকে স্বতন্ত্র থাকেন। ভগবানের এই অপ্রাকৃত তত্ত্ব অসুরেরা কিছুতেই বুঝতে পারে না। সেই কথা ভগবান পরবর্তী শ্লোকে বর্ণনা করছেন।

শ্লোক ৬

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্ ।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬ ॥

অজঃ—জন্মরহিত; **অপি**—যদিও; **সন্**—হয়েও; **অব্যয়**—অক্ষয়; **আত্মা**—দেহ; ভূতানাম্—জীবসমূহের; **ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর; **অপি**—যদিও; **সন্**—হয়ে; **প্রকৃতিম্**—চিন্ময় রূপে; **স্বাম্**—আমার; **অধিষ্ঠায়**—অধিষ্ঠিত হয়ে; **সম্ভবামি**—আবির্ভূত হই; **আত্মমায়য়া**—আমার অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা।

গীতার গান

সকলের নিয়ামক অজন্মা হইয়া ।
অব্যয়াত্মা পরমাত্মা ভুবন ভরিয়া ॥
তথাপি স্বশক্তি সাথে জন্ম লই আমি ।
সেই ভগবত্তা মোর ভাল বুঝ তুমি ॥

অনুবাদ

যদিও আমি জন্মরহিত এবং আমার চিন্ময় দেহ অব্যয় এবং যদিও আমি সর্বভূতের ঈশ্বর, তবুও আমার অন্তরঙ্গা শক্তিকে আশ্রয় করে আমি আমার আদি চিন্ময় রূপে যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

তাৎপর্য

ভগবান এখানে তাঁর আবির্ভাবের বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন—যদিও তিনি সাধারণ মানুষের মতো আবির্ভূত হন, তবুও তাঁর বহু বহু পূর্ব 'জন্মের' সমস্ত ঘটনাই

তাঁর মনে থাকে। কিন্তু সাধারণ মানুষ কয়েক ঘণ্টা পূর্বে কি ঘটেছিল, তা মনে রাখতে পারে না। যদি কাউকে জিজ্ঞেস করা হয়, একদিন আগে ঠিক একই সময়ে সে কি করেছিল, তবে সাধারণ লোকের পক্ষে সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তর দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। তাকে অনেক হিসাব-নিকাশ করে, স্মৃতি রোমন্থন করে, তবে মনে করতে হয় গত দিন ঠিক সেই সময়ে সে কি করেছিল, অথচ তারাই আবার ভগবান হবার দুরাশা পোষণ করে। এই ধরনের অর্থহীন দাবি শুনে কারও বিভ্রান্ত হওয়া ঠিক নয়। ভগবান এখানে তাঁর *প্রকৃতি* বা রূপের কথা ব্যাখ্যা করেছেন। *প্রকৃতি* বলতে 'স্বভাব' ও 'স্বরূপ' দুই-ই বোঝায়। ভগবান বলছেন, তিনি তাঁর চিন্ময় স্বরূপে আবির্ভূত হন। সাধারণ জীবদের মতো তিনি এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হন না। বদ্ধ জীবাত্মা এই জন্মে এক রকম দেহ ধারণ করতে পারে, কিন্তু পরবর্তী জন্মে সে ভিন্ন দেহ ধারণ করে। জড় জগতে জীবের দেহ স্থায়ী নয়, প্রকৃতপক্ষে সে প্রতিনিয়তই তার দেহ পরিবর্তন করছে। কিন্তু ভগবানকে দেহ পরিবর্তন করতে হয় না। যখন তিনি জড় জগতে আবির্ভূত হন, তখন তিনি তাঁর সচ্চিদানন্দময় দেহ নিয়েই আবির্ভূত হন। অর্থাৎ, তিনি যখন এই জড় জগতে আবির্ভূত হন, তখন তিনি তাঁর দ্বিভুজ, মুরলীধারী শাশ্বত রূপ নিয়েই আবির্ভূত হন। জড় জগতের কোন কলুষই তাঁর রূপকে স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু তিনি যদিও তাঁর অপ্রাকৃত রূপ নিয়ে এই জড় জগতে আবির্ভূত হন এবং সর্ব অবস্থাতেই তিনি সমস্ত জগতের অধীশ্বর থাকেন, তবুও তাঁর জন্মলীলা আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতোই বলে মনে হয়। তাঁর দেহ যদিও পরিবর্তন হয় না, তবুও তিনি শৈশব থেকে পৌগণ্ডে, পৌগণ্ড থেকে কিশোর এবং কৈশোর থেকে যৌবনে উত্তীর্ণ হন, কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে যৌবনের ঊর্ধ্বে তাঁর দেহের আর কোন রূপান্তর হয় না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় তাঁর অনেক পৌত্র ছিল, অর্থাৎ জাগতিক হিসাবে তাঁর তখন অনেক বয়স হয়েছিল, কিন্তু তাঁকে দেখে মনে হত যেন তিনি কুড়ি-পঁচিশ বছরের যুবক। যদিও শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সর্বকালীন আদিপুরুষ—সর্বপ্রাচীন পুরুষ, কিন্তু তাঁকে আমরা কোন অবস্থাতেই বৃদ্ধরূপে দেখি না, কোন ছবিতেও শ্রীকৃষ্ণকে বার্ধক্যগ্রস্ত অবস্থায় দেখা যায় না। কখনও তাঁর দেহের অথবা বুদ্ধির কোন রকম বিকার হয় না। তাই আমরা সহজেই বুঝতে পারি, এই জড় জগতে এসে সাধারণ মানুষের মতো লীলাখেলা করলেও তিনি চিরকালই অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাতন, আদিপুরুষ ও সচ্চিদানন্দময়। বাস্তবিকপক্ষে, তাঁর আবির্ভাব ও অন্তর্ধান সূর্যের মতো যেন আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন, তারপর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেন। আকাশে সূর্যকে দেখে যেমন আমরা মনে করি, সূর্য এখন আকাশে রয়েছে, তারপর আমাদের

দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলে যেমন আমরা মনে করি সূর্য এখন অস্ত গেছে। প্রকৃতপক্ষে সূর্য তার নির্দিষ্ট কক্ষপথে রয়েছে, কিন্তু আমাদের ত্রুটিপূর্ণ ইন্দ্রিয়ের প্রভাবে আমরা মনে করি যে, সূর্য উদিত হয় এবং অস্ত যায়। ভগবানও তেমন নিত্য। তাঁর আবির্ভাব ও অন্তর্ধান সাধারণ মানুষের জন্ম-মৃত্যুর মতো নয়, তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর থেকে আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারি, তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে ভগবান সৎ, চিৎ, আনন্দময়—এবং জড়া প্রকৃতির দ্বারা তিনি কখনই কলুষিত হন না। *বেদেও* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান অজ, কিন্তু তবুও মনে হয় তাঁর বহুধা প্রকাশরূপে তিনি যেন সাধারণ মানুষের মতো জন্মগ্রহণ করেছেন। সমস্ত বৈদিক অনুশাস্ত্রাদিতেও অনুমোদন করা হয়েছে যে, ভগবান যখন অবতরণ করেন, তখন জীবের মতো জন্মগ্রহণ করেন বলে মনে হলেও তিনি তাঁর অপ্রাকৃত ও অপরিবর্তনীয় দেহ নিয়েই অবতরণ করেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* আছে, কংসের কারাগারে তিনি চতুর্ভুজ ও ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ নারায়ণ রূপ নিয়ে তাঁর মায়ের সামনে আবির্ভূত হন। জীবদের প্রতি তাঁর অহৈতুকী কৃপার ফলেই তিনি তাঁর শাশ্বত আদি রূপ নিয়ে আবির্ভূত হন, যাতে তারা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি মনোনিবেশ করতে পারে—নির্বিশেষ রূপের প্রতি নয়, যা নির্বিশেষবাদীরা ভ্রান্তিবশত মনে করে থাকে। *মায়া* অথবা *আত্মমায়া* হচ্ছে ভগবানের সেই অহৈতুকী কৃপা—*বিশ্বকোষ* অভিধানে তাই বলা হয়েছে। ভগবান তাঁর পূর্ববর্তী সমস্ত অবতরণের এবং অন্তর্ধানের ঘটনাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মনে রাখেন। কিন্তু সাধারণ জীব অন্য একটি দেহ পাওয়া মাত্রই তার পূর্ব জন্মের সমস্ত কথা ভুলে যায়। ভগবান সমস্ত জীবের ঈশ্বর, কারণ এই জগতে অবস্থান করার সময় তিনি বিস্ময়কর ও অতিমানবীয় অসীম শৌর্যবীর্যের লীলা প্রদর্শন করেন। তাই, ভগবান সব সময়ই পরমতত্ত্ব। তাঁর নাম ও রূপের মধ্যে, গুণ ও লীলার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এখন আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, ভগবান কেন এই জড় জগতে আবির্ভূত হন এবং আবার অন্তর্হিত হয়ে যান। সেই কথা পরবর্তী শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

শ্লোক ৭

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

যদা যদা—যখন ও যেখানে; **হি**—অবশ্যই; **ধর্মস্য**—ধর্মের; **গ্লানিঃ**—হানি; **ভবতি**—হয়; **ভারত**—হে ভরতবংশীয়; **অভ্যুত্থানম্**—উত্থান; **অধর্মস্য**—অধর্মের; **তদা**—তখন; **আত্মানম্**—নিজেকে; **সৃজামি**—প্রকাশ করি; **অহম্**—আমি।

গীতার গান

যদা যদা ধর্মগ্লানি হইল সংসারে ।
হে ভারত! বিশ্বভার লঘু করিবারে ॥
অধর্মের অভ্যুত্থান ধর্মগ্লানি হলে ।
আত্মার সৃজন করি দেখয়ে সকলে ॥

অনুবাদ

হে ভারত! যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই।

তাৎপর্য

এখানে *সৃজামি* কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। *এই সৃজামি* কথাটি সৃষ্টি করার অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। কারণ, পূর্ববর্তী শ্লোক অনুযায়ী, ভগবানের সমস্ত রূপই নিত্য বিরাজমান, তাই ভগবানের রূপ বা শরীর কখনও সৃষ্টি হয় না। সুতরাং, *সৃজামি* মানে— ভগবানের যা স্বরূপ, সেভাবেই তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন। যদিও ব্রহ্মার একদিনে, সপ্তম মনুর অষ্ট-বিংশতি চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে ভগবান তাঁর স্বরূপে আবির্ভূত হন, কিন্তু প্রকৃতির কোন নিয়মকানুনের বন্ধনে তিনি আবদ্ধ নন। তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে লীলা করেন—তিনি হচ্ছেন *স্বরাট্*। তাই, যখন অধর্মের অভ্যুত্থান এবং ধর্মের গ্লানি হয়, তখন ভগবান তাঁর ইচ্ছা অনুসারে এই জড় জগতে অবতরণ করেন। ধর্মের তত্ত্ব *বেদে* নির্দেশিত হয়েছে এবং *বেদের* এই নির্দেশগুলির যথাযথ আচার না করাটাই হচ্ছে অধর্ম। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে, এই সমস্ত নির্দেশগুলি হচ্ছে ভগবানের আইন এবং ভগবান নিজেই কেবল ধর্মের সৃষ্টি করতে পারেন। *বেদ* ভগবানেরই বাণী এবং ব্রহ্মার হৃদয়ে তিনি এই জ্ঞান সঞ্চার করেন। তাই ধর্মের বিধান হচ্ছে সরাসরিভাবে ভগবানের আদেশ (*ধর্মং তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতম্*)। *ভগবদ্গীতার* সর্বত্রই এই তত্ত্বের বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবানের নির্দেশে এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে *বেদের* উদ্দেশ্য। *গীতার* শেষে ভগবান স্পষ্টভাবেই বলেছেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*— সর্ব ধর্ম ত্যাগি লও আমার শরণ। বৈদিক নির্দেশগুলি মানুষকে ভগবানের প্রতি পূর্ণ শরণাগত হতে সাহায্য করে। যখনই অসুরেরা অথবা আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা তাতে বাধার সৃষ্টি করে, তখন ভগবান আবির্ভূত হন। *শ্রীমদ্ভাগবত* থেকে

আমরা জানতে পারি, যখন জড়বাদে পৃথিবী ছেয়ে গিয়েছিল এবং জড়বাদীরা *বেদের* নাম করে যথেচ্ছাচার করছিল, তখন শ্রীকৃষ্ণের অবতার বুদ্ধদেব অবতরণ করেছিলেন। *বেদে* কোন কোন বিশেষ অবস্থায় পশুবলি দেবার বিধান আছে, কিন্তু আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা বৈদিক সিদ্ধান্ত অনুসরণ না করে নিজেদের ইচ্ছামতো পশুবলি দিতে শুরু করে। এই অনাচার দূর করে *বেদের* অহিংস নীতির প্রতিষ্ঠা করার জন্য ভগবান বুদ্ধ আবির্ভূত হয়েছিলেন। এভাবেই আমরা দেখতে পাই, ভগবানের সমস্ত অবতার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য এই জড় জগতে অবতরণ করেন এবং শাস্ত্রে তার উল্লেখ থাকে। শাস্ত্রের প্রমাণ না থাকলে কাউকে অবতার বলে গ্রহণ করা উচিত নয়। অনেকে আবার মনে করেন, ভগবান কেবল ভারত-ভূমিতেই অবতরণ করেন, কিন্তু এই ধারণাটি ভুল। তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যে কোন জায়গায়, যে কোন অবস্থায়, যে কোন রূপে অবতরণ করতে পারেন। প্রত্যেক অবতরণে তিনি ধর্ম সম্বন্ধে ততটুকুই ব্যাখ্যা করেন, যতটুকু সেই বিশেষ স্থান ও কালের মানুষেরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য একই থাকে—ধর্ম সংস্থাপন করা এবং মানুষকে ভগবন্মুখী করা। কখনও তিনি স্বয়ং আবির্ভূত হন, কখনও তিনি তাঁর সন্তান অথবা ভৃত্যরূপে তাঁর প্রতিনিধিকে প্রেরণ করেন, আবার কখনও তিনি ছদ্মবেশে অবতরণ করেন।

অর্জুনের মতো মহাভাগবতকে ভগবান *ভগবদ্গীতা* শুনিয়েছিলেন, কারণ *ভগবদ্গীতার* মর্মার্থ উন্নত বুদ্ধি-মত্তাসম্পন্ন মানুষেরাই কেবল বুঝতে পারে। দুই আর দুইয়ে চার হয়। এই আঙ্কিক তত্ত্ব একটি শিশুর কাছেও সত্য আবার একজন মহাপণ্ডিত গণিতজ্ঞের কাছেও সত্য, কিন্তু তবুও গণিতের স্তরভেদ আছে। প্রতিটি অবতারে ভগবান একই তত্ত্বজ্ঞান দান করেন, কিন্তু স্থান-কাল বিশেষে তাদের উচ্চ ও নিম্ন মানসম্পন্ন বলে মনে হয়। উচ্চ মানের ধর্ম অনুশীলন শুরু হয় বর্ণাশ্রম ধর্ম সমন্বিত সমাজ-ব্যবস্থার মাধ্যমে। ভগবানের অবতরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বত্র সকলকে কৃষ্ণভাবনায় উদ্বুদ্ধ করা। কেবলমাত্র অবস্থাভেদে সময়-সময় এই ভাবনার প্রকাশ ও অপ্রকাশ হয়।

শ্লোক ৮

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥

পরিত্রাণায়—পরিত্রাণ করার জন্য; **সাধূনাম্**—ভক্তদের; **বিনাশায়**—বিনাশ করার জন্য; **চ**—এবং; **দুষ্কৃতাম্**—দুষ্কৃতকারীদের; **ধর্ম**—ধর্ম; **সংস্থাপনার্থায়**—সংস্থাপনের জন্য; **সম্ভবামি**—অবতীর্ণ হই; **যুগে যুগে**—যুগে যুগে।

গীতার গান

সাধুদের পরিত্রাণ অসাধুর বিনাশ ।
যে করে অধর্ম তার করি সর্বনাশ ॥
আর ধর্ম স্থিতি অর্থ করিতে সাধন ।
যুগে যুগে আসি আমি মান সে বচন ॥

অনুবাদ

সাধুদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করার জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতা অনুসারে কৃষ্ণভাবনায় উদ্বুদ্ধ যে মানুষ, তিনি হচ্ছেন সাধু। কোন লোককে আপাতদৃষ্টিতে অধার্মিক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তাঁর অন্তরে তিনি যদি সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনাময় হন, তবে বুঝতে হবে তিনি সাধু। আর যারা কৃষ্ণভাবনাকে গ্রাহ্য করে না, তাদের উদ্দেশ্যে *দুষ্কৃতাম্* শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে। এই সমস্ত অসাধু বা দুষ্কৃতকারীরা লৌকিক বিদ্যায় অলঙ্কৃত হলেও এদের মূঢ় ও নরাধম বলা হয়। কিন্তু যিনি চব্বিশ ঘণ্টায় ভগবদ্ভক্তিতে নিয়োজিত, তিনি যদি মূর্খ এবং অসভ্যও হন, তবুও বুঝতে হবে যে তিনি সাধু। রাবণ, কংস আদি অসুরদের নিধন করার জন্য পরমেশ্বর ভগবান যেমনভাবে অবতরণ করেছিলেন, নিরীশ্বরবাদীদের বিনাশ করবার জন্য তাঁকে তেমনভাবে অবতরণ করতে হয় না। ভগবানের অনেক অনুচর আছেন, যাঁরা অনায়াসে অসুরদের সংহার করতে পারেন। কিন্তু ভগবানের অবতরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাঁর ভক্তদের শান্তিবিধান করা। অসুরেরা ভগবানের ভক্তদের নানাভাবে কষ্ট দেয়, তাঁদের উপর উৎপাত করে, তাই তাঁদের পরিত্রাণ করবার জন্য ভগবান অবতরণ করেন। অসুরের স্বভাবই হচ্ছে ভক্তদের উপর অত্যাচার করা, ভক্ত যদি তার পরমাত্মীয়ও হয়, তবুও সে রেহাই পায় না। প্রহ্লাদ মহারাজ ছিলেন হিরণ্যকশিপুর সন্তান, কিন্তু তা সত্ত্বেও হিরণ্যকশিপু তাঁকে নানাভাবে নির্যাতন করে। শ্রীকৃষ্ণের মাতা দেবকী ছিলেন কংসের ভগিনী,

কিন্তু তা সত্ত্বেও কংস তাঁকে এবং তাঁর পতি বসুদেবকে নানাভাবে নির্যাতিত করে, কারণ সে জানতে পেরেছিল যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের সন্তানরূপে আবির্ভূত হবেন। এর থেকে বোঝা যায়, কংসকে নিধন করাটা শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না, মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দেবকীকে উদ্ধার করা। কিন্তু এই দুটি কাজই একসঙ্গে সাধিত হয়েছিল। তাই ভগবান এখানে বলেছেন, সাধুদের পরিত্রাণ আর অসাধুর বিনাশ করবার জন্য তিনি অবতরণ করেন।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিম্নলিখিত (*মধ্য* ২০/২৬৩-২৬৪) শ্লোকগুলির মাধ্যমে ভগবানের অবতরণের মূলতত্ত্ব সংক্ষেপে উপস্থাপনা করেছেন—

সৃষ্টি-হেতু যেই মূর্তি প্রপঞ্চে অবতরে ।
সেই ঈশ্বরমূর্তি 'অবতার' নাম ধরে ॥
মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান ।
বিশ্বে অবতরি' ধরে 'অবতার' নাম ॥

"ভগবৎ-ধাম থেকে এই জড় জগতে প্রকট হবার ফলে ঈশ্বরমূর্তি অবতার নাম ধরে। এই অবতারেরা অপ্রাকৃত পরব্যোমে অবস্থান করেন। প্রাকৃত জগতে অবতরণ করার জন্য তাঁকে অবতার বলা হয়।"

ভগবানের অনেক রকম অবতার আছে, যেমন—পুরুষাবতার, গুণাবতার, লীলাবতার, শক্ত্যাবেশ অবতার, মন্বন্তর অবতার ও যুগাবতার। তাঁরা নির্ধারিত সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অবতরণ করেন। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত অবতারের উৎস—আদিপুরুষ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতরণ করেন তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের আর্তিহরণ এবং পরিতোষণ করবার জন্য, যাঁরা তাঁর শাশ্বত সনাতন শ্রীবৃন্দাবন-লীলায় তাঁকে দর্শন করবার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে থাকেন। তাই, শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের পরিতোষণ করা।

ভগবান এখানে বলেছেন, তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। এর থেকে বোঝা যায়, তিনি কলিযুগেও অবতরণ করেন। *শ্রীমদ্ভাগবতেও* বলা হয়েছে, কলিযুগের অবতার গৌরসুন্দর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সংকীর্তন যজ্ঞের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করবেন এবং সমগ্র ভারতবর্ষে ভগবদ্ভক্তি প্রচার করবেন। তিনি ভবিষ্যৎ-বাণী করে গেছেন—

পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম ।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ॥

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতরণের কথা *উপনিষদ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত* আদি শাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশে গুপ্তভাবে উল্লেখ আছে, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখ নেই। শ্রীকৃষ্ণের ভক্তেরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত সংকীর্তন যজ্ঞের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। ভগবানের এই অবতার দুষ্কৃতকারীদের সংহার করেন না,, বরং তিনি তাঁর অহৈতুকী কৃপায় ভবসাগর থেকে তাদের উদ্ধার করেন।

শ্লোক ৯

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥ ৯ ॥

জন্ম—জন্ম; **কর্ম**—কর্ম; **চ**—এবং; **মে**—আমার; **দিব্যম্**—দিব্য; **এবম্**—এভাবে; **যঃ**—যিনি; **বেত্তি**—জানেন; **তত্ত্বতঃ**—যথার্থভাবে; **ত্যক্ত্বা**—ত্যাগ করে; **দেহম্**—বর্তমান দেহ; **পুনঃ**—পুনরায়; **জন্ম**—জন্ম; **ন**—না; **এতি**—প্রাপ্ত হন; **মাম্**—আমাকে; **এতি**—প্রাপ্ত হন; **সঃ**—তিনি; **অর্জুন**—হে অর্জুন।

গীতার গান

আমার যে জন্মকর্ম সে অতি মহান ।
যে বুঝিল সেই কথা সেও ভাগ্যবান ॥
সে ছাড়িয়া দেহ এই নহে পুনর্জন্ম ।
মম ধামে ফিরি আসে ছাড়ে জড় ধর্ম ॥

অনুবাদ

হে অর্জুন! যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম ও কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্য ধাম লাভ করেন।

তাৎপর্য

পরব্যোম থেকে ভগবানের অবতরণের কথা ষষ্ঠ শ্লোকে ইতিমধ্যেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যিনি ভগবানের অবতরণের তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তিনি জড় জগতের বন্ধন থেকে ইতিমধ্যেই মুক্ত হয়েছেন এবং তাই দেহত্যাগ করার পর তিনি তৎক্ষণাৎ ভগবৎ-ধামে ফিরে যান। জড় বন্ধন থেকে এভাবে মুক্ত হওয়া

মোটেই সহজসাধ্য নয়। নির্বিশেষবাদী জ্ঞানী ও যোগীরা বহু জন্ম-জন্মান্তরের কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে এই মুক্তি লাভ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, ব্রহ্মজ্যোতিতে বিলীন হয়ে গিয়ে তারা যে মুক্তি লাভ করে, তা পূর্ণ মুক্তি নয়, তাদের পুনরায় এই জড় জগতে পতিত হবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু কৃষ্ণভক্ত, ভগবানের সচ্চিদানন্দময় দেহ ও তাঁর লীলার অপ্রাকৃতত্ব অনুভব করতে পেরে দেহত্যাগ করার পরে ভগবানের ধামে গমন করেন এবং তখন আর তাঁর জড় জগতে অধঃপতিত হবার কোনও সম্ভাবনা থাকে না। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৩) বলা হয়েছে, ভগবানের রূপ অনন্ত, ভগবানের অবতার অনন্ত—*অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপম্*। ভগবানের রূপ অনন্ত হলেও তিনি এক এবং অদ্বিতীয় পরমেশ্বর ভগবান। এই সত্যকে সুদৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বুঝতে হবে। দুর্ভাগ্যবশত জড় জ্ঞানী ও পণ্ডিতেরা এই পরম সত্যকে বিশ্বাস করতে পারে না। *বেদে* (*পুরুষবোধিনী উপনিষদে*) বলা হয়েছে—

একো দেবো নিত্যলীলানুরক্তো ভক্তব্যাপী হৃদ্যন্তরাত্মা ।

"এক ও অদ্বিতীয় ভগবান নানা দিব্যরূপে তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গে লীলা করতে নিত্য অনুরক্ত।" *বেদের* এই উক্তিকে ভগবান নিজেই *গীতার* এই শ্লোকে প্রমাণিত করেছেন। যিনি সুদৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে *বেদের* এই কথাকে, ভগবানের এই কথাকে সত্য বলে গ্রহণ করে দার্শনিক জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে কালক্ষয় করেন না, তিনি সর্বোচ্চ স্তরের মুক্তি লাভ করেন। *বেদের তত্ত্বমসি* কথাটির যথার্থ তাৎপর্য এই সন্দর্ভে আছে। যিনি বুঝতে পেরেছেন, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর অথবা যিনি ভগবানকে বলতে পারেন, "তুমিই পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর, স্বয়ং ভগবান"—তাঁর তৎক্ষণাৎ মুক্তি লাভ হয় এবং ভগবানের নিত্য ধামে তিনি নিশ্চিতভাবে ভগবানের চিন্ময় সাহচর্য লাভ করেন। অর্থাৎ, ভগবানের এই রকম একনিষ্ঠ ভক্তই যে পরমার্থ লাভ করেন, সেই সম্বন্ধে বৈদিক উক্তির মাধ্যমে প্রতিপন্ন হয়েছে—

তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ।

"পরমেশ্বর ভগবানকে জানবার ফলেই জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এ ছাড়া আর কোনই পথ নেই।" (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* ৩/৮) কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যে জানে না, সে তমোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত, তাই তার পক্ষে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া অসম্ভব। মধুর বোতল চাটলেই যেমন মধুর স্বাদ লাভ করা যায় না, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে না জেনে *ভগবদ্গীতা* পাঠ করলে এবং তার মনগড়া ব্যাখ্যা করলেও তেমন কোন কাজ হয় না। এই সমস্ত দার্শনিকেরা জড় জগতে অনেক সম্মান, অনেক প্রতিপত্তি, অনেক অর্থ উপার্জন করতে পারে, কিন্তু

তারা ভগবানের কৃপা লাভ করে মুক্তি লাভের যোগ্য নয়। ভগবদ্ভক্তের অহৈতুকী কৃপা লাভ না করা পর্যন্ত অহঙ্কারে মত্ত এই সমস্ত পণ্ডিতেরা জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না। তাই মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য হচ্ছে সুদৃঢ় বিশ্বাস এবং তত্ত্বজ্ঞান সহকারে কৃষ্ণভাবনামৃতের অনুশীলন করে পরমার্থ সাধন করা।

শ্লোক ১০

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ১০ ॥

বীত—মুক্ত; **রাগ**—আসক্তি; **ভয়**—ভয়; **ক্রোধাঃ**—ক্রোধ; **মন্ময়া**—আমাতে নিবিষ্ট চিত্ত; **মাম্**—আমার; **উপাশ্রিতাঃ**—একান্তভাবে আশ্রিত হয়ে; **বহবঃ**—বহু; **জ্ঞান**—জ্ঞান; **তপসা**—তপস্যার দ্বারা; **পূতাঃ**—পবিত্র হয়ে; **মদ্ভাবম্**—আমার প্রতি অপ্রাকৃত প্রেম; **আগতাঃ**—লাভ করেছে।

গীতার গান

ছাড়ি রাগ ভয় ক্রোধ ত্রিবিধ অসার ।
মন্ময় মদ্ভক্তি সাধ্য করিয়া বিচার ॥
বহু ভক্ত জ্ঞানী সব তপস্যার দ্বারে ।
বিধৌত হইয়া পাপ পেয়েছে আমারে ॥

অনুবাদ

আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ থেকে মুক্ত হয়ে, সম্পূর্ণরূপে আমাতে মগ্ন হয়ে, একান্তভাবে আমার আশ্রিত হয়ে, পূর্বে বহু বহু ব্যক্তি আমার জ্ঞান লাভ করে পবিত্র হয়েছে—এবং এভাবেই সকলেই আমার অপ্রাকৃত প্রীতি লাভ করেছে।

তাৎপর্য

আগেই বলা হয়েছে, যে সমস্ত মানুষ জড়ের প্রতি অত্যধিক অনুরক্ত, তাদের পক্ষে পরম-তত্ত্বের সবিশেষ রূপ উপলব্ধি করা দুষ্কর। সাধারণত, যে সমস্ত মানুষ দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত, তারা জড় বস্তুবাদ চিন্তায় এমনই মগ্ন যে, তাদের পক্ষে ভগবানের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সচ্চিদানন্দময় স্বরূপ উপলব্ধি করা প্রায় অসম্ভব। এই সমস্ত জড়বাদীরা কোনমতেই বুঝে উঠতে পারে না যে, ভগবানের একটি

চিন্ময় দেহ আছে, যা অবিনশ্বর, পূর্ণ জ্ঞানময় এবং নিত্য আনন্দময়। জড়বাদী চিন্তাধারায়, আমাদের জড় দেহটি নশ্বর, অজ্ঞানতার দ্বারা আচ্ছন্ন এবং সম্পূর্ণ নিরানন্দ। সুতরাং, এই জড় দেহটিকেই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ বলে মেনে নিয়ে আমরা মনে করি, ভগবানের দেহটিও তেমন নশ্বর, অজ্ঞান এবং সম্পূর্ণ নিরানন্দ। সুতরাং, সাধারণ মানুষকে যখন ভগবানের ব্যক্তিগত স্বরূপ সম্পর্কে কিছু বলা হয়, তখন তারা জড় দেহগত ধারণাই মনে ভাবতে থাকে। এই জড় দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দেহসর্বস্ব মানুষ মনে করে, বিশ্বচরাচরের যে বিরাটরূপ সেটিই পরমতত্ত্ব। তার ফলে তারা মনে করে, পরমেশ্বরের কোন আকার নেই—তিনি নির্বিশেষ। আর তারা এতই গভীরভাবে বিষয়াসক্ত যে, জড় জগৎ থেকে মুক্ত হবার পরেও যে একটি অপ্রাকৃত ব্যক্তিত্ব আছে, তা তারা মানতে ভয় পায়। যখন তারা অবহিত হয় যে, চিন্ময় জীবনও হচ্ছে স্বতন্ত্র ও সবিশেষ, তখন তারা পুনরায় ব্যক্তি হবার ভয়ে ভীত হয় এবং তাই নিরাকার, নির্বিশেষ শূন্যে বিলীন হতে পারলেই পরম প্রাপ্তি বলে তারা মনে করে। সাধারণত তারা জীবাত্মাকে সমুদ্রের বুদ্বুদের সঙ্গে তুলনা করে, যা সমুদ্র থেকে উত্থিত হয়ে সমুদ্রের মধ্যেই আবার বিলীন হয়ে যায়। তাদের মতে এটিই হচ্ছে পৃথক ব্যক্তিসত্তা রহিত চিন্ময় অস্তিত্বের চরম সিদ্ধি। প্রকৃতপক্ষে এটি হচ্ছে যথার্থ আত্মজ্ঞানশূন্য জীবনের এক ভয়ংকর অবস্থা। এ ছাড়া আর এক দল লোক আছে যারা অপ্রাকৃত অস্তিত্বের কথা একেবারেই বুঝতে পারে না। মানুষের কল্পনাপ্রসূত নানা রকম দার্শনিক মতবাদ এবং তাদের মতভেদের ফলে বিভ্রান্ত হয়ে তারা এতই বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে যে, শেষকালে তারা মূর্খের মতো সিদ্ধান্ত নেয়, ভগবান নেই এবং এক সময় সব কিছুই শূন্যে পর্যবসিত হবে। এই ধরনের লোকেরা বিকারগ্রস্ত রুগ্ন জীবন যাপন করে। আর এক ধরনের লোক আছে, যারা জড় বিষয়ে এতই আসক্ত যে, পারমার্থিক তত্ত্ব নিয়ে তারা একেবারেই মাথা ঘামায় না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ পরম চিন্ময় কারণে লীন হতে চায় এবং কেউ কেউ আবার মনগড়া দার্শনিক তত্ত্বের কোন কূল-কিনারা না পেয়ে, নিরাশ হয়ে সব কিছুকেই অবিশ্বাস করে। এই ধরনের মানুষেরা গাঁজা, চরস, ভাঙ আদি মাদকদ্রব্যের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তাদের সেই নেশাগ্রস্ত বিকৃত মনের অলীক কল্পনাকে দিব্য দর্শন বলে প্রচার করে ধর্মভীরু কিছু মানুষকে প্রতারিত করে। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে, পারমার্থিক কর্তব্যে অবহেলা করা, ভগবানের অপ্রাকৃত স্বরূপকে আমাদের জড় রূপের মতো বলে মনে করে ভীত হওয়া এবং জড় জীবনের নৈরাশ্যের ফলে সব কিছুকে শূন্য বলে মনে করা—জড় জগতের এই তিনটি আসক্তির স্তর থেকে মুক্ত হওয়া। জড়

জীবনের এই তিনটি বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হবার একমাত্র উপায় হচ্ছে—সদ্গুরুর চরণাশ্রয় গ্রহণ করে ভগবানের সেবা করা, বিধি অনুসারে ভক্তিযোগের অনুশীলন করা। ভক্তির সর্বোচ্চ স্তরকে বলা হয় 'ভাব' অর্থাৎ ভগবানের প্রতি অপ্রাকৃত প্রেমের অনুভূতি।

শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রণীত ভক্তিবিজ্ঞান *শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে* (১/৪/১৫-১৬) বলা হয়েছে—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া ।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি ।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥

"প্রথমে অবশ্যই আত্ম-উপলব্ধি লাভের প্রতি প্রারম্ভিক আগ্রহ জাগাতে হবে। এই থেকে পারমার্থিক স্তরে উন্নীত সাধু ব্যক্তিদের সঙ্গ লাভের বাসনা জন্মাবে। পরবর্তী স্তরে কোনও ভগবৎ-জ্ঞানী সদ্গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে নবদীক্ষিত ভক্ত সাধনভক্তির পদ্ধতি অনুশীলন করতে শুরু করবেন। সদ্গুরুর অধীনে এভাবেই ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করার ফলে, মানুষ জড় বন্ধনের আসক্তি থেকে মুক্তি লাভ করে, আত্ম-উপলব্ধির পথে অবাধ গতি লাভ করে এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথায় রুচি অর্জন করে। এই রুচি অর্জনের ফলে মানুষ কৃষ্ণভাবনার প্রতি আরও আসক্তি লাভ করে—যা থেকে ভগবানের প্রতি পারমার্থিক প্রেমভক্তির প্রারম্ভিক স্তর 'ভাব' পর্যায়ে উন্নীত হওয়া যায়। ভগবানের প্রতি প্রকৃত ভালবাসার নাম প্রেম। এই প্রেম হচ্ছে জীবনের চরম সার্থকতার পরিণতি।" এই প্রেমভক্তির স্তরে ভক্ত নিরন্তর ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময় সেবায় নিয়োজিত থাকে। সুতরাং সদ্গুরুর পথনির্দেশ অনুসারে ধীরে ধীরে ভগবৎ-সেবার পদ্ধতি অনুসরণ করতে করতে মানুষ আত্মোন্নতির সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হতে পারে। সে তখন জড় বন্ধনের সমস্ত আসক্তি থেকে মুক্তি লাভ করে, তার নিজের পৃথক চিন্ময় ব্যক্তিসত্তার আতঙ্ক থেকে মুক্ত হয় এবং শূন্যবাদী জীবনদর্শন চিন্তার ফলে সৃষ্ট হতাশাবোধ থেকে নিষ্কৃতি পায়। তখন সে পরমেশ্বর ভগবানের ধামে অবশেষে পৌঁছতে পারে।

শ্লোক ১১

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ১১ ॥

যে—যারা; **যথা**—যেভাবে; **মাম্**—আমাকে; **প্রপদ্যন্তে**—আত্মসমর্পণ করে; **তান্**—তাদের; **তথা**—সেভাবে; **এব**—অবশ্যই; **ভজামি**—পুরস্কৃত করি; **অহম্**—আমি; **মম**—আমার; **বর্ত্ম**—পথ; **অনুবর্তন্তে**—অনুসরণ করে; **মনুষ্যাঃ**—সমস্ত মানুষ; **পার্থ**—হে পৃথাপুত্র; **সর্বশঃ**—সর্বতোভাবে।

গীতার গান

যেভাবে যে ভজে মোরে আমি সেই ভাবে ।
যথাযোগ্য ফল দিই আপন প্রভাবে ॥
আমাকেই সর্ব মতে চাহে সব ঠাঁই ।
আগুপিছু মাত্র হয় পথে ভেদ নাই ॥

অনুবাদ

যারা যেভাবে আমার প্রতি আত্মসমর্পণ করে, আমি তাদেরকে সেভাবেই পুরস্কৃত করি। হে পার্থ! সকলেই সর্বতোভাবে আমার পথ অনুসরণ করে।

তাৎপর্য

সকলেই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করছে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি রূপে এবং অণু-পরমাণু সহ সর্বভূতে বিরাজমান পরমাত্মারূপে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায় না। কিন্তু তাঁর শুদ্ধ ভক্তেরাই কেবল শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারেন। সমস্ত তত্ত্ব অনুসন্ধানী সাধকের সাধনার বস্তু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, তবে যে যেভাবে ভগবানকে পেতে চায়, তার সিদ্ধিও হয় তেমনভাবে। অপ্রাকৃত জগতেও ভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্তের ভাবনা অনুযায়ী তাদের সঙ্গে ভাবের বিনিময় করে থাকেন। সেখানে কেউ শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর জেনে সেবা করে, কেউ তাঁকে সখা বলে মনে করে খেলা করে, কেউ সন্তান বলে মনে করে স্নেহ করে, আবার কেউ পরম প্রিয় বলে মনে করে ভালবাসে। ভগবানও তেমন তাঁদের বাসনা অনুযায়ী তাঁদের সকলের সঙ্গে লীলাখেলা করে তাঁদের ভালবাসার প্রতিদান দেন। জড় জগতেও তেমন, বিভিন্ন লোক বিভিন্নভাবে ভজনা করে এবং ভগবানও তাদের ভাবনা অনুযায়ী তাদের সঙ্গে ভাবের বিনিময় করেন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা অপ্রাকৃত জগতে এবং এই জড় জগতে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করেন এবং তাঁর সেবায় নিয়োজিত হয়ে অপ্রাকৃত আনন্দ অনুভব করেন। যে সমস্ত নির্বিশেষবাদী তাদের আত্মার সত্তাকে বিনাশ করে দিয়ে

আধ্যাত্মিক আত্মহত্যা করতে চায়, শ্রীকৃষ্ণ তাদের তাঁর ব্রহ্মজ্যোতিতে আত্মসাৎ করে নেন। এই সমস্ত নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের সচ্চিদানন্দময় রূপ বিশ্বাস করে না; তাই তারা ভগবানের সান্নিধ্য লাভের আনন্দও উপলব্ধি করতে পারে না এবং পরিণামে তাদের ব্যক্তিগত সত্তার অনুভূতিও বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার ব্রহ্মেও বিলীন হয়ে যেতে পারে না, তারা এই জড় জগতে ফিরে এসে তাদের সুপ্ত ভোগবাসনা চরিতার্থ করে। তারা অপ্রাকৃত জগতে প্রবেশ করার অনুমতি পায় না, কিন্তু এই জগতে এসে আবার পবিত্র হবার সুযোগ পায়। যারা সকাম কর্মী, যজ্ঞেশ্বররূপে ভগবান তাদের যাগ-যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফল প্রদান করেন এবং যে সমস্ত যোগী সিদ্ধি কামনা করে, তিনি তাদের সেই ক্ষমতা প্রদান করেন। এভাবেই আমরা দেখতে পাই, সকলের সাধনার সিদ্ধি লাভ হয় ভগবানেরই করুণার ফলে এবং পরমার্থ সাধনের বিভিন্ন পন্থাগুলি হচ্ছে সেই একই মার্গের বিভিন্ন স্তর। তাই, কৃষ্ণভাবনার চরম সিদ্ধির স্তরে অধিষ্ঠিত না হলে সমস্ত প্রচেষ্টাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/৩/১০) এই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥

"সব রকম কামনা-রহিত ভক্তই হোক, সব রকম কামনা-বিশিষ্ট যাজ্ঞিকই হোক, বা মোক্ষকামী যোগীই হোক না কেন, সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে ভক্তিযোগের দ্বারা ভগবানের আরাধনা করা।

শ্লোক ১২

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা ॥ ১২ ॥

কাঙ্ক্ষন্তঃ—কামনা করে; **কর্মণাম্**—সকাম কর্মসমূহের; **সিদ্ধিম্**—সিদ্ধি; **যজন্তে**—যজ্ঞের দ্বারা উপাসনা করে; **ইহ**—এই; **দেবতাঃ**—দেবতাদের; **ক্ষিপ্রম্**—অতি শীঘ্র; **হি**—অবশ্যই; **মানুষে**—মানব-সমাজে; **লোকে**—জড় জগতে; **সিদ্ধিঃ**—ফল লাভ; **ভবতি**—হয়; **কর্মজা**—সকাম কর্ম থেকে।

গীতার গান

কর্মকাণ্ডী সিদ্ধি লাগি বহু দেবদেবী ।
ইহলোক হয় সব বহু সেব্য সেবী ॥

শীঘ্র যেই কর্মফল এ মনুষ্যলোকে ।
অনিত্য সে ফল ভুঞ্জে দুঃখে আর শোকে ॥

অনুবাদ

এই জগতে মানুষেরা সকাম কর্মের সিদ্ধি কামনা করে এবং তাই তারা বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসনা করে। সকাম কর্মের ফল অবশ্যই অতি শীঘ্রই লাভ হয়।

তাৎপর্য

এই জড় জগতের দেব-দেবীদের সম্বন্ধে বিষয়াসক্ত লোকদের একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে। অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন বেশ কিছু লোক, যারা নিজেদের মহাপণ্ডিত বলে লোক ঠকায়, তারা এই সমস্ত দেব-দেবীকে ভগবানের বিভিন্ন রূপ বলে মনে করে এবং তাদের ভ্রান্ত প্রচারের ফলে জনসাধারণও সেই কথা সত্য বলে মনে করে। প্রকৃতপক্ষে, এই সমস্ত দেব-দেবী ভগবানের বিভিন্ন রূপ নন, তাঁরা হচ্ছেন ভগবানের বিভিন্ন অংশ-বিশেষ। ভগবান হচ্ছেন এক আর অবিচ্ছেদ্য অংশেরা হচ্ছে বহু। *বেদে* বলা হয়েছে, *নিত্যো নিত্যানাম্*—ভগবান হচ্ছেন এক ও অদ্বিতীয়। *ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ*—"ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর।" বিভিন্ন দেব-দেবী হচ্ছেন শক্তিপ্রাপ্ত যাতে তাঁরা এই জড় জগৎকে পরিচালনা করতে পারেন। এই সমস্ত দেব-দেবীও হচ্ছেন জড় জগতের বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন জীব (*নিত্যানাম্*), তাই তাঁরা কোন অবস্থাতেই ভগবানের সমকক্ষ হতে পারেন না। যে মনে করে যে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবিষ্ণু, শ্রীনারায়ণ ও বিভিন্ন দেব-দেবী একই পর্যায়ভুক্ত, তার কোন রকম শাস্ত্রজ্ঞান নেই, তাকে বলা হয় নাস্তিক অথবা পাষণ্ডী। এমন কি দেবাদিদেব মহাদেব এবং আদি পিতামহ ব্রহ্মাকেও ভগবানের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। প্রকৃতপক্ষে শিব, ব্রহ্মা আদি দেবতারা নিরন্তর ভগবানের সেবা করেন (*শিববিরিঞ্চিনুতম্*)। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানব-সমাজে অনেক নেতা আছে, যাদেরকে মূর্খ লোকেরা 'ভগবানে নরত্ব আরোপ', এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে অবতার জ্ঞানে পূজা করে। *ইহ দেবতাঃ* বলতে এই জড় জগতের কোন শক্তিশালী মানুষকে অথবা দেবতাকে বোঝায়। কিন্তু ভগবান শ্রীনারায়ণ, শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর, তিনি এই জড় জগতের তত্ত্ব নন। তিনি জড় জগতের অতীত চিন্ময় জগতে অবস্থান করেন। এমন কি মায়াবাদ দর্শনের প্রণেতা শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য বলে গেছেন, নারায়ণ অথবা শ্রীকৃষ্ণ এই জড় জগতের অতীত। কিন্তু মূর্খ লোকেরা (*হৃতজ্ঞান*) তা সত্ত্বেও তাৎকালিক ফল লাভ করার আশায় বিভিন্ন জড়

দেব-দেবীর পূজা করে চলে। এই সমস্ত মূর্খ লোকগুলি বুঝতে পারে না, বিভিন্ন দেব-দেবীকে পূজা করার ফলে যে ফল লাভ হয়, তা অনিত্য। যিনি প্রকৃত বুদ্ধিমান, তিনি ভগবানেরই সেবা করেন। তুচ্ছ ও অনিত্য লাভের জন্য বিভিন্ন দেব-দেবীকে পূজা করা নিষ্প্রয়োজন। জড়া প্রকৃতির বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত দেব-দেবী এবং তাঁদের উপাসকেরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। দেব-দেবীদের দেওয়া বরও হচ্ছে জড় এবং অনিত্য। জড় জগৎ, জড় জগতের বাসিন্দা, এমন কি বিভিন্ন দেব-দেবী এবং তাঁদের উপাসকেরা সকলেই হচ্ছে মহাজাগতিক সমুদ্রের বুদ্বুদ। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই জগতের মানব-সমাজ ভূসম্পত্তি, পরিবার-পরিজন, ভোগের সামগ্রী আদি অনিত্য জড় ঐশ্বর্য লাভের আশায় উন্মাদ। এই প্রকার অনিত্য বস্তু লাভের জন্য মানুষেরা মানব-সমাজে বিভিন্ন দেব-দেবীর অথবা শক্তিশালী কোন ব্যক্তির পূজা করে। কোন রাজনৈতিক নেতাকে পূজা করে যদি ক্ষমতা লাভ করা যায়, সেটিকে তারা পরম প্রাপ্তি বলে মনে করে। তাই তারা সকলেই তথাকথিত নেতাদের দণ্ডবৎ প্রণাম করছে এবং তার ফলে তাদের কাছ থেকে ছোটখাটো কিছু আশীর্বাদও লাভ করছে। এই সমস্ত মূর্খ লোকেরা জড় জগতের দুঃখকষ্ট থেকে চিরকালের জন্য মুক্ত হবার জন্য ভগবানের শরণাগত হতে আগ্রহী নয়। পক্ষান্তরে, সকলেই তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করার জন্য ব্যস্ত এবং তুচ্ছ একটু ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার জন্য এরা দেব-দেবী নামক বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত জীবদের আরাধনার প্রতি আকর্ষিত হয়। এই শ্লোক থেকে বোঝা যায়, খুব কম মানুষই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণের শরণাগত হয়। অধিকাংশ মানুষই সর্বক্ষণ চিন্তা করছে কিভাবে আরও একটু বেশি ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করা যায়। আর এই সমস্ত ভোগবাসনা চরিতার্থ করবার জন্য তারা বিভিন্ন দেব-দেবীর দুয়ারে ধর্ণা দিয়ে 'এটি দাও' 'ওটি দাও' বলে কাঙ্গালপনা করে তাদের সময় নষ্ট করছে।

শ্লোক ১৩

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

চাতুর্বর্ণ্যম্—মানব-সমাজের চারিটি বিভাগ; **ময়া**—আমার দ্বারা; **সৃষ্টম্**—সৃষ্ট হয়েছে; **গুণ**—গুণ; **কর্ম**—কর্ম; **বিভাগশঃ**—বিভাগ অনুসারে; **তস্য**—তার; **কর্তারম্**—স্রষ্টা; **অপি**—যদিও; **মাম্**—আমাকে; **বিদ্ধি**—জানবে; **অকর্তারম্**—অকর্তারূপে; **অব্যয়ম্**—পরিবর্তন রহিত।

গীতার গান

চারি বর্ণ সৃষ্টি মোর গুণ কর্ম ভাগে ।
যার যাহা গুণ হয় কহিব সে আগে ॥
তথাপি সে নহি আমি গুণ কর্ম মাঝে ।
যদ্যপি নিয়ন্তা আমি সকলের কাজে ॥

অনুবাদ

প্রকৃতির তিনটি গুণ ও কর্ম অনুসারে আমি মানব-সমাজে চারিটি বর্ণবিভাগ সৃষ্টি করেছি। আমি এই প্রথার স্রষ্টা হলেও আমাকে অকর্তা এবং অব্যয় বলে জানবে।

তাৎপর্য

ভগবানই সব কিছুর স্রষ্টা। তাঁর থেকেই সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে, তিনিই সব কিছু রক্ষা করেন, আবার প্রলয়ের পরে সব কিছু তাঁরই মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। সমাজের চারটি বর্ণও তাঁরই সৃষ্টি। সমাজের সর্বোচ্চ স্তর সৃষ্টি হয়েছে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি-মত্তাসম্পন্ন লোকদের নিয়ে, তাঁদের বলা হয় ব্রাহ্মণ এবং তাঁরা সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত। এর পরের স্তর হচ্ছে শাসক সম্প্রদায়, এদের বলা হয় ক্ষত্রিয় এবং এরা রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত। তার পরের স্তর হচ্ছে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, এদের বলা হয় বৈশ্য এবং এরা রজ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত। তার পরের স্তর হচ্ছে শ্রমজীবী সম্প্রদায়, এদের বলা হয় শূদ্র, এরা তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত। ভগবান যদিও এই চারটি বর্ণ সৃষ্টি করেছেন, তবুও তিনি এই বর্ণের অন্তর্ভুক্ত নন। কারণ তিনি মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ জীবের মতো নন। জীব হচ্ছে ভগবানের অণুসদৃশ অংশ-বিশেষ, কিন্তু ভগবান হচ্ছেন বিভু। প্রকৃতপক্ষে, মানব-সমাজ হচ্ছে যে-কোনও পশু-সমাজেরই মতো, কিন্তু মানুষকে পশুর স্তর থেকে প্রকৃত মানুষের স্তরে উন্নীত করবার জন্য ভগবান এই চারটি বর্ণ-বিভাগ করেছেন, যাতে মানুষ সুষ্ঠুভাবে পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে কৃষ্ণভাবনাময় হতে পারে। গুণ অনুসারে মানুষের কর্ম নির্ধারিত হয়। জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণ অনুসারে জীবনের বিভিন্ন লক্ষণ *ভগবদ্গীতার* অষ্টাদশ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে, কৃষ্ণভক্ত বা বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের থেকেও উত্তম। যদিও গুণগতভাবে ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম বা পরব্রহ্মের জ্ঞানসম্পন্ন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতির উপাসক। তাঁরা সবিশেষ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারেন না। বিষ্ণুতত্ত্ব বা কৃষ্ণতত্ত্বকে উপলব্ধি করতে হয় ব্রহ্মতত্ত্বকে অতিক্রম

করে এবং তখন তিনি বৈষ্ণব পদবাচ্য হন। কৃষ্ণতত্ত্ব রাম, নৃসিংহ, বরাহ আদি সব কয়টি অংশ-অবতারের তত্ত্ব সমন্বিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন সমাজের চার বর্ণের অতীত, তাঁর ভক্তও তেমন এই বর্ণ-বিভাগের অতীত, এমন কি তিনি জাতি, কুলাদি বিচারেরও অতীত।

শ্লোক ১৪

ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা ।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪ ॥

ন—না; **মাম্**—আমাকে; **কর্মাণি**—সর্বপ্রকার কর্ম; **লিম্পন্তি**—প্রভাবিত করতে পারে; **ন**—না; **মে**—আমার; **কর্মফলে**—কর্মফলে; **স্পৃহা**—আকাঙ্ক্ষা; **ইতি**—এভাবে; **মাম্**—আমাকে; **যঃ**—যিনি; **অভিজানাতি**—জানেন; **কর্মভিঃ**—এই প্রকার কর্মের দ্বারা; **ন**—না; **সঃ**—তিনি; **বধ্যতে**—আবদ্ধ হন।

গীতার গান

আমি কর্মফলে লিপ্ত নহি কোন কালে ।
স্পৃহা কভু নাই মোর কোন কর্মফলে ॥
আমার কর্মের কথা বুঝে ভাল মতে ।
বন্ধন ঘুচিল তার কর্মের ফলেতে ॥

অনুবাদ

কোন কর্মই আমাকে প্রভাবিত করতে পারে না এবং আমিও কোন কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা করি না। আমার এই তত্ত্ব যিনি জানেন, তিনিও কখনও সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হন না।

তাৎপর্য

এই জড় জগতের সংবিধানে উল্লেখ থাকে যে, রাজা কোন ভুল করতে পারেন না, অথবা রাজা রাষ্ট্রের আইনের অধীন নন। তেমনই এই জড় জগতের অধীশ্বর ভগবানও জড় জগতের কোন কর্মের দ্বারাই আবদ্ধ নন। যদিও তিনি এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তবুও এই জড় জগৎ সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ নিরাসক্ত ও উদাসীন। কিন্তু জীব জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করতে চায় বলে কর্মফলের

বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। কোন প্রতিষ্ঠানের মালিক যেমন তাঁর কর্মচারীদের সৎ-অসৎ কোন কর্মের জন্যই দায়ী নন, কর্মচারীরাই তার জন্যে দায়ী হয়ে থাকে, জীবও তেমনই তার কর্মফল ভোগ করে থাকে। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করবার জন্য জীব নানা রকম কর্ম করে চলে। ভগবান কখনও এই ধরনের কর্ম করার বিধান দেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও জীব উত্তরোত্তর আরও বেশি ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করবার জন্য এই সংসারে কর্ম করে এবং মৃত্যুর পর স্বর্গসুখ ভোগ করার কামনা করে। ভগবান যেহেতু স্বয়ংসম্পূর্ণ, তাই তাঁর তথাকথিত স্বর্গসুখের প্রতি কোন রকম আকর্ষণ নেই। স্বর্গের দেব-দেবীরা হচ্ছেন ভগবানেরই দাস-দাসী, যাঁদের ভগবান নিজেই নিয়োজিত করেছেন। কর্মচারীরা যে প্রকার নিম্নস্তরের সুখভোগ করতে চায়, মালিক কখনই তা চায় না। ভগবানেরও তেমনই জড় সুখভোগ করার কোন স্পৃহা নেই। তিনি সব সময়ই জাগতিক কর্ম এবং তার ফল সম্বন্ধে নিরাসক্ত থাকেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, পৃথিবীতে নানা রকম গাছপালা সৃষ্টির জন্য বৃষ্টি দায়ী নয়, যদিও বৃষ্টির অভাবে কোন গাছপালা জন্মানোর সম্ভাবনাই থাকে না। বৈদিক *স্মৃতিতে* সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

নিমিত্তমাত্রমেবাসৌ সৃজ্যানাং সর্গকর্মণি ।
প্রধানকারণীভূতা যতো বৈ সৃজ্যশক্তয়ঃ ॥

"এই জড় সৃষ্টির পরম কারণ হচ্ছেন একমাত্র ভগবান। জড়া প্রকৃতি হচ্ছে নিমিত্ত কারণ, যার ফলে জড় সৃষ্টিকে প্রত্যক্ষ করা যায়।" সৃষ্ট জীব অনেক রকম, যেমন—দেবতা, মানুষ, পশু, পাখি আদি এবং তারা সকলেই তাদের পূর্বকৃত পুণ্য অথবা পাপকর্ম অনুসারে সুখ ও দুঃখ পেয়ে থাকে। ভগবান তাদের প্রকৃতির গুণ অনুসারে কর্ম করার সব রকম সুযোগ দেন। কিন্তু তিনি নিজে তাদের ভূত ও ভবিষ্যৎ কোন কর্মের জন্য দায়ী হন না। *বেদান্ত-সূত্রে* (২/১/৩৪) বলা হয়েছে, *বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ*—ভগবান সর্বদাই নিরপেক্ষ থাকেন, তিনি কোন জীবের প্রতি পক্ষপাতযুক্ত নন। জীব তার নিজের ইচ্ছা অনুসারে কর্ম করে এবং সেই সমস্ত কর্মের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তার নিজের। ভগবান বহিরঙ্গা শক্তি জড়া প্রকৃতির মাধ্যমে জীবের সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণ করবার সুযোগ প্রদান করেন। সকাম কর্মের এই জটিল তত্ত্ব যিনি বুঝতে পারেন, তিনি তাঁর কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হন না। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি ভগবানের অপ্রাকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন, তিনি কৃষ্ণভাবনার অমৃত আস্বাদন করেন, তার ফলে কর্মের অধীন হন না। ভগবানের অপ্রাকৃত তত্ত্ব বুঝতে না পেরে যে মনে করে, ভগবানও আর পাঁচটি

বদ্ধ জীবের মতো কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ, তারা কোন দিনই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না। কিন্তু যিনি পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করেছেন, তিনি মুক্তাত্মারূপে কৃষ্ণভাবনায় দৃঢ়চিত্ত হতে পারেন।

শ্লোক ১৫

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ ।
কুরু কর্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্ ॥ ১৫ ॥

এবম্—এভাবে; **জ্ঞাত্বা**—জেনে; **কৃতম্**—অনুষ্ঠান করেছেন; **কর্ম**—কর্ম; **পূর্বৈঃ**—প্রাচীন; **অপি**—যদিও; **মুমুক্ষুভিঃ**—মুক্তিকামীগণ কর্তৃক; **কুরু**—কর; **কর্ম**—শাস্ত্রোক্ত কর্ম; **এব**—অবশ্যই; **তস্মাৎ**—অতএব; **ত্বম্**—তুমি; **পূর্বৈঃ**—প্রাচীন মহাজনগণ কর্তৃক; **পূর্বতরম্**—প্রাচীনকালে; **কৃতম্**—অনুষ্ঠিত।

গীতার গান

এই গূঢ় তত্ত্বকথা পূর্বে যে বুঝিল ।
অনায়াসে তারা সব সংসার তরিল ॥
তুমি পূর্ব মহাজনে যথা অনুসার ।
যথাবৎ সিদ্ধিলাভ হইবে বিস্তর ॥

অনুবাদ

প্রাচীনকালে সমস্ত মুক্ত পুরুষেরা আমার অপ্রাকৃত তত্ত্ব অবগত হয়ে কর্ম করেছেন। অতএব তুমিও সেই প্রাচীন মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তোমার কর্তব্য সম্পাদন কর।

তাৎপর্য

পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর মানুষ আছে। তাদের মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষের হৃদয় সব রকমের কলুষে পরিপূর্ণ এবং অন্য শ্রেণীর মানুষের হৃদয় অত্যন্ত নির্মল। কৃষ্ণভাবনার অমৃত—ভগবদ্ভক্তি এই দুই শ্রেণীর লোকেরই হিত সাধন করে। যাদের হৃদয় কলুষে পরিপূর্ণ, তারা বিধিভক্তির অনুশীলন করে তাদের হৃদয়কে পরিষ্কার করতে পারে—তাদের হৃদয়ের আবর্জনা দূর করতে পারে; আর যাদের হৃদয় ইতিমধ্যেই পবিত্র হয়ে আছে, তারা কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করার মাধ্যমে আর

সকলকে কৃষ্ণভক্তি লাভ করার শিক্ষা দান করতে পারে। যারা মূর্খ, অথবা যাদের মনে কৃষ্ণভক্তির পূর্ণ প্রকাশ হয়নি, তারা অনেক সময় মনে করে, সব রকমের কাজকর্ম পরিত্যাগ করে নির্জনে ভগবদ্ভজন করাটাই হচ্ছে পরমার্থ সাধন করার পন্থা। কিন্তু এই ধারণাটি ভ্রান্ত। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুন যখন কর্তব্যকর্ম পরিত্যাগ করে বনবাসী হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে তা থেকে নিরস্ত করেন। আমাদের কেবলমাত্র জানতে হবে কিভাবে কর্ম করতে হয়। কৃষ্ণভক্তির ভান করে কর্তব্যকর্ম ত্যাগ করাটা মূঢ়তা। যথার্থ কৃষ্ণভক্তি হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার উদ্দেশ্যে সব রকম কাজকর্ম করা। তাই ভগবান অর্জুনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, কৃষ্ণভক্ত মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করতে। ভগবান ত্রিকালজ্ঞ, তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত কথাই জানেন। তাঁর ভক্তেরা কখন কিভাবে তাঁর সেবা করেছেন, সেই কথা তিনি কখনও ভোলেন না। তাই তিনি সূর্যদেব বিবস্বানের উদাহরণ দিয়ে অর্জুনকে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে বলেন। এই বিবস্বানকে বারো কোটি বছর আগে ভগবান নিজেই *ভগবদ্গীতার* তত্ত্বজ্ঞান দান করেছিলেন। এই সমস্ত ভগবদ্ভক্ত মহাজনেরা সকলেই মুক্ত পুরুষ এবং তাঁরা সকলেই সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে তাঁর সেবায় রত। তাই, তিনি অর্জুনকে উপদেশ দেওয়ার মাধ্যমে আমাদের উপদেশ দিয়েছেন যে, ভগবদ্ভক্ত মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভগবানের সেবায় কর্তব্যকর্ম করাটাই হচ্ছে সিদ্ধি লাভের একমাত্র উপায়।

শ্লোক ১৬

কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ ।
তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১৬ ॥

কিম্—কি; **কর্ম**—কর্ম; **কিম্**—কি; **অকর্ম**—অকর্ম; **ইতি**—এভাবে; **কবয়ঃ**—বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ; **অপি**—ও; **অত্র**—এই বিষয়ে; **মোহিতাঃ**—মোহিত হন; **তৎ**—তাই; **তে**—তোমাকে; **কর্ম**—কর্ম; **প্রবক্ষ্যামি**—আমি বিশ্লেষণ করব; **যৎ**—যা; **জ্ঞাত্বা**—জেনে; **মোক্ষ্যসে**—তুমি মুক্ত হবে; **অশুভাৎ**—অশুভ অবস্থা থেকে।

গীতার গান

কিবা কর্ম অকর্ম বা করিতে বিচার ।
বড় বড় মুনি ঋষি হয় চমৎকার ॥

তাই সে বলিব আমি কিবা কর্ম হয় ।
জানিলে সে তত্ত্বকথা অশুভের ক্ষয় ॥

অনুবাদ

কাকে কর্ম ও কাকে অকর্ম বলে, তা স্থির করতে বিবেকী ব্যক্তিরাও মোহিত হন। আমি সেই কর্ম বিষয়ে তোমাকে উপদেশ করব। তুমি তা অবগত হয়ে সমস্ত অশুভ অবস্থা থেকে মুক্ত হবে।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভক্ত মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম করা সকলেরই কর্তব্য। পূর্ববর্তী শ্লোকে ভগবান যে উপদেশ দিয়েছেন, পরবর্তী শ্লোকে তিনি তার ব্যাখ্যা করে বলেছেন, কেন স্বাধীনভাবে ভগবানের সেবা করা উচিত নয়।

এই অধ্যায়ের প্রথমেই বর্ণনা করা হয়েছে, পরম্পরার ধারায় ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছেন এমন কোন মহাপুরুষকে গুরুরূপে বরণ করতে হয়। ভগবান নিজেই ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান সর্বপ্রথমে সূর্যদেব বিবস্বানকে দান করেন। সেই তত্ত্বজ্ঞান বিবস্বান তাঁর পুত্র মনুকে দান করেন, মনু তা তাঁর পুত্র ইক্ষ্বাকুকে দান করেন। এভাবেই সৃষ্টির আদি থেকে এই তত্ত্বজ্ঞান প্রবাহিত হয়ে আসছে। তাই গুরু-শিষ্য পরম্পরায় পূর্বতন যে সমস্ত মহান আচার্যেরা রয়েছেন, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই এই জ্ঞান আহরণ করতে হয়। মানুষ যত বুদ্ধিমানই হোক না কেন, গুরু-পরম্পরার ধারায় এই জ্ঞান আহরণ না করলে, সে কখনই কৃষ্ণভাবনাময় তত্ত্বকে প্রামাণ্যরূপে উপলব্ধি করতে পারে না। সেই জন্যই ভগবান নিজে অর্জুনকে এই তত্ত্বজ্ঞান সরাসরি দান করতে মনস্থ করলেন। অর্জুনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে যদি কেউ ভগবানের দেওয়া এই তত্ত্বজ্ঞান আহরণ করেন, তা হলে তিনি অনায়াসে জড় জগতের বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হতে পারেন।

কেবলমাত্র জাগতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে ধর্মীয় পন্থাগুলি কখনই নিরূপণ করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে, একমাত্র ভগবানই পরমতত্ত্ব সম্বলিত ধর্মনীতি প্রণয়ন করতে পারেন। *ধর্মং তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতম্* (ভাঃ ৬/৩/১৯)। জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে একটি মনগড়া ধর্ম তৈরি করলে তাকে ধর্ম বলে গ্রহণ করা যায় না। ব্রহ্মা, শিব, নারদ, মনু, কুমার, কপিল, প্রহ্লাদ, ভীষ্ম, শুকদেব গোস্বামী, যমরাজ, জনক, বলী মহারাজ আদি মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমাদের ধর্মের প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে হয় এবং তা অনুশীলন করতে হয়। কল্পনা ও অনুমানের ভিত্তিতে আমরা আত্ম-উপলব্ধির পন্থা প্রতিপাদন করতে

পারি না। তাই ভগবান তাঁর অহৈতুকী কৃপার বশবর্তী হয়ে সরাসরি অর্জুনকে সেই জ্ঞানের মাধ্যমে তিনি আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, শুধুমাত্র কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনের মাধ্যমেই আমরা এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারি।

শ্লোক ১৭

কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যং চ বিকর্মণঃ ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ ॥ ১৭ ॥

কর্মণঃ—কর্মের; **হি**—অবশ্যই; **অপি**—ও; **বোদ্ধব্যম্**—জানা উচিত; **বোদ্ধব্যম্**—জ্ঞাতব্য; **চ**—ও; **বিকর্মণঃ**—শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম; **অকর্মণঃ**—অকর্ম; **চ**—ও; **বোদ্ধব্যম্**—জ্ঞাতব্য; **গহনা**—অত্যন্ত কঠিন; **কর্মণঃ**—কর্মের; **গতিঃ**—গতি।

গীতার গান

কর্ম যে বুঝিতে তুমি অকর্ম বুঝিবে ।
বিকর্ম বুঝিতে তথা ভাবে বুদ্ধ হবে ॥
দুর্গম কর্মের গতি নিগূঢ় সে তত্ত্ব ।
যে বুঝিল সে বুঝিল তাহার মহত্ত্ব ॥

অনুবাদ

কর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন। তাই কর্ম, বিকর্ম ও অকর্ম সম্বন্ধে যথাযথভাবে জানা কর্তব্য।

তাৎপর্য

কেউ যদি সত্যিই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চায়, তবে তাকে কর্ম, অকর্ম ও বিকর্মের পার্থক্য জানতে হবে। তাকে জানতে হবে ভগবৎ-তত্ত্ব কি, ভগবানের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক এবং এই জড় জগতের বিভিন্ন গুণের প্রভাবে সে কিভাবে তার কর্তব্যকর্ম করে। এই তত্ত্বের উপলব্ধিই হচ্ছে আত্ম-উপলব্ধি। এই তত্ত্ব পূর্ণরূপে যে উপলব্ধি করতে পারে, সে-ই বুঝতে পারে যে, *জীবের 'স্বরূপ' হয়—'কৃষ্ণের নিত্যদাস'*। তাই কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে ভগবানের সেবা করাই প্রতিটি জীবের পরম কর্তব্য। সমগ্র *ভগবদ্গীতায়* ভগবান আমাদের এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষাই দান করেছেন। যে চিন্তাধারা এবং যে কর্ম এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে, তাকে বলা হয় বিকর্ম অর্থাৎ নিষিদ্ধ কর্ম। এই তত্ত্বজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে

উপলব্ধি করতে হলে মানুষকে কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তের সঙ্গ করতে হয়—সাধুসঙ্গ করতে হয় এবং তাদের কাছ থেকে এই জ্ঞানের যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করতে হয়। ভগবদ্ভক্তের কাছ থেকে এই জ্ঞান আহরণ করা এবং ভগবানের কাছ থেকে তা আহরণ করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এই পরম তত্ত্বজ্ঞান এভাবেই সদ্‌গুরুর কাছ থেকে আহরণ না করলে বড় বড় বুদ্ধিমান মানুষেরা পর্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং এই জ্ঞানের যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করতে পারে না।

শ্লোক ১৮

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ ।
স বুদ্ধিমান্মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ ॥ ১৮ ॥

কর্মণি—কর্মে; **অকর্ম**—অকর্ম; **যঃ**—যিনি; **পশ্যেৎ**—দর্শন করেন; **অকর্মণি**—অকর্মে; **চ**—ও; **কর্ম**—কর্ম; **যঃ**—যিনি; **সঃ**—তিনি; **বুদ্ধিমান্**—বুদ্ধিমান; **মনুষ্যেষু**—মানব-সমাজে; **সঃ**—তিনি; **যুক্তঃ**—চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত; **কৃৎস্নকর্মকৃৎ**—সব রকম কর্মে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও।

গীতার গান

কর্মেতে অকর্ম দেখে অকর্মে যে কর্ম ।
সে বুদ্ধিমান মনুষ্যে সে বুঝেছে মর্ম ॥

অনুবাদ

যিনি কর্মে অকর্ম দর্শন করেন এবং অকর্মে কর্ম দর্শন করেন, তিনিই মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমান। সব রকম কর্মে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনায় অধিষ্ঠিত হয়ে যে মানুষ ভগবানের সেবায় ব্রতী হয়েছেন, তিনি স্বাভাবিকভাবে সব রকমের কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত। তিনি তাঁর সমস্ত কর্মই করেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য। তাই তাঁর কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তাঁকে আর সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করতে হয় না। এভাবেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যাঁরা ব্রতী হয়েছেন, তাঁরাই মানব-সমাজে যথার্থ বুদ্ধিমান মানুষ। অকর্ম কথাটার অর্থ হচ্ছে কর্মফল রহিত কর্ম। নির্বিশেষবাদীরা কর্মফলের ভয়ে ভীত হয়ে সব রকম কর্ম

পরিত্যাগ করে। তারা মনে করে, কর্ম করলেই তার ফল ভোগ করতে হবে এবং এই সমস্ত কর্মফল তাদের মুক্তির পথে প্রতিবন্ধক-স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু ভগবানের ভক্ত ভালভাবেই জানেন, তিনি হচ্ছেন ভগবানের নিত্যদাস। তাই তিনি সর্বতোভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত থাকেন। ভগবানের সেবা করার জন্য তিনি সমস্ত কাজকর্ম করেন, তাই সেই সমস্ত কর্মের ফল ভগবানই গ্রহণ করেন, তাঁকে আর তা ভোগ করতে হয় না। এভাবেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার ফলে তিনি সব রকম কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হন এবং সর্বদা চিন্ময় আনন্দ উপভোগ করেন। তাই বলা হয়, 'কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম', কারণ তাঁর ব্যক্তিগত কোন কামনা নেই। তিনি তাঁর নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করবার জন্য কোন কিছুই আশা করেন না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাসত্ব করার পরম আনন্দ লাভের ফলে তিনি জড় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের সমস্ত বাসনার নিরর্থকতা উপলব্ধি করতে পারেন এবং তার ফলে তিনি সম্পূর্ণভাবে কর্মফলের বন্ধন থেকে মুক্ত হন।

শ্লোক ১৯

যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জিতাঃ ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯ ॥

যস্য—যাঁর; **সর্বে**—সব রকম; **সমারম্ভাঃ**—কর্ম প্রচেষ্টা; **কাম**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা; **সংকল্প**—সংকল্প; **বর্জিতাঃ**—রহিত; **জ্ঞান**—জ্ঞানের; **অগ্নি**—অগ্নি দ্বারা; **দগ্ধ**—দগ্ধ; **কর্মাণম্**—কর্মসমূহ; **তম্**—তাঁকে; **আহুঃ**—বলেন; **পণ্ডিতম্**—পণ্ডিত; **বুধাঃ**—জ্ঞানীগণ।

গীতার গান

সকল সমারম্ভে যার সংকল্প বর্জন ।
জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ কর্ম পাণ্ডিত্যে গ্রহণ ॥

অনুবাদ

যাঁর সমস্ত কর্ম প্রচেষ্টা কাম ও সংকল্প রহিত, তিনি পূর্ণ জ্ঞানে অধিষ্ঠিত। জ্ঞানীগণ বলেন যে, তাঁর সমস্ত কর্মের প্রতিক্রিয়া পরিশুদ্ধ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে।

তাৎপর্য

যে মানুষ প্রকৃতই জ্ঞানবান, তিনিই কেবল কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত বৈষ্ণবের কার্যকলাপ বুঝতে পারেন। কারণ, কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব সব রকম ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বিষয়ক বাসনা থেকে মুক্ত। তাঁর স্বরূপ যে ভগবানের নিত্যদাস, এই সত্যকে উপলব্ধি করতে পারার ফলে তাঁর অন্তর কলুষমুক্ত হয়েছে। শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তির আগুনে তাঁর অন্তরের সমস্ত কলুষ দগ্ধ হয়ে যায়। এভাবেই অন্তর যখন কলুষমুক্ত হয়, তখন জড় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার সমস্ত কামনা অন্তর্হিত হয়, তাই তিনি তখন নিষ্কাম। প্রকৃত জ্ঞানী তিনিই, যিনি এই পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পেরেছেন। ভগবানের নিত্য দাসত্বের এই পরম তত্ত্বজ্ঞানকে আগুনের সঙ্গে তুলনা করা হয়। এই আগুন একবার জ্বলে উঠলে, তা সব রকম কর্মফলকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দিতে পারে।

শ্লোক ২০

ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ ।
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥ ২০ ॥

ত্যক্ত্বা—ত্যাগ করে; **কর্মফলাসঙ্গম্**—কর্মফলের আসক্তি; **নিত্য**—সর্বদা; তৃপ্তঃ—পরিতৃপ্ত; নিরাশ্রয়ঃ—আশ্রয়শূন্য; কর্মণি—কর্মে; **অভিপ্রবৃত্তঃ**—পূর্ণরূপে প্রবৃত্ত; **অপি**—সত্ত্বেও; ন—না; এব—অবশ্যই; **কিঞ্চিৎ**—কিছুই; **করোতি**—করেন; সঃ—তিনি।

গীতার গান

ত্যক্ত কর্মফলাসঙ্গ আশ্রয় বিহীন ।
নিত্য তৃপ্ত নিত্যানন্দ নিজ কর্মে লীন ॥
সে প্রবৃত্ত নিজ কর্মে কিছু নাহি করে ।
অনাসক্ত কর্মফল স্বচ্ছন্দ বিহরে ॥

অনুবাদ

যিনি কর্মফলের আসক্তি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে সর্বদা তৃপ্ত এবং কোন রকম আশ্রয়ের অপেক্ষা করেন না, তিনি সব রকম কর্মে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও কর্মফলের আশায় কোন কিছুই করেন না।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ বিধানের জন্য সব রকম কর্ম করার মাধ্যমেই কেবল কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। কৃষ্ণভাবনার অমৃত লাভ করেছেন যে ভক্ত, তিনি বিশুদ্ধ ভগবৎ-প্রেমের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে কর্ম করেন, তাই তিনি কোন রকম কর্মফলের আশা করেন না। তিনি সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত, তাই তিনি কিভাবে তাঁর জীবন ধারণ করবেন, সেই সম্বন্ধেও কোন রকম চিন্তা করেন না। তিনি জানেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমেশ্বর এবং তিনি সর্ব কারণের কারণ, তাই তিনি সব কিছুই ভগবানের শ্রীচরণে সমর্পণ করেন। তিনি কিছুই সংগ্রহ বা সঞ্চয় করতে চান না, কিংবা এ যাবৎ যা কিছু তিনি তাঁর অধিকারে লাভ করেছেন, সেই সবও সংরক্ষণ করে রাখতে চান না। তাঁর সমস্ত শক্তি, সমস্ত ক্ষমতা, সমস্ত সম্পদ দিয়ে তিনি কেবল ভগবানেরই সেবা করেন, এ ছাড়া আর কোন কাজেই তাঁর কোন রকম স্পৃহা থাকে না। এই ধরনের নিরাসক্ত কৃষ্ণভক্ত ভাল ও মন্দ সব রকম কর্মফল থেকে মুক্ত; যেন তিনি কোন কাজকর্মই করছেন না। এই হচ্ছে অকর্ম অর্থাৎ কর্মফলহীন কাজকর্মের লক্ষণ। তাই, কৃষ্ণভাবনা রহিত যে সব কর্ম, তা সবই জীবকে কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে। তাকে বলা হয় বিকর্ম, এই কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

শ্লোক ২১

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ ।
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ২১ ॥

নিরাশীঃ—কামনাশূন্য; **যত**—সংযত; **চিত্তাত্মা**—মন ও বুদ্ধি; **ত্যক্ত**—পরিত্যাগ করে; **সর্ব**—সমস্ত; পরিগ্রহঃ—আধিপত্য করার প্রবৃত্তি; **শারীরম্**—শরীর রক্ষার্থে; কেবলম্—কেবল; **কর্ম**—কর্ম; **কুর্বন্**—করেও; ন—না; **আপ্নোতি**—লাভ করেন; **কিল্বিষম্**—পাপ।

গীতার গান

কর্মফলে স্পৃহাহীন দত্ত চিত্ত আত্মা ।
সর্ব পরিগ্রহ ত্যক্ত যুক্ত সে সর্বথা ॥
শরীর নির্বাহ মাত্র কর্ম যেই করে ।
করিয়াও সর্ব কর্ম সর্ব পাপ হরে ॥

অনুবাদ

এই প্রকার জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর মন ও বুদ্ধিকে সর্বতোভাবে সংযত করে কার্য করেন। তিনি প্রভুত্ব করার প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করে কেবল জীবন ধারণের জন্য কর্ম করেন। এভাবেই কর্ম করার ফলে কোন রকম পাপ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনার অমৃত যিনি লাভ করেছেন, তিনি তাঁর কাজকর্মের ফলস্বরূপ শুভ অথবা অশুভ কোন ফলেরই আশা করেন না। তাঁর মন, বুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে সংযত। তিনি জানেন যে, যেহেতু তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই পরমেশ্বরের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে তাঁর কোন কাজকর্মই তাঁর নিজের কাজকর্ম নয়, সেই কাজকর্ম করা হয় ভগবানেরই নিয়ন্ত্রণে। যেমন, আমরা যখন আমাদের হাতটিকে নাড়ি, তখন হাতটি নিজের ইচ্ছায় নড়ে না। সমস্ত শরীরের প্রচেষ্টার ফলেই তা সম্পন্ন হয়। কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত ভগবানের বাসনার দ্বারাই পরিচালিত হন, কেন না তাঁর নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কোন রকম বাসনা নেই। একটি যন্ত্রের অংশ যেভাবে পরিচালিত হয়, তিনিও সেভাবেই পরিচালিত হন। যন্ত্রের কলকব্জায় যেমন তেল দিতে হয়, পরিষ্কার করতে হয়, ভগবদ্ভক্তও তেমন ভগবানের সেবা করার জন্যই কেবল নিজেকে সুস্থ-সবল রাখেন। তাই তিনি সব রকম কর্মফল থেকে মুক্ত। যেমন, একটি পশুর নিজের দেহের উপরেই কোন মালিকানার অধিকার নেই। পশুর নিষ্ঠুর মালিক ইচ্ছা করলেই সেই পশুটিকে বলি দিতে পারে, তবু পশুটি কোন প্রতিবাদ করে না। তার সত্যিই কোন স্বাধীনতা নেই। ভগবদ্ভক্তও তেমনই নির্বিকার। সম্পূর্ণভাবে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হয়ে তিনি যখন পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করেন, তিনি যখন পরম সত্যকে দর্শন করেন, তখন জড় জগতের উপর আধিপত্য করার কোন বাসনা তাঁর থাকে না। জীবন ধারণের জন্য অসৎ উপায়ে অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টাকে তিনি তখন নিতান্তই হাস্যকর বলে মনে করেন। তাই, এই সমস্ত জড়-জাগতিক পাপের দ্বারা তিনি আর কলুষিত হন না। তখন তিনি তাঁর সব রকমের কাজকর্মের ফল থেকে মুক্ত থাকেন।

শ্লোক ২২

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২ ॥

যদৃচ্ছা—অনায়াসে; **লাভ**—লাভে; **সন্তুষ্টঃ**—সন্তুষ্ট; **দ্বন্দ্ব**—দ্বন্দ্ব; **অতীতঃ**—অতীত; **বিমৎসরঃ**—মাৎসর্যমুক্ত; **সমঃ**—স্থির; **সিদ্ধৌ**—সিদ্ধি লাভে; **অসিদ্ধৌ**—অসাফল্যে; **চ**—ও; **কৃত্বা**—করলেও; **অপি**—যদিও; **ন**—না; **নিবধ্যতে**—প্রভাবিত হন।

গীতার গান

যথালাভ তথা তুষ্ট সর্ব দ্বন্দ্বমুক্ত ।
নির্মৎসর সমচিত্ত নিজ কর্মে যুক্ত ॥
সিদ্ধাসিদ্ধ সমদৃষ্টি নাহিত বিদ্বেষ ।
করিয়াও সর্ব কর্ম কর্মফল শেষ ॥

অনুবাদ

যিনি অনায়াসে যা লাভ করেন, তাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, যিনি সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ আদি দ্বন্দ্বের বশীভূত হন না এবং মাৎসর্যশূন্য, যিনি কার্যের সাফল্য ও অসাফল্যে অবিচলিত থাকেন, তিনি কর্ম সম্পাদন করলেও কর্মফলের দ্বারা কখনও আবদ্ধ হন না।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনার অমৃত লাভ করেছেন যে মানুষ, তিনি তাঁর শরীর সংরক্ষণের জন্যও অতিরিক্ত প্রচেষ্টা করেন না। অনায়াসে তিনি যা পান, তাতেই সন্তুষ্ট থাকেন। অযাচিতভাবে তাঁর কাছে যা আসে, তিনি কেবল তা-ই গ্রহণ করেন। তিনি ভিক্ষা করেন না, আবার ঋণও করেন না। তাঁর সাধ্যানুসারে পরিশ্রম করে চলেন এবং তার ফলে তিনি যা পান, তা ভগবানের দান বলে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট থাকেন। তাই, তাঁর জীবন ধারণের ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণভাবে উদাসীন। শ্রীকৃষ্ণের দাসত্বে বিঘ্ন হবে বলে, তিনি অন্য আর কারও দাসত্ব করেন না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের দাসত্ব করার জন্য তিনি যে কোন রকম কাজ করতে প্রস্তুত থাকেন। জড় জগতের দ্বন্দ্বভাব—শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ, তাঁকে কোন অবস্থাতেই প্রভাবিত করতে পারে না। কৃষ্ণভাবনামৃতের আস্বাদ লাভ করার ফলে তিনি জড় ইন্দ্রিয় অনুভূতির অতীত, তাই ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির প্রকাশ-স্বরূপ এই দ্বন্দ্বভাব থেকে তিনি সম্পূর্ণভাবে মুক্ত থেকে সর্ব অবস্থাতেই শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ বিধান করতে চেষ্টা করেন। তাই সাফল্য ও ব্যর্থতা—এই দুয়ের প্রভাব থেকেই তিনি মুক্ত থাকেন। পূর্ণরূপে যিনি ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছেন, তাঁর মধ্যে এই সমস্ত লক্ষণগুলি প্রকট হয়।

শ্লোক ২৩

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩ ॥

গতসঙ্গস্য—জড়া প্রকৃতির গুণের প্রতি অনাসক্ত ব্যক্তি; **মুক্তস্য**—মুক্ত; **জ্ঞানাবস্থিত**—চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত; **চেতসঃ**—চিত্ত; **যজ্ঞায়**—যজ্ঞের (শ্রীকৃষ্ণের) উদ্দেশ্যে; **আচরতঃ**—আচরণ করে; **কর্ম**—কর্ম; **সমগ্রম্**—সম্পূর্ণরূপে; **প্রবিলীয়তে**—লয় প্রাপ্ত হয়।

গীতার গান

অসঙ্গ নিযুক্ত জ্ঞানী চিত্তে ক্ষোভ নাই ।
জ্ঞানাবস্থিত সেই সর্বদা সব ঠাঁই ॥
সেই সে যাজ্ঞিক সদা আচরণে দক্ষ ।
তার কর্ম প্রবিলীত একান্ত সমক্ষ ॥

অনুবাদ

জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে, চিন্ময় জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি যজ্ঞের উদ্দেশ্যে যে কর্ম সম্পাদন করেন, সেই সকল কর্ম সম্পূর্ণরূপে লয় প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভক্তি লাভ করে মানুষ যখন দ্বন্দ্বভাব থেকে মুক্ত হন, তখন তিনি প্রকৃতির ত্রিগুণের কলুষ থেকে মুক্তি লাভ করেন। তিনি তখন যথার্থ মুক্ত, কারণ তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্পর্ক উপলব্ধি করতে পারেন এবং তখন আর তাঁর মন কৃষ্ণভাবনা থেকে বিচলিত হয় না। তখন তিনি যা-ই করেন, তা কেবল আদি বিষ্ণু—শ্রীকৃষ্ণের জন্যই করেন। তাই, তাঁর সমস্ত কাজকর্ম যজ্ঞময় হয়ে ওঠে, কারণ যজ্ঞের উদ্দেশ্য হচ্ছে যজ্ঞেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে তুষ্ট করা। তাঁর সমস্ত কাজকর্মই অপ্রাকৃত তত্ত্বে পর্যবসিত হয়, তাই তাঁকে আর কর্মফল-জনিত ক্লেশভোগ করতে হয় না।

শ্লোক ২৪

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্ ।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্ম—চিন্ময় প্রকৃতি; **অর্পণম্**—অর্পণ; **ব্রহ্ম**—পরম; **হবিঃ**—ঘৃত; **ব্রহ্ম**—চিন্ময়; **অগ্নৌ**—অগ্নিতে; **ব্রহ্মণা**—আত্মার দ্বারা; **হুতম্**—নিবেদিত হয়; **ব্রহ্ম**—চিৎ-জগৎ; **এব**—অবশ্যই; **তেন**—তাঁর দ্বারা; **গন্তব্যম্**—গন্তব্য; **ব্রহ্ম**—চিন্ময়; **কর্ম**—কর্ম; **সমাধিনা**—সমাহিত হয়ে।

গীতার গান

ব্রহ্মময় কর্ম, তার ব্রহ্মেতে অর্পণ ।
ব্রহ্ম হবি ব্রহ্ম অগ্নি হোতা ব্রহ্মফল ॥
তাহার সে ব্রহ্মগতি নিশ্চিত নির্ণয় ।
ব্রহ্ম কর্ম সমাধিস্থ সর্বত্র বিজয় ॥

অনুবাদ

যিনি কৃষ্ণভাবনায় সম্পূর্ণ মগ্ন তিনি অবশ্যই চিৎ-জগতে উন্নীত হবেন, কারণ তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ চিন্ময়। তাঁর কর্মের উদ্দেশ্য চিন্ময় এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি যা নিবেদন করেন, তাও চিন্ময়।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত কর্মের প্রভাবে কিভাবে পরমার্থ সাধিত হয়, তা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম নানা প্রকারের হতে পারে। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে তা বিশদভাবে বর্ণনা করা হবে। কিন্তু তার আগে, এখানে কেবল কৃষ্ণভাবনার মূল তত্ত্ব বর্ণনা করা হচ্ছে। বদ্ধ জীব জড় কলুষের দ্বারা কলুষিত, তাই তাকে নিশ্চিতভাবে জড়-জাগতিক পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে কাজকর্ম করতে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে এই পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। যে পন্থা অবলম্বন করে বদ্ধ জীব এই পরিবেশ থেকে মুক্ত হতে পারে, তাকেই বলা হয় কৃষ্ণভাবনামৃত বা ভগবদ্ভক্তি। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, নানা রকম দুগ্ধজাত খাদ্যের অত্যাহারের ফলে যখন পেটের অসুখ হয়, তখন আর একটি দুগ্ধজাত খাদ্য দইয়ের দ্বারা সেই রোগ নিবারণ করা হয়। ঠিক তেমনই, বিষয়াসক্ত বদ্ধ জীবের ভবরোগ নিরাময় করা যায় *ভগবদ্গীতায়* বর্ণিত কৃষ্ণভাবনার অমৃতের দ্বারা। ভবরোগ নিরাময়ের এই পন্থাকে বলা হয় যজ্ঞ, অর্থাৎ যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণকে তুষ্ট করার জন্য কাজকর্ম বা যজ্ঞ করা। জড় জগতের যত বেশি কার্যকলাপ কৃষ্ণভাবনায় অথবা বিষ্ণুর জন্য অনুষ্ঠিত হয়, সম্পূর্ণ অভিনিবিষ্টতার ফলে তত বেশি জড় পরিবেশ চিন্ময়ত্ব লাভ করে। *ব্রহ্ম* বলতে বোঝায় 'চিন্ময়'। ভগবান

হচ্ছেন চিন্ময় এবং তাঁর দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটাকে বলা হয় ব্রহ্মজ্যোতি। বিশ্বচরাচরের সব কিছুই এই ব্রহ্মজ্যোতিতে অবস্থান করছে। কিন্তু সেই জ্যোতি মায়া অথবা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কলুষের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পড়লে তাকে প্রাকৃত বা জড়-জাগতিক বলা হয়। তখন সব কিছুই জড় বলে প্রতিভাত হয়। এই জড় আবরণকে কৃষ্ণভাবনার প্রভাবে উন্মোচিত করা যায়। তাই, ভগবদ্ভাবনায় ভাবিত হয়ে আমরা যখন ভগবানের চরণে কোন কিছু উৎসর্গ করি, তখন অর্পণ, হবি, অগ্নি, হোতা ও ফল অথবা যখন ভগবানের প্রসাদরূপে কোন কিছু গ্রহণ করি, তখন তা সবই একই তত্ত্বে পর্যবসিত হয়—*ব্রহ্মন্* অথবা পরমতত্ত্ব। পরমতত্ত্ব যখন মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে, তখন তাকে জড় পদার্থ বলে মনে হয়। আবার এই জড় পদার্থ দিয়ে যখন ভগবানের সেবা করা হয়, তখন তা অপ্রাকৃত তত্ত্বে পর্যবসিত হয়। এভাবেই কৃষ্ণভাবনামৃত বা ভগবদ্ভক্তির দ্বারা আমরা আমাদের জড় চেতনাকে *ব্রহ্মন্* অথবা পরমতত্ত্বে রূপান্তরিত করতে পারি। মন যখন সর্বতোভাবে কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন থাকে, তখন তাকে বলা হয় সমাধি। এই প্রকার অপ্রাকৃত চেতনায় যখন কোন কিছু করা হয়, তখন তাকে বলা হয় যজ্ঞ। এই চিন্ময় চেতনায় অর্পণ, অর্পিত হবি, অগ্নি, হোতা—সবই ব্রহ্মময় হয়ে ওঠে, অর্থাৎ অপ্রাকৃত তত্ত্বে পর্যবসিত হয়। এটিই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনার পদ্ধতি।

শ্লোক ২৫

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্যুপাসতে ।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫ ॥

দৈবম্—দেবতাদের পূজায়; **এব**—এভাবে; **অপরে**—অন্য অনেকে; **যজ্ঞম্**—যজ্ঞ; **যোগিনঃ**—যোগিগণ; **পর্যুপাসতে**—যথাযথভাবে উপাসনা করেন; **ব্রহ্ম**—চিন্ময় তত্ত্বরূপ; **অগ্নৌ**—অগ্নিতে; **অপরে**—অন্যেরা; **যজ্ঞম্**—যজ্ঞ; **যজ্ঞেন**—যজ্ঞের দ্বারা; **এব**—এভাবে; **উপজুহ্বতি**—আহুতি প্রদান করেন।

গীতার গান

দৈব যজ্ঞ করে পরে সেও যোগী হয় ।
ব্রহ্মজ্ঞানী সেও যোগী হোমাদি নিলয় ॥

অনুবাদ

কোনও কোনও যোগী দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করার মাধ্যমে তাঁদের উপাসনা করেন, আর অন্য অনেকে ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে সব কিছু নিবেদন করার মাধ্যমে যজ্ঞ করেন।

তাৎপর্য

পূর্বের বর্ণনা অনুসারে, কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে যিনি তাঁর কর্তব্য পালন করেন, তাঁকে বলা হয় সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। কিন্তু এমনও অনেক মানুষ আছেন, যাঁরা দেবোপাসনা করার জন্য অনুরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। আবার অনেকে আছেন, যাঁরা ব্রহ্ম অথবা ভগবানের নির্বিশেষ রূপের উদ্দেশ্যে সব কিছু উৎসর্গ করেন। এর থেকে বোঝা যায় যে, বিভিন্ন লোকে বিভিন্নভাবে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে যজ্ঞ কেবল ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে তুষ্ট করার জন্য অনুষ্ঠিত হয় এবং বিষ্ণুর আর এক নাম যজ্ঞ। সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠানকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। তার একটি হচ্ছে জড় সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্য এবং অন্যটি হচ্ছে ভগবানকে জানবার জন্য। যাঁরা প্রকৃতই জ্ঞানী, যাঁরা ভগবানের ভক্ত, তাঁরা ভগবানকে তুষ্ট করার জন্য তাঁদের সব কিছুই ভগবানের চরণে অর্পণ করেন। কিন্তু আর এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা আরও বেশি করে জড় সুখভোগ করবার জন্য ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ আদি দেবতাদের উপাসনা করে যজ্ঞ করেন। এই সমস্ত দেবতারা হচ্ছেন অগ্নি, বায়ু, জল, বজ্র আদি প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির পর্যবেক্ষক। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই তাঁদের এই সমস্ত দায়িত্বশীল কর্মে নিয়োগ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, এই সমস্ত শক্তি ভগবানেরই শক্তি, এগুলি কোন দেবতার নিজস্ব শক্তি নয়। তবে ভগবানের আদেশ অনুসারে তাঁরা এই সমস্ত শক্তির পরিচালনা করেন। যারা জড় সুখভোগ করার জন্য বৈদিক কর্মকাণ্ড অনুসারে বিভিন্ন যজ্ঞের দ্বারা দেব-দেবীর পূজা করে, তাদের বলা হয় 'বহু-ঈশ্বরবাদী'। আর এক শ্রেণীর অধ্যাত্মবাদী আছেন, যাঁরা পরম-তত্ত্বের নির্বিশেষ রূপের উপাসনা করেন এবং বিভিন্ন দেব-দেবীর অনিত্যতা অনুভব করে ব্রহ্মজ্যোতিতে তাঁদের পৃথক সত্তা উৎসর্গ করে ব্রহ্মে লীন হয়ে যান। এই সমস্ত নির্বিশেষবাদীরা ব্রহ্মতত্ত্বের চিন্ময় স্বরূপ উপলব্ধি করবার জন্য দার্শনিক মনোধর্মের পন্থা অবলম্বন করেন। পক্ষান্তরে, সকাম কর্মী ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য তাঁর জাগতিক সম্পদ উৎসর্গ করেন, আর নির্বিশেষবাদী ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যাবার জন্য তাঁর জড় উপাধিসমূহ উৎসর্গ করেন। নির্বিশেষবাদীদের কাছে যজ্ঞাগ্নি হচ্ছে পরমব্রহ্ম এবং ব্রহ্মাগ্নিতে তাদের অস্তিত্বের আহুতি হচ্ছে যজ্ঞার্পণ। কিন্তু অর্জুনের মতো কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ বিধানের জন্য সর্বস্ব

অর্পণ করেন—এমন কি তাঁর আত্ম-স্বরূপও ভগবানের শ্রীচরণে সমর্পিত। এভাবেই, কৃষ্ণভক্ত হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী, কিন্তু তিনি কখনও তাঁর পৃথক স্বরূপের বিনাশ সাধন করেন না।

শ্লোক ২৬

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি ।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬ ॥

শ্রোত্রাদীনি—শ্রবণ আদি; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **অন্যে**—অন্যেরা; **সংযম**—সংযমরূপ; **অগ্নিষু**—অগ্নিতে; **জুহ্বতি**—আহুতি দেন; **শব্দাদীন্**—শব্দ আদি; **বিষয়ান্**—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় আদি; **অন্যে**—অন্যেরা; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়রূপ; **অগ্নিষু**—অগ্নিতে; **জুহ্বতি**—আহুতি প্রদান করেন।

গীতার গান

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর যজ্ঞ ইন্দ্রিয় সংযম ।
শ্রোতাদি মানস তপ অগ্নিতে অর্পণ ॥
রূপ রস শব্দ স্পর্শ বিষয়ে সংযম ।
যজ্ঞাহুতি সেই হয় ইন্দ্রিয় হবন ॥

অনুবাদ

কেউ কেউ (শুদ্ধ ব্রহ্মচারীরা) মনঃসংযমরূপ অগ্নিতে শ্রবণ আদি ইন্দ্রিয়গুলিকে আহুতি দেন, আবার অন্য অনেকে (নিয়মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা) শব্দাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলিকে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে আহুতি দেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—মানব-জীবনের এই চারটি আশ্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে পূর্ণ যোগী হতে সহায়তা করা। পশুদের মতো ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করা মানব-জীবনের উদ্দেশ্য নয়। তাই, মানব-জীবনের এই চারটি আশ্রমকে এমনভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, যাতে মানুষ তার পারমার্থিক জীবনে পূর্ণতা লাভ করতে পারে। ব্রহ্মচারীরা সদ্গুরুর তত্ত্বাবধানে থেকে ইন্দ্রিয় দমন করে মনঃসংযম করেন। এই শ্লোকে তাঁদের সম্বন্ধে বলা হচ্ছে যে, তাঁরা তাদের শ্রবণ ইন্দ্রিয়কে এবং অন্যান্য

ইন্দ্রিয়কে চিত্তসংযমরূপী আগুনে অর্পণ করে। ব্রহ্মচারীরা কেবলমাত্র কৃষ্ণভাবনা সম্বন্ধীয় শব্দই শ্রবণ করেন। জ্ঞান আহরণ করবার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে শ্রবণ, তাই প্রকৃত ব্রহ্মচারী সর্বক্ষণ *হরের্নামানুকীর্তনম্* অর্থাৎ, ভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তনে তন্ময় হয়ে থাকেন। তিনি কখনও লৌকিক আলোচনা বা গ্রাম্য কথা শ্রবণ করেন না। জড় জগতের যে শব্দ, সেই শব্দ মনকে জড় বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে—মনকে জড় অভিমুখী করে তোলে। তাই ব্রহ্মচারী কখনও সেই রকম শব্দে কর্ণপাত না করে সর্বক্ষণ ভগবানের দিব্যনাম শ্রবণ ও কীর্তন করেন—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

তেমনই আবার যিনি গৃহস্থ, যিনি ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করার অনুমতি লাভ করেছেন, তিনি অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে সেই কার্যে লিপ্ত হন। যৌনসঙ্গ, মাদকদ্রব্য সেবন, আমিষ আহার আদির প্রতি মানুষের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে। কিন্তু সংযমী গৃহস্থ মৈথুনাদি বিষয় বা ইন্দ্রিয়তর্পণে কখনই অনিয়ন্ত্রিতভাবে প্রবৃত্ত হন না। তাই, প্রতিটি সভ্য সমাজেই ধর্মীয় জীবনের ভিত্তিতে বিবাহের প্রচলন দেখা যায়, কারণ সংযত যৌন জীবন যাপনের সেটিই ঠিক পথ। এই ধরনের সংযত, আসক্তি রহিত কামও এক প্রকার যজ্ঞ, কারণ এর মাধ্যমে সংযমী গৃহস্থ তাঁর বিষয়-ভোগোন্মুখ প্রবৃত্তিকে তাঁর পারমার্থিক জীবনের মহৎ উদ্দেশ্যের কাছে উৎসর্গ করেন।

শ্লোক ২৭

সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে ।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭ ॥

সর্বাণি—সমস্ত; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়; **কর্মাণি**—কর্মসমূহ; **প্রাণকর্মাণি**—প্রাণবায়ুর কার্যকলাপ; **চ**—ও; **অপরে**—অন্যেরা; **আত্মসংযম**—মনঃসংযমের; **যোগ**—যুক্ত হওয়ার পন্থা; **অগ্নৌ**—অগ্নিতে; **জুহ্বতি**—আহুতি দেন; **জ্ঞানদীপিতে**—আত্মজ্ঞানের দ্বারা প্রদীপ্ত।

গীতার গান

সর্বেন্দ্রিয় কর্ম প্রাণ সংযম অগ্নিতে ।
যত্নশীল যত যোগী হবন করিতে ॥

আত্মসংযমাদি যোগ জ্ঞান দীপিতে।
পৃথক পৃথক যোগী হয় যুক্ত সে যোগেতে ॥

অনুবাদ

মন ও ইন্দ্রিয়-সংযমের মাধ্যমে যাঁরা আত্মজ্ঞান লাভের প্রয়াসী, তাঁরা তাঁদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ ও প্রাণবায়ু জ্ঞানের দ্বারা প্রদীপ্ত আত্মসংযমরূপ অগ্নিতে আহুতি দেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে পতঞ্জলি প্রণীত যোগপদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। পতঞ্জলির *যোগসূত্রে* আত্মাকে *প্রত্যগাত্মা* ও *পরাগাত্মা* নামে অভিহিত করা হয়েছে। আত্মা যখন ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত থাকে, তখন তাকে বলা হয় *পরাগাত্মা*। কিন্তু যখনই জীবাত্মা ঐ ধরনের ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ থেকে আসক্তি রহিত হয়, তখন তাকে বলা হয় *প্রত্যগাত্মা*। আত্মা জীবদেহের অভ্যন্তরে দশ রকমের বায়ুর কার্যকলাপের অধীন থাকে। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়ার মাধ্যমে এটি অনুভব করা যায়। পতঞ্জলির যোগপদ্ধতি শিক্ষা দেয় কিভাবে দেহস্থিত বায়ুকে নিয়ন্ত্রিত করে আত্মাকে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত করা যায়। এই যোগপদ্ধতি অনুসারে প্রত্যগাত্মাই হচ্ছে চরম উদ্দেশ্য। এই প্রত্যগাত্মা হচ্ছে জড় কার্যকলাপ থেকে প্রত্যাহার। ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় পরস্পরের উপর ক্রিয়া করে। যেমন শ্রবণের জন্য কান, দৃষ্টির জন্য চোখ, ঘ্রাণের জন্য নাক, আস্বাদনের জন্য জিহ্বা ও স্পর্শের জন্য ত্বক এবং এরা সকলেই আত্মার বাইরে নানা রকম কাজকর্ম করে চলেছে। প্রাণবায়ুর ক্রিয়ার প্রভাবে এগুলি সম্ভব হয়। অপান বায়ুর গতি অধোগামী, ব্যান বায়ুর প্রভাবে সংকোচন ও প্রসারণ হয়, সমান বায়ু সমতা বজায় রাখে, আর উদান বায়ু ঊর্ধ্বগামী। প্রবুদ্ধ মানুষ এদের সকলকে আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধানে নিযুক্ত করেন।

শ্লোক ২৮

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

দ্রব্যযজ্ঞাঃ—দ্রব্য অর্পণরূপ যজ্ঞ; **তপোযজ্ঞাঃ**—তপস্যার মাধ্যমে যজ্ঞ; **যোগযজ্ঞাঃ**—অষ্টাঙ্গ যোগরূপী যজ্ঞ; **তথা**—তেমনই; **অপরে**—অন্যেরা; **স্বাধ্যায়**—বেদ অধ্যয়নরূপ যজ্ঞ; **জ্ঞানযজ্ঞাঃ**—দিব্যজ্ঞান লাভরূপ যজ্ঞ; **চ**—ও; **যতয়ঃ**—তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ; **সংশিতব্রতাঃ**—কঠোর ব্রতপরায়ণ।

গীতার গান

দ্রব্যযজ্ঞ তপোযজ্ঞ যোগযজ্ঞ যত।
স্বাধ্যায় যোগীর জ্ঞান শংসিত সে ব্রত ॥

অনুবাদ

কঠোর ব্রত গ্রহণ করে কেউ কেউ দ্রব্য দানরূপ যজ্ঞ করেন। কেউ কেউ তপস্যারূপ যজ্ঞ করেন, কেউ কেউ অষ্টাঙ্গ-যোগরূপ যজ্ঞ করেন এবং অন্য অনেকে পারমার্থিক জ্ঞান লাভের জন্য বেদ অধ্যয়নরূপ যজ্ঞ করেন।

তাৎপর্য

এই সমস্ত যজ্ঞকে নানা রকম শ্রেণীবিভাগ করা যেতে পারে। অনেক লোক আছে, যারা নানা রকম দান-ধ্যান করার মাধ্যমে যজ্ঞ সম্পন্ন করে। ভারতবর্ষে অনেক ধনী-বণিক ও রাজ-পরিবারের লোক আছেন, যাঁরা ধর্মশালা, অন্নক্ষেত্র, অতিথিশালা, অনাথাশ্রম, বিদ্যাপীঠ আদি নানা রকম দাতব্য সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যান্য দেশেও হাসপাতাল, বৃদ্ধদের আশ্রয়-ভবন এবং এই ধরনের নানা রকম দাতব্য সংস্থা রয়েছে, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে দুঃস্থ-দরিদ্রদের খাদ্যসামগ্রী দান করা, শিক্ষা দান করা ও ঔষধ বিতরণ করা। এই সমস্ত দানকর্মকে বলা হয় *দ্রব্যময়-যজ্ঞ*। অনেক লোক আছেন যাঁরা উন্নততর জীবন অথবা স্বর্গারোহণ করবার জন্য চন্দ্রায়ণ, চাতুর্মাস্য আদি স্বেচ্ছামূলক তপশ্চর্যার অনুশীলন করেন। এই সমস্ত পন্থায় বিশেষ বিধি-নিষেধের মাধ্যমে জীবনযাত্রাকে পরিচালিত করবার জন্য কঠোর ব্রত পালন করতে হয়। যেমন, চাতুর্মাস্য ব্রত পালনকারী চার মাস দাড়ি কামান না, নিষিদ্ধ জিনিস আহার করেন না, দিনে একবারের বেশি দুবার আহার গ্রহণ করেন না, অথবা কখনও গৃহ পরিত্যাগ করেন না। এভাবেই সাংসারিক সুখ পরিত্যাগ করাকে বলা হয় *তপোময়-যজ্ঞ*। আর এক ধরনের লোক আছেন, যাঁরা ব্রহ্মৈক্য লাভ করবার জন্য পাতঞ্জল-যোগ, হঠযোগ ও অষ্টাঙ্গযোগ আদির অনুশীলনে প্রবৃত্ত থাকেন। কেউ আবার সমস্ত পবিত্র তীর্থে ভ্রমণ করেন। এই সমস্ত ক্রিয়াকে বলা হয় *যোগ-যজ্ঞ*, অর্থাৎ এই জড় জগতে বিশেষ ধরনের সিদ্ধি লাভের জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা। অনেকে আছেন, যাঁরা নানা রকম বৈদিক শাস্ত্র, বিশেষ করে *উপনিষদ, বেদান্ত-সূত্র* অথবা *সাংখ্য-দর্শন* পাঠ করেন। এগুলিকে বলা হয় *স্বাধ্যায়-যজ্ঞ*। এই সমস্ত যোগীরা শ্রদ্ধা সহকারে বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞে নিয়োজিত এবং তাঁরা উচ্চতর জীবনের অভিলাষী। কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত এই সমস্ত যজ্ঞ

থেকে ভিন্ন, কারণ তা হচ্ছে পরম রসমাধুর্যপূর্ণ ভগবানের সাক্ষাৎ সেবা। উপরোক্ত কোন প্রকার যজ্ঞের মাধ্যমে এই কৃষ্ণভাবনামৃত বা ভক্তিযোগ লাভ করা যায় না, তা লাভ করা যায় কেবল ভগবান ও তাঁর শুদ্ধ ভক্তের কৃপার ফলে। তাই, কৃষ্ণভাবনামৃত হচ্ছে দিব্য, অপ্রাকৃত।

শ্লোক ২৯

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে ।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ।
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥ ২৯ ॥

অপানে—অধোগামী বায়ুতে; **জুহ্বতি**—আহুতি দেন; **প্রাণম্**—ঊর্ধ্বগামী বায়ুকে; **প্রাণে**—ঊর্ধ্বগামী বায়ুতে; **অপানম্**—অধোগামী বায়ুকে; **তথা**—তেমনই; **অপরে**—অপর কেউ; **প্রাণ**—প্রাণবায়ু; **অপান**—অপান বায়ু; **গতী**—গতি; **রুদ্ধ্বা**—নিরোধ করে; **প্রাণায়াম**—শ্বাস-প্রশ্বাস সংযমের মাধ্যমে প্রাণায়াম; **পরায়ণাঃ**—পরায়ণ; **অপরে**—অপর কেউ; **নিয়ত**—নিয়ন্ত্রিত করে; **আহারাঃ**—আহার; **প্রাণান্**—প্রাণবায়ুকে; **প্রাণেষু**—প্রাণবায়ুতে; **জুহ্বতি**—আহুতি প্রদান করেন।

গীতার গান

প্রাণাপান যোগক্রিয়া অপানে হবন ।
প্রাণাপান গতিরুদ্ধ প্রাণায়ামী হন ॥
আহারাদি খর্ব করি নিয়ত আহার ।
প্রাণকে প্রাণেতে দেয় হোমের আকার ॥

অনুবাদ

আর যাঁরা প্রাণায়াম চর্চায় আগ্রহী, তাঁরা অপান বায়ুকে প্রাণবায়ুতে এবং প্রাণবায়ুকে অপান বায়ুতে আহুতি দিয়ে অবশেষে প্রাণ ও অপান বায়ুর গতি রোধ করে সমাধিস্থ হন। কেউ আবার আহার সংযম করে প্রাণবায়ুকে প্রাণবায়ুতেই আহুতি দেন।

তাৎপর্য

যোগে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের প্রণালীকে বলা হয় প্রাণায়াম। প্রাথমিক স্তরে হঠযোগে বিভিন্ন প্রণালী অভ্যাস করার মাধ্যমে এই প্রাণায়ামের অনুশীলন করা

হয়। ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করে পারমার্থিক উন্নতি সাধন করবার জন্য এই সমস্ত বিধি বিধান দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত ক্রিয়া অনুশীলন করার ফলে দেহস্থিত বায়ুকে নিয়ন্ত্রিত করে বিপরীত দিকে চালিত করা হয়। অপান বায়ুর গতি নিম্নমুখী এবং প্রাণবায়ুর গতি ঊর্ধ্বমুখী। প্রাণায়াম অনুশীলনের মাধ্যমে যোগী এই বায়ু দুটিকে বিপরীত মুখে চালিত করে তাদের বেগকে দমন করেন এবং 'পূরকে' তাদের ভারসাম্যের সৃষ্টি করেন। এভাবেই নিঃশ্বাসকে যখন প্রশ্বাসে অর্পণ করা হয়, তখন তাকে বলা হয় 'রেচক'। দুটি বায়ুর গতিকে যখন স্থির করা হয়, তখন তাকে বলা হয় 'কুম্ভক'। এই কুম্ভকের অনুশীলনের ফলে যোগীরা পারমার্থিক উপলব্ধির পূর্ণতা লাভের উদ্দেশ্যে তাঁদের আয়ু বৃদ্ধি করতে পারেন। প্রবুদ্ধ যোগী একই জন্মে পারমার্থিক উপলব্ধির চরম পূর্ণতা লাভ করতে চান, পরবর্তী জন্মের জন্য প্রতীক্ষা করতে ইচ্ছা করেন না। সেই জন্য, কুম্ভক-যোগ সাধনার মাধ্যমে যোগীরা বহু বহু বছর আয়ু বৃদ্ধি করে নিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ভক্তিযোগে নিত্যযুক্ত কৃষ্ণভক্ত অপ্রাকৃত ভগবৎ-প্রেমে মগ্ন থাকার ফলে, অনায়াসে তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করতে সক্ষম হন। তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি সর্বক্ষণ ভগবানের সেবায় নিয়োজিত থাকে, তাই আর তিনি বিষয়ে প্রবৃত্ত হন না। সুতরাং জীবনের শেষে, তিনি অনায়াসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় স্তরে প্রবেশ করেন। বিভিন্ন যোগক্রিয়ার মাধ্যমে তাঁর আয়ুকে বর্ধিত করে বহু দিন এই জড় জগতে বাস করার কোন বাসনাই তাঁর থাকে না। সর্ব অবস্থাতেই তিনি মুক্ত পুরুষ। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৬) বলা হয়েছে—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"যিনি ভগবানের প্রতি শুদ্ধ ভক্তিমূলক সেবায় নিয়োজিত থাকেন, তিনি জড়া প্রকৃতির গুণগুলিকে অতিক্রম করেন এবং অচিরেই চিন্ময় স্তরে উন্নীত হন।" প্রকৃতপক্ষে, কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হবার সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধ ভক্ত জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করেন। ব্রহ্মভূত স্তর থেকেই কৃষ্ণভাবনামৃতের শুরু হয়। কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত মহাত্মারা তাই সর্বদাই অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত। এই স্তর থেকে তিনি কখনই পতিত হন না এবং অন্তকালে অবিলম্বে তিনি ভগবানের চিন্ময় ধামে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন। কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করেন বলে তিনি সর্বদাই অল্পাহারী এবং তার ফলে তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি সর্বদাই সংযত। আর ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত না করতে পারলে কোন মতেই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না।

শ্লোক ৩০

সর্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ ।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৩০ ॥

সর্বে—সকলে; **অপি**—আপাতদৃষ্টিতে পৃথক হলেও; **এতে**—এঁরা সকলে; **যজ্ঞবিদঃ**—যজ্ঞবিদ; **যজ্ঞক্ষপিত**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে নির্মল হয়ে; **কল্মষাঃ**—পাপ থেকে; **যজ্ঞশিষ্ট**—এই প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফল; **অমৃতভুজঃ**—অমৃত ভোজনকারীরা; **যান্তি**—লাভ করেন; **ব্রহ্ম**—পরম; **সনাতনম্**—সনাতন প্রকৃতি।

গীতার গান

এই সব তত্ত্ববিৎ ক্ষীণ পাপ হয় ।
ক্রমে ক্রমে পাপহীন ব্রহ্ম সে প্রাপয় ॥
যজ্ঞনিষ্ঠ ভোজী তারা নিষ্পাপ জীবন ।
যোগ্য ব্যক্তি হয় লাভে ব্রহ্ম সনাতন ॥

অনুবাদ

এঁরা সকলেই যজ্ঞতত্ত্ববিৎ এবং যজ্ঞের প্রভাবে পাপ থেকে মুক্ত হয়ে তাঁরা যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত আস্বাদন করেন, এবং তার পর সনাতন প্রকৃতিতে ফিরে যান।

তাৎপর্য

যজ্ঞাদি সম্পর্কিত পূর্বোক্ত বর্ণনায় জানতে পারা যায় যে, দ্রব্যময়-যজ্ঞ, তপোময়-যজ্ঞ, যাগ-যজ্ঞ, স্বাধ্যায়-যজ্ঞ আদি অনুষ্ঠানের সাধারণ উদ্দেশ্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়-সংযম করা। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনাই হচ্ছে ভবরোগের মূল কারণ। তাই, ইন্দ্রিয়-সুখের ভোগবাসনা পরিত্যাগ না করতে পারলে সচ্চিদানন্দময় জীবনের স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব নয়। এই স্তর হচ্ছে শাশ্বত ব্রহ্ম পরিবেশ। পূর্বোক্ত সব কয়টি যজ্ঞ পাপপূর্ণ জীবনের কলুষ থেকে মানুষকে মুক্ত করতে সাহায্য করে। এই আত্মোন্নতির দ্বারা কেবল এই জীবনেই সুখ-বৈভবের প্রাপ্তি হয়, তাই নয়, তা ছাড়া এই জীবনের শেষে নির্বিশেষ ব্রহ্মৈক্য লাভ অথবা ভগবৎ-ধামে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ হয়।

শ্লোক ৩১

নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১ ॥

ন—না; **অয়ম্**—এই; **লোকঃ**—জগৎ; **অস্তি**—আছে; **অযজ্ঞস্য**—যজ্ঞরহিত ব্যক্তির; **কুতঃ**—কোথায়; **অন্যঃ**—অন্য; **কুরুসত্তম**—হে কুরুশ্রেষ্ঠ।

গীতার গান

ইহলোকে যজ্ঞ বিনা কোন সুখ নাই ।
পরলোক বিনাযজ্ঞে কেমনে সে পাই ॥

অনুবাদ

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! যজ্ঞ অনুষ্ঠান না করে কেউই এই জগতে সুখে থাকতে পারে না, তা হলে পরলোকে সুখপ্রাপ্তি কি করে সম্ভব?

তাৎপর্য

জীব যে-রকম দেহই ধারণ করে এই জড় জগতে অবস্থান করুক না কেন, তার যথার্থ স্বরূপ তার কাছে অবধারিতভাবে অজ্ঞাত থাকে। পক্ষান্তরে বলা যায়, জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত পাপের ফলে জীবাত্মা এই জড় জগতে অবস্থান করে। অজ্ঞানতা হচ্ছে এই পাপ-পঙ্কিল জীবনের কারণ এবং জীবন যতক্ষণ পাপের দ্বারা কলুষিত থাকে, ততক্ষণ জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। জড় জগতের এই কারাগার থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে মানব-শরীর। তাই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সাধন করার মাধ্যমে এই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পথ *বেদ* দেখিয়ে দিচ্ছে। ধর্মের পথে অগ্রসর হয়ে বিভিন্ন যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলে, স্বাভাবিকভাবেই আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হয়। যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে খাদ্য, শস্য, দুধ আদি পর্যাপ্ত মাত্রায় অর্জন করা যায়, তখন অত্যধিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও খাদ্যদ্রব্যের কোন অনটন হয় না। দেহের এই সমস্ত স্থূল প্রয়োজনগুলি মিটে গেলে, তখন স্বভাবতই ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির প্রশ্ন আসে। তাই, *বেদে* নিয়ন্ত্রিতভাবে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য বিবাহ-যজ্ঞের বিধান বর্ণিত হয়েছে। এভাবেই ধীরে ধীরে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হবার দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। মুক্ত জীবনের সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে ভগবানের সঙ্গ লাভ করা। উপরের বর্ণনা অনুসারে আমরা দেখতে পাই যে, যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে জীবনের পূর্ণতা আসে। কিন্তু বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে যদি কেউ এই সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করে, তা হলে সে এই দেহের মাধ্যমে সুখী জীবনের কি করে আশা করতে পারে এবং অন্য গ্রহে গিয়ে পরবর্তী জীবনের তো কথাই নেই? বিভিন্ন

রকমের স্বর্গলোকে সুখভোগ করার পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। সুতরাং বিভিন্ন রকমের যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে সব দিক দিয়েই অসীম সুখভোগ করা যায়। কিন্তু সর্বোচ্চ সুখ কেবল তখনই অনুভব করা যায়, যখন কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে, ভগবানের চিন্ময় ধামে ভগবানের সাহচর্য লাভ করে ভগবানের সেবা করা যায়। তাই কৃষ্ণভক্তি সাধন করাটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ এবং সব রকম সমস্যার সমাধান করার সেটি শ্রেষ্ঠ উপায়।

শ্লোক ৩২

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে ।
কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২ ॥

এবম্—এভাবে; **বহুবিধাঃ**—বহুবিধ; **যজ্ঞাঃ**—যজ্ঞ; **বিততাঃ**—বিস্তৃত; **ব্রহ্মণঃ**—বেদের; **মুখে**—মুখে; **কর্মজান্**—কর্মজাত; **বিদ্ধি**—জানবে; **তান্**—তাদের; **সর্বান্**—সকলকে; **এবম্**—এভাবে; **জ্ঞাত্বা**—জেনে; **বিমোক্ষ্যসে**—মুক্তি লাভ করতে পারবে।

গীতার গান

হে পুরুষোত্তম! অতঃ যজ্ঞই যে ধর্ম ।
আর সব যাহা কিছু সকল বিকর্ম ॥
বেদাদি শাস্ত্রেতে তথা বহু যজ্ঞ হয় ।
কত শাখা প্রশাখাদি কে করে নির্ণয় ॥
সে সব যজ্ঞাদি জান সব কর্মজান ।
মুক্তিপথ সেই জান যজ্ঞ সে সর্বান ॥

অনুবাদ

এই সমস্ত যজ্ঞই বৈদিক শাস্ত্রে অনুমোদিত হয়েছে এবং এই সমস্ত যজ্ঞ বিভিন্ন প্রকার কর্মজাত। সেগুলিকে যথাযথভাবে জানার মাধ্যমে তুমি মুক্তি লাভ করতে পারবে।

তাৎপর্য

বিভিন্ন কর্মীর বিভিন্ন মনোবৃত্তি অনুসারে বেদে নানা রকম যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ মানুষই তার দেহাত্মবুদ্ধিতে তন্ময় হয়ে আছে। তাই, সমস্ত যজ্ঞের এমনভাবে ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে মানুষ তার দেহ, মন অথবা বুদ্ধির যোগ্যতা অনুসারে তাদের অনুষ্ঠান করতে পারে। কিন্তু সমস্ত যজ্ঞের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে দেহের বন্ধন থেকে জীবকে মুক্ত করা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে তাঁর নিজের মুখ থেকে সেই কথা প্রতিপন্ন করেছেন।

শ্লোক ৩৩

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩ ॥

শ্রেয়ান্—শ্রেয়; **দ্রব্যময়াৎ**—দ্রব্যময়; **যজ্ঞাৎ**—যজ্ঞ থেকে; **জ্ঞানযজ্ঞঃ**—জ্ঞানময় যজ্ঞ; **পরন্তপ**—হে শত্রু দমনকারী; **সর্বম্**—সমস্ত; **কর্ম**—কর্ম; **অখিলম্**—পূর্ণরূপে; **পার্থ**—হে পৃথাপুত্র; **জ্ঞানে**—জ্ঞানে; **পরিসমাপ্যতে**—সমাপ্ত হয়।

গীতার গান

কিন্তু শ্রেয় জ্ঞানযজ্ঞ দ্রব্য যজ্ঞাপেক্ষা ।
জ্ঞানীর নাহিক আর কর্মজ অপেক্ষা ॥
সর্ব কর্ম শেষ হয় জ্ঞানে সমাপন ।
কর্মশুদ্ধ চিত্তে হয় জ্ঞানের সাধন ॥

অনুবাদ

হে পরন্তপ। দ্রব্যময় যজ্ঞ থেকে জ্ঞানময় যজ্ঞ শ্রেয়। হে পার্থ! সমস্ত কর্মই পূর্ণরূপে চিন্ময় জ্ঞানে পরিসমাপ্তি লাভ করে।

তাৎপর্য

সমস্ত যজ্ঞের উদ্দেশ্য হচ্ছে পূর্ণ জ্ঞানে অধিষ্ঠিত হয়ে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া এবং অবশেষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অপ্রাকৃত প্রেম লাভ করে অপ্রাকৃত জগতে উত্তীর্ণ হয়ে তাঁর নিত্য সাহচর্য লাভ করা। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রত্যেকটি যজ্ঞেরই একটি নিগূঢ় রহস্য আছে এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে হলে সেই রহস্য সম্বন্ধে অবগত হওয়া প্রয়োজন। অনুষ্ঠানকারীর বিশ্বাস ও বাসনা অনুসারে যজ্ঞ বিভিন্নভাবে অনুষ্ঠিত হয়। অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞান লাভ করার কামনায় কেউ যখন জ্ঞানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সেই যজ্ঞ অপ্রাকৃত জ্ঞানরহিত কর্মযজ্ঞের থেকে শ্রেয়, কেন না

জ্ঞানবিহীন যজ্ঞ লৌকিক ক্রিয়া মাত্র—তাতে পরমার্থ লাভ হয় না। প্রকৃত জ্ঞান সর্বোচ্চ পর্যায়ের অপ্রাকৃত জ্ঞানে অর্থাৎ কৃষ্ণভাবনায় পরিসমাপ্তি হয়। জ্ঞানের স্তরে উন্নীত না হলে যজ্ঞানুষ্ঠান কেবলমাত্র জাগতিক কার্যকলাপ। যখন যজ্ঞের সকল কাজকর্ম অপ্রাকৃত জ্ঞানের স্তরে উন্নীত করে, তখন তার সুফল পারমার্থিক পর্যায়ে পর্যবসিত হয়। স্তরভেদে যজ্ঞ-ক্রিয়াকে কর্মকাণ্ড (সকাম কর্ম) অথবা জ্ঞানকাণ্ড (সত্য-জিজ্ঞাসা) বলা হয়। কিন্তু সেই যজ্ঞই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ, যার ফলে পরম জ্ঞান লাভ করা যায়।

শ্লোক ৩৪

তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪ ॥

তৎ—বিভিন্ন যজ্ঞের সেই জ্ঞান; **বিদ্ধি**—জানবার চেষ্টা কর; **প্রণিপাতেন**—সদ্‌গুরুর শরণাগত হয়ে; **পরিপ্রশ্নেন**—ঐকান্তিক বিনম্র প্রশ্নের দ্বারা; **সেবয়া**—সেবার দ্বারা; **উপদেক্ষ্যন্তি**—উপদেশ দান করবেন; **তে**—তোমাকে; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **জ্ঞানিনঃ**—আত্ম-তত্ত্ববেত্তা; **তত্ত্ব**—তত্ত্ব; **দর্শিনঃ**—দ্রষ্টাগণ।

গীতার গান

অতএব সে বিজ্ঞান যে জানিবারে চায় ।
উপযুক্ত গুরুপদ করয়ে আশ্রয় ॥
প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন সেবার সহিত ।
গুরুস্থানে জানি লও আপনার হিত ॥

অনুবাদ

সদ্‌গুরুর শরণাগত হয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার চেষ্টা কর। বিনম্র চিত্তে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর এবং অকৃত্রিম সেবার দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট কর। তা হলে সেই তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষেরা তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দান করবেন।

তাৎপর্য

পারমার্থিক উপলব্ধির পথ নিঃসন্দেহে দুর্গম। তাই, ভগবান আমাদের উপদেশ দিয়েছেন সেই সদ্‌গুরুর শরণাগত হতে, যিনি গুরু-পরম্পরার ধারায় ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছেন। গুরু-পরম্পরাক্রমে যিনি ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেননি, তিনি কখনই গুরু হতে পারেন না। ভগবান হচ্ছেন আদি গুরু। তিনি এই পরম তত্ত্বজ্ঞান সৃষ্টির আদিতে দান করেছিলেন। তারপর গুরু-শিষ্য ধারায় পরম্পরাক্রমে এই জ্ঞান প্রবাহিত হয়ে আসছে। তাই, এই পরম্পরার ধারায় যিনি এই জ্ঞান আহরণ করেছেন, তিনি এই জ্ঞানের প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং তিনিই এই জ্ঞানকে যথাযথরূপে দান করতে পারেন। মনগড়া একটি পদ্ধতির উদ্ভাবন করে আমরা কখনই ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারি না। একদল মূঢ় প্রতারক গুরু সেজে নানা রকম অশাস্ত্রীয় পদ্ধতির উদ্ভাবন করে লোক ঠকায়। এই জন্য *ভাগবতে* (৬/৩/১৯) বলা হয়েছে, *ধর্মং তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতম্*—ধর্মের পথ স্বয়ং ভগবানই প্রত্যক্ষভাবে নির্দেশ করেছেন। তাই, জল্পনা-কল্পনা বা বৃথা তর্ক অথবা শাস্ত্রগ্রন্থের মনগড়া ব্যাখ্যার মাধ্যমে কখনই আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর হওয়া যায় না। পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার জন্য কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা গুরুদেবের শরণাগত হতে হয়, সুদৃঢ় বিশ্বাসে তাঁর চরণাম্বুজে আত্মসমর্পণ করতে হয় এবং সম্পূর্ণ নিরহঙ্কারী হয়ে ক্রীতদাসের মতো তাঁর সেবা করতে হয়। সদ্‌গুরুর সন্তুষ্টি বিধান করার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি লাভ করা যায়। আত্মসমর্পণ ও সেবা না করে কেবল প্রশ্ন করে কখনই এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় না। গুরুদেব পরীক্ষা করে দেখেন শিষ্যের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার বাসনা কতটা প্রবল হয়েছে এবং এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেই গুরুদেব তাঁর শিষ্যকে পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার আশীর্বাদ দান করেন। এখানে অন্ধের মতো অনুকরণ করা অথবা মূঢ়ের মতো নিরর্থক প্রশ্ন করার নিন্দা করা হয়েছে। শিষ্য কেবল শ্রদ্ধা সহকারে গুরুপ্রদত্ত উপদেশ শ্রবণ করবে, তা নয়, তাকে আত্মসমর্পণ, গুরুদেবের ঐকান্তিক সেবা এবং তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার মাধ্যমে এই জ্ঞানের মর্ম উপলব্ধি করতেও হবে। সদ্‌গুরু সর্বদাই তাঁর শিষ্যের প্রতি অত্যন্ত কৃপা পরায়ণ। তাই শিষ্য যখন বিনীত ও আজ্ঞানুবর্তী সেবায় সর্বতোভাবে তৎপর হয়, তখন জ্ঞান ও তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার বিনিময় পূর্ণ হয়।

শ্লোক ৩৫

যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব ।
যেন ভূতান্যশেষাণি দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৩৫ ॥

যৎ—যা; **জ্ঞাত্বা**—জেনে; **ন**—না; **পুনঃ**—পুনরায়; **মোহম্**—মোহ; **এবম্**—এই প্রকার; **যাস্যসি**—প্রাপ্ত হবে; **পাণ্ডব**—হে পাণ্ডুপুত্র; **যেন**—যার দ্বারা; **ভূতানি**—জীবসমূহ; **অশেষাণি**—সমস্ত; **দ্রক্ষ্যসি**—দর্শন করবে; **আত্মনি**—পরমাত্মায়; **অথো**—অর্থাৎ; **ময়ি**—আমাতে।

গীতার গান

সে সব জ্ঞানের কথা বুঝিতে পারিলে ।
মোহ আর হবে নাহি হারিলে জিতিলে ॥
তখন সে আত্মাদৃক দেখে ব্রহ্মসম ।
সম্পূর্ণ দর্শন সেই সম্পর্ক সে সম ॥

অনুবাদ

হে পাণ্ডব! এভাবে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে তুমি আর মোহগ্রস্ত হবে না, কেন না এই জ্ঞানের দ্বারা তুমি দর্শন করবে যে, সমস্ত জীবই আমার বিভিন্ন অংশ অর্থাৎ তারা সকলেই আমার এবং তারা আমাতে অবস্থিত।

তাৎপর্য

তত্ত্বদর্শী সদ্‌গুরুর কাছ থেকে পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার ফলে শিষ্য বুঝতে পারে যে, সকল জীবই হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। শ্রীকৃষ্ণ থেকে আলাদা অস্তিত্ব থাকাকে বলা হয় মায়া। *মা* শব্দের অর্থ হচ্ছে 'না' আর *য়া* শব্দের অর্থ হচ্ছে 'যা' অর্থাৎ 'যার কোন অস্তিত্ব নেই'। কেউ কেউ মনে করে, আমাদের শ্রীকৃষ্ণের প্রয়োজন নেই। তাদের মতে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন একজন মহান ঐতিহাসিক পুরুষ এবং পরমতত্ত্ব হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্ম। কিন্তু *ভগবদ্গীতার* মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সব কিছুর মূল কারণ। *ব্রহ্মসংহিতায়* স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পরম পুরুষোত্তম ভগবান, সর্ব কারণের কারণ। অনন্ত কোটি অবতারেরাও হচ্ছেন তাঁর বিভিন্ন অংশ-প্রকাশ মাত্র। তেমনই, সকল জীবও হচ্ছে ভগবানের অংশ-প্রকাশ। মায়াবাদী দার্শনিকেরা ভুল করে মনে করে যে, বিভিন্ন অংশ-প্রকাশের মাধ্যমে প্রকট হবার ফলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেন। এটি হচ্ছে প্রাকৃত চিন্তাধারা। প্রাকৃত জড় জগতে আমাদের

অভিজ্ঞতা এই যে, যখন কোন কিছু খণ্ডরূপে পরিবেশিত হয়, তখন তার মূল স্বরূপ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু মায়াবাদী দার্শনিকেরা এটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না যে, ভগবান হচ্ছেন পরতত্ত্ব, তিনি হচ্ছেন অনন্ত। অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে এক যোগ করলেও তাঁর কোন বিকার হয় না, আবার তাঁর থেকে এক বিয়োগ করলেও তাঁর কোন বিকার হয় না। এটিই হচ্ছে অপ্রাকৃত তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য।

পর্যাপ্ত পারমার্থিক জ্ঞান না থাকার ফলে আমরা বর্তমানে মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পড়েছি এবং তারই ফলে আমরা মনে করি, আমরা শ্রীকৃষ্ণের থেকে বিচ্ছিন্ন। আমরা যদিও শ্রীকৃষ্ণের ভিন্নাংশ কিন্তু তবুও আমরা শ্রীকৃষ্ণ থেকে বিচ্ছিন্ন নই। জীবের দেহগত পার্থক্য হচ্ছে মায়া, অর্থাৎ তার সত্যিকারের অস্তিত্ব নেই। আমাদের সকলেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ বিধান করা। মায়ার প্রভাবে অর্জুন মনে করেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর নিত্য চিন্ময় সম্পর্ক অপেক্ষা তাঁর দেহগত সম্বন্ধে যারা তাঁর আত্মীয়, তারা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। *ভগবদ্গীতার* সমস্ত উপদেশই আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে যে, জীব হচ্ছে ভগবানের নিত্যকালের সেবক এবং সে শ্রীকৃষ্ণ থেকে দূরে সরে থাকতে পারে না। সে যদি মনে করে, সে শ্রীকৃষ্ণ থেকে আলাদা, সেটিই হচ্ছে মায়া। ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে জীবদের বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। অনন্তকাল ধরে সেই উদ্দেশ্যকে ভুলে যাওয়ার ফলেই তারা কখনও মানুষ কখনও পশু কখনও দেবতা আদি রূপে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভগবানের সঙ্গে অপ্রাকৃত সেবার কথা ভুলে যাওয়ার ফলেই এই দেহগত পার্থক্যের উদয় হয়। কিন্তু কেউ যখন কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হন, তখন তিনি এই মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হন। এই শুদ্ধ পারমার্থিক জ্ঞান কেবল সদ্‌গুরুর কাছ থেকেই লাভ করা যায়। এই জ্ঞানের প্রভাবেই কেবল জীব শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ, এই মোহ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। পরম তত্ত্বজ্ঞান হচ্ছে সেই জ্ঞান, যার প্রভাবে আমরা জানতে পারি যে, পরম আত্মা শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরম আশ্রয়। এই পরম আশ্রয় হারিয়ে ফেলার ফলেই জীবসমূহ তাদের নিজেদের পৃথক পরিচয় আছে, এরূপ কল্পনা করে মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। এভাবেই তারা একটির পর একটি দেহ ধারণ করে জগৎকে ভোগ করতে চায় এবং সম্পূর্ণভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে যায়। এই ধরনের মোহগ্রস্ত জীবেরা যখন ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরে তাঁর শরণাগত হয়, তখন বুঝতে হবে যে, তারা মুক্তির পথে এগিয়ে চলেছে। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে (২/১০/৬)* বলা হয়েছে—*মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ*। মুক্তির অর্থ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাসরূপে নিজের স্বরূপে অধিষ্ঠিত হওয়া।

শ্লোক ৩৬

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥

অপি—এমন কি; **চেৎ**—যদি; **অসি**—তুমি হও; **পাপেভ্যঃ**—পাপীদের থেকে; **সর্বেভ্যঃ**—সমস্ত; **পাপকৃত্তমঃ**—পাপিষ্ঠ; **সর্বম্**—এই প্রকার সমস্ত পাপকর্ম; **জ্ঞানপ্লবেন**—দিব্য জ্ঞানরূপ তরণীর দ্বারা; **এব**—অবশ্যই; **বৃজিনম্**—দুঃখরূপ সমুদ্র; **সন্তরিষ্যসি**—অতিক্রম করবে।

গীতার গান

পাপী হতে পাপী যদি হয়ে থাক তুমি ।
তথাপি জ্ঞানের পোতে তরিবে আপনি ॥

অনুবাদ

তুমি যদি সমস্ত পাপীদের থেকেও পাপিষ্ঠ বলে গণ্য হয়ে থাক, তা হলেও এই জ্ঞানরূপ তরণীতে আরোহণ করে তুমি দুঃখ-সমুদ্র পার হতে পারবে।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে আমাদের স্বরূপ উপলব্ধি করা এতই মাধুর্যময় যে, তা অজ্ঞানতার সমুদ্রে যে জীবন-সংগ্রাম, তা থেকে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার করে। এই জড় জগৎকে কখনও অবিদ্যার সমুদ্র অথবা কখনও দাবানলের সঙ্গে তুলনা করা হয়। অতি সুদক্ষ সাঁতারুও যেমন সাঁতার কেটে সমুদ্র পার হতে পারে না, ঠিক তেমনই জড় জগতের যে জীবন-সংগ্রাম তা দুরতিক্রম্য। মাঝ-সমুদ্রে যে মানুষ হাবুডুবু খাচ্ছে, তার উদ্ধারের একমাত্র উপায় হচ্ছে, যদি কেউ এসে তাকে তুলে নেয়। এই ভবসমুদ্রে আমরাও সেই রকম হাবুডুবু খাচ্ছি। এখন কেউ যদি কৃপাপরবশ হয়ে আমাদের এই ভবসমুদ্র থেকে তুলে নেয়, তা হলেই কেবল আমরা উদ্ধার পেতে পারি। ভগবানের কাছ থেকে পাওয়া অপ্রাকৃত ভগবৎ-তত্ত্ব হচ্ছে একমাত্র মুক্তির পথ। এই ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান বা কৃষ্ণভাবনামৃত হচ্ছে আমাদের উদ্ধারকারী নৌকা। মুক্তি লাভের এই পথ অত্যন্ত সহজ, সরল ও মাধুর্যে পরিপূর্ণ।

শ্লোক ৩৭

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন ।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭ ॥

যথা—যেমন; **এধাংসি**—দাহ্য কাঠ; **সমিদ্ধঃ**—সম্যক্‌রূপে প্রজ্বলিত; **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **ভস্মসাৎ**—ভস্মীভূত; **কুরুতে**—করে; **অর্জুন**—হে অর্জুন; **জ্ঞানাগ্নিঃ**—জ্ঞানরূপ অগ্নি; **সর্বকর্মাণি**—সমস্ত জড় কর্মফলকে; **ভস্মসাৎ**—ভস্মীভূত; **কুরুতে**—করে; **তথা**—তেমনই।

গীতার গান

প্রবল অগ্নিতে যথা কাষ্ঠ ভস্মসাৎ ।
জ্ঞানাগ্নি জ্বলিলে পাপ সকল নিপাত ॥
অতএব জ্ঞানতুল্য নাহি সে পবিত্র ।
তাহা নহে জড় জ্ঞান লাভ যত্রতত্র ॥

অনুবাদ

প্রবলরূপে প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠকে ভস্মসাৎ করে, হে অর্জুন! তেমনই জ্ঞানাগ্নিও সমস্ত কর্মকে দগ্ধ করে ফেলে।

তাৎপর্য

যে জ্ঞান আত্মা ও পরমাত্মা এবং তাঁদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়, তাকে এখানে অগ্নির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই অগ্নি কেবল পাপ কর্মফলকেই দহন করে তাই নয়, তা পুণ্য কর্মফলকেও দহন করে তাদের ভস্মে পরিণত করে। কর্মের ফল নানা রকম হয়। কোন কোন কর্মের ফল অপরিণত, কোন কর্মের ফল পরিণত, কোন কর্মের ফল ইতিমধ্যেই ভোগ করা হয়ে গেছে, আবার কোন কোন কর্মের ফল পূর্বজন্মের থেকে সঞ্চিত হয়ে আছে। কিন্তু স্বরূপ উপলব্ধির পরম জ্ঞানের আগুনে তা সবই ভস্মীভূত হয়ে যায়। *বেদে* (*বৃহদারণ্যক উপনিষদ* ৪/৪/২২) বলা হয়েছে, *উভে উহৈবৈষ এতে তরত্যমৃতঃ সাধ্বসাধূনী*—"পাপ ও পুণ্য উভয় কর্মফল থেকেই পরিত্রাণ পাওয়া যায়।"

শ্লোক ৩৮

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে ।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮ ॥

ন—কিছুই নেই; **হি**—অবশ্যই; **জ্ঞানেন**—জ্ঞানের; **সদৃশম্**—তুল্য; **পবিত্রম্**—পবিত্র; **ইহ**—এই জগতে; **বিদ্যতে**—বিদ্যমান; **তৎ**—তা; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **যোগ**—যোগে; **সংসিদ্ধঃ**—সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ; **কালেন**—কালক্রমে; **আত্মনি**—আত্মায়; **বিন্দতি**—উপভোগ করেন।

গীতার গান

যোগসিদ্ধ সেই জ্ঞান চিন্ময় নির্মল ।
সে জ্ঞান লভিলে হবে আনন্দে বিহ্বল ॥

অনুবাদ

এই জগতে চিন্ময় জ্ঞানের মতো পবিত্র আর কিছুই নেই। এই জ্ঞান সমস্ত যোগের পরিপক্ব ফল। ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের মাধ্যমে যিনি সেই জ্ঞান আয়ত্ত করেছেন, তিনি কালক্রমে আত্মায় পরা শান্তি লাভ করেন।

তাৎপর্য

জ্ঞানের তাৎপর্য হচ্ছে পরমার্থ উপলব্ধি। তাই, এই দিব্য জ্ঞানের মতো মহিমান্বিত ও নির্মল আর কিছুই নেই। আমাদের বন্ধনের কারণ হচ্ছে অজ্ঞান এবং মুক্তির কারণ হচ্ছে জ্ঞান। এই জ্ঞান হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির সুপক্ব ফল। এই জ্ঞান যিনি লাভ করেছেন, তাঁকে আর অন্যত্র শান্তির অন্বেষণ করতে হয় না, কেন না তিনি তাঁর অন্তস্তলে নিত্য শান্তি উপভোগ করেন। পক্ষান্তরে বলা যায়, এই জ্ঞান ও শান্তি কৃষ্ণভাবনামৃতে পর্যবসিত হয়। *ভগবদ্গীতার* এই হচ্ছে চরম উপদেশ।

শ্লোক ৩৯

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥

শ্রদ্ধাবান্—শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি; **লভতে**—লাভ করেন; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **তৎপরঃ**—সেই অনুষ্ঠানে অনুরক্ত; **সংযত**—সংযত; **ইন্দ্রিয়ঃ**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **লব্ধ্বা**—লাভ করে; **পরাম্**—অপ্রাকৃত; **শান্তিম্**—শান্তি; **অচিরেণ**—অচিরেই; **অধিগচ্ছতি**—লাভ করেন।

গীতার গান

শ্রদ্ধাবান যেই হয় লভে সেই জ্ঞান ।
সংযত ইন্দ্রিয় যার তৎপর সে হন ॥
সে জ্ঞান লভিলে শান্তি অচিরাৎ পায় ।
সংসারের যত ক্লেশ সব মিটে যায় ॥

অনুবাদ

সংযতেন্দ্রিয় ও তৎপর হয়ে চিন্ময় তত্ত্বজ্ঞানে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি এই জ্ঞান লাভ করেন। সেই দিব্য জ্ঞান লাভ করে তিনি অচিরেই পরা শান্তি প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

যিনি সুদৃঢ় বিশ্বাসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধাবান, তিনিই কেবল কৃষ্ণভাবনামৃতের এই জ্ঞান লাভ করতে পারেন। শ্রদ্ধাবান তাঁকেই বলা হয় যিনি বিশ্বাস করেন যে, কৃষ্ণভক্তি সাধন করলে সমস্ত কর্ম সুসম্পন্ন হয়। ভগবদ্ভক্তি সাধন করলে জীবনের পরমার্থ সাধিত হয়। সুদৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে ভগবানের সেবা সম্পাদন এবং *হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে*—এই মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে অন্তর সব রকমের জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয় এবং তখন হৃদয়ে এই শ্রদ্ধার উদয় হয়। এ ছাড়া, ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করার সময় আমাদের ইন্দ্রিয়-সংযম করতে হয়। যিনি ইন্দ্রিয়ের বেগগুলিকে সংযত করে সুদৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, তিনি অচিরেই কৃষ্ণভাবনামৃতের পূর্ণ জ্ঞান লাভ করে সিদ্ধি প্রাপ্ত হন।

শ্লোক ৪০

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি ।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০ ॥

অজ্ঞঃ—শাস্ত্রজ্ঞান রহিত মূঢ়; **চ**—এবং; **অশ্রদ্দধানঃ**—শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাহীন; **চ**—ও; **সংশয়**—সংশয়; **আত্মা**—ব্যক্তি; **বিনশ্যতি**—বিনষ্ট হয়; **ন**—না; **অয়ম্**—এই; **লোকঃ**—লোকে; **অস্তি**—আছে; **ন**—না; **পরঃ**—পরবর্তী জীবনে; **ন**—না; **সুখম্**—সুখ; **সংশয়**—সংশয়; **আত্মনঃ**—ব্যক্তির।

গীতার গান

সংশয়াত্মা অজ্ঞ যারা তাহে শ্রদ্ধা নাই।
বিনাশ নিশ্চয় তার কহিনু নিশ্চয়ই ॥
সে সব লোকের নাই ইহ-পরকাল।
সংশয়ী আত্মা সে দুঃখী সে সংসারজাল ॥

অনুবাদ

অজ্ঞ ও শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি কখনই ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে পারে না। সন্দিগ্ধ চিত্ত ব্যক্তি ইহলোকে সুখভোগ করতে পারে না এবং পরলোকেও সুখভোগ করতে পারে না।

তাৎপর্য

সমস্ত প্রামাণ্য দিব্য শাস্ত্রের মধ্যে *ভগবদ্গীতাই* হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। যে সমস্ত মানুষের প্রবৃত্তি প্রায় পশুদের মতো, তাদের শাস্ত্রজ্ঞান অথবা শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে না। আবার এমনও কিছু লোক আছে, যাদের শাস্ত্রজ্ঞান থাকলেও বা শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিতে পারলেও, শাস্ত্রের কথায় তাদের বিশ্বাস নেই। শাস্ত্র থেকে বিভিন্ন শ্লোক উদ্ধৃত করে এরা নানা রকম যুক্তি-তর্কের অবতারণা করতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রের প্রতি তাদের মোটেই বিশ্বাস নেই। আবার আর এক ধরনের মানুষ আছে, যাদের *ভগবদ্গীতার* প্রতি বিশ্বাস থাকলেও তারা বিশ্বাস করে না যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমেশ্বর, তাই তারা তাঁর আরাধনা করে না। এই ধরনের মানুষদের মনে কৃষ্ণভাবনার উদয় হয় না। তারা অধঃপতিত হয়। এদের মধ্যে যাদের মোটেই বিশ্বাস নেই এবং যারা এই শাস্ত্রোক্ত বিষয় সম্বন্ধে সন্দিহান, তারা তাদের পারমার্থিক জীবনে কোন রকম উন্নতি লাভ করতে পারে না। ভগবান এবং তাঁর মুখ-নিঃসৃত বাণীর প্রতি যাদের শ্রদ্ধা নেই, তারা কখনই ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারে না। তাই শ্রদ্ধা সহকারে শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের অনুগমন করে পরম জ্ঞান লাভ করাই হচ্ছে প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। পারমার্থিক উপলব্ধির অপ্রাকৃত স্তরে উন্নীত

হতে এই জ্ঞানই সাহায্য করবে। পক্ষান্তরে, সন্দিগ্ধচিত্ত মানুষদের পক্ষে পারমার্থিক মুক্তির কোনও মর্যাদা লাভ সম্ভব নয়। তাই প্রতিটি মানুষেরই কর্তব্য হচ্ছে, গুরু-পরম্পরায় যে সমস্ত মহান আচার্য আছেন, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সাফল্য লাভ করা।

শ্লোক ৪১

যোগসংন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১ ॥

যোগ—কর্মযোগে ভগবদ্ভক্তির দ্বারা; **সংন্যস্ত**—ত্যাগ করেন; **কর্মাণম্**—কর্মফল; **জ্ঞান**—জ্ঞানের দ্বারা; **সংছিন্ন**—ছেদন করেন; **সংশয়ম্**—সংশয়; **আত্মবন্তম্**—আত্মবান; **ন**—না; **কর্মাণি**—কর্মসমূহ; **নিবধ্নন্তি**—আবদ্ধ করতে পারে; **ধনঞ্জয়**—হে ধনঞ্জয়।

গীতার গান

অতএব যোগ দ্বারা কর্মবিহীন।
জ্ঞানলাভ দ্বারা হয় সংশয় বিলীন ॥
আত্মবান জ্ঞানবান কর্ম হতে মুক্ত।
হে ধনঞ্জয়! তুমি সেই হও নিত্যমুক্ত ॥

অনুবাদ

অতএব, হে ধনঞ্জয়! যিনি নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা কর্মত্যাগ করেন, জ্ঞানের দ্বারা সংশয় নাশ করেন এবং আত্মার চিন্ময় স্বরূপ অবগত হন, তাঁকে কোন কর্মই আবদ্ধ করতে পারে না।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ-নিঃসৃত *গীতার* জ্ঞানকে যিনি অনুসরণ করেন, এই দিব্য জ্ঞানের প্রভাবে তাঁর অন্তরের সমস্ত সংশয় বিদূরিত হয়। ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হবার ফলে তিনি ইতিমধ্যেই আত্মজ্ঞানে অধিষ্ঠিত। তাই, তিনি নিঃসন্দেহে সমস্ত কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত।

শ্লোক ৪২

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **অজ্ঞানসম্ভূতম্**—অজ্ঞান থেকে উদ্ভূত; **হৃৎস্থম্**—হৃদয়স্থিত; **জ্ঞান**—জ্ঞানের; **অসিনা**—খড়্গের দ্বারা; **আত্মনঃ**—আত্মার; **ছিত্ত্বা**—ছিন্ন করে; **এনম্**—এই; **সংশয়ম্**—সংশয়; **যোগম্**—যোগে; **আতিষ্ঠ**—অধিষ্ঠিত হও; **উত্তিষ্ঠ**—যুদ্ধ করার জন্য উঠে দাঁড়াও; **ভারত**—হে ভরতবংশীয়।

গীতার গান

অজ্ঞানসম্ভূত মোহ জ্ঞান অসি দ্বারা ।
হৃদয়ে উদয় সব হইয়াছে যারা ॥
এই সব ছিন্ন করি জাগিয়া উঠিবে ।
হে ভারত! যোগোতিষ্ঠ হও এ সংসারে ॥

অনুবাদ

অতএব, হে ভারত! তোমার হৃদয়ে যে অজ্ঞানপ্রসূত সংশয়ের উদয় হয়েছে, তা জ্ঞানরূপ খড়্গের দ্বারা ছিন্ন কর। যোগাশ্রয় করে যুদ্ধ করার জন্য উঠে দাঁড়াও।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ে যে যোগমার্গের উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তাকে বলা হয় 'সনাতন-যোগ' অর্থাৎ জীবের উপযোগী শাশ্বত কার্যকলাপ। এই যোগে দুই রকম যজ্ঞ অনুষ্ঠান সাধিত হয়—তার একটি হচ্ছে দ্রব্যযজ্ঞ অর্থাৎ সব রকম জড় বিষয়কে উৎসর্গ করা এবং অন্যটি হচ্ছে আত্মজ্ঞান যজ্ঞ, যা সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ পারমার্থিক কর্ম। দ্রব্যময়-যজ্ঞ যদি পারমার্থিক উদ্দেশ্যে সাধিত না হয়, তবে তা জড়-জাগতিক কর্মে পর্যবসিত হয়। কিন্তু এই যজ্ঞ যদি পরমার্থ সাধন করবার জন্য, অর্থাৎ কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে সাধিত হয়, তবে তা সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। পারমার্থিক কর্মও দুটি ভাগে বিভক্ত—নিজের স্বরূপকে উপলব্ধি করা এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করা। *ভগবদ্গীতার* যথার্থ জ্ঞান লাভ করলে এই দুটি তত্ত্বকেই অনায়াসে উপলব্ধি করা যায়। তখন অনায়াসে উপলব্ধি করা যায় যে, জীবাত্মা হচ্ছে ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই প্রকার উপলব্ধি

পরম মঙ্গলময়, কারণ এই জ্ঞানের প্রভাবে ভগবানের দিব্য লীলার তত্ত্ব সহজেই বুঝতে পারা যায়। এই অধ্যায়ের প্রথমেই ভগবান নিজেই তাঁর অপ্রাকৃত কার্যকলাপের কথা বর্ণনা করেছেন। *ভগবদ্গীতায়* নির্দেশিত ভগবানের উপদেশ যে বুঝতে পারে না, সে হচ্ছে শ্রদ্ধাহীন ভগবৎ-বিদ্বেষী। ভগবান যে তাকে একটুখানি স্বাধীনতা দিয়েছেন, সে তার অপব্যবহার করছে। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান এত সরলভাবে তাঁর স্বরূপ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও যে ভগবানের সচ্চিদানন্দময় স্বরূপকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, সে নিতান্তই মূর্খ। কৃষ্ণভাবনামৃতের সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম করলে ধীরে ধীরে অজ্ঞানতা দূর হয়। দেবযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, ব্রহ্মচর্য-যজ্ঞ, গার্হস্থ্য পালনরূপ যজ্ঞ, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ যজ্ঞ, যোগাভ্যাস-যজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, দ্রব্যযজ্ঞ ও স্বাধ্যায়-যজ্ঞের অনুষ্ঠানের দ্বারা এবং বর্ণাশ্রম-ধর্ম আচরণের দ্বারা অন্তরে কৃষ্ণভাবনামৃতের বিকাশ হয়। এই সব কয়টিকেই বলা হয় 'যজ্ঞ' এবং সব কয়টি ক্রিয়াই নিয়ন্ত্রিত কর্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই সমস্ত ক্রিয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি। এই উদ্দেশ্যকে যিনি অনুসন্ধান করেন, তিনিই হচ্ছেন *ভগবদ্গীতার* যথার্থ শিষ্য। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব সম্বন্ধে যার মনে সংশয় আছে, সে অধঃপতিত হয়। তাই উপদেশ দেওয়া হয়েছে, যথার্থ সদ্গুরুর শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করে তাঁর সেবায় নিয়োজিত হয়ে, তাঁর কাছ থেকে *ভগবদ্গীতা* বা অন্য শাস্ত্রগ্রন্থ শিক্ষালাভ করা উচিত। সৃষ্টির আদি থেকে যে জ্ঞান গুরু-শিষ্য পরম্পরার ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে, তা আহরণ করতে হয় পরম্পরার ধারায় অধিষ্ঠিত যে সদ্গুরু, তাঁর কাছ থেকে। কোটি কোটি বছর আগে সূর্যদেবকে ভগবান যে শিক্ষা দিয়েছিলেন, সেই শিক্ষা তাঁর কাছ থেকে এই পৃথিবীতে নেমে এসেছে এবং সদ্গুরু তা সম্পূর্ণ অপরিবর্তিতভাবে দান করেন। তাই, *ভগবদ্গীতার* যথাযথ উপদেশ প্রত্যেকের গ্রহণ করা উচিত। যে সমস্ত প্রতারক তাদের স্বার্থসিদ্ধি করার জন্য *ভগবদ্গীতার* জ্ঞানকে বিকৃত করে তার কদর্থ করে মানুষকে বিপথে চালিত করে, তাদের সম্বন্ধে সাবধান হওয়াই মানুষের কর্তব্য। ভগবান হচ্ছেন অবিসম্বাদিত পরমেশ্বর এবং তাঁর সমস্ত লীলাই অপ্রাকৃত। এই সত্যকে সুদৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে যিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তিনি *ভগবদ্গীতার* জ্ঞান লাভ করার মুহূর্ত থেকেই মুক্ত।

ভক্তিবেদান্ত কহে শ্রীগীতার গান ।
শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ ॥

ইতি—অপ্রাকৃত পারমার্থিক জ্ঞানের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন বিষয়ক 'জ্ঞানযোগ' নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়

কর্মসন্ন্যাস-যোগ

শ্লোক ১

অর্জুন উবাচ

সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগং চ শংসসি ।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্ ॥ ১ ॥

অর্জুনঃ উবাচ—অর্জুন বললেন; সন্ন্যাসম্—ত্যাগ; কর্মণাম্—সমস্ত কর্মের; কৃষ্ণ—হে শ্রীকৃষ্ণ; পুনঃ—পুনরায়; যোগম্—যোগ; চ—ও; শংসসি—প্রশংসা করছ; যৎ—যা; শ্রেয়ঃ—শ্রেয়স্কর; এতয়োঃ—এই দুটির মধ্যে; একম্—একটি; তৎ—তা; মে—আমাকে; ব্রূহি—দয়া করে বল; সুনিশ্চিতম্—নিশ্চিতভাবে।

গীতার গান

অর্জুন কহিলেন ঃ

হে কৃষ্ণ বারেক কর্ম ত্যাগ যে কথন ।
পুনরায় কর্মযোগ কহ বিবরণ ॥
তার মধ্যে যেবা নিশ্চিত জানিবা ।
সংশয়বিহীন করি আমারে কহিবা ॥

অনুবাদ

অর্জুন বললেন—হে শ্রীকৃষ্ণ! প্রথমে তুমি আমাকে কর্ম ত্যাগ করতে বললে এবং তারপর কর্মযোগের অনুষ্ঠান করতে বললে। এই দুটির মধ্যে কোন্‌টি অধিক কল্যাণকর, তা সুনিশ্চিতভাবে আমাকে বল।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার এই পঞ্চম অধ্যায়ে ভগবান বলছেন যে, শুষ্ক জ্ঞানের মানসিক জল্পনার চেয়ে কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তিভাবমূলক কর্ম শ্রেয়। ভক্তিভাবমূলক সেবা শুষ্ক জল্পনা-কল্পনার চেয়ে সহজতর, কারণ এই ধরনের কর্ম অপ্রাকৃত এবং তা সাধন করার ফলে মানুষ কর্মফলের প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মার প্রাথমিক জ্ঞান এবং জড় জগতে তার বন্ধনের কারণ বর্ণনা করা হয়েছে এবং বুদ্ধিযোগ বা ভক্তিযোগের অনুশীলনের ফলে কিভাবে সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়, তার ব্যাখ্যাও করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, যিনি শুধু জ্ঞানের স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তাঁর আর কোন কর্তব্য নেই। চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান অর্জুনকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, সব রকমের যজ্ঞই জ্ঞানে পরিসমাপ্তি হয়। তবে, এই চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে ভগবান অর্জুনকে উপদেশ দিলেন, পূর্ণ জ্ঞানে অধিষ্ঠিত হয়ে মোহমুক্ত হয়ে যুদ্ধ করতে। সুতরাং, এভাবে একই সঙ্গে ভক্তিভাবমূলক কর্মে নিয়োজিত হতে এবং জ্ঞানে অধিষ্ঠিত হয়ে কর্ম পরিহার করতে পরামর্শ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিভ্রান্ত করেছিলেন আর তাঁকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিচলিত করে তোলেন। অর্জুন বুঝতে পেরেছিলেন যে, জ্ঞানের প্রভাবে কর্ম ত্যাগের অর্থ হচ্ছে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য যে সমস্ত কর্ম, তা থেকে বিরত থাকা। কিন্তু কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে ভক্তিযোগ সাধন করার জন্য যদি কর্ম করা হয়, তা হলে কর্ম ত্যাগ করা হল কি করে? তিনি মনে করেছিলেন, জ্ঞানের প্রভাবে কর্মত্যাগ অর্থাৎ সন্ন্যাস হচ্ছে সব রকমের কর্ম থেকে বিরত হওয়া, কারণ কর্ম ও ত্যাগ তাঁর কাছে অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হয়েছিল। সাধারণ মানুষের মতো তিনিও বুঝতে পারেননি যে, পূর্ণ জ্ঞানে অধিষ্ঠিত হয়ে যে কর্ম করা হয়, তা কর্মফল থেকে মুক্ত এবং তাই তা 'অকর্ম'। সুতরাং, তিনি ভগবানকে প্রশ্ন করেছেন, পরমার্থ সাধনের জন্য তিনি কি সর্বতোভাবে কর্ম পরিত্যাগ করবেন, না, পূর্ণ জ্ঞানে কর্ম করবেন।

শ্লোক ২

শ্রীভগবানুবাচ

সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **সন্ন্যাসঃ**—কর্মত্যাগ; **কর্মযোগঃ**—কর্মযোগ; **চ**—ও; **নিঃশ্রেয়সকরৌ**—মুক্তিদায়ক; **উভৌ**—উভয়; **তয়োঃ**—সেই দুটির মধ্যে; **তু**—কিন্তু; **কর্মসন্ন্যাসাৎ**—কর্মসন্ন্যাস থেকে; **কর্মযোগঃ**—কর্মযোগ; **বিশিষ্যতে**—শ্রেয়।

গীতার গান

ভগবান কহিলেন ঃ

সন্ন্যাস আর কর্মযোগ দুই শ্রেয় হয়।
সকল বেদাদি শাস্ত্রে তাই সে কহয় ॥
তার মধ্যে কর্মযোগ সন্ন্যাস অপেক্ষা।
ক্রিয়াত্মক জনমধ্যে না কর উপেক্ষা ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—কর্মত্যাগ কর্মযোগ উভয়ই মুক্তিদায়ক। কিন্তু, এই দুটির মধ্যে কর্মযোগ কর্মসন্ন্যাস থেকে শ্রেয়।

তাৎপর্য

ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য যে সকাম কর্ম করা হয়, তা মানুষকে জড় বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে। জীব যখন তার শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করার আশায় নানাবিধ কর্ম করে চলে, তখন সে নিশ্চিতভাবে তার কর্মের ফলস্বরূপ একটির পর একটি বিভিন্ন ধরনের দেহ ধারণ করে এই জড় জগতে ঘুরে বেড়ায় এবং তার ফলে জড় বন্ধন অনন্তকাল ধরেই চলতে থাকে। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৫/৫/৪-৬) প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—

নূনং প্রমত্তঃ কুরুতে বিকর্ম
যদিন্দ্রিয়প্রীতয় আপৃণোতি।
ন সাধু মন্যে যত আত্মনোঽয়-
মসন্নপি ক্লেশদ আস দেহঃ ॥

পরাভবস্তাবদবোধজাতো
যাবন্ন জিজ্ঞাসত আত্মতত্ত্বম্ ।
যাবৎ ক্রিয়াস্তাবদিদং মনো বৈ
কর্মাত্মকং যেন শরীরবন্ধঃ ॥

এবং মনঃ কর্মবশং প্রযুঙ্ক্তে
অবিদ্যয়াত্মন্যুপধীয়মানে ।
প্রীতির্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে
ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ ॥

'ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করবার জন্য মানুষ উন্মাদ এবং সে জানে না যে, তার ক্লেশদায়ক দেহটি হচ্ছে তার পূর্বকৃত সকাম কর্মের ফল। এই দেহটি অস্থায়ী, অথচ এর জন্যই মানুষকে দুঃখকষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। তাই, জড় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করবার আশায় কর্ম করা ভাল নয়। নিজের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে যে মানুষ কোনও অনুসন্ধান করে না, তার জীবন ব্যর্থ বলেই মনে করতে হবে। যতদিন মানুষ তার প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে না পারে, ততদিন তাকে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য কর্মফলের আশায় কর্ম করতে হয় এবং যতদিন বিষয়সুখ ভোগ করবার বাসনায় তার চেতনা আচ্ছন্ন থাকে, ততদিন তাকে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হতে হয়। অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন মন সকাম কর্মে নিবিষ্ট হতে পারে, কিন্তু মানুষের কর্তব্য হচ্ছে মনের এই বাসনাকে দমন করে বাসুদেবের চরণে প্রপত্তি করা। কেবল তখনই সে এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হবার সুযোগ পেতে পারে।"

তাই, যে জ্ঞান মানুষকে শিক্ষা দেয় যে, সে তার জড় দেহ নয়, তার প্রকৃত স্বরূপ হচ্ছে তার আত্মা, সেই জ্ঞানও জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়। আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরে আত্মার শাশ্বত ধর্ম পালন করতে হয়, নচেৎ জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় নেই। কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে ভগবানের সেবা করার জন্য যে কর্ম করা হয়, সেই কর্ম সকাম কর্ম নয়। জ্ঞানময় কর্ম মানুষের প্রকৃত জ্ঞানের প্রগতিকে শক্তিশালী করে। কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত না হয়ে, কেবল সকাম কর্ম ত্যাগ করলেই বদ্ধ জীবের হৃদয় কলুষমুক্ত হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত হৃদয় সম্পূর্ণভাবে কলুষমুক্ত না হচ্ছে, ততক্ষণ সকাম কর্মের স্তরে কর্ম করতে হয়। কিন্তু কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম সাধিত হলে তা আপনা থেকেই কর্মফলের বন্ধন থেকে মানুষকে মুক্ত করতে সাহায্য করে এবং তখন তাকে আর

এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না। তাই, কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম সর্বদাই কর্মত্যাগের চেয়ে শ্রেয়, কেন না কর্মত্যাগ থেকে পতনের সম্ভাবনা থাকে। কৃষ্ণভক্তিবিহীন বৈরাগ্য অপূর্ণ, সেই কথা শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে* (পূর্ব ২/২৫৬) বলেছেন—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

"মুমুক্ষুরা ভগবান সম্বন্ধীয় বস্তুকেও প্রাকৃত জ্ঞানে পরিত্যাগ করে এবং সেই ত্যাগ সম্পূর্ণ হয় না। এই ধরনের বৈরাগ্যকে 'ফল্গুবৈরাগ্য' বলা হয়।" আমরা যখন বুঝতে পারি যে, সব কিছুই ভগবানের, আমাদের কিছুই নয়, তাই 'আমার' বলে কোন কিছুর উপর আমাদের অধিকার বিস্তার করা উচিত নয়; তখন ত্যাগের সম্পূর্ণতা আসে। মানুষের বোঝা উচিত, বাস্তবিকই কোন কিছুই তার নিজের নয়। তা হলে ত্যাগের প্রশ্ন আসে কোথা থেকে? যে জানে, সব কিছুই হচ্ছে ভগবানের সম্পত্তি, সে নিত্য বৈরাগ্যযুক্ত। যেহেতু সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের, তাই সবই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োগ করতে হয়। এই শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত কর্ম মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের কৃত্রিম বৈরাগ্যের চেয়ে অনেক ভাল।

শ্লোক ৩

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি ।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

জ্ঞেয়ঃ—জ্ঞাতব্য; **সঃ**—তিনি; **নিত্য**—সর্বদা; **সন্ন্যাসী**—সন্ন্যাসী; **যঃ**—যিনি; **ন**—না; **দ্বেষ্টি**—দ্বেষ করেন; **ন**—না; **কাঙ্ক্ষতি**—আকাঙ্ক্ষা করেন; **নির্দ্বন্দ্বঃ**—দ্বন্দ্বরহিত; **হি**—অবশ্যই; **মহাবাহো**—হে মহাবীর; **সুখম্**—সুখে; **বন্ধাৎ**—বন্ধন থেকে; **প্রমুচ্যতে**—মুক্ত হন।

গীতার গান

রাগদ্বেষ বিবর্জিত যেবা কর্মযোগী ।
অনাসক্ত বিষয়েতে নহেত সে ভোগী ॥
নির্দ্বন্দ্ব সে মহাবাহো দুঃখ বন্ধ নাই ।
তোমারে কহিনু আমি করিয়া নিশ্চয় ॥

অনুবাদ

হে মহাবাহো! যিনি তাঁর কর্মফলের প্রতি দ্বেষ বা আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাঁকেই নিত্য সন্ন্যাসী বলে জানবে। এই প্রকার ব্যক্তি দ্বন্দ্বরহিত এবং পরম সুখে কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করেন।

তাৎপর্য

যিনি পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময়, তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত ত্যাগী, কারণ তিনি কর্মফলের প্রতি বীতরাগ বা অনুরাগ যে কোন দিক থেকেই সম্পূর্ণভাবে নিরাসক্ত। এভাবেই যিনি সব কিছু ত্যাগ করে অনন্য ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করেন, তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত জ্ঞানী। কারণ, ভগবানের সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্পর্কের কথা তিনি জানেন। তিনি খুব ভালভাবেই জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সম্যক্‌ভাবেই পূর্ণ এবং তিনি হচ্ছেন তাঁর অবিচ্ছেদ্য অংশ মাত্র। এই জ্ঞানই পরম জ্ঞান, তা গুণবৈশিষ্ট্য এবং পরিমাণ-তত্ত্ব বিচারেও পরম সত্য। নির্বিশেষবাদীরা যে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে ভগবান হওয়ার বাসনা পোষণ করে তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, কারণ অংশ কখনও পূর্ণের সমান হতে পারে না। গুণগত বৈশিষ্ট্যে মানুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ, তবে পরিমাণ-তত্ত্ব বিচারে ভিন্নতা-বিশিষ্ট, এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্বজ্ঞানই হচ্ছে প্রকৃত পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান। তখন মানুষের আকাঙ্ক্ষা বা শোক করবার কিছুই থাকে না। তাই তাঁর মনে আর কোনও দ্বন্দ্বভাব থাকে না, কারণ তিনি যা করেন তা সবই শ্রীকৃষ্ণের জন্য করেন। এভাবেই দ্বন্দ্বভাবের স্তর থেকে মুক্ত হবার ফলে তিনি জড় বন্ধনমুক্ত হন। এমন কি এই জড় জগতে অবস্থানকালেও তিনি বন্ধনমুক্ত থাকেন।

শ্লোক ৪

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥ ৪ ॥

সাংখ্য—জড় জগতের বিশ্লেষণমূলক তত্ত্ব; **যোগৌ**—যোগকে; **পৃথক্**—পৃথক; **বালাঃ**—অল্পজ্ঞ; **প্রবদন্তি**—বলে; **ন**—না; **পণ্ডিতাঃ**—পণ্ডিতেরা; **একম্**—একটিতে; **অপি**—ও; **আস্থিতঃ**—অবস্থিত হলে; **সম্যক্**—পূর্ণরূপে; **উভয়োঃ**—উভয়ের; **বিন্দতে**—লাভ হয়; **ফলম্**—ফল।

গীতার গান

সাংখ্যযোগ কর্মযোগ যেবা পৃথক বলে ।
পণ্ডিত সে নহে কভু বালকের ছলে ॥
উভয় কার্যের মধ্যে যে কোন সে এক ।
উভয়ের ফল প্রাপ্তি হইবে সম্যক্ ॥

অনুবাদ

অল্পজ্ঞ ব্যক্তিরাই কেবল সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগকে পৃথক পৃথক পদ্ধতি বলে প্রকাশ করে, পণ্ডিতেরা তা বলেন না। উভয়ের মধ্যে যে-কোন একটিকে সুষ্ঠুরূপে আচরণ করলে উভয়ের ফলই লাভ হয়।

তাৎপর্য

সাংখ্য-দর্শনের উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় জগতের বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে আত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি করা। জড় জগতের আত্মা হচ্ছেন শ্রীবিষ্ণু বা পরমাত্মা। ভক্তিযোগে যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা হয়, তখন পরমাত্মারও সেবা সাধিত হয়। একটি প্রক্রিয়া হচ্ছে গাছের মূল খুঁজে বার করা, আর অন্যটি হচ্ছে সেই মূলে জলসিঞ্চন করা। সাংখ্য-দর্শনের যথার্থ শিক্ষার্থী জড় জগতের মূল শ্রীবিষ্ণুকে জানতে পেরে পূর্ণ জ্ঞানযুক্ত হয়ে তাঁর সেবায় প্রবৃত্ত হন। তাই, এই দুটি পদ্ধতিতে কোনও ভেদ নেই, কারণ এদের উভয়েরই উদ্দেশ্য হচ্ছেন শ্রীবিষ্ণু। তাই, পরম লক্ষ্যকে যারা জানে না, তারাই কেবল বলে যে, সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগের উদ্দেশ্য এক নয়। কিন্তু যিনি যথার্থ জ্ঞানী তিনি জানেন, এই সমস্ত বিভিন্ন পদ্ধতির উদ্দেশ্য হচ্ছে এক।

শ্লোক ৫

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে ।
একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫ ॥

যৎ—যা; **সাংখ্যৈঃ**—সাংখ্য-দর্শনের দ্বারা; **প্রাপ্যতে**—লাভ হয়; **স্থানম্**—স্থান; **তৎ**—তা; **যোগৈঃ**—নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা; **অপি**—ও; **গম্যতে**—প্রাপ্ত হওয়া যায়; **একম্**—এক; **সাংখ্যম্**—সাংখ্য; **চ**—এবং; **যোগম্**—কর্মযোগকে; **চ**—এবং; **যঃ**—যিনি; **পশ্যতি**—দর্শন করেন; **সঃ**—তিনি; **পশ্যতি**—যথার্থ দর্শন করেন।

গীতার গান

সাংখ্যযোগ সাধ্য করি যে পদ সে পায় ।
যোগসিদ্ধ হলে লাভ তাহা উপজয় ॥
অতএব সাংখ্য কিংবা যোগ এক বল ।
বুদ্ধিমান সেই হয় যে বুঝে এক ফল ॥

অনুবাদ

যিনি জানেন, সাংখ্য-যোগের দ্বারা যে গতি লাভ হয়, কর্মযোগের দ্বারাও সেই গতি প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং তাই যিনি সাংখ্যযোগ ও কর্ম-যোগকে এক বলে জানেন, তিনিই যথার্থ তত্ত্বদ্রষ্টা।

তাৎপর্য

দার্শনিক গবেষণার যথার্থ উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনের পরম লক্ষ্য সম্বন্ধে অবগত হওয়া। জীবনের পরম লক্ষ্য হচ্ছে আত্ম-উপলব্ধি, তাই এই দুটি পদ্ধতির মাধ্যমে যেই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তা ভিন্ন নয়। সাংখ্য-দর্শনের মাধ্যমে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, জীব এই জড় জগতের বস্তু নয়, সে হচ্ছে পূর্ণ পরমাত্মার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই, এই জড় জগতে চিন্ময় আত্মার কোনই প্রয়োজন নেই। তার অস্তিত্বের ও কর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করা। যখন সে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে কর্ম করে, তখন সে যথার্থই তার স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়। প্রথমোক্ত পদ্ধতি সাংখ্য-যোগের মাধ্যমে মানুষকে জড় বিষয়ের প্রতি নিরাসক্ত হতে হয় এবং কর্মযোগ পদ্ধতি অনুসারে মানুষকে কৃষ্ণভাবনাময় কর্মে আসক্ত হতে হয়। প্রকৃতপক্ষে, এই দুটি পন্থা এক ও অভিন্ন, যদিও আপাতদৃষ্টিতে তাদের একটিকে নিরাসক্তি ও অন্যটিকে আসক্তি বলে মনে হয়। কিন্তু জড় বস্তুর প্রতি অনাসক্তি এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তি একই তত্ত্ব। এই কথা যিনি বুঝতে পেরেছেন, তিনি প্রকৃত তত্ত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

শ্লোক ৬

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬ ॥

সন্ন্যাসঃ—সন্ন্যাস আশ্রম; **তু**—কিন্তু; **মহাবাহো**—হে মহাবীর; **দুঃখম্**—দুঃখ; **আপ্তুম্**—প্রাপ্ত হয়; **অযোগতঃ**—নিষ্কাম কর্মযোগ ব্যতীত; **যোগযুক্তঃ**—নিষ্কাম কর্ম অনুষ্ঠানকারী; **মুনিঃ**—জ্ঞানী; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্মকে; **ন চিরেণ**—অচিরেই; **অধিগচ্ছতি**—লাভ করেন।

গীতার গান

সন্ন্যাস করিয়া যদি নহে কর্মযোগী ।
মহাবাহো কি বলিব বৃথা সেই ত্যাগী ॥
যোগযুক্ত মুনি যেবা ব্রহ্মপদ পায় ।
অচিরাৎ সেই কার্য সিদ্ধি যোগে হয় ॥

অনুবাদ

হে মহাবাহো! কর্মযোগ ব্যতীত কেবল কর্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস দুঃখজনক। কিন্তু যোগযুক্ত মুনি অচিরেই ব্রহ্মকে লাভ করেন।

তাৎপর্য

সন্ন্যাসী দুই প্রকারের—মায়াবাদী ও বৈষ্ণব। মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা সাংখ্য-দর্শন অধ্যয়ন করেন আর বৈষ্ণব সন্ন্যাসীরা *বেদান্ত-সূত্রের* যথার্থ ভাষ্য *শ্রীমদ্ভাগবত*-দর্শন অধ্যয়ন করেন। মায়াবাদী সন্ন্যাসীরাও *বেদান্ত-সূত্র* অধ্যয়ন করেন, কিন্তু তাঁরা তা অধ্যয়ন করেন শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের *শারীরক-ভাষ্যের* পরিপ্রেক্ষিতে। *শ্রীমদ্ভাগবত* অনুসরণকারী বৈষ্ণবেরা *পাঞ্চরাত্রিকী* বিধি অনুসারে ভক্তিমার্গে ভগবানের সেবা করেন, তাই বৈষ্ণব সন্ন্যাসীরা চিন্ময় ভগবদ্ভক্তিতে নানাবিধ কর্তব্য পালন করেন। বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের জড়-জাগতিক কর্তব্যকর্ম সাধন করার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই, কিন্তু তবুও ভগবানের সেবা করার জন্য তাঁরা নানা রকম কার্যকলাপের অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু সাংখ্য ও বেদান্ত-দর্শন অধ্যয়নকারী এবং মনোধর্ম-পরায়ণ মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা ভগবদ্ভক্তি আস্বাদন করতে পারেন না। যেহেতু তাঁদের অধ্যয়ন অত্যন্ত শ্রমদায়ক, তাই ব্রহ্ম বিষয়ক মনোধর্মের প্রভাবে বিভ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়ে তাঁরা কখনও কখনও *শ্রীমদ্ভাগবতের* শরণাপন্ন হন। কিন্তু *শ্রীমদ্ভাগবতের* যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করতে না পারার ফলে তাও ক্লেশদায়ক হয়ে ওঠে। কৃত্রিম উপায়ে মায়াবাদীদের শুষ্ক জ্ঞানালোচনা এবং জল্পনা-কল্পনা-প্রসূত অনুমান সবই নিরর্থক। ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ বৈষ্ণব সন্ন্যাসীরা তাঁদের দিব্য কর্তব্য সম্পাদন করে অপ্রাকৃত আনন্দ লাভ করেন এবং এই জগতের কাজ সমাপ্ত হলে অন্তিমে তাঁরা যে চিন্ময় ভগবৎ-ধামে ফিরে যাবেন, সেই সম্বন্ধে তাঁরা নিশ্চিত। মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা কখনও কখনও

আত্ম-উপলব্ধির মার্গ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে সমাজসেবা, পরোপকার আদি প্রাকৃত কার্যকলাপে পুনরায় প্রবৃত্ত হন। এগুলি সবই জড়-জাগতিক কর্মবন্ধন। এভাবেই আমরা দেখতে পাই, যাঁরা ভক্তি সহকারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করে চলেছেন, তাঁরা ব্রহ্মজ্ঞান অনুসন্ধানী সন্ন্যাসীদের থেকে অনেক উচ্চ মার্গে রয়েছেন। এই সমস্ত ব্রহ্মবাদী জ্ঞানীরাও বহু জন্মের পরে কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করেন।

শ্লোক ৭

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭ ॥

যোগযুক্তঃ—নিষ্কাম কর্মযোগে যুক্ত; **বিশুদ্ধাত্মা**—শুদ্ধ চিত্ত; **বিজিতাত্মা**—আত্মসংযত; **জিতেন্দ্রিয়ঃ**—ইন্দ্রিয়জয়ী; **সর্বভূতাত্মভূতাত্মা**—সমস্ত জীবের প্রতি দয়াশীল; **কুর্বন্নপি**—কর্ম করেও; **ন**—না; **লিপ্যতে**—লিপ্ত হন।

গীতার গান

যোগযুক্ত বিশুদ্ধাত্মা জিত ষড় গুণ ।
জিতেন্দ্রিয় হয় সেই অত্যন্ত প্রবীণ ॥
সর্বভূত লাগি যেবা কর্মযোগ সাধে ।
বিষয়ের মধ্যে থাকে বিষয় না বাধে ॥

অনুবাদ

যোগযুক্ত জ্ঞানী বিশুদ্ধ বুদ্ধি, বিশুদ্ধ চিত্ত ও জিতেন্দ্রিয় এবং তিনি সমস্ত জীবের অনুরাগভাজন হয়ে সমস্ত কর্ম করেও তাতে লিপ্ত হন না।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে যিনি মুক্তির পথে এগিয়ে চলেছেন, তিনি প্রতিটি জীবেরই অত্যন্ত প্রিয় এবং প্রতিটি জীবই তাঁর প্রিয়। কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করার ফলেই এটি সম্ভব। এই প্রকার ব্যক্তি কোন কিছুকেই শ্রীকৃষ্ণের থেকে ভিন্নরূপে দেখেন না। একটি গাছের ডালপালা যেমন গাছটি থেকে ভিন্ন নয়, তেমনই তিনিও দেখেন যে, প্রতিটি জীবও ভগবানের থেকে অভিন্ন। তিনি জানেন, গাছের গোড়ায় জল দিলে যেমন সমস্ত গাছটিকে জল দেওয়া হয় অথবা উদরকে খাদ্য দিলে যেমন

সমস্ত দেহকেই খাদ্য দেওয়া হয়, তেমনই ভগবানের সেবা করার ফলে সমস্ত জীব-জগতের সেবা করা হয়। এভাবেই শ্রীকৃষ্ণের দাসত্ব করার মাধ্যমে তিনি সকলেরই দাসত্ব করে চলেছেন। তাই তিনি সকলেরই প্রিয় এবং সকলেই তাঁর অতি প্রিয়। যেহেতু তাঁর কার্যকলাপে সকলেই সন্তুষ্ট, তাই তাঁর চেতনা পবিত্র ও নির্মল। যেহেতু তাঁর চেতনা পবিত্র ও নির্মল, তাই তাঁর মন সম্পূর্ণরূপে সংযত। আর তাঁর চিত্ত সংযত হবার ফলে তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিও সংযত। তাঁর মন সর্বদাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিবদ্ধ, তাই তিনি কখনই ভগবানকে বিস্মৃত হন না। সুতরাং, তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি কৃষ্ণসেবা ব্যতীত জড় কার্যকলাপে নিযুক্ত হবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। তিনি কৃষ্ণকথা ছাড়া আর কিছুই শোনেন না, তিনি কৃষ্ণপ্রসাদ ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করেন না এবং তিনি ভগবানের মন্দির ছাড়া অন্য কোথাও যেতে চান না। তাই, তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি সর্বতোভাবে সংযত। এভাবেই যাঁর ইন্দ্রিয় সংযত হয়েছে, তিনি কারও ক্ষতিসাধন করেন না। এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারে, "তা হলে অর্জুন কেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অন্যদের আঘাত দিলেন? তিনি কি ভগবৎ-চেতনাময় ছিলেন না?" সেই প্রশ্নের উত্তর *ভগবদ্গীতার* দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে অর্জুনকে অপরাধী বলে মনে হতে পারে, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত ব্যক্তিরা স্বতন্ত্রভাবে চিরকাল বেঁচে থাকবে, কেন না আত্মাকে কখনই হত্যা করা যায় না। তাই, আত্মার পরিপ্রেক্ষিতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে কেউই নিহত হয়নি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে কেবল তাদের পোশাকের পরিবর্তন হয়েছিল। তাই, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুন সত্যি সত্যিই যুদ্ধ করছিলেন না। সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পালন করছিলেন। এই ধরনের ভগবদ্ভক্ত কোন অবস্থাতেই কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না।

শ্লোক ৮-৯

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥ ৮ ॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯ ॥

ন—না; **এব**—অবশ্যই; **কিঞ্চিৎ**—কোন কিছু; **করোমি**—করি; **ইতি**—এভাবে; **যুক্তঃ**—চিন্ময় চেতনায় যুক্ত; **মন্যেত**—মনে করেন; **তত্ত্ববিৎ**—তত্ত্বজ্ঞ; **পশ্যন্**—দর্শন;

শৃণ্বন্—শ্রবণ; **স্পৃশন্**—স্পর্শ; **জিঘ্রন্**—ঘ্রাণ; **অশ্নন্**—ভোজন; **গচ্ছন্**—গমন; **স্বপন্**—স্বপ্ন; **শ্বসন্**—শ্বাস গ্রহণ; **প্রলপন্**—প্রলাপ; **বিসৃজন্**—ত্যাগ; **গৃহ্নন্**—গ্রহণ; **উন্মিষন্**—উন্মীলন; **নিমিষন্**—নিমীলন; **অপি**—সত্ত্বেও; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **ইন্দ্রিয়ার্থেষু**—ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে; **বর্তন্তে**—প্রবৃত্ত হয়; **ইতি**—এভাবে; **ধারয়ন্**—ধারণা করে।

গীতার গান

সে যোগী চিন্তয়ে সদা হয়ে তত্ত্ববিৎ।
সর্বকার্য করি কিন্তু করি না কিঞ্চিৎ॥
দেখি শুনি স্পর্শ করি নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে।
স্বপনে গমনে কিংবা ভোজনে বিলাসে॥
প্রলাপন করি কিংবা ভোগে বা সে ত্যাগে।
উন্মীলন নিমীলন কিংবা নিদ্রা যায় জাগে॥
জড়কার্যে জড়েন্দ্রিয় সতত সে জানে।
নিজ কার্য আত্মতত্ত্ব সর্বদা সে ধ্যানে॥

অনুবাদ

চিন্ময় চেতনায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তি দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা ও নিঃশ্বাস আদি ক্রিয়া করেও সর্বদা জানেন যে, প্রকৃতপক্ষে তিনি কিছুই করছেন না। কারণ প্রলাপ, ত্যাগ, গ্রহণ, চক্ষুর উন্মেষ ও নিমেষ করার সময় তিনি সব সময় জানেন যে, জড় ইন্দ্রিয়গুলিই কেবল ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়েছে, তিনি নিজে কিছুই করছেন না।

তাৎপর্য

যিনি কৃষ্ণভাবনাময় তাঁর অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে পবিত্র, তাই তিনি কর্তা, কর্ম, অধিষ্ঠান, প্রচেষ্টা ও দৈব—এই পাঁচটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণের দ্বারা সাধিত কর্মের সঙ্গে কোনভাবে সংযুক্ত নন। তার কারণ হচ্ছে, তিনি সর্বক্ষণ কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে প্রেমভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করছেন। আপাতদৃষ্টিতে যদিও মনে হয়, তিনি তাঁর দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাঁর কর্ম করছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর যথার্থ স্থিতি সম্বন্ধে সচেতন, যা হচ্ছে পারমার্থিক কার্যকলাপ। জড় চেতনায় ইন্দ্রিয়গুলি ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের চেষ্টায় নিয়োজিত থাকে, কিন্তু কৃষ্ণভাবনায় ইন্দ্রিয়গুলি শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের সন্তুষ্টি বিধান করার সেবায় প্রবৃত্ত হয়। তাই, কৃষ্ণভক্তকে আপাতদৃষ্টিতে ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপে নিয়োজিত বলে মনে হলেও

প্রকৃতপক্ষে তিনি সর্বদাই মুক্ত। দর্শন ও শ্রবণাদি হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ এবং এগুলির উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্ঞান আহরণ করা, সেই রকম গমন, প্রলাপন ও মলত্যাগাদিও ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ এবং এগুলির উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্ম করা। কৃষ্ণভক্ত কোন অবস্থাতেই ইন্দ্রিয়ের এই সমস্ত কর্মের দ্বারা প্রভাবিত হন না। ভগবানের সেবা ছাড়া তিনি আর কোন কর্মই করতে পারেন না। কারণ তিনি জানেন, তিনি হচ্ছেন ভগবানের নিত্যদাস।

শ্লোক ১০

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥ ১০॥

ব্রহ্মণি—পরমেশ্বর ভগবানকে; **আধায়**—সমর্পণ করে; **কর্মাণি**—সমস্ত কর্ম; **সঙ্গম্**—আসক্তি; **ত্যক্ত্বা**—ত্যাগ করে; **করোতি**—অনুষ্ঠান করেন; **যঃ**—যিনি; **লিপ্যতে**—প্রভাবিত হন; **ন**—না; **সঃ**—তিনি; **পাপেন**—পাপের দ্বারা; **পদ্মপত্রম্**—পদ্মপাতা; **ইব**—মতো; **অম্ভসা**—জল দ্বারা।

গীতার গান

ব্রহ্মণি নিবিষ্ট কার্য নিঃসঙ্গ যে করে।
বিষয় প্রভাবে সেই তাহাতে না ডরে॥
অতএব পাপ পুণ্যে নাহি তারে লেপে।
সেই পদ্মপত্র জলে জানি বা সংক্ষেপে॥

অনুবাদ

যিনি সমস্ত কর্মের ফল পরমেশ্বর ভগবানকে অর্পণ করে অনাসক্ত হয়ে কর্ম করেন, কোন পাপ তাঁকে কখনও স্পর্শ করতে পারে না, ঠিক যেমন জল পদ্মপাতাকে স্পর্শ করতে পারে না।

তাৎপর্য

এখানে *ব্রহ্মণি* শব্দটির অর্থ হচ্ছে কৃষ্ণভাবনায়। জড় জগৎ হচ্ছে প্রকৃতির তিনটি গুণের অভিব্যক্তি—তাকে বলা হয় 'প্রধান'। বৈদিক মন্ত্র—*সর্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম* (*মাণ্ডুক্য উপনিষদ* ২), *তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নামরূপমন্নং চ জায়তে* (*মুণ্ডক উপনিষদ*

১/১/৯) এবং *ভগবদ্গীতার* শ্লোক *মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম* (*গীতা* ১৪/৩) বর্ণনা করে যে, এই জগতে সব কিছুই ব্রহ্মের প্রকাশ। এই প্রকাশ যদিও ভিন্নরূপে হয়, কিন্তু তা মূল কারণ থেকে অভিন্ন। *ঈশোপনিষদে* বলা হয়েছে, সব কিছুই পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। তাই, তিনি হচ্ছেন সব কিছুর অধীশ্বর। যিনি এই সত্যকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং সেই উপলব্ধির ফলে সব কিছুই ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করেছেন, তিনি কোন অবস্থাতেই পাপ-পুণ্য কর্মফলের বন্ধনের দ্বারা আবদ্ধ হন না। পাপ অথবা পুণ্য কোন কর্মফলই তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তিনি জানেন, কোন বিশেষ কর্ম সাধন করার জন্যই ভগবান তাঁকে তাঁর জড় শরীরটি দান করেছেন, তাই ভগবানের সেবাতেই তিনি সেটি নিয়োজিত করেন। তখন তা সব রকম কলুষ থেকে মুক্ত, ঠিক যেমন জলে থাকলেও পদ্মপাতাকে জল কখনও স্পর্শ করতে পারে না। *গীতাতেও* (৩/৩০) ভগবান বলেছেন, *ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্য*—"সমস্ত কর্ম আমার (শ্রীকৃষ্ণের) কাছে সমর্পণ কর।" সিদ্ধান্ত হচ্ছে, যে জীব কৃষ্ণভাবনাশূন্য, তার দেহ ও ইন্দ্রিয়কে তার স্বরূপ মনে করে সে কর্ম করে, কিন্তু যিনি কৃষ্ণভাবনাময় তিনি জানেন, তাঁর দেহটি শ্রীকৃষ্ণের সম্পত্তি, তাই তিনি তা সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করেন।

শ্লোক ১১

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি ।
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১ ॥

কায়েন—দেহের দ্বারা; **মনসা**—মনের দ্বারা; **বুদ্ধ্যা**—বুদ্ধির দ্বারা; **কেবলৈঃ**—বিশুদ্ধ; **ইন্দ্রিয়ৈঃ**—ইন্দ্রিয় দ্বারা; **অপি**—এমন কি; **যোগিনঃ**—কৃষ্ণভাবনাময় নিষ্কাম কর্মযোগীগণ; **কর্ম**—কর্ম; **কুর্বন্তি**—করেন; **সঙ্গম্**—আসক্তি; **ত্যক্ত্বা**—পরিত্যাগ করে; **আত্ম**—আত্মা; **শুদ্ধয়ে**—শুদ্ধ করার জন্য।

গীতার গান

কায় মন বাক্যে সে যে যোগের সাধন ।
মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি একত্রে বন্ধন ॥
যোগার্থে যে কার্য হয় বৈরাগ্য সে যুক্ত ।
সকল সময়ে জ্ঞানযোগী নিত্যযুক্ত ॥

অনুবাদ

আত্মশুদ্ধির জন্য যোগীরা কর্মফলের আসক্তি ত্যাগ করে দেহ, মন, বুদ্ধি, এমন কি ইন্দ্রিয়ের দ্বারাও কর্ম করেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করার জন্য শরীর, মন, বুদ্ধি অথবা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তা জীবকে জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত করে। কৃষ্ণভাবনাময় কর্মের কোন জড় প্রতিক্রিয়া হয় না। তাই, কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম করার ফলে অনায়াসে সদাচার সাধিত হয়। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (*পূর্ব* ২/১৮৭) শ্রীল রূপ গোস্বামী তার বর্ণনা করে বলেছেন—

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মণা মনসা গিরা ।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥

"যিনি শরীর, মন, বুদ্ধি ও বাণী দিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, তিনি এই জড় জগতে অবস্থান করলেও, এমন কি তথাকথিত জড়-জাগতিক কর্মে ব্যাপৃত থাকলেও তিনি মুক্ত পুরুষ।" তাঁর কোন রকম মিথ্যা অহঙ্কার নেই এবং তিনি কখনই মনে করেন না তাঁর দেহটিই হচ্ছে তাঁর স্বরূপ, অথবা তিনি তাঁর দেহটির মালিক। তিনি জানেন যে, তাঁর স্বরূপ তাঁর দেহটি নয় এবং তাঁর দেহটি তাঁর সম্পত্তি নয়। তিনি শ্রীকৃষ্ণের এবং তাঁর দেহটিও শ্রীকৃষ্ণের। যখন তিনি তাঁর দেহ, মন, বুদ্ধি, বাণী, জীবন, ধন আদি সবই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিবেদন করেন, তৎক্ষণাৎ তিনি সর্বতোভাবে কৃষ্ণগত প্রাণ। যে মিথ্যা অহঙ্কারের প্রভাবে মানুষ মনে করে, তার দেহটি হচ্ছে তার স্বরূপ, কৃষ্ণভাবনায় তন্ময় থাকার ফলে তিনি সেই অহঙ্কার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হন। এটিই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃতের পূর্ণ বিকশিত অবস্থা।

শ্লোক ১২

যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্ ।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২ ॥

যুক্তঃ—যোগযুক্ত; **কর্মফলম্**—কর্মের ফল; **ত্যক্ত্বা**—পরিত্যাগ করে; **শান্তিম্**—শান্তি; **আপ্নোতি**—লাভ করেন; **নৈষ্ঠিকীম্**—নিষ্ঠাসম্পন্ন; **অযুক্তঃ**—সকাম কর্মী; **কামকারেণ**—কামনাপূর্বক প্রবৃত্ত হওয়ায়; **ফলে**—কর্মফলে; **সক্তঃ**—আসক্ত; **নিবধ্যতে**—আবদ্ধ হয়।

গীতার গান

কর্মফল ত্যজি যুক্ত বৈরাগ্য সাধন ।
নৈষ্ঠিকী শান্তি সে, নহে সংসার বন্ধন ॥
ফল্গু বৈরাগ্য যে কামকারী ফল ।
ফলকার্যে নিবন্ধন তাই সে দুর্বল ॥

অনুবাদ

যোগী কর্মফল ত্যাগ করে নৈষ্ঠিকী শান্তি লাভ করেন; কিন্তু সকাম কর্মী কর্মফলের প্রতি আসক্ত হয়ে কর্ম করার ফলে কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত ও দেহাত্ম-বুদ্ধিসম্পন্ন বৈষয়িক মানুষের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে, কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত এবং দেহাত্ম-বুদ্ধিসম্পন্ন বিষয়ী তার কর্মফলের প্রতি আসক্ত। যে মানুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত এবং তাঁর প্রীতি উৎপাদনের জন্য সমস্ত কর্ম করেন, তিনি অবধারিতভাবে মুক্ত পুরুষ; কারণ, তিনি কখনই কর্মফলের আশায় উৎকণ্ঠিত হন না। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে, দ্বৈত ধারণাযুক্ত হয়ে, অর্থাৎ পরতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত না হয়ে কর্ম করার ফলে কর্মফলের প্রতি উৎকণ্ঠার উদয় হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরতত্ত্ব পরমেশ্বর। কৃষ্ণভাবনায় তাই দ্বৈতভাব নেই। বিশ্বচরাচরের যা কিছু আছে, তা সবই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তিজাত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম মঙ্গলময়। তাই, কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে যে কার্যকলাপ সাধিত হয়, তা পারমার্থিক কর্ম; তা অপ্রাকৃত এবং জড় জগতের কলুষের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। তাই কৃষ্ণভক্ত শান্ত। কিন্তু যারা সর্বক্ষণ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য লাভ-ক্ষতির হিসাব করছে, তারা কখনই শান্তি পেতে পারে না। এটিই কৃষ্ণভাবনামৃতের রহস্য—শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ-রহিত কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই এবং এই সত্য উপলব্ধিই পরম শান্তি ও অভয় দান করে।

শ্লোক ১৩

সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী ।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ন কারয়ন্ ॥ ১৩ ॥

সর্ব—সমস্ত; **কর্মাণি**—কর্ম; **মনসা**—মনের দ্বারা; **সংন্যস্য**—ত্যাগ করে; **আস্তে**—থাকেন; **সুখম্**—সুখে; **বশী**—সংযত; **নবদ্বারে**—নয়টি দ্বারবিশিষ্ট; **পুরে**—নগরে; **দেহী**—দেহধারী জীব; **ন**—না; **এব**—অবশ্যই; **কুর্বন্**—করেন; **ন**—না; **কারয়ন্**—করান।

গীতার গান

বাহ্যে সর্বকার্য করে অন্তরে সন্ন্যাস ।
সর্বকার্যে সুষ্ঠু করি সুখেতে নিবাস ॥
নবদ্বার যুক্ত দেহ থাকি সেই পুরে ।
নিজে কিছু নাহি করে না করায় পরে ॥

অনুবাদ

বাহ্যে সমস্ত কার্য করেও মনের দ্বারা সমস্ত কর্ম ত্যাগ করে জীব নবদ্বার-বিশিষ্ট দেহরূপ গৃহে পরম সুখে বাস করতে থাকেন; তিনি নিজে কিছুই করেন না এবং কাউকে দিয়েও কিছু করান না।

তাৎপর্য

দেহধারী জীবাত্মা নয়টি দ্বারবিশিষ্ট একটি নগরে বাস করে। দেহরূপী নগরটির কার্য প্রকৃতির বিশেষ গুণের প্রভাবে আপনা থেকেই সাধিত হয়। জীবাত্মা যদিও স্বেচ্ছায় এই দেহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে, কিন্তু তবুও যদি সে ইচ্ছা করে, তবে এর থেকে মুক্ত হতে পারে। তার দিব্য স্বরূপের কথা ভুলে যাওয়ার ফলে সে তার জড় দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে নানা রকম দুঃখকষ্ট ভোগ করে। কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রভাবে তার যথার্থ স্বরূপকে পুনরুজ্জীবিত করার ফলে সে তার দেহবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। জীব যখন কৃষ্ণভক্তে পরিণত হয়, তখন তাঁর দেহগত সমস্ত কর্ম থেকে সে মুক্ত হয়। এই ধরনের নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করে যখন তার মনোবৃত্তির পরিবর্তন হয়, তখন সে মহানন্দে এই নবদ্বার-বিশিষ্ট নগরীতে বাস করে। এই নয়টি দ্বারবিশিষ্ট নগরীর বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

নবদ্বারে পুরে দেহী হংসো লেলায়তে বহিঃ ।
বশী সর্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য চরস্য চ ॥

"পরমেশ্বর ভগবান যিনি জীবাত্মার দেহে বাস করছেন, তিনিই হচ্ছেন বিশ্বচরাচরের অধীশ্বর। দেহের নয়টি দ্বার হচ্ছে—দুটি চোখ, দুটি নাক, দুটি কান, মুখ, উপস্থ ও পায়ু। বদ্ধ অবস্থায় জীব তার দেহকে তার স্বরূপ বলে পরিচয় দেয়, কিন্তু যখন সে তার অন্তরে অধিষ্ঠিত পরমাত্মার সঙ্গে তার পরিচয় খুঁজে পায়, তখন দেহে থাকলেও সে পরমাত্মার মতোই মুক্ত হয়।" (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* ৩/১৮)

সেই জন্য, কৃষ্ণভাবনাময় মানুষ জড় দেহের বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ এই দুই প্রকার কর্ম থেকেই মুক্ত।

শ্লোক ১৪

ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ ।
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে ॥ ১৪ ॥

ন—না; **কর্তৃত্বম্**—কর্তৃত্ব; **ন**—না; **কর্মাণি**—কর্মসমূহ, **লোকস্য**—জীবের; **সৃজতি**—সৃষ্টি করে; **প্রভুঃ**—দেহরূপ নগরীর প্রভু; **ন**—না; **কর্মফল**—কর্মের ফল; **সংযোগম্**—সংযোগ; **স্বভাবঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণ; **তু**—কিন্তু; **প্রবর্ততে**—প্রবৃত্ত হয়।

গীতার গান

অনাদি কর্মফলে ভবার্ণব জলে ।
আছে পড়ে বা না হয় তাঁহার সৃজন ॥
কর্মফল যেবা যোগ যাহা করে ভোগ ।
স্বভাব সে কার্য হয় নাম ভবরোগ ॥

অনুবাদ

দেহরূপ নগরীর প্রভু জীব কর্ম সৃষ্টি করে না, সে কাউকে দিয়ে কিছু করায় না এবং সে কর্মের ফলও সৃষ্টি করে না। এই সবই হয় জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায় অনুসারে, জীব ভগবানের মতোই পরা প্রকৃতি-সম্ভূত। এই পরা প্রকৃতি ভগবানের অন্য প্রকৃতি অপরা থেকে ভিন্ন। কোন না কোনভাবে

এই উৎকৃষ্ট পরা প্রকৃতির অংশ জীবাত্মা অনাদিকাল ধরে অপরা প্রকৃতির সংসর্গে আছে। জীবাত্মা তার কর্ম অনুসারে ক্ষণস্থায়ী এক-একটি দেহ প্রাপ্ত হয়ে সেই দেহে বাস করে। এভাবেই দেহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সে বদ্ধদশা প্রাপ্ত হয়। সে তখন অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে সেই জড় দেহটিকেই তার প্রকৃত স্বরূপ বলে মনে করতে শুরু করে এবং সেই দেহগত কর্মের ফল ভোগ করতে থাকে। জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত অজ্ঞতার পরিণামে তাকে এই দেহজাত দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়। কিন্তু যে মুহূর্তে সে দেহাত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করে এবং বুঝতে শেখে যে, সে তার দেহ নয়, সেই মুহূর্তেই সে তার দেহের বন্ধন থেকে—তার কর্মফলের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। যতক্ষণ সেই দেহরূপ নগরীতে সে বাস করে, ততক্ষণ সে মনে করে যে, সে-ই হচ্ছে তার দেহটির অধীশ্বর। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে তার দেহের অধীশ্বরও নয় এবং তার কর্মফলের কর্তাও নয়। সে হচ্ছে ভবসমুদ্রে নিমজ্জমান, জীবন-সংগ্রামে বিধ্বস্ত, অণুসদৃশ জীব। ভব-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গগুলি তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ করবার কোন শক্তিই তার নেই। চিন্ময় কৃষ্ণভাবনামৃতরূপী তরণীর আশ্রয় গ্রহণ করলে সে এই ভবসমুদ্র পার হতে পারে—সমস্ত দুর্যোগ থেকে রক্ষা পেতে পারে।

শ্লোক ১৫

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥ ১৫ ॥

ন—না; **আদত্তে**—গ্রহণ করেন; **কস্যচিৎ**—কারও; **পাপম্**—পাপ; **ন**—না; **চ**—ও; **এব**—অবশ্যই; **সুকৃতম্**—পুণ্য; **বিভুঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **অজ্ঞানেন**—অজ্ঞানের দ্বারা; **আবৃতম্**—আবৃত; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **তেন**—তার দ্বারা; **মুহ্যন্তি**—মোহিত হয়; **জন্তবঃ**—জীবসমূহ।

গীতার গান

ঈশ্বরের দত্ত নহে সেই পাপ পুণ্য ।
পাপ পুণ্য যাহা কিছু নিজ ইচ্ছা জন্য ॥
অজ্ঞানজনিত সেই ভোগ ইচ্ছা করে ।
পাশে থাকি মায়া তারে জাপটিয়া ধরে ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান জীবের পাপ অথবা পুণ্য কিছুই গ্রহণ করেন না। অজ্ঞানের দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান আবৃত হওয়ার ফলে জীবসমূহ মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

তাৎপর্য

সংস্কৃত *বিভু* শব্দটির অর্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান, যিনি অনন্ত জ্ঞান, শ্রী, যশ, বীর্য, ঐশ্বর্য ও বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ। তিনি সর্বদাই আত্মতৃপ্ত। পাপ ও পুণ্য তাঁকে কখনই স্পর্শ করতে পারে না। তিনি কোন জীবের জন্যই কোন বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি করেন না। কিন্তু অজ্ঞানতার দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে জীব বিভিন্ন পরিস্থিতির কামনা করে এবং তার ফলে তার কর্ম ও কর্মফলের প্রবাহ শুরু হয়। জীব ভগবানের পরা প্রকৃতিজাত, তাই তার স্বরূপে সে পূর্ণজ্ঞানে অধিষ্ঠিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার শক্তি সীমিত হওয়ার ফলে সে অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ভগবান সর্ব শক্তিমান, কিন্তু জীব তা নয়। ভগবান বিভু, কিন্তু জীব অণুসদৃশ। জীবাত্মার স্বাধীনভাবে ইচ্ছা করার স্বাতন্ত্র্য আছে, কিন্তু কেবলমাত্র সর্ব শক্তিমান ভগবানের দ্বারাই তার সেই ইচ্ছা পরিপূর্ণ হয়। জীব যখন তার কামনা-বাসনার দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, তখন সেই কামনা-বাসনাগুলিকে পূর্ণ করতে ভগবান তাকে অনুমোদন করেন। কিন্তু তাদের বিশেষ বাসনার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের কর্ম ও কর্মফলের জন্য ভগবান কোন অবস্থাতেই দায়ী নন। বিভ্রান্ত হয়ে জীব তাই তার জড় দেহটিকেই তার স্বরূপ বলে মনে করে এবং অনিত্য সুখ ও দুঃখ ভোগ করতে থাকে। পরমাত্মারূপে ভগবান প্রতিটি জীবের নিত্য সহচর। ফুলের কাছে গেলে যেমন তার গন্ধ পাওয়া যায়, তেমনই আমাদের খুব কাছে আছেন বলে ভগবান আমাদের অন্তরের সমস্ত কামনা-বাসনাগুলির কথা জানেন। কামনা-বাসনাগুলি হচ্ছে জীবের বন্ধনের সূক্ষ্ম রূপ। জীব যেভাবে কামনা করে, ভগবান ঠিক সেভাবেই তার যথাযোগ্য পূর্তি করেন। তাই, ইচ্ছা পূরণ করার কোন শক্তিই জীবের নেই, কিন্তু ভগবান হচ্ছেন সর্ব শক্তিমান বাঞ্ছাকল্পতরু। তিনি সর্বতোভাবে নিরপেক্ষ, তাই তিনি অণু স্বাতন্ত্র্য-বিশিষ্ট জীবের ইচ্ছায় হস্তক্ষেপ করেন না। কিন্তু কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়ার ইচ্ছা করেন, তখন ভগবান তাঁর প্রতি বিশেষভাবে যত্নপরায়ণ হন এবং তাঁকে এমনভাবে উৎসাহিত করেন, যার ফলে তিনি তাঁকে পেয়ে শাশ্বত সুখ আস্বাদন করতে পারেন।

বৈদিক মন্ত্রে বলা হয়েছে, *এষ উ হ্যেব সাধু কর্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্যো উন্নিনীষতে। এষ উ এবাসাধু কর্ম কারয়তি যমধো নিনীষতে*—"ভগবান

জীবকে সৎকর্মে প্রবৃত্ত করেন যাতে তার উন্নতি সাধন হয়। তিনি জীবকে অসৎ কর্মে প্রবৃত্ত করেন যাতে সে নরকগামী হয়।" (*কৌষীতকী উপনিষদ* ৩/৮)

অজ্ঞো জন্তুরনীশোঽয়মাত্মনঃ সুখদুঃখয়োঃ ।
ঈশ্বরপ্রেরিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং বাশ্বভ্রমেব চ ॥

"সুখ-দুঃখের উপর জীব সর্বতোভাবে নির্ভরশীল। বায়ু যেমন মেঘকে চালিত করে, তেমনই ভগবানের ইচ্ছার ফলে জীব স্বর্গে অথবা নরকে গমন করে।"

তাই, দেহধারী জীব অনন্তকাল ধরে কৃষ্ণবিমুখ হয়ে থাকার বাসনা করে এবং সেটিই তার মোহাচ্ছন্ন হবার কারণ। তাই সে সচ্চিদানন্দময় হলেও, যেহেতু তার সত্তা ক্ষুদ্র ও বদ্ধ, তাই সে তার স্বরূপ বিস্মৃত হয়—সে ভুলে যায় যে, সে ভগবানের নিত্যদাস এবং এভাবেই সে অবিদ্যার দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ে। অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ার ফলে সে বলে যে, তার ভব-বন্ধনের জন্য ভগবানই দায়ী। এই কথার বিরোধিতা করে *বেদান্ত-সূত্রে* (২/১/৩৪) বলা হয়েছে, *বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি*—"ভগবান কাউকে ঘৃণা করেন না অথবা ভালবাসেন না, যদিও সেই রকম মনে হয়।"

শ্লোক ১৬

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ ।
তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্ ॥ ১৬ ॥

জ্ঞানেন—জ্ঞানের দ্বারা; **তু**—কিন্তু; **তৎ**—সেই; **অজ্ঞানম্**—অজ্ঞান; **যেষাম্**—যাঁদের; **নাশিতম্**—বিনাশ হয়; **আত্মনঃ**—জীবের; **তেষাম্**—তাঁদের; **আদিত্যবৎ**—উদীয়মান সূর্যের মতো; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **প্রকাশয়তি**—প্রকাশ করে; **তৎ**—সেই; **পরম্**—অপ্রাকৃত পরমতত্ত্বকে।

গীতার গান

অতএব জ্ঞান উপজিলে মায়া নাশ ।
আত্মার স্বরূপ তথা স্বতঃই প্রকাশ ॥
সূর্যের প্রকাশে যথা অন্ধকার যায় ।
জ্ঞানের প্রকাশে তথা অজ্ঞানের ক্ষয় ॥

অনুবাদ

জ্ঞানের প্রভাবে যাঁদের অজ্ঞান বিনষ্ট হয়েছে, তাঁদের সেই জ্ঞান অপ্রাকৃত পরমতত্ত্বকে প্রকাশ করে, ঠিক যেমন দিনমানে সূর্যের উদয়ে সব কিছু প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্য

যারা শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে গেছে তারা অবশ্যই মোহাচ্ছন্ন, কিন্তু যাঁরা কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত তাঁরা কখনই মোহাচ্ছন্ন হন না। *ভগবদ্গীতাতে* বলা হয়েছে—*সর্বং জ্ঞানপ্লবেন, জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি* এবং *ন হি জ্ঞানেন সদৃশম্*। জ্ঞান সর্বদাই অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন। এই জ্ঞানের স্বরূপ কি? শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার ফলেই পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা যায়, যে কথা সপ্তম অধ্যায়ের ঊনবিংশতি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে—*বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে*। বহু বহু জন্মের পরে জ্ঞানী যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন, অথবা কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হন, তখন তাঁর কাছে সমস্ত তত্ত্ব প্রকাশিত হয়, যেমন দিনের বেলায় সূর্যের আলোতে সব কিছু প্রকাশিত হয়। জীব নানাভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ধৃষ্টতাপূর্বক সে যখন নিজেকে ভগবান বলে মনে করে, তখন সে মায়ার অন্তিম ফাঁদে পতিত হয়। জীব যদি ভগবান হয়, তা হলে সে মায়ার দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয় কিভাবে? যদি তা সম্ভব হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে, অজ্ঞান বা শয়তান ভগবানের চেয়েও বেশি ক্ষমতাশালী। যথার্থ জ্ঞান কৃষ্ণভাবনাময় মহাপুরুষের কাছ থেকেই লাভ করা যায়। তাই, এই রকম যথার্থ সদ্‌গুরুর অনুসন্ধান করে তাঁর কাছে কৃষ্ণভাবনামৃতের শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। সূর্য যেমন অন্ধকার দূর করে, কৃষ্ণভাবনামৃত তেমন সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞানতা দূর করতে পারে। কেউ জ্ঞান লাভের মাধ্যমে উপলব্ধি করতে পারে যে, সে তার দেহ নয়, সে তার জড় দেহের অতীত, তবুও সে আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে না। কিন্তু সে যদি কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত সদ্‌গুরুর শরণাগত হতে যত্নবান হয়, তা হলে সে সব কিছুই ভালভাবে জানতে পারে। কেবলমাত্র ভগবানের প্রতিনিধির সান্নিধ্য লাভ হলেই ভগবান ও ভগবানের সঙ্গে আমাদের নিত্য সম্পর্কের কথা জানা যায়। ভগবানের প্রতিনিধি কখনও দাবি করেন না যে, তিনি ভগবান, কিন্তু তাঁকে ভগবানের মতোই সম্মান করা হয়, কারণ তিনি ভগবৎ-তত্ত্ব জানেন। ভগবান ও জীবের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তা জানা উচিত। *ভগবদ্গীতার* দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই জন্য বলেছেন, প্রত্যেক জীব স্বতন্ত্র এবং

ভগবানও স্বতন্ত্র। অতীতে তাদের সকলেরই পৃথক স্বরূপ ছিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতে মুক্তির পরেও থাকবে। রাত্রির অন্ধকারে যেমন সব কিছুই এক বলে মনে হয়, কিন্তু দিনের বেলায় সূর্যোদয় হলে প্রতিটি বস্তু তাদের যথার্থ রূপে প্রতিভাত হয়। জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হলে তেমনই সব কিছুর স্বরূপ উপলব্ধি হয়। পারমার্থিক জীবনে স্বতন্ত্রভাবে স্বরূপ উপলব্ধিই হচ্ছে যথার্থ জ্ঞান।

শ্লোক ১৭

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥ ১৭ ॥

তদ্বুদ্ধয়ঃ—যাঁর বুদ্ধি পরমেশ্বর ভগবানে স্থির হয়েছে; **তদাত্মানঃ**—যাঁর মন পরমেশ্বর ভগবানে একাগ্র হয়েছে; **তন্নিষ্ঠাঃ**—কেবল ভগবানেই নিষ্ঠাসম্পন্ন; **তৎপরায়ণাঃ**—যিনি সম্পূর্ণরূপে তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেছেন; **গচ্ছন্তি**—লাভ করেন; **অপুনরাবৃত্তিম্**—মুক্তি; **জ্ঞান**—জ্ঞানের দ্বারা; **নির্ধূত**—বিধৌত; **কল্মষাঃ**—কলুষ।

গীতার গান

সেই জ্ঞান অনুকূলে বুদ্ধি নিষ্ঠা যার ।
আত্মজ্ঞান পরায়ণ সংসার উদ্ধার ॥

অনুবাদ

যাঁর বুদ্ধি ভগবানের প্রতি উন্মুখ হয়েছে, মন ভগবানের চিন্তায় একাগ্র হয়েছে, নিষ্ঠা ভগবানে দৃঢ় হয়েছে এবং যিনি ভগবানকে তাঁর একমাত্র আশ্রয় বলে গ্রহণ করেছেন, জ্ঞানের দ্বারা তাঁর সমস্ত কলুষ সম্পূর্ণরূপে বিধৌত হয়েছে এবং তিনি জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরতত্ত্ব। সম্পূর্ণ *ভগবদ্গীতা* শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার কথা ঘোষণা করছে। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রেও সেই একই কথা বলা হয়েছে। তত্ত্ববিদেরা পরতত্ত্বকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানরূপে জানেন। ভগবান হচ্ছেন পরতত্ত্বের শেষ কথা। তাঁর ঊর্ধ্বে আর কিছু নেই। ভগবানও বলছেন, *মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়*—"হে অর্জুন! আমার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউই নয়।" নির্বিশেষ ব্রহ্ম সম্বন্ধেও শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্*—আমিই নির্বিশেষ ব্রহ্মের

আশ্রয়। সুতরাং, সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরাৎপর তত্ত্ব। যাঁর মন, বুদ্ধি, নিষ্ঠা ও আশ্রয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণতেই নিত্য কেন্দ্রীভূত, অর্থাৎ যিনি পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত, তিনি নিঃসন্দেহে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ণজ্ঞানে পরম সত্যকে উপলব্ধি করেন। কৃষ্ণভক্ত পূর্ণরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারেন। এই দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে তিনি অবিচলিতভাবে মুক্তির পথে এগিয়ে চলেন।

শ্লোক ১৮

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮ ॥

বিদ্যা—বিদ্যা; **বিনয়**—বিনয়; **সম্পন্নে**—সম্পন্ন; **ব্রাহ্মণে**—ব্রাহ্মণে; **গবি**—গাভীতে; **হস্তিনি**—হাতিতে; **শুনি**—কুকুরে; **চ**—এবং; **এব**—অবশ্যই; **শ্বপাকে**—চণ্ডালে; **চ**—এবং; **পণ্ডিতাঃ**—পণ্ডিতেরা; **সমদর্শিনঃ**—সমদর্শী।

গীতার গান

সমদর্শী হয় সে জ্ঞানের প্রভাবে।
বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে বা গবে ॥
হস্তী বা কুকুর বা সে নীচ বা চণ্ডাল।
সমদর্শী জ্ঞানী দেখে সবাই সমান ॥

অনুবাদ

জ্ঞানবান পণ্ডিতেরা বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গাভী, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডাল সকলের প্রতি সমদর্শী হন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভক্ত কখনই জাতি অথবা কুলের মধ্যে পার্থক্য বিচার করেন না। সমাজ-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একজন ব্রাহ্মণ একজন চণ্ডালের থেকে আলাদা হতে পারে, অথবা একটি কুকুর, একটি গরু, একটি হাতি জাতিগতভাবে ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞানীর দৃষ্টিতে এই দেহজাত ভেদগুলি নিরর্থক। কারণ, সকলেই ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। তিনি দেখেন, সমস্ত জীবের অন্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

তাঁর আংশিক প্রকাশ পরমাত্মারূপে বিরাজ করছেন। পরতত্ত্বের এই উপলব্ধি হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান। জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে ভগবান সকলকেই সমানভাবে কৃপা করেন, কারণ তিনি প্রতিটি জীবকেই তাঁর সখা বলে মনে করেন এবং জীবের অবস্থা নির্বিশেষে পরমাত্মা রূপে সর্বদাই তার সঙ্গে বিরাজ করেন। চণ্ডাল এবং ব্রাহ্মণের দেহ ভিন্ন হলেও ভগবান তাদের উভয়ের সঙ্গেই পরমাত্মা রূপে বিরাজমান। জড় প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন গুণের প্রভাবে জড় দেহের সৃষ্টি হয়। কিন্তু দেহমধ্যস্থ জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই চিন্ময় গুণসম্পন্ন। গুণগতভাবে এক হলেও জীবাত্মা এবং পরমাত্মার আয়তন ভিন্ন, কারণ জীবাত্মা কেবল একটি দেহে থাকতে পারে, কিন্তু পরমাত্মা প্রত্যেক দেহে বিরাজ করেন। কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত কৃষ্ণভক্ত এই তত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে অবগত। তাই, তিনি প্রকৃত জ্ঞানী এবং সমদৃষ্টিসম্পন্ন। জীবাত্মা ও পরমাত্মার সাদৃশ্য হচ্ছে যে, উভয়েই সচ্চিদানন্দময়; আর তাদের বৈসাদৃশ্য হচ্ছে যে, জীবাত্মা অণুচৈতন্য আর পরমাত্মা সর্বদেহে বিরাজমান বিভুচৈতন্য।

শ্লোক ১৯

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯ ॥

ইহ—এই জীবনে; **এব**—অবশ্যই; **তৈঃ**—তাঁদের দ্বারা; **জিতঃ**—বিজিত; **সর্গঃ**—জন্ম ও মৃত্যু; **যেষাম্**—যাঁদের; **সাম্যে**—সমভাবে; **স্থিতম্**—স্থিত; **মনঃ**—মন; **নির্দোষম্**—নির্দোষ; **হি**—অবশ্যই; **সমম্**—সমভাব; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্ম; **তস্মাৎ**—সেই হেতু; **ব্রহ্মণি**—ব্রহ্মে; **তে**—তারা; **স্থিতাঃ**—অবস্থিত।

গীতার গান

জীবন্মুক্ত সেই জ্ঞানী সাধারণ নয়।
সেই সাম্যস্থিত মনে সংসার যে ক্ষয় ॥
সমতা নির্দেশ ব্রহ্ম তাহে ব্রহ্মস্থিতি।
ব্রহ্মজ্ঞানী যেই তার সেই হয় রীতি ॥

অনুবাদ

যাঁদের মন সাম্যে অবস্থিত হয়েছে, তাঁরা ইহলোকেই জন্ম ও মৃত্যুর সংসার জয় করেছেন। তাঁরা ব্রহ্মের মতো নির্দোষ, তাই তাঁরা ব্রহ্মেই অবস্থিত হয়ে আছেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে যে মনের সাম্যস্থিতির কথা বলা হয়েছে, তা আত্ম-উপলব্ধির লক্ষণ। যাঁরা এই স্থিতি প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁরা জড় বন্ধন, বিশেষ করে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছেন বলে বুঝতে হবে। যতক্ষণ জীব তার দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে, ততক্ষণ সে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু আত্ম-উপলব্ধির ফলে যখন সে সব কিছুর প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, তখন সে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। পক্ষান্তরে, তখন আর তাকে এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করতে হয় না, দেহত্যাগ করার পর সে ভগবৎ-ধামে প্রবিষ্ট হয়। রাগ ও দ্বেষ থেকে মুক্ত হবার ফলে ভগবান সম্পূর্ণ নির্দোষ। তেমনই, জীবও যখন রাগ ও দ্বেষ থেকে মুক্ত হয়, তখন সেও নির্দোষ হয় এবং ভগবৎ-ধামে প্রবেশ করার যোগ্যতা লাভ করে। এই ধরনের লোকেরা জীবন্মুক্ত। তাদের লক্ষণ পরবর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২০

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্ ।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ২০ ॥

ন—না; **প্রহৃষ্যেৎ**—হর্ষে উৎফুল্ল হন; **প্রিয়ম্**—প্রিয় বস্তু; **প্রাপ্য**—লাভ করে; **ন**—না; **উদ্বিজেৎ**—বিচলিত হন; **প্রাপ্য**—লাভ করে; **চ**—ও; **অপ্রিয়ম্**—অপ্রিয় বস্তু; **স্থিরবুদ্ধিঃ**—স্থির বুদ্ধিসম্পন্ন; **অসংমূঢ়ঃ**—মোহশূন্য; **ব্রহ্মবিৎ**—ব্রহ্মজ্ঞানী; **ব্রহ্মণি**—ব্রহ্মে; **স্থিতঃ**—অবস্থিত।

গীতার গান

প্রিয় বস্তু প্রাপ্য হলে উঠে না নাচিয়া ।
অপ্রিয় প্রাপ্তিতে কভু মরে না কাঁদিয়া ॥
স্থির বুদ্ধি ব্রহ্মবিদ্ অসংমূঢ় মতি ।
ব্রহ্মেতে নিয়ত বাস নাম ব্রহ্মস্থিতি ॥

অনুবাদ

যে ব্যক্তি প্রিয় বস্তুর প্রাপ্তিতে উৎফুল্ল হন না এবং অপ্রিয় বস্তুর প্রাপ্তিতে বিচলিত হন না, যিনি স্থিরবুদ্ধি, মোহশূন্য ও ভগবৎ-তত্ত্ববেত্তা, তিনি ব্রহ্মেই অবস্থিত।

তাৎপর্য

এখানে আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষের বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর প্রথম লক্ষণ হচ্ছে যে, তিনি মোহাচ্ছন্ন হয়ে তাঁর দেহটিকে তাঁর যথার্থ স্বরূপ বলে ভুল করেন না। তিনি সুনিশ্চিত ভাবেই জানেন যে, তিনি তাঁর দেহ নন। তাঁর প্রকৃত স্বরূপ হচ্ছে পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এক অণুসদৃশ অংশ। সেই কারণে, দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে তিনি জড়-জাগতিক লাভ অথবা ক্ষতিতে আনন্দিত বা দুঃখিত হন না। মনের এই দৃঢ়তাকে বলা হয় *স্থিরবুদ্ধি*। তাই, কখনই তিনি তাঁর জড় দেহটিকে আত্মা বলে ভুল করেন না, অথবা দেহটিকে নিত্য বলে মনে করে আত্মার অবহেলা করেন না। এই জ্ঞানের প্রভাবে তিনি পরমতত্ত্ব উপলব্ধির পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেন; অর্থাৎ তিনি ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানকে জানতে পারেন। তিনি তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত হন, তাই তিনি ভগবানের সঙ্গে সর্বতোভাবে এক হয়ে যাবার ভ্রান্ত প্রচেষ্টা করেন না। এই হচ্ছে ব্রহ্ম-উপলব্ধি অথবা আত্ম-উপলব্ধি। এই স্থিরমতি ভাবনার স্তরকেই বলা হয় কৃষ্ণভাবনা।

শ্লোক ২১

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্ ।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ২১ ॥

বাহ্যস্পর্শেষু—বিষয়সুখে; **অসক্তাত্মা**—অনাসক্ত-চিত্ত ব্যক্তি; **বিন্দতি**—অনুভব করেন; **আত্মনি**—আত্মায়; **যৎ**—যা; **সুখম্**—সুখ; **সঃ**—তিনি; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্মে; **যোগযুক্তাত্মা**—যোগযুক্ত হয়ে; **সুখম্**—সুখ; **অক্ষয়ম্**—অন্তহীন; **অশ্নুতে**—ভোগ করেন।

গীতার গান

বাহ্যস্পর্শ সুখ যাহা নাই যে আসক্তি ।
আত্মানন্দে সেবানন্দী আত্মাতে বিন্দতি ॥
সেই ব্রহ্মযোগ যুক্ত আত্মা পায় ।
অক্ষয় সুখেতে মগ্ন সর্বদা সে রয় ॥

অনুবাদ

সেই প্রকার ব্রহ্মবিৎ পুরুষ কোন রকম জড় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আকৃষ্ট হন না, তিনি চিন্ময় সুখ লাভ করেন। ব্রহ্মে যোগযুক্ত হয়ে তিনি অক্ষয় সুখ ভোগ করেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত মহাভাগবত শ্রীযামুনাচার্য বলেছেন—

যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপদারবিন্দে
নবনবরসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ ।
তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্যমানে
ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনং চ ॥

"যখন থেকে আমি ভগবদ্ভক্তি লাভ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দের সেবায় রত হয়ে নব নব রস আস্বাদন করছি, তখন থেকে নারীসঙ্গমের কথা মনে হলে সেই চিন্তার উদ্দেশ্যে আমি থুতু ফেলি এবং ঘৃণায় আমার মুখ বিকৃত হয়।" ব্রহ্মযোগী বা কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত ভক্ত ভগবানের প্রেমময় সেবায় এতই তন্ময় থাকেন যে, তখন আর ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করবার বাসনার প্রতি তাঁর লেশমাত্র রুচি থাকে না। জড় জগতে স্ত্রীসঙ্গ করাটাই হচ্ছে পরম সুখ। সমগ্র বিশ্ব এরই মোহে চালিত হচ্ছে। দেহসর্বস্ব বিষয়ী লোকেরা কিন্তু এর অনুপ্রেরণা ছাড়া কোন কাজই করতে পারে না। কিন্তু কৃষ্ণভাবনায় নিয়োজিত ভক্ত কামসুখ পরিহার করেও দ্বিগুণ উৎসাহে কর্ম করতে পারেন। সেটিই হচ্ছে পরমার্থ উপলব্ধির পরীক্ষা। পরমার্থ উপলব্ধি ও কাম উপভোগ সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। জীবন্মুক্ত কৃষ্ণভক্ত কোন রকম ইন্দ্রিয়-সুখের প্রতি আকৃষ্ট হন না।

শ্লোক ২২

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে ।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২ ॥

যে—যে সমস্ত; হি—অবশ্যই; সংস্পর্শজাঃ—জড় ইন্দ্রিয়ের সংযোগ-জনিত; **ভোগাঃ**—ভোগসমূহ; **দুঃখ**—দুঃখ; যোনয়ঃ—কারণ; এব—অবশ্যই; তে—সেই সমস্ত; আদি—আদি; **অন্তবন্তঃ**—অন্তবিশিষ্ট; **কৌন্তেয়**—হে কুন্তীপুত্র; ন—না; তেষু—তাতে; **রমতে**—প্রীতি লাভ করেন; **বুধঃ**—বিবেকী ব্যক্তি।

গীতার গান

স্পর্শ সুখে যে আনন্দ তাহা দুঃখময় ।
ভোগ নহে ভোগী সেই জানিহ নিশ্চয় ॥

সেই সুখে আদি অন্তে শুধু দুঃখ হয় ।
বুদ্ধিমান ব্যক্তি যেই না তাতে রময় ॥

অনুবাদ

বিবেকবান পুরুষ দুঃখের কারণ যে ইন্দ্রিয়জাত বিষয়ভোগ তাতে আসক্ত হন না। হে কৌন্তেয়! এই ধরনের সুখভোগ আদি ও অন্তবিশিষ্ট। তাই, জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাতে প্রীতি লাভ করেন না।

তাৎপর্য

জড় ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংযোগের ফলে ইন্দ্রিয়-সুখানুভূতির উদয় হয়। কিন্তু এই ইন্দ্রিয়গুলি অনিত্য, কারণ দেহটিই অনিত্য। জীবন্মুক্ত পুরুষ কখনও অনিত্য বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন না। অপ্রাকৃত আনন্দের স্বাদ পাবার পরে, কিভাবে তিনি অনিত্য জড় সুখভোগের প্রয়াসী হতে পারেন? *পদ্ম পুরাণে* বলা হয়েছে—

রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি ।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে ॥

"যোগীরা পরমতত্ত্বে রমণ করে অনন্ত চিদানন্দ আস্বাদন করেন। তাই, সেই পরম-ব্রহ্মকে রাম বলা হয়।"

শ্রীমদ্ভাগবতেও (৫/৫/১) বলা হয়েছে—

নায়ং দেহো দেহভাজাং নৃলোকে
কষ্টান্ কামানর্হতে বিড়্ভুজাং যে ।
তপো দিব্যং পুত্রকা যেন সত্ত্বং
শুদ্ধ্যেদ্যস্মাদ্ ব্রহ্মসৌখ্যং ত্বনন্তম্ ॥

"হে পুত্রগণ! মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হয়ে জড় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করার কোন প্রয়োজন নেই। বিষ্ঠাহারী শূকরেরা এই সুখ লাভ করে থাকে। বরং, এই জীবনে তোমাদের তপশ্চর্যার অনুশীলন করা উচিত, যার প্রভাবে তোমরা শুদ্ধ হবে, পবিত্র হবে এবং তার ফলে অনন্ত চিন্ময় আনন্দ লাভ করবে।"

তাই, যথার্থ যোগী ইন্দ্রিয়-সুখের প্রতি আকৃষ্ট হন না, যা হচ্ছে অপ্রতিহত ভবরোগের কারণ। জীবের ভোগাসক্তি যত বেশি হয়, ততই সে জাগতিক ক্লেশের বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

শ্লোক ২৩

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ২৩ ॥

শক্নোতি—সক্ষম; **ইহ এব**—এই শরীরে; **যঃ**—যিনি; **সোঢ়ুম্**—সহ্য করতে; **প্রাক্**—পূর্বে; **শরীর**—শরীর; **বিমোক্ষণাৎ**—ত্যাগ করার; **কাম**—কাম; **ক্রোধ**—ক্রোধ; **উদ্ভবম্**—উদ্ভূত; **বেগম্**—বেগ; **সঃ**—তিনি; **যুক্তঃ**—আত্ম-সমাহিত; **সঃ**—তিনি; **সুখী**—সুখী; **নরঃ**—মানুষ।

গীতার গান

শরীর ছাড়িতে পূর্বে যে অভ্যাস করে ।
তাহার সুলভ সেই অন্যে কাঁদি মরে ॥
ষড়বেগ জয় করি গোস্বামী যে হয় ।
সুখী সেই নরনারী করে দিগ্বিজয় ॥

অনুবাদ

এই দেহ ত্যাগ করার পূর্বে যিনি কাম, ক্রোধ থেকে উদ্ভূত বেগ সহ্য করতে সক্ষম হন, তিনিই যোগী এবং এই জগতে তিনিই সুখী হন।

তাৎপর্য

যদি কেউ আত্ম-উপলব্ধির পথে উন্নতি সাধনে প্রয়াসী হন, তবে তাঁকে জড় ইন্দ্রিয়ের বেগ দমন করবার চেষ্টা করতেই হবে। এই বেগ ছয় প্রকারের—বাচোবেগ, ক্রোধবেগ, মনোবেগ, উদরবেগ, উপস্থবেগ ও জিহ্বাবেগ। যিনি ইন্দ্রিয়ের এই সমস্ত বেগ ও মনকে বশ করতে সক্ষম হয়েছেন, তাঁকে বলা হয় গোস্বামী অথবা স্বামী। এই গোস্বামীরা কঠোর সংযমের সঙ্গে তাঁদের জীবন যাপন করেন এবং ইন্দ্রিয়ের সমস্ত বেগগুলিকে সর্বতোভাবে দমন করেন। জড় বাসনা যখন অতৃপ্ত থেকে যায়, তখন ক্রোধের সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে মন, চক্ষু ও বক্ষ উত্তেজিত হয়। তাই, এই জড় দেহটিকে ত্যাগ করার আগেই এই বেগগুলি দমন করার অভ্যাস করতে হয়। যিনি তা পারেন, তিনি হচ্ছেন আত্ম-তত্ত্ববিদ এবং আত্ম-উপলব্ধির স্তরে তিনি পরম সুখী। যোগীদের কর্তব্য হচ্ছে কাম ও ক্রোধকে বশ করার প্রাণপণ চেষ্টা করা।

শ্লোক ২৪

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ ।
স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥ ২৪ ॥

যঃ—যিনি; **অন্তঃসুখঃ**—অন্তরে সুখী; **অন্তরারামঃ**—আত্মাতেই ক্রীড়াশীল; **তথা**—এবং; **অন্তর্জ্যোতিঃ**—অন্তর্বর্তী আত্মাই যাঁর লক্ষ্য; **এব**—নিশ্চিতরূপে; **যঃ**—যিনি; **সঃ**—তিনি; **যোগী**—যোগী; **ব্রহ্মনির্বাণম্**—ব্রহ্মনির্বাণ; **ব্রহ্মভূতঃ**—ব্রহ্মে অবস্থিত হয়ে; **অধিগচ্ছতি**—লাভ করেন।

গীতার গান

বাহিরের সুখ ছাড়ি যেবা অন্তর্মুখ ।
অন্তরে রমণ করে অন্তর্জ্যোতি রূপ ॥
ব্রহ্মভূত হয় সেই ব্রহ্মতে নির্বাণ ।
বহিরঙ্গা মায়া ছাড়ে পায় ভগবান ॥

অনুবাদ

যিনি আত্মাতেই সুখ অনুভব করেন, যিনি আত্মাতেই ক্রীড়াযুক্ত এবং আত্মাই যাঁর লক্ষ্য, তিনিই যোগী। তিনি ব্রহ্মে অবস্থিত হয়ে ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন।

তাৎপর্য

আত্মায় যে সুখ আস্বাদন করেনি, সে অনিত্য সুখভোগের বাহ্য ক্রিয়াগুলি কিভাবে পরিত্যাগ করবে? জীবন্মুক্ত পুরুষ যথার্থ অনুভূতিতে সুখ আস্বাদন করেন। তাই, তিনি এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে চিন্ময় চেতনার সাহায্যে জীবনের ক্রিয়াগুলিকে উপভোগ করতে পারেন। এই ধরনের মুক্ত পুরুষ কখনই বাহ্য জাগতিক সুখের আকাঙ্ক্ষা করেন না। এই অবস্থাকে *ব্রহ্মভূত* বলে, তখন ভগবৎ-ধামে ফিরে যাওয়া সুনিশ্চিত হয়।

শ্লোক ২৫

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণম্ ঋষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫ ॥

লভন্তে—লাভ করেন; **ব্রহ্মনির্বাণম্**—ব্রহ্মনির্বাণ; **ঋষয়ঃ**—ঋষিগণ; **ক্ষীণকল্মষাঃ**—নিষ্পাপ; **ছিন্ন**—ছিন্ন করে; **দ্বৈধাঃ**—দ্বিধা; **যতাত্মানঃ**—সংযতচিত্ত; **সর্বভূত**—সমস্ত জীবের; **হিতে**—কল্যাণে; **রতাঃ**—রত।

গীতার গান

নিষ্পাপ হইয়া ঋষি ব্রহ্মেতে নির্বাণ।
সর্বভূত হিতে রত ছিন্ন দ্বিধাজ্ঞান ॥

অনুবাদ

সংযতচিত্ত, সমস্ত জীবের কল্যাণে রত এবং সংশয় রহিত নিষ্পাপ ঋষিগণ ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন।

তাৎপর্য

যিনি সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনাময়, তিনিই কেবল পারেন সমস্ত জীবের মঙ্গল সাধন করতে। মানুষ যখন বুঝতে পারেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সর্ব কারণের কারণ, তখন সেভাবেই ভাবিত হয়ে তিনি যে কর্ম করেন, সেই কর্ম সকলেরই মঙ্গল সাধন করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে পরম ভোক্তা, পরম ঈশ্বর, পরম বন্ধু, সেই কথা ভুলে যাওয়ার ফলেই মানুষ নানাভাবে কষ্ট পায়। তাই, সমস্ত মানব-সমাজে এই চেতনাকে পুনর্জাগরিত করাই হচ্ছে সবচেয়ে কল্যাণকর কর্ম। ব্রহ্মনির্বাণ স্তর লাভ না করলে, এই পরম পবিত্র কর্ম সম্পাদন করা যায় না। কৃষ্ণভক্তের মনে শ্রীকৃষ্ণের পরম ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে কোন সংশয় থাকে না। তাঁর মনে কোন সংশয় থাকে না, কারণ তিনি সম্পূর্ণরূপে পাপমুক্ত। এটিই হচ্ছে দিব্য ভগবৎ-প্রেমের প্রকাশ।

যে মানুষ কেবলমাত্র মানব-সমাজের জাগতিক কল্যাণ সাধন করার কাজে রত, সে প্রকৃতপক্ষে কারওই কল্যাণ সাধন করতে পারে না। বাহ্যিক দেহ ও মনের সাময়িক উপশম কখনই শান্তি দিতে পারে না। জীবন-সংগ্রামের সমস্ত দুঃখ-কষ্টের যথার্থ কারণ হচ্ছে, ভগবানের সঙ্গে জীবের নিত্য সম্পর্কের চরম বিস্মৃতি। মানুষ যখন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্পর্কের কথা পূর্ণরূপে অবগত হন, তখন তিনি জড় জগতের বন্ধন থেকে যথার্থই মুক্তি লাভ করেন, এমন কি জড় দেহের মধ্যে অবস্থান করলেও তিনি তখন মুক্ত।

শ্লোক ২৬

কামক্রোধবিমুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্ ।
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥ ২৬ ॥

কাম—কাম; **ক্রোধ**—ক্রোধ; **বিমুক্তানাম্**—মুক্ত; **যতীনাম্**—সন্ন্যাসীদের; **যতচেতসাম্**—সংযতচিত্ত; **অভিতঃ**—সর্বতোভাবে অচিরেই; **ব্রহ্মনির্বাণম্**—ব্রহ্মনির্বাণ; **বর্ততে**—উপস্থিত হয়; **বিদিতাত্মনাম্**—আত্মজ্ঞ।

গীতার গান

কাম ক্রোধ বিনির্মুক্ত যত চিত্ত ধীর ।
আত্মতত্ত্ব জ্ঞানী যতি অতীব গম্ভীর ॥
সদসদ্ বিচার করি ব্রহ্মেতে নির্বাণ ।
প্রকৃতি অতীত তার ব্রহ্মে অবস্থান ॥

অনুবাদ

কাম-ক্রোধশূন্য, সংযতচিত্ত, আত্মতত্ত্বজ্ঞ সন্ন্যাসীরা সর্বতোভাবে অচিরেই ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন।

তাৎপর্য

মুক্তি লাভের জন্য যে সমস্ত সাধুসন্ত সতত পরমার্থ সাধনে রত, তাঁদের মধ্যে কৃষ্ণভক্তই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ। ভাগবতে (৪/২২/৩৯) এই কথার সমর্থনে বলা হয়েছে—

যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা
কর্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্‌গ্রথয়ন্তি সন্তঃ ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্ ॥

"কেবল ভগবৎ-সেবার মাধ্যমে পরম পুরুষোত্তম ভগবান বাসুদেবের ভজনা কর। যাঁরা সকাম কর্মের বদ্ধমূল বাসনা উৎপাটিত করে অপ্রাকৃত আনন্দের সঙ্গে ভগবানের পাদপদ্মের সেবায় রত আছেন, তাঁদের মতো সুষ্ঠুভাবে কোনও মহান মুনি-ঋষিরাও ইন্দ্রিয়বেগ দমন করতে পারেন না।"

বদ্ধ জীবের কর্মফল ভোগ করার বাসনা এত প্রবল যে, বড় বড় মুনি-ঋষিরা বহু তপস্যার ফলেও সেই বাসনাকে দমন করতে পারেন না। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত নিরন্তর ভগবান কৃষ্ণের অপ্রাকৃত সেবায় নিযুক্ত হওয়ার ফলে, আত্ম-উপলব্ধি করে অতি শীঘ্রই ব্রহ্মনির্বাণ স্তর লাভ করেন। পূর্ণরূপে আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার ফলে তিনি সর্বদাই সমাধিস্থ থাকেন। এর উপমামূলক উদাহরণ দিয়ে বলা যায়—

দর্শনধ্যানসংস্পর্শৈর্মৎস্যকূর্মবিহঙ্গমাঃ ।
স্বান্যপত্যানি পুষ্ণন্তি তথাহমপি পদ্মজ ॥

"দর্শন, ধ্যান ও স্পর্শের দ্বারাই কেবল মাছ, কূর্ম ও পাখিরা তাদের সন্তান প্রতিপালন করে। হে পদ্মজ (ব্রহ্মা)! আমিও তাই করি।"

মাছেরা কেবল দৃষ্টিপাতের দ্বারা তাদের সন্তান প্রতিপালন করে। কূর্ম ধ্যান করে তাদের সন্তান প্রতিপালন করে। সে ডাঙ্গায় ডিম পেড়ে তারপর জলের মধ্যে তাদের ধ্যান করতে থাকে। তেমনই, কৃষ্ণভক্ত ভগবৎ-ধাম থেকে অনেক দূরে থাকলেও সর্বক্ষণ ভগবানের ধ্যান করার ফলে এবং সর্বক্ষণ কৃষ্ণভাবনায় তৎপর থাকার ফলে ভগবৎ-ধাম প্রাপ্ত হন। তিনি জড় জগতের দুঃখ-কষ্টের প্রতি সম্পূর্ণ নির্বিকার। ভগবৎ-উপলব্ধির এই স্তরকে বলা হয় *ব্রহ্মনির্বাণ*, যার অর্থ হচ্ছে ভগবানের চিন্তায় নিমগ্ন থাকার ফলে প্রাকৃত দুঃখ-কষ্টের পূর্ণ নিবৃত্তি।

শ্লোক ২৭-২৮

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ২৭ ॥
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮ ॥

স্পর্শান্—শব্দ আদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়; **কৃত্বা**—করে; **বহিঃ**—বহিষ্কৃত; **বাহ্যান্**—বাহ্য; **চক্ষুঃ**—চক্ষু; **চ**—ও; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অন্তরে**—মধ্যে; **ভ্রুবোঃ**—ভ্রূদ্বয়ের; **প্রাণাপানৌ**—প্রাণ ও অপান বায়ু; **সমৌ**—সমান; **কৃত্বা**—করে; **নাসাভ্যন্তর**—নাসিকার মধ্যে; **চারিণৌ**—বিচরণশীল; **যত**—সংযত; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়; **মনঃ**—মন; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **মুনিঃ**—মুনি; **মোক্ষ**—মুক্তি; **পরায়ণঃ**—পরায়ণ; **বিগত**—বর্জিত; **ইচ্ছা**—ইচ্ছা; **ভয়**—ভয়; **ক্রোধঃ**—ক্রোধ; **যঃ**—যিনি; **সদা**—সর্বদা; **মুক্তঃ**—মুক্ত; **এব**—অবশ্যই; **সঃ**—তিনি।

গীতার গান

এ ছাড়া অষ্টাঙ্গ যোগ তাহা বলি শুন ।
অভ্যাস যাহার হয় অতীব ত্রিগুণ ॥
শব্দ স্পর্শ রূপ রস আর যাহা গন্ধ ।
বহির্বাহ্য করি রাখি না রাখি সম্বন্ধ ॥
চক্ষু সেই ভ্রূমধ্যে রাখিয়া নিশ্চল ।
প্রাণাপান বায়ু ধরি নাসা অভ্যন্তর ॥
নাসিকার অগ্রভাগ কেবল দর্শন ।
উত্তম প্রক্রিয়া সেই যোগের সাধন ॥
ইন্দ্রিয় সংযম সেই যোগ প্রকরণ ।
মন বুদ্ধি দ্বারা মুনি মোক্ষ পরায়ণ ॥
সে ভাবে যে বীত ইচ্ছা ভয় আর ক্রোধ ।
মুক্ত হয় সে পুরুষ সংযত নিরোধ ॥

অনুবাদ

মন থেকে বাহ্য ইন্দ্রিয়ের বিষয় প্রত্যাহার করে, ভ্রূযুগলের মধ্যে দৃষ্টি স্থির করে, নাসিকার মধ্যে বিচরণশীল প্রাণ ও অপান বায়ুর ঊর্ধ্ব ও অধোগতি রোধ করে, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সংযম করে এবং ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ শূন্য হয়ে যে মুনি সর্বদা বিরাজ করেন, তিনি নিশ্চিতভাবে মুক্ত।

তাৎপর্য

ভক্তিযোগে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হলে অচিরেই স্বরূপ উপলব্ধি হয়। ভক্তির মাধ্যমে ভগবানকে জানা যায়। নিষ্ঠার সঙ্গে ভক্তিযোগ সাধন করার ফলে কৃষ্ণভক্ত অপ্রাকৃত স্থিতি লাভ করে তাঁর কর্মের গণ্ডিতে ভগবানের উপস্থিতি অনুভব করার যোগ্যতা অর্জন করেন। এই বিশেষ অবস্থাকে ব্রহ্মনির্বাণ বলা হয়।

ব্রহ্মনির্বাণ সম্বন্ধে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করার পর ভগবান অর্জুনকে অষ্টাঙ্গযোগ (যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি) অভ্যাস করার মাধ্যমে কিভাবে এই স্তরে উন্নীত হওয়া যায়, সেই সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছেন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে যোগের বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তাই পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে, এখানে

কেবল তার অবতারণা করা হচ্ছে। যোগের প্রত্যাহার পদ্ধতির মাধ্যমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই ইন্দ্রিয়জ বিষয়গুলিকে পরিত্যাগ করে, দুই ভ্রূর মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, অর্ধনিমীলিত নেত্রে নাসিকাগ্রে একাগ্র করতে হয়। এখানে সম্পূর্ণভাবে চোখ বন্ধ করতে নিষেধ করা হয়েছে, কারণ তা হলে ঘুমিয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। সম্পূর্ণভাবে চোখ খুলে রাখতেও নিষেধ করা হয়েছে, কারণ তা হলে ইন্দ্রিয়-বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হবার ভয় থাকে। দেহের অভ্যন্তরে প্রাণ ও অপান বায়ুকে রোধ করার ফলে নাসিকার অভ্যন্তরে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। এভাবেই অভ্যাস করার ফলে ইন্দ্রিয়-বিষয় পরিত্যাগ করে ইন্দ্রিয়বেগ দমন করা সম্ভব হয় এবং তার ফলে সাধক ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করতে সক্ষম হন।

এই যোগপদ্ধতি সব রকম ভয়, ক্রোধ আদি থেকে মুক্ত করতে সাহায্য করে এবং এভাবেই অপ্রাকৃত শুদ্ধ সত্ত্বময় অবস্থায় পরমাত্মার উপস্থিতি অনুভব করা যায়। তবে, কৃষ্ণভাবনামৃতই হচ্ছে যোগসাধন করার সবচেয়ে সহজ ও সাবলীল পন্থা। পরবর্তী অধ্যায়ে তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হবে। কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত সর্বদাই ভগবৎ-সেবায় নিয়োজিত, তাই তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি অন্য কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হতে পারে না। সুতরাং, ইন্দ্রিয়-সংযম করার জন্য অষ্টাঙ্গ-যোগের চেয়ে ভক্তিযোগ অধিক উত্তম।

শ্লোক ২৯

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৯ ॥

ভোক্তারম্—ভোক্তা; **যজ্ঞ**—যজ্ঞ; **তপসাম্**—তপস্যার; **সর্বলোক**—সর্বলোকের; **মহেশ্বরম্**—পরম ঈশ্বর; **সুহৃদম্**—সুহৃদ; **সর্ব**—সমস্ত; **ভূতানাম্**—জীবের; **জ্ঞাত্বা**—এভাবে জেনে; **মাম্**—আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে); **শান্তিম্**—জড় দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তি; **ঋচ্ছতি**—লাভ করেন।

গীতার গান

যোগেশ্বর আমি হই আমি সেই লক্ষ্য ।
সে কথা যে বুঝে ভাল সেই যোগী দক্ষ ॥
সকল যজ্ঞ তপস্যার আমি ভোক্তা হই ।
সমস্ত লোকের স্বামী কেহ নহে সেই ॥

সমস্ত জীবের বন্ধু আমি একমাত্র ।
জগতের শান্তি হয় জানিলে সর্বত্র ॥

অনুবাদ

আমাকে সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার পরম ভোক্তা, সর্বলোকের মহেশ্বর এবং সমস্ত জীবের সুহৃদরূপে জেনে যোগীরা জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়ে শান্তি লাভ করেন।

তাৎপর্য

মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে বদ্ধ জীব এই জড় জগতে শান্তির অন্বেষণ করে, কিন্তু *ভগবদ্গীতার* এই অংশে বর্ণিত শান্তি লাভের যথার্থ পন্থার কথা তারা জানে না। শান্তি লাভের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নীতি হচ্ছে—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত কর্মের ভোক্তা, এটি উপলব্ধি করা। তাই, মানুষের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের সেবায় সব কিছু উৎসর্গ করা, কারণ তিনি হচ্ছেন সমস্ত গ্রহলোকের এমন কি দেবতাদের অধীশ্বর। তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই। শিব, ব্রহ্মা আদি শ্রেষ্ঠ দেবতারাও তাঁর অনুগত ভৃত্য। *বেদে* (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* ৬/৭) ভগবানকে বলা হয়েছে—*তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্* । মায়ার দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে জীব সব কিছুর উপর আধিপত্য করার প্রয়াসী হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে ভগবানের মায়ার অধীন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন মায়াধীশ, কিন্তু জীব জড়া প্রকৃতির কঠোর নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ। এই সরল সত্যটিকে উপলব্ধি করতে না পারলে, ব্যক্তিগতভাবে অথবা সঙ্ঘবদ্ধভাবে, কোনমতেই এই সংসারে শান্তি লাভ করা সম্ভব নয়। কৃষ্ণভাবনার অর্থ হচ্ছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমেশ্বর এবং আর সমস্ত জীব, এমন কি বড় বড় দেবতারাও হচ্ছেন তাঁর অনুগত ভৃত্য। এই পরম সত্যকে উপলব্ধি করতে পারলেই পূর্ণ শান্তি লাভ করা যায়।

ভগবদ্গীতার এই পঞ্চম অধ্যায়ে কৃষ্ণভাবনামৃত বা কৃষ্ণভক্তির ব্যবহারিক ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যাকে সাধারণত কর্মযোগ বলা হয়। কর্মযোগ কিভাবে মুক্তি প্রদান করতে পারে—মনোধর্ম-প্রসূত এই যে প্রশ্ন, তার উত্তর এখানে দেওয়া হয়েছে। কর্মযোগের অর্থ হচ্ছে, পূর্ণজ্ঞানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব সম্বন্ধে অবগত হয়ে তাঁর সেবায় কর্ম করা। এই কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ অভিন্ন। কৃষ্ণভাবনামৃত হচ্ছে সাক্ষাৎ ভক্তিযোগ, আর জ্ঞানযোগ হচ্ছে ভক্তিযোগে অধিষ্ঠিত হওয়ার একটি পন্থাবিশেষ। কৃষ্ণভাবনামৃতের অর্থ হচ্ছে পরম-তত্ত্বের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের

কথা পূর্ণরূপে অবগত হয়ে তাঁর সেবায় কর্ম করা এবং এই ভাবনার পূর্ণতা আসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান লাভ করার মাধ্যমে। শুদ্ধ আত্মা ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে তাঁর নিত্যদাস। মায়াকে ভোগ করবার বাসনার ফলে সে মায়ার সংসর্গে আসে এবং সেটিই তার নানা রকম দুঃখকষ্ট ভোগের কারণ। যতক্ষণ সে জড়ের সংসর্গে থাকে, ততক্ষণ সে জাগতিক আবশ্যকতা অনুযায়ী কর্ম করতে বাধ্য হয়। কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃতের বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, প্রকৃতির গণ্ডির মধ্যে থাকলেও তা মানুষকে পারমার্থিক জীবন দান করে, কারণ জড় জগতে ভক্তির অভ্যাস করলে জীবের চিন্ময় স্বরূপ পুনর্জাগরিত হয়। ভক্তিমার্গে উত্তরোত্তর উন্নতি সাধনের অনুপাতে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ হয়। ভগবান কোন জীবের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন না। সব কিছু নির্ভর করে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ও কাম-ক্রোধ দমন করবার জন্য কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ব্যবহারিক কর্তব্য পালন করার উপর। এই সমস্ত বিকারগুলি নিগ্রহ করে কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করলে বাস্তবিকপক্ষে অপ্রাকৃত স্তর অথবা ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করা যায়। অষ্টাঙ্গ-যোগের পরম লক্ষ্য হচ্ছে এই কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করা। তাই, কৃষ্ণভাবনামৃতে অষ্টাঙ্গযোগ আপনা থেকেই সাধিত হয়ে যায়। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি অভ্যাসের দ্বারা ধীরে ধীরে প্রগতি হয়। কিন্তু ভক্তিযোগের প্রারম্ভেই এই সব কয়টিতে সিদ্ধিলাভ হয়ে যায়। তাই, একমাত্র ভক্তিযোগই মানুষকে প্রকৃত শান্তি দিতে পারে—ভক্তিযোগেই জীবনের পরম প্রাপ্তি।

ভক্তিবেদান্ত কহে শ্রীগীতার গান।
শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ॥

ইতি—কৃষ্ণভাবনাময় কর্তব্যকর্ম বিষয়ক 'কর্মসন্ন্যাস-যোগ' নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পঞ্চম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধ্যানযোগ

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥ ১॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **অনাশ্রিতঃ**—আশ্রয় বা অপেক্ষা না করে; **কর্মফলম্**—কর্মফলের; **কার্যম্**—কর্তব্য; **কর্ম**—কর্ম; **করোতি**—অনুষ্ঠান করেন; **যঃ**—যিনি; **সঃ**—তিনি; **সন্ন্যাসী**—সন্ন্যাসী; **চ**—ও; **যোগী**—যোগী; **চ**—ও; **ন**—না; **নিরগ্নিঃ**—অগ্নি রহিত; **ন**—না; **চ**—ও; **অক্রিয়ঃ**—নিষ্ক্রিয়।

গীতার গান

ভগবান কহিলেন ঃ

অনাশ্রিত কর্মফল সেই মুখ্য হয়।
তাহা বিনা সন্ন্যাসী কি যোগী কিছু নয়॥
কর্মত্যাগ নহে মুখ্য কর্মফল ত্যাগ।
দৈহিক চেষ্টা সে ত্যাগ নহে ত সম্যক॥
তাই সে সন্ন্যাসী যোগী সমান যে ক্রম।
কর্মফল ত্যাগ বিনা দুই সেই ভ্রম॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—যিনি অগ্নিহোত্রাদি কর্ম ত্যাগ করেছেন এবং দৈহিক চেষ্টাশূন্য তিনি সন্ন্যাসী বা যোগী নন। যিনি কর্মফলের প্রতি আসক্ত না হয়ে তাঁর কর্তব্য কর্ম করেন, তিনিই যথার্থ সন্ন্যাসী বা যোগী।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনা করেছেন যে, অষ্টাঙ্গযোগ হচ্ছে মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করার একটি পন্থাবিশেষ। তবে এই যোগ সকলের পক্ষে অনুশীলন করা কষ্টকর, বিশেষ করে এই কলিযুগে তা অনুশীলন করা এক রকম অসম্ভব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই অধ্যায়ে অষ্টাঙ্গ-যোগের পদ্ধতি বর্ণনা করে অবশেষে দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করেছেন যে, কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম বা কর্মযোগ অষ্টাঙ্গযোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই জগতের সকলেই তার স্ত্রী, পুত্র, পরিজনের ভরণ-পোষণের জন্য কর্ম করে। ব্যক্তিগত স্বার্থ অথবা ভোগবাঞ্ছা ব্যতীত কেউই কোন কর্ম করে না। কিন্তু সাফল্যের মানদণ্ড হচ্ছে কর্মফলের প্রত্যাশা না করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার জন্য কর্ম করা। প্রতিটি জীবই ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই ভগবানের সেবা করাই হচ্ছে তাদের একমাত্র কর্তব্য। শরীরের বিবিধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণ শরীরের পালন-পোষণের জন্য কর্ম করে, তাদের আংশিক স্বার্থের জন্য নয়। তেমনই, যে মানুষ ব্যক্তিগত স্বার্থের পরিবর্তে পরব্রহ্মের তৃপ্তির জন্য কর্ম করেন, তিনি হচ্ছেন প্রকৃত সন্ন্যাসী এবং প্রকৃত যোগী।

ভ্রান্তিবশত, কিছু সন্ন্যাসী মনে করে যে, তারা সব রকম জাগতিক কর্তব্য থেকে মুক্ত হয়েছে এবং তাই তারা অগ্নিহোত্র যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করা ত্যাগ করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা স্বার্থপরায়ণ, কারণ তাদের লক্ষ্য হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করা। এই সমস্ত বাসনা জাগতিক কামনা থেকে মহত্তর হলেও তা স্বার্থশূন্য নয়। ঠিক তেমনই, সব রকমের জাগতিক ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ করে, অর্ধনিমীলিত নেত্রে যোগী যে তপস্যা করে চলেছেন, তাও ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত। তিনিও তাঁর আত্মতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষার দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত ভক্তই হচ্ছেন একমাত্র যোগী, যিনি পরমেশ্বরের তৃপ্তিসাধন করার জন্য নিঃস্বার্থভাবে কর্ম করেন। তাই, তাতে একটুও স্বার্থসিদ্ধির বাসনা থাকে না। শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধান করাটাই তাঁর সাফল্যের একমাত্র মাপকাঠি, তাই, তিনিই হচ্ছেন যথার্থ যোগী, যথার্থ সন্ন্যাসী। বৈরাগ্যের মূর্তবিগ্রহ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রার্থনা করেছেন—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে ।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

"হে জগদীশ্বর! আমি ধন কামনা করি না, আমি অনুগামী কামনা করি না এবং আমি সুন্দরী স্ত্রী কামনা করি না। আমার একমাত্র কামনা হচ্ছে, আমি যেন জন্ম-জন্মান্তরে তোমার প্রতি অহৈতুকী ভক্তি লাভ করতে পারি।"

শ্লোক ২

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব ।
ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২ ॥

যম্—যাকে; **সন্ন্যাসম্**—সন্ন্যাস; **ইতি**—এভাবে; **প্রাহুঃ**—বলা হয়; **যোগম্**—পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পন্থাকে; **তম্**—তাকে; **বিদ্ধি**—জানবে; **পাণ্ডব**—হে পাণ্ডুপুত্র; **ন**—না; **হি**—অবশ্যই; **অসংন্যস্ত**—ত্যাগ না করে; **সংকল্পঃ**—সংকল্প; **যোগী**—যোগী; **ভবতি**—হন; **কশ্চন**—কেউ।

গীতার গান

অসংন্যস্ত সংকল্প বিনা নহে যোগী ।
বাহ্যে মাত্র ক্রিয়াহীন অন্তরে সে ভোগী ॥

অনুবাদ

হে পাণ্ডব! যাকে সন্ন্যাস বলা যায়, তাকেই যোগ বলা যায়, কারণ ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা ত্যাগ না করলে কখনই যোগী হওয়া যায় না।

তাৎপর্য

যথার্থ 'সন্ন্যাস-যোগ' অথবা 'ভক্তিযোগের' তাৎপর্য হচ্ছে জীবাত্মারূপে স্বীয় স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হয়ে সেই অনুসারে কর্ম করা। জীবাত্মার কোন পৃথক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। জীব হচ্ছে ভগবানের তটস্থা শক্তি। যখন সে জড়া শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে, তখন সে বদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং যখন সে কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করে, অর্থাৎ ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়, তখন সে তার স্বরূপে

অধিষ্ঠিত হয়। তাই, জীব যখন ভগবৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত হয়, তখন সে জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তি থেকে বিরত হয়, অথবা সব রকম ইন্দ্রিয় উপভোগের কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে। ইন্দ্রিয়-দমন করে যোগীরা জড় আসক্তি থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করে। কিন্তু কৃষ্ণভক্ত তাঁর সব কয়টি ইন্দ্রিয়ই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত করেন, তাই তাঁর অন্য কোন বিষয়ের প্রতি আর আসক্তি থাকে না। সুতরাং, কৃষ্ণভক্ত একাধারে যোগী ও সন্ন্যাসী। জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ বিষয়ক যোগের প্রয়োজন কৃষ্ণভাবনায় আপনা থেকেই পূর্ণ হয়ে যায়। স্বার্থসিদ্ধির প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করতে না পারলে জ্ঞান অথবা যোগ সাধন করার কোন অর্থ হয় না। জীবনের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে, সব রকম ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানে ব্রতী হওয়া। যিনি পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছেন, অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণভাবনার অমৃত লাভ করেছেন, ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি তাঁর আর কোন স্পৃহা থাকে না। তিনি সব সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করবার চেষ্টায় মগ্ন। যারা ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারেনি, তাদের পক্ষে জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই, কারণ নিষ্ক্রিয় স্তরে কেউ এক মুহূর্তও থাকতে পারে না। কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলন করার ফলে সব কয়টি প্রয়োজনই যথার্থভাবে সাধিত হয়।

শ্লোক ৩

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে ।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

আরুরুক্ষোঃ—আরোহণ করতে ইচ্ছুক; **মুনেঃ**—মুনির; **যোগম্**—অষ্টাঙ্গযোগ; **কর্ম**—কর্ম; **কারণম্**—কারণ; **উচ্যতে**—বলা হয়; **যোগ**—অষ্টাঙ্গযোগ; **আরূঢ়স্য**—আরূঢ় হয়েছেন; **তস্য**—তাঁর; **এব**—অবশ্যই; **শমঃ**—সমস্ত কর্মের নিবৃত্তি; **কারণম্**—কারণ; **উচ্যতে**—বলা হয়।

গীতার গান

সব যোগ হয় সিদ্ধ কর্ম সে কারণ ।
আরুরুক্ষ মুনি সেই শুন বিবরণ ॥
যোগেতে আরূঢ় সেই শমতা কারণ ।
সাধকের ক্রম পন্থা যোগানুসরণ ॥

অনুবাদ

অষ্টাঙ্গযোগ অনুষ্ঠানে যারা নবীন, তাদের পক্ষে কর্ম অনুষ্ঠান করাই উৎকৃষ্ট সাধন, আর যাঁরা ইতিমধ্যেই যোগারূঢ় হয়েছেন, তাঁদের পক্ষে সমস্ত কর্ম থেকে নিবৃত্তিই উৎকৃষ্ট সাধন।

তাৎপর্য

ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পন্থাকে বলা হয় যোগ। এই যোগকে একটি সিঁড়ির সঙ্গে তুলনা করা হয়, যার দ্বারা পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানের সর্বোচ্চ স্তরে আরোহণ করা যায়। জীবনের সর্বনিম্ন স্তর থেকে এই সিঁড়ির শুরু এবং ক্রমান্বয়ে তা অধ্যাত্মমার্গের চরম স্তরে উপনীত হয়েছে। উচ্চতার ক্রম অনুসারে এই সিঁড়ির বিভিন্ন অংশের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। কিন্তু সম্পূর্ণ সিঁড়িটিকে বলা হয় যোগ এবং সেটি তিন ভাগে বিভক্ত—জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ও ভক্তিযোগ। এই সিঁড়ির প্রথম ও সর্বোচ্চ সোপানকে যথাক্রমে *যোগারুরুক্ষু* ও *যোগারূঢ়* স্তর বলা হয়।

অষ্টাঙ্গ-যোগের প্রাথমিক স্তরে নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপনের মাধ্যমে আসন অভ্যাস করে ধ্যান করার প্রচেষ্টাকে সকাম কর্ম বলে গণ্য করা হয়। এই সমস্ত ক্রিয়ার প্রভাবে ক্রমশ ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পূর্ণ মানসিক সমতা লাভ হয়। ধ্যানাভ্যাসে সিদ্ধি লাভ হলে উদ্বেগ সৃষ্টিকারী সব রকম মানসিক ক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করা যায়।

কৃষ্ণভাবনাময় কৃষ্ণভক্ত শুরু থেকেই ধ্যানের স্তরে অবস্থিত, কারণ তিনি সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করেন। তিনি সর্বদাই ভগবানের সেবায় রত, তাই তিনি সব রকম জাগতিক কর্মগুলি সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করেছেন বলে গণ্য করা হয়।

শ্লোক ৪

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্জতে ।
সর্বসংকল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪ ॥

যদা—যখন; **হি**—অবশ্যই; **ন**—না; **ইন্দ্রিয়ার্থেষু**—ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে; **ন**—না; **কর্মসু**—সকাম কর্মে; **অনুষজ্জতে**—আসক্ত হন; **সর্বসংকল্প**—সমস্ত জড় বাসনা; **সন্ন্যাসী**—ত্যাগী; **যোগারূঢ়ঃ**—যোগারূঢ়; **তদা**—তখন; **উচ্যতে**—বলা হয়।

গীতার গান

ইন্দ্রিয়ার্থ যদা কর্ম আচরিত নয় ।
সর্ব সংকল্পশূন্য সন্ন্যাসী সে হয় ॥
যোগারূঢ় সে অবস্থা শাস্ত্রের নির্ণয় ।
সে অবস্থা মুক্ত পথ করহ আশ্রয় ॥

অনুবাদ

যখন যোগী জড় সুখভোগের সমস্ত সংকল্প ত্যাগ করে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে এবং সকাম কর্মের প্রতি আসক্তি রহিত হন, তখন তাঁকেই যোগারূঢ় বলা হয়।

তাৎপর্য

মানুষ যখন ভক্তিযোগে সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হয়, তখন সে সর্বতোভাবে আত্মতৃপ্ত হয়, তখন ইন্দ্রিয়তৃপ্তি অথবা সকাম কর্ম করার কোন প্রবৃত্তি তার থাকে না। আর তা না হলে, সে অবশ্যই ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে প্রবৃত্ত হবে, কারণ কর্মরহিত হয়ে মানুষ কখনও থাকতে পারে না। তাই, কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম না করা হলে, আত্মকেন্দ্রিক অথবা সমষ্টির স্বার্থে কর্ম করার বাসনা দেখা দেবে। কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ বিধানের জন্য সব কিছুই করেন, তাই তিনি ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত। পক্ষান্তরে বলা যায়, যার এই উপলব্ধি হয়নি, তাকে যোগমার্গরূপ সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত বিষয়-বাসনা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য যন্ত্রবৎ প্রযত্ন করতে হবে।

শ্লোক ৫

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৫ ॥

উদ্ধরেৎ—উদ্ধার করা কর্তব্য; **আত্মনা**—মনের দ্বারা; **আত্মানম্**—জীবাত্মাকে; **ন**—না; **আত্মানম্**—আত্মাকে; **অবসাদয়েৎ**—অধঃপতিত করা; **আত্মা**—মন; **এব**—অবশ্যই; **হি**—বাস্তবিকই; **আত্মনঃ**—জীবাত্মার; **বন্ধুঃ**—বন্ধু; **আত্মা**—মন; **এব**—অবশ্যই; **রিপুঃ**—শত্রু; **আত্মনঃ**—জীবাত্মার।

গীতার গান

অনাসক্ত বিষয়েতে যথা কর্ম দৃঢ় ।
সংসার সে কূপ হতে নিজ আত্মা কাড় ॥
আত্মাকে উদ্ধার করা আত্মার উচিত ।
আত্মাকে নাহি কভু কর অবসাদ ॥
আত্মাই আত্মার বন্ধু আত্মাই সে রিপু ।
আত্মার শত্রু যে হয় হিরণ্যকশিপু ॥

অনুবাদ

মানুষের কর্তব্য তার মনের দ্বারা নিজেকে জড় জগতের বন্ধন থেকে উদ্ধার করা, মনের দ্বারা আত্মাকে অধঃপতিত করা কখনই উচিত নয়। মনই জীবের অবস্থা ভেদে বন্ধু ও শত্রু হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

অবস্থানুসারে আত্মা বলতে দেহ, মন ও আত্মাকে বোঝায়। যোগপন্থায় বদ্ধ জীবাত্মা ও মনের বিশেষ গুরুত্ব আছে। যেহেতু মনই হচ্ছে যোগাভ্যাসের কেন্দ্র, তাই এখানে আত্মা বলতে মনকে বোঝানো হয়েছে। যোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে মনকে বশ করে ইন্দ্রিয়-বিষয় থেকে তাকে সম্পূর্ণ অনাসক্ত রাখা। এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে, মনকে এমনভাবে সংযত করতে হবে যাতে তিনি বদ্ধ জীবকে অজ্ঞান-সাগর থেকে উদ্ধার করতে সমর্থ হন। জড় বন্ধনে আবদ্ধ জীব মন ও ইন্দ্রিয়ের অধীন থাকে। বাস্তবিকপক্ষে শুদ্ধ আত্মা এই জড় জগতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, কারণ মন অহঙ্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। তাই, মনকে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত যাতে সে আর মায়ার মিথ্যা চমকের প্রতি আকৃষ্ট না হয় এবং তার ফলে বদ্ধ জীবাত্মার উদ্ধার হয়। ইন্দ্রিয় বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অধঃপতিত হওয়া উচিত নয়। বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ যত বেশি হবে, ভবরোগের বন্ধনটিও তত দৃঢ় হবে। বন্ধন থেকে মুক্তির সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কৃষ্ণভাবনায় মনকে সর্বক্ষণ নিযুক্ত করে রাখা। এই কথাটিকে জোর দেওয়ার জন্য *হি* শব্দটি এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে, অর্থাৎ, এই ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই, তাই এই পন্থাকে অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ ।
বন্ধায় বিষয়াসঙ্গো মুক্ত্যৈ নির্বিষয়ং মনঃ ॥

"মনই মানুষের বন্ধন অথবা মুক্তির কারণ। ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রতি মনের তন্ময়তা হচ্ছে বন্ধনের কারণ এবং বিষয়ের প্রতি মনের অনাসক্তি হচ্ছে মুক্তির কারণ।" (*অমৃতবিন্দু উপনিষদ* ২) সুতরাং কৃষ্ণভাবনায় সর্বদা মনকে নিয়োজিত রাখলে চরম মুক্তি লাভ সম্ভব হয়।

শ্লোক ৬

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬ ॥

বন্ধুঃ—বন্ধু; **আত্মা**—মন; **আত্মনঃ**—জীবের; **তস্য**—তাঁর; **যেন**—যার দ্বারা; **আত্মা**—মন; **এব**—অবশ্যই; **আত্মনা**—জীবাত্মা কর্তৃক; **জিতঃ**—বিজিত; **অনাত্মনঃ**—যিনি মনকে সংযত করতে অক্ষম; **তু**—কিন্তু; **শত্রুত্বে**—শত্রুতার জন্য; **বর্তেত**—থাকেন; **আত্মৈব**—সেই মন; **শত্রুবৎ**—শত্রুর মতো।

গীতার গান

যে জন জিনিল নিজ মন আত্মজিত ।
সে মন যে বন্ধু তাহা শাস্ত্রেতে কথিত ॥
অজিত যে মন সেই মন নিজ শত্রু ।
অপকারী হয় সদা বিরুদ্ধ বিপক্ষ ॥

অনুবাদ

যিনি তাঁর মনকে জয় করেছেন, তাঁর মন তাঁর পরম বন্ধু, কিন্তু যিনি তা করতে অক্ষম, তাঁর মনই তাঁর পরম শত্রু।

তাৎপর্য

অষ্টাঙ্গ-যোগের অনুশীলন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে মনকে সংযত করা, যার ফলে পরমার্থ সাধনের পথে সে বন্ধুর মতো সাহায্য করতে পারে। মনঃসংযম না করে লোকদেখানো যোগাভ্যাস করলে কেবল সময়ের অপচয় হয়। যে মানুষ মনকে বশ করতে অক্ষম, সে সর্বক্ষণ তার পরম শত্রুর সঙ্গে বাস করছে। তার ফলে,

তার জীবন ও তার উদ্দেশ্য, দু-ই নষ্ট হয়ে যায়। জীবের স্বরূপ হচ্ছে তার প্রভুর আজ্ঞা পালন করা। মন যতক্ষণ অজিত শত্রু হয়ে থাকে, ততক্ষণ তাকে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ আদির আজ্ঞা পালন করতে হয়। কিন্তু মন যখন বশীভূত হয়, তখন পরমাত্মারূপে প্রত্যেকের হৃদয়ে অবস্থিত যে ভগবান তাঁর আদেশ পালনে জীব স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়। যোগাভ্যাসের যথার্থ তাৎপর্য হচ্ছে, হৃদয়ে পরমাত্মার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে তাঁর আজ্ঞা পালন করা। কেউ যখন সরাসরিভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করে, তখন সে আপনা থেকেই ভগবানের আজ্ঞার প্রতি সম্পূর্ণভাবে শরণাগত হয়।

শ্লোক ৭

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭ ॥

জিতাত্মনঃ—জিতেন্দ্রিয়; **প্রশান্তস্য**—প্রশান্ত ব্যক্তির; **পরমাত্মা**—পরমাত্মা; **সমাহিতঃ**—সমাধিস্থ; **শীত**—শীত; **উষ্ণ**—তাপ; **সুখ**—সুখ; **দুঃখেষু**—দুঃখ; **তথা**—ও; **মান**—সম্মান; **অপমানয়োঃ**—অপমান।

গীতার গান

প্রশান্ত যে মন সেই সর্বদাই জিত ।
আত্মজিত মন পরমাত্মা সমাহিত ॥
গ্রীষ্ম শীত যত দুঃখ মান অপমান ।
জিত মন যার তার সকলই সমান ॥

অনুবাদ

জিতেন্দ্রিয় ও প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তি পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তাঁর কাছে শীত ও উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ এবং সম্মান ও অপমান সবই সমান।

তাৎপর্য

পরমাত্মারূপে প্রত্যেক জীবের অন্তরে বিরাজ করেন যে ভগবান, তাঁর আদেশ পালন করাই হচ্ছে জীবের যথার্থ কর্তব্য। বহিরঙ্গা মায়াশক্তির প্রভাবে মন যখন বিপথে চালিত হয়, তখন জীব জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাই, কোন

একটি যোগ অভ্যাস করার মাধ্যমে মন যখন সংযত হয়, তখন বুঝতে হবে যে, তিনি তাঁর গন্তব্যস্থলে উপনীত হয়েছেন। ভগবানের আদেশ সকলকেই পালন করতে হয়। মন যখন পরা প্রকৃতিতে নিবিষ্ট হয়, তখন ভগবানের আদেশ শিরোধার্য করা ছাড়া আর কোন বিকল্প পন্থা থাকে না। মনকে অবশ্যই ঊর্ধ্বতন কারও বশ্যতা স্বীকার করে তাঁর নির্দেশ অনুসারে পরিচালিত হতে হয়। মনকে সংযত করার ফলে মন আপনা থেকেই পরমাত্মার নির্দেশ অনুসারে পরিচালিত হতে থাকে। কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্ত যেহেতু অবিলম্বে এই অপ্রাকৃত স্তরে উন্নীত হন, তাই তিনি সুখ-দুঃখ, শীত-উষ্ণ আদি জড় অস্তিত্বের দ্বৈত ভাবের দ্বারা প্রভাবিত হন না। এই অবস্থাকে বলা হয় ব্যবহারিক সমাধি অথবা ভগবৎ-তন্ময়তা।

শ্লোক ৮

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮ ॥

জ্ঞান—জ্ঞান; **বিজ্ঞান**—উপলব্ধ জ্ঞান; **তৃপ্ত**—তৃপ্ত; **আত্মা**—জীব; **কূটস্থঃ**—চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত; **বিজিতেন্দ্রিয়ঃ**—জিতেন্দ্রিয়; **যুক্তঃ**—আত্মজ্ঞান লাভের যোগ্য; **ইতি**—এভাবে; **উচ্যতে**—বলা হয়; **যোগী**—যোগী; **সম**—সমদর্শী; **লোষ্ট্র**—মৃৎখণ্ড; **অশ্ম**—পাথর; **কাঞ্চনঃ**—সোনা।

গীতার গান

নিজ তৃপ্ত সেই মন জ্ঞান বিজ্ঞানেতে ।
কূটস্থ বিজিতেন্দ্রিয় নিজের কার্যেতে ॥
সম লোষ্ট্র স্বর্ণ যার যুক্ত হয় যোগী ।
সকল অবস্থাতে যে সর্বদাই ত্যাগী ॥

অনুবাদ

যে যোগী শাস্ত্রজ্ঞান ও তত্ত্ব অনুভূতিতে পরিতৃপ্ত, যিনি চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত ও জিতেন্দ্রিয় এবং যিনি মৃৎখণ্ড, প্রস্তর ও সুবর্ণে সমদর্শী, তিনি যোগারূঢ় বলে কথিত হন।

তাৎপর্য

পরম-তত্ত্বের অনুভূতি না হলে পুঁথিগত বিদ্যার কোন সার্থকতা নেই। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥

"জড় কলুষিত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কেউ শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলার দিব্য প্রকৃতি উপলব্ধি করতে পারে না। ভগবানের সেবা করার মাধ্যমে যখন দিব্য চেতনার উন্মেষ হয়, তখন ভগবানের অপ্রাকৃত নাম, রূপ ও লীলার চিন্ময় স্বরূপ তাঁর কাছে অনুভূত হয়।" (*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব* ২/২৩৪)

এই *ভগবদ্গীতা* হচ্ছে কৃষ্ণভাবনার বিজ্ঞান। কেবল লৌকিক পাণ্ডিত্যের দ্বারা কৃষ্ণভাবনা লাভ করা যায় না। এই জ্ঞান লাভ করতে হলে ভগবৎ-তত্ত্ববেত্তা শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লাভের সৌভাগ্যবান হতে হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপার ফলে কৃষ্ণভাবনাময় মহাত্মা ভগবৎ-তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারেন, কারণ তিনি শুদ্ধ ভক্তির দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়ে থাকেন। ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধির ফলে মানুষ তাঁর জীবনের যথার্থ সার্থকতা লাভ করেন। অপ্রাকৃত জ্ঞানের প্রভাবে ভগবানের প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হয়, কিন্তু পুঁথিগত বিদ্যার ফলে আপাত পরস্পর-বিরোধী উক্তির দ্বারা সহজেই মোহাচ্ছন্ন ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। ভগবৎ-তত্ত্ববেত্তা কৃষ্ণভক্তই হচ্ছেন যথার্থ আত্ম-সংযমী, কারণ তিনি সর্বতোভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত। তিনি সর্বদাই অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত, কারণ লৌকিক জ্ঞানের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। অন্যদের কাছে লৌকিক বিদ্যা ও মনোধর্মপ্রসূত জ্ঞান স্বর্ণবৎ উত্তম বলে প্রতিভাত হতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণভক্তের কাছে তার মূল্য এক টুকরো মৃৎখণ্ড বা পাথরের থেকে বেশি নয়।

শ্লোক ৯

সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু ।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥

সুহৃৎ—স্বভাবত হিতাকাঙ্ক্ষী; **মিত্র**—স্নেহবশত হিতকারী; **অরি**—শত্রু; **উদাসীন**—বিবাদের মধ্যেও নিরপেক্ষ; **মধ্যস্থ**—বিবাদ মিমাংসাকারী; **দ্বেষ্য**—মৎসর; **বন্ধুষু**—বন্ধুতে; **সাধুষু**—সাধুতে; **অপি**—ও; **চ**—এবং; **পাপেষু**—পাপীতে; **সমবুদ্ধিঃ**—সমবুদ্ধি; **বিশিষ্যতে**—শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন।

গীতার গান

সুহৃদ মিত্র নিষ্পক্ষ বন্ধু কিংবা অরি ।
সকলের প্রতি যিনি সমবুদ্ধি করি ॥
মধ্যস্থ কিংবা সাধু যে পাপীয়সী হয় ।
সকলের প্রতি সাম্য শ্রেষ্ঠতা প্রাপয় ॥

অনুবাদ

যিনি সুহৃদ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, মৎসর, বন্ধু, ধার্মিক ও পাপাচারী—সকলের প্রতি সমবুদ্ধি, তিনিই শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন।

শ্লোক ১০

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০ ॥

যোগী—যোগী; **যুঞ্জীত**—সমাধিযুক্ত করবেন; **সততম্**—সর্বদা; **আত্মানম্**—(দেহ, মন ও আত্মার দ্বারা) নিজেকে; **রহসি**—নির্জন স্থানে; **স্থিতঃ**—অবস্থিত হয়ে; **একাকী**—একলা; **যতচিত্তাত্মা**—সংযতচিত্ত; **নিরাশীঃ**—নিস্পৃহ হয়ে; **অপরিগ্রহঃ**—পরিগ্রহ রহিত হয়ে।

গীতার গান

যে যোগী সতত থাকি একাকী নির্জনে ।
নিরাশী অপরিগ্রহ চিত্তের যতনে ॥
সমাধিস্থ হয়ে থাকে অধিক সময় ।
বৈরাগী তাহার মন বশীভূত হয় ॥

অনুবাদ

যোগারূঢ় ব্যক্তি সর্বদা পরব্রহ্মে সম্পর্কযুক্ত হয়ে তাঁর দেহ, মন ও নিজেকে নিয়োজিত করবেন; তিনি একাকী নির্জন স্থানে বসবাস করবেন এবং সর্বদা সতর্কভাবে তাঁর মনকে বশীভূত করবেন। তিনি বাসনামুক্ত ও পরিগ্রহ রহিত হবেন।

তাৎপর্য

স্তরবিশেষে শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও পরম পুরুষোত্তম ভগবানরূপে উপলব্ধি করা যায়। ভক্তি সহকারে সর্বক্ষণ ভগবানের সেবা করাই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনা। কিন্তু নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদী জ্ঞানী এবং পরমাত্মার অন্বেষণকারী যোগীরাও আংশিকভাবে কৃষ্ণভাবনাময়, কারণ নির্বিশেষ ব্রহ্ম হচ্ছেন ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা এবং সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মা হচ্ছেন ভগবানের আংশিক প্রকাশ। তাই, ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা না করলেও যোগী এবং জ্ঞানীরাও পরোক্ষভাবে কৃষ্ণভাবনাময়। তবে, সরাসরিভাবে কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী, কারণ তিনি পূর্ণরূপে ব্রহ্ম ও পরমাত্মাতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত। তিনিই পরমতত্ত্বকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। কিন্তু নির্বিশেষবাদী জ্ঞানী ও ধ্যানমগ্ন যোগী পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করতে পারেননি।

তা সত্ত্বেও, এই সমস্ত নির্দেশ এখানে দেওয়া হয়েছে তাঁদের নির্দিষ্ট কার্যকলাপে সর্বদাই নিয়োজিত হবার জন্যে যাতে তাঁরা আগে-পরে সর্বোত্তম সিদ্ধিতে পৌঁছতে পারে। যোগীর প্রথম কর্তব্য হচ্ছে মনকে সর্বদা ভগবান শ্রীকৃষ্ণে একাগ্র করা। মুহূর্তের জন্যও ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে না গিয়ে সর্বক্ষণ তাঁর কথা স্মরণ করা। এভাবেই নিরন্তর ভগবানের চিন্তায় মনকে একাগ্র করার নাম হচ্ছে সমাধি। মনের এই একাগ্রতা লাভ করার জন্য নির্জনে বসবাস করা উচিত এবং বাহ্য বিষয়রূপী উপদ্রব থেকে দূরে থাকা উচিত। সাধকের সতর্ক থাকা উচিত—ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য অনুকূল পরিস্থিতি গ্রহণ করা এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি পরিত্যাগ করা। দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে তাঁর অনাবশ্যক ভোগবাসনা পরিত্যাগ করা উচিত, কারণ তা পরিগ্রহরূপে বন্ধনের সৃষ্টি করে।

এই সমস্ত সাধন ও সতর্কতার পূর্ণ পালন তিনিই করতে পারেন, যিনি সর্বতোভাবে কৃষ্ণভাবনাময়; কারণ সর্বতোভাবে কৃষ্ণভাবনাময় হওয়া মানেই সম্পূর্ণরূপে ভগবানের কাছে আত্ম-উৎসর্গ করা। এই ধরনের ত্যাগে পরিগ্রহের কোন সম্ভাবনা থাকে না। শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ কৃষ্ণভাবনামৃতের ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

"বিষয়ের প্রতি আসক্তিশূন্য হয়ে এবং শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে নির্বন্ধ করে ভগবানের সেবার অনুকূল বিষয়টুকু গ্রহণ করাকেই বলা হয় যুক্তবৈরাগ্য। পক্ষান্তরে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে জীবের সম্পর্কের কথা না জেনে যে সব কিছু পরিত্যাগ করে, তার বৈরাগ্য পূর্ণ নয়।" (*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব* ২/২৫৫-২৫৬)

কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত যথার্থরূপে জানেন যে, সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের সম্পত্তি। তাই, তিনি কোন কিছুই নিজের বলে দাবি করেন না। নিজে ভোগ করার জন্য তিনি কোন কিছুর লালসা করেন না। তিনি জানেন, শ্রীকৃষ্ণের সেবার অনুকূলে কোন্‌টি গ্রহণ করা উচিত এবং কোন্‌টি পরিত্যাগ করা উচিত। বিষয় ভোগের প্রতি তিনি সর্বদাই উদাসীন, কারণ তিনি সর্বদাই অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত। ভগবদ্ভক্ত ছাড়া আর কারও সঙ্গ করার কোন প্রয়োজন নেই বলে তিনি সর্বদাই একাকী। তাই, কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তই হচ্ছে পরম যোগী।

শ্লোক ১১-১২

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্ ॥ ১১ ॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২ ॥

শুচৌ—পবিত্র; **দেশে**—স্থানে; **প্রতিষ্ঠাপ্য**—স্থাপন করে; **স্থিরম্**—স্থির; **আসনম্**—আসন; **আত্মনঃ**—নিজের; **ন**—না; **অতি**—অতি; **উচ্ছ্রিতম্**—উচ্চ; **ন**—না; **অতি**—অতি; **নীচম্**—নীচু; **চৈলাজিনকুশোত্তরম্**—কুশাসনের উপর মৃগচর্ম, তার উপরে বস্ত্রাসন রেখে; **তত্র**—সেই আসনে; **একাগ্রম্**—একাগ্র; **মনঃ**—মনকে; **কৃত্বা**—করে; **যতচিত্ত**—মনকে সংযত করে; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়; **ক্রিয়ঃ**—কার্যকলাপ; **উপবিশ্য**—উপবেশন করে; **আসনে**—আসনে; **যুঞ্জ্যাৎ**—অভ্যাস করবেন; **যোগম্**—যোগ অভ্যাস; **আত্ম**—অন্তঃকরণ; **বিশুদ্ধয়ে**—শুদ্ধ করবার জন্য।

গীতার গান

পবিত্র স্থানেতে বসি নিজাসন উপরে।
চেলাজিন বস্ত্র আসনাদি পরোপরে ॥
অতি উচ্চে নাহি বসে অতি নীচে নহে।
স্থির মন হয়ে সেবা যোগাভ্যাসে রহে ॥

একাগ্রতঃ মন করি যত চিত্তেন্দ্রিয়।
যোগাভ্যাস করে মুনি বিশুদ্ধ হৃদয় ॥

অনুবাদ

যোগ অভ্যাসের নিয়ম এই যে, কুশাসনের উপর মৃগচর্মের আসন, তার উপরে বস্ত্রাসন রেখে অত্যন্ত উচ্চ বা অত্যন্ত নীচ না করে, সেই আসন পবিত্র স্থানে স্থাপন করে তাতে আসীন হবেন। সেখানে উপবিষ্ট হয়ে চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে চিত্ত শুদ্ধির জন্য মনকে একাগ্র করে যোগ অভ্যাস করবেন।

তাৎপর্য

এখানে 'পবিত্র স্থান' বলতে তীর্থস্থানকে বোঝানো হয়েছে। ভারতবর্ষে প্রায় সমস্ত যোগী ও ভক্ত গৃহত্যাগ করে প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, হৃষীকেশ, হরিদ্বার আদি স্থানে অথবা গঙ্গা ও যমুনার তীরবর্তী কোন নির্জন স্থানে বসবাস করে যোগ অনুশীলন করেন। কিন্তু আধুনিক যুগের অধিকাংশ মানুষের পক্ষে এই ধরনের সাধনা করা সম্ভব নয়। আজকাল অনেক বড় বড় শহরে তথাকথিত যোগ অনুশীলনের স্কুল বা যৌগিক সংস্থা গড়ে উঠেছে। এই সমস্ত সংস্থাগুলি টাকা উপার্জনের একটি ভাল ব্যবসা হতে পারে, কিন্তু যথার্থ যোগ সাধনার জন্য এগুলি সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। উদ্বিগ্নচিত্ত, অসংযমী মানুষ কখনই ধ্যান করতে পারে না। তাই, *বৃহন্নারদীয় পুরাণে* বলা হয়েছে যে, বর্তমান কলিযুগে মানুষ যখন অল্পায়ু, পরমার্থ সাধনে অপটু এবং সর্বদাই নানা রকম উপদ্রবের দ্বারা উৎকণ্ঠিত, তাদের ক্ষেত্রে পরমার্থ সাধনের শ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র সংকীর্তন করা।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

"বিবাদ ও শঠতায় পরিপূর্ণ এই কলিযুগে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র সংকীর্তন করা। এ ছাড়া আর কোন গতি নাই, এ ছাড়া আর কোন গতি নাই, এ ছাড়া আর কোন গতি নাই।"

শ্লোক ১৩-১৪

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১৩ ॥

প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ১৪ ॥

সমম্—সরল; **কায়শিরঃ**—শরীর ও মস্তক; **গ্রীবম্**—গ্রীবা; **ধারয়ন্**—ধারণ করে; **অচলম্**—নিশ্চলভাবে; **স্থিরঃ**—স্থির হয়ে; **সংপ্রেক্ষ্য**—দৃষ্টি রেখে; **নাসিকাগ্রম্**—নাসিকার অগ্রভাগে; **স্বম্**—স্বীয়; **দিশঃ**—সমস্ত দিকে; **চ**—ও; **অনবলোকয়ন্**—অবলোকন না করে; **প্রশান্ত**—প্রশান্ত; **আত্মা**—চিত্ত; **বিগতভীঃ**—নির্ভয়; **ব্রহ্মচারিব্রতে**—ব্রহ্মচর্য ব্রতে; **স্থিতঃ**—অবস্থিত; **মনঃ**—মন; **সংযম্য**—সম্পূর্ণরূপে সংযত করে; **মৎ**—আমাতে (শ্রীকৃষ্ণে); **চিত্তঃ**—চিত্ত; **যুক্তঃ**—সমাহিতভাবে; **আসীত**—অবস্থান করবেন; **মৎ**—আমাকে; **পরঃ**—চরম লক্ষ্য।

গীতার গান

দেহ শির গ্রীবা তিন সমান করিয়া ।
অচল অবস্থা ধীর ভাবেতে বসিয়া ॥
নাসিকার অগ্রভাগ সতত দেখিয়া ।
অন্য যত দৃশ্যবস্তু কিছু না দেখিয়া ॥
প্রশান্তাত্মা ভয় নাই ব্রহ্মচারী ব্রত ।
সংযমিত মন যেবা আমাতেই রত ॥

অনুবাদ

শরীর, মস্তক ও গ্রীবাকে সমানভাবে রেখে অন্য দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করে, নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে প্রশান্তাত্মা, ভয়শূন্য ও ব্রহ্মচর্যব্রতে স্থিত পুরুষ মনকে সমস্ত জড় বিষয় থেকে প্রত্যাহার করে, আমাকে জীবনের চরম লক্ষ্যরূপে স্থির করে হৃদয়ে আমার ধ্যানপূর্বক যোগ অভ্যাস করবেন।

তাৎপর্য

জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে জানা, যিনি চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপে সকলের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজ করছেন। যোগসাধন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের এই পরমাত্মা রূপকে দর্শন করা। এ ছাড়া যোগের আর কোন উদ্দেশ্য নেই। জীবের হৃদয়ে বিরাজমান বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ। চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপী পরমাত্মাকে দর্শন করার অভিপ্রায় না নিয়ে যিনি যোগ অনুশীলন করেন, তিনি কেবল অনর্থক সময়ের

অপচয় করেন। জীবনের পরম উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানা। যোগাভ্যাসের মাধ্যমে তাঁরই অংশ পরমাত্মাকে জানার চেষ্টা করা হয়। জীবের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মারূপী শ্রীবিষ্ণুকে উপলব্ধি করতে হলে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য পালন করতে হয়। তাই, যোগীকে গৃহত্যাগ করে নির্জনে একাকী পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে ভগবানের ধ্যান করতে হয়। ঘরে অথবা বাইরে নিত্য মৈথুন-পরায়ণ হয়ে তথাকথিত যোগশিক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে তথাকথিত যোগাভ্যাস করলে কখনই যোগী হওয়া যায় না। মনঃসংযম ও সমস্ত রকমের ইন্দ্রিয়তর্পণ, বিশেষ করে যৌন জীবন পরিত্যাগের অভ্যাস করতে হয়। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য রচিত *ব্রহ্মচর্য-ব্রত সন্দর্ভে* বলা হয়েছে—

কর্মণা মনসা বাচা সর্বাবস্থাসু সর্বদা ।
সর্বত্র মৈথুনত্যাগো ব্রহ্মচর্যং প্রচক্ষতে ॥

"সব রকম পরিস্থিতিতে সর্বদা সর্বত্র মন, বচন ও কর্মের দ্বারা পূর্ণরূপে মৈথুন পরিত্যাগ করাকে বলা হয় ব্রহ্মচর্য।" মৈথুন-পরায়ণ ব্যক্তি কখনই যথার্থ যোগসাধন করতে পারে না। তাই শৈশব থেকেই ব্রহ্মচর্য পালন করার শিক্ষা দেওয়া হয়, কারণ তখন যৌন জীবন সম্বন্ধে তার কোন ধারণাই থাকে না। বৈদিক সংস্কৃতি অনুসারে শিশুকে পাঁচ বছর বয়সে গুরুকুলে প্রেরণ করা হয়, সেখানে গুরুদেব তাকে ব্রহ্মচর্যের দৃঢ় সংযম শিক্ষা দান করেন। এভাবেই সুনিয়ন্ত্রিত না হলে ধ্যান, জ্ঞান অথবা ভক্তি আদি কোন যোগের পথেই অগ্রসর হওয়া যায় না। শাস্ত্রের বিধান অনুসারে বিবাহিত জীবন যাপন করে যে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে স্ত্রীসঙ্গ করে, তাকে ব্রহ্মচারী বলে গণ্য করা হয়। এই ধরনের সংযত গৃহস্থকে ভক্ত সম্প্রদায় গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু জ্ঞানী অথবা ধ্যানী সম্প্রদায় গৃহস্থ ব্রহ্মচারীকেও গ্রহণ করে না। তাদের জন্য পূর্ণ ব্রহ্মচর্য পালন করা অবশ্য কর্তব্য। ভক্তিমার্গে গৃহস্থ ব্রহ্মচারীকেও গ্রহণ করা হয়, কারণ এই যোগ এত বলবতী যে, তার অভ্যাস করে ভগবানের সেবা করার ফলে স্ত্রীসঙ্গ করার সমস্ত বাসনা আপনা থেকেই অন্তর্হিত হয়ে যায়। *ভগবদ্গীতায়* (২/৫৯) বলা হয়েছে—

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে ॥

পরমার্থ সাধনের পথে আর সকলকে জোর করে ইন্দ্রিয়-সংযম করতে হলেও পরমতত্ত্বের সৌন্দর্য দর্শন করে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ফলে, ভক্তের আভ্যন্তরীণ বিষয়াসক্তি আপনা থেকেই নিবৃত্ত হয়ে যায়। ভক্ত ছাড়া আর কেউই এই অপ্রাকৃত আনন্দের স্বাদ পায় না।

বিগতভীঃ। পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করে প্রশান্ত না হলে নির্ভীক হওয়া যায় না। বদ্ধ জীব স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে যাওয়ার ফলে সর্বদাই ভীত। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/২/৩৭) বলা হয়েছে—*ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্যয়োঽস্মৃতিঃ*। কৃষ্ণভাবনামৃতই হচ্ছে ভয় থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র অবলম্বন। তাই, কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তই কেবল যথার্থভাবে যোগ অভ্যাস করতে পারেন। আর যেহেতু যোগসাধন করার পরম লক্ষ্য হচ্ছে অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করা, তাই নিঃসন্দেহে কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ যোগী। এখানে যে যোগের কথা বলা হয়েছে, তা আজকাল যে সমস্ত জনপ্রিয় তথাকথিত যোগশিক্ষা কেন্দ্র গড়ে উঠেছে, তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

শ্লোক ১৫

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ ।
শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫ ॥

যুঞ্জন্—অভ্যাস করে; **এবম্**—এই প্রকারে; **সদা**—সর্বদা; **আত্মানম্**—দেহ, মন ও আত্মাকে; **যোগী**—যোগী; **নিয়তমানসঃ**—সংযতচিত্ত; **শান্তিম্**—শান্তি; **নির্বাণ-পরমাম্**—জড় বন্ধনমুক্তি; **মৎসংস্থাম্**—চিৎ-জগৎ; **অধিগচ্ছতি**—প্রাপ্ত হন।

গীতার গান

সেভাবে যে যোগ সাধে নিয়ত মানস ।
সদাত্ম সেই যোগী অমৃত পরশ ॥
নির্বাণ পরম শান্তি হয় অধিকারী ।
ফিরে যায় মম ধামে যথা লীলাহরি ॥

অনুবাদ

এভাবেই দেহ, মন ও কার্যকলাপ সংযত করার অভ্যাসের ফলে যোগীর জড় বন্ধন মুক্ত হয় এবং তিনি তখন আমার ধাম প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

যোগ অনুশীলন করার পরম উদ্দেশ্য এখানে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। জড় জগতের সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভ করা যোগ-সাধনের উদ্দেশ্য নয়। পক্ষান্তরে, জড়

জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করাই হচ্ছে যোগ-সাধনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করা অথবা লৌকিক সিদ্ধিলাভ করার জন্য যোগ অভ্যাস যে করে, *ভগবদ্গীতায়* তাকে যোগী বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। ভবরোগ নিবৃত্তির অর্থ স্বকপোলকল্পিত শূন্যে বিলীন হয়ে যাওয়া নয়। ভগবানের সৃষ্টিতে শূন্য বলে কিছুই নেই। বরং, ভবরোগ নিবৃত্তি হলে পরব্যোমে ভগবৎ-ধাম প্রাপ্তি হয়। *ভগবদ্গীতায়* ভগবৎ-ধামের বিশদ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, সেই বৈকুণ্ঠধামকে আলোকিত করবার জন্য সূর্য, চন্দ্র অথবা তড়িৎ-শক্তির প্রয়োজন হয় না। সেখানে প্রতিটি গ্রহই সূর্যের মতো আপন আলোকে উদ্ভাসিত। ভগবৎ-ধাম সর্বব্যাপক, কিন্তু পরব্যোম এবং সেখানে অবস্থিত গ্রহলোককে *পরমং ধাম* অথবা উৎকৃষ্ট ধাম বলা হয়।

যে যোগী তাঁর যোগ-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন, যিনি সর্বতোভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পেরেছেন, তাঁর সম্বন্ধে ভগবান বলেছেন—*মচ্চিত্তঃ, মৎপরঃ, মৎস্থানম্*। তিনিই যথার্থ শান্তি লাভ করেন, জীবনান্তে কৃষ্ণলোক বা গোলোক বৃন্দাবন নামক তাঁর পরম ধামে প্রবেশ করার যোগ্যতা অর্জন করেন। ভগবানের আলয় গোলোক বৃন্দাবন সম্বন্ধে *ব্রহ্মসংহিতাতে* (৫/৩৭) বলা হয়েছে, *গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতঃ*—ভগবান যদিও তাঁর স্বধাম গোলোকে বাস করেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর উৎকৃষ্ট চিন্ময় শক্তির প্রভাবে সর্বব্যাপ্ত ব্রহ্ম এবং সর্বভূতে পরমাত্মারূপে সর্বত্র বিরাজমান। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর স্বাংশ-প্রকাশ বিষ্ণু সম্বন্ধে সর্বতোভাবে অবগত না হলে কোন অবস্থাতেই ভগবানের নিত্য আলয় বৈকুণ্ঠলোক অথবা গোলোক বৃন্দাবনে প্রবেশ করা যায় না। তাই, পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে যিনি ভগবানের সেবা করছেন, তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত যোগী, কারণ তাঁর মন সর্বতোভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তাতেই মগ্ন—*স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ*। *বেদেও* (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* ৩/৮) বলা হয়েছে, *তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি*—"পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারার ফলেই জন্ম ও মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়।" এর থেকে বোঝা যায় যে, যোগসাধন করার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। ম্যাজিক দেখানো বা শারীরিক কসরৎ দেখিয়ে লোকঠকানো যোগের উদ্দেশ্য নয়।

শ্লোক ১৬

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন ॥ ১৬ ॥

ন—না; **অতি**—অত্যধিক; **অশ্নতঃ**—ভোজনকারী; **তু**—কিন্তু; **যোগঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত; **অস্তি**—হয়; **ন**—না; **চ**—ও; **একান্তম্**—নিতান্ত; **অনশ্নতঃ**—অনাহারীর; **ন**—না; **চ**—ও; **অতি**—অত্যন্ত; **স্বপ্নশীলস্য**—নিদ্রাশীলের; **জাগ্রতঃ**—জাগরণকারীর; **ন**—না; **এব**—কখনও; **চ**—এবং; **অর্জুন**—হে অর্জুন।

গীতার গান

অতিভোজী অনাহারী যোগে সিদ্ধ নয় ।
অতিনিদ্রা অতিজাগী শুন ধনঞ্জয় ॥

অনুবাদ

অধিক ভোজনকারী, নিতান্ত অনাহারী, অধিক নিদ্রাপ্রিয় ও নিদ্রাশূন্য ব্যক্তির যোগী হওয়া সম্ভব নয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে যোগীদের আহার ও নিদ্রা সংযত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতিভোজীর অর্থ হচ্ছে যে, যারা প্রাণ ধারণের অতিরিক্ত আহার করে। মানুষের জন্য ভগবান যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য-শস্য, ফল-মূল, দুধ আদি দিয়েছেন, তাই পশু ভক্ষণ করা মানুষের কোন মতেই উচিত নয়। *ভগবদ্গীতায়* এই প্রকার সাদাসিধে খাদ্যকে সত্ত্বগুণময় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মাংস তমোগুণ-সম্পন্ন মানুষের আহার। তাই, যারা মাছ-মাংস আহার করে, মদ পান করে, ধূমপান করে এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন না করে আহার করে, তারা আহার-দোষের ফলস্বরূপ নিঃসন্দেহে পাপের ফল ভোগ করে। *ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ।* যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন না করে কেবল নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য রন্ধন করে এবং আহার করে, সে পাপ ভক্ষণ করে। যে এভাবে পাপ আহার করে বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার করে, সে কখনই যোগ অনুশীলন করতে পারে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করে তাঁর প্রসাদ গ্রহণ করাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত ভগবানকে উৎসর্গ না করে কখনই কিছু গ্রহণ করেন না। তাই, কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তই কেবল যোগসাধনে পূর্ণতা লাভ করতে পারেন। কিন্তু যে মনগড়া উপবাস প্রণালী সৃষ্টি করে কৃত্রিম উপায়ে আহার বর্জন করে, সে যথার্থ যোগ অনুশীলন করতে পারে না। কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত শাস্ত্রের বিধান অনুসারে উপবাস করেন। তিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহারও করেন না, আবার উপবাসও

করেন না। তাই, তিনি যোগ অভ্যাস করার জন্য যথার্থই উপযুক্ত। যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার করে, সে ঘুমন্ত অবস্থায় নানা রকম স্বপ্ন দেখে এবং তার ফলে সে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঘুমায়। ৬ ঘণ্টার বেশি ঘুমানো কারও পক্ষেই উচিত নয়। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যে ছয় ঘণ্টার বেশি ঘুমায়, সে অবধারিতভাবে তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত। যে মানুষ তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন, সে স্বভাবতই অলস এবং অত্যধিক নিদ্রাতুর। সেই মানুষ যোগ অনুশীলন করতে পারে না।

শ্লোক ১৭

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু ।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ১৭ ॥

যুক্ত—নিয়ন্ত্রিত; **আহার**—ভোজন; **বিহারস্য**—বিহার; **যুক্ত**—নিয়ন্ত্রিত; **চেষ্টস্য**—চেষ্টাবিশিষ্ট; **কর্মসু**—কর্তব্যকর্ম অনুষ্ঠানে; **যুক্ত**—নিয়ন্ত্রিত; **স্বপ্নাববোধস্য**—নিদ্রিত ও জাগ্রত ব্যক্তির; **যোগঃ**—যোগ অভ্যাস; **ভবতি**—হয়; **দুঃখহা**—দুঃখনাশক।

গীতার গান

যুক্তভোজী বিহার সে যুক্ত কর্ম চেষ্টা ।
যুক্ত নিদ্রা যুক্ত জাগি যোগ পরাসৃষ্টা ॥

অনুবাদ

যিনি পরিমিত আহার ও বিহার করেন, পরিমিত প্রয়াস করেন, যাঁর নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিত, তিনিই যোগ অভ্যাসের দ্বারা সমস্ত জড়-জাগতিক দুঃখের নিবৃত্তি সাধন করতে পারেন।

তাৎপর্য

আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন—এগুলি হচ্ছে দেহের প্রবৃত্তি। যথাযথভাবে এদের সংযত না করা হলে এরা যোগের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। ভগবানকে নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করার মাধ্যমে আহারের প্রবৃত্তিকে সংযত করা যায়। *ভগবদ্গীতা* (৯/২৬) অনুসারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অন্ন, শাক, সবজি, ফল, ফুল, দুধ আদি নিবেদন করা যায়। এভাবেই কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত মানুষের অযোগ্য অর্থাৎ সত্ত্বগুণের শ্রেণীভুক্ত নয়, এমন খাদ্য বর্জন করার শিক্ষা লাভ করেন। কৃষ্ণভক্ত

সর্বদাই তাঁর কৃষ্ণভাবনাময় কর্তব্য পালন করতে তৎপর, তাই তিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিদ্রা উপভোগকে মস্ত বড় ক্ষতি বলে মনে করেন। *অব্যর্থকালত্বম্*—কৃষ্ণভক্ত শ্রীকৃষ্ণের সেবা না করে একটি মুহূর্তও নষ্ট করতে চান না। তাই তিনি খুব অল্প সময় নিদ্রার জন্য ব্যয় করেন। এই বিষয়ে তাঁর আদর্শ হচ্ছেন শ্রীল রূপ গোস্বামী, যিনি সর্বদাই কৃষ্ণভাবনায় তন্ময় থেকে কেবলমাত্র দুই ঘণ্টার জন্য নিদ্রা যেতেন, কখনও কখনও আবার তারও কম। নামাচার্য ঠাকুর হরিদাস তিন লক্ষ নাম জপ না করে মুহূর্তের জন্যও ঘুমাতেন না এবং প্রসাদ পর্যন্ত গ্রহণ করতেন না। কৃষ্ণসেবা ছাড়া কৃষ্ণভক্ত আর কোন কর্মই করেন না। তাই, তাঁর প্রতিটি কর্মই সংযত এবং ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কলুষ থেকে মুক্ত। কৃষ্ণভক্তের যেহেতু ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনা থাকে না, তাই তাঁর জড় সুখভোগের অবকাশ নেই। যেহেতু তাঁর কর্ম, বাক্য, নিদ্রা, জাগরণ এবং সব রকমের দৈহিক কর্ম সুনিয়ন্ত্রিত, তাই তিনি কখনই জড়-জাগতিক ক্লেশ ভোগ করেন না।

শ্লোক ১৮

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে ।
নিস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ১৮ ॥

যদা—যখন; **বিনিয়তম্**—বিশেষভাবে সংযত; **চিত্তম্**—মন এবং তার কার্যকলাপ; **আত্মনি**—আত্মাতে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অবতিষ্ঠতে**—অবস্থান করে; **নিস্পৃহঃ**—স্পৃহাশূন্য; **সর্ব**—সর্বপ্রকার; **কামেভ্যঃ**—কামনা থেকে; **যুক্তঃ**—যোগযুক্ত; **ইতি**—এভাবে; **উচ্যতে**—বলা হয়; **তদা**—তখন।

গীতার গান

যতাত্মা বিনিয়ত চিত্ত আত্মতুষ্ট ।
নিস্পৃহ যে সর্বকামে সেই যোগপুষ্ট ॥

অনুবাদ

যোগী যখন অনুশীলনের দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ করেন এবং সমস্ত জড় কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে আত্মাতে অবস্থান করেন, তখন তিনি যোগযুক্ত হয়েছেন বলে বলা হয়।

তাৎপর্য

সাধারণ মানুষের কার্যকলাপের সঙ্গে যোগীর কার্যকলাপের পার্থক্য হচ্ছে যে, যোগী কোন অবস্থাতেই জড়-জাগতিক কামনা-বাসনা বিশেষ করে যৌনসঙ্গের দ্বারা প্রভাবিত হন না। যথার্থ যোগীর মনঃক্রিয়া এত সংযত যে, তিনি কোন রকম জাগতিক বাসনার দ্বারা উদ্বিগ্ন হন না। কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্ত আপনা থেকেই এই অতি উৎকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হন। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৯/৪/১৮-২০) বলা হয়েছে—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে ।
করৌ হরেমন্দিরমার্জনাদিষু
শ্রুতিং চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে ॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ
তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্ ।
ঘ্রাণং চ তৎপাদসরোজসৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে ॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে ।
কামং চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া
যথোত্তমশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ ॥

"মহারাজ অম্বরীষ সর্বপ্রথমে তাঁর মনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দের ধ্যানে মগ্ন করেছিলেন। তারপর ক্রমশ তিনি তাঁর বাণী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলা বর্ণনায় নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁর হস্ত দ্বারা তিনি ভগবানের মন্দির মার্জনা করেছিলেন, তাঁর শ্রবণ-ইন্দ্রিয় দ্বারা ভগবানের লীলা শ্রবণ করেছিলেন, তাঁর চক্ষু দ্বারা ভগবানের অপ্রাকৃত রূপ দর্শন করেছিলেন, তাঁর ত্বক-ইন্দ্রিয় দিয়ে তিনি ভগবদ্ভক্তের দেহ স্পর্শ করেছিলেন এবং তাঁর ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয় দিয়ে তিনি ভগবানের শ্রীচরণে অর্পিত পদ্ম ফুলের ঘ্রাণ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জিহ্বা দিয়ে ভগবানের শ্রীচরণে অর্পিত তুলসীর স্বাদ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর পদযুগল দ্বারা তিনি বিভিন্ন তীর্থস্থানে এবং ভগবানের মন্দিরে গমন করেছিলেন, তাঁর মস্তক দিয়ে তিনি ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন এবং তাঁর সমস্ত কামনাকে তিনি ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করেছিলেন। এই সমস্ত অপ্রাকৃত কর্মগুলি শুদ্ধ ভক্তেরই যোগ্য।"

নির্বিশেষবাদীদের পক্ষে এই অপ্রাকৃত অবস্থার কথা অনুমান করা অসম্ভব হতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তের পক্ষে তা অত্যন্ত সুগম এবং ব্যবহারিক, যা মহারাজ অম্বরীষের কার্যকলাপের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। অনবরত স্মরণের দ্বারা মন যতক্ষণ না ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে একাগ্র হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত অপ্রাকৃত ভগবৎ-সেবায় এই রকম তৎপরতা সম্ভব নয়। ভক্তিমার্গে এই সমস্ত বিহিত কর্মগুলিকে বলা হয় 'অর্চন' অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয় ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করা। মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে কোন না কোন কর্মে অবশ্যই নিযুক্ত করতে হয়। কর্মবিরত হয়ে মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করা কোন মতেই সম্ভব নয়। তাই, সাধারণ মানুষের বিশেষ করে যারা সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন, তাদের পক্ষে পূর্ববর্ণিত বিধি অনুসারে ইন্দ্রিয়গুলিকে ও মনকে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করাই ভগবৎ-প্রাপ্তির যথার্থ পন্থা। *ভগবদ্গীতায়* একে *যুক্ত* বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১৯

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা ।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥

যথা—যেমন; **দীপঃ**—প্রদীপ; **নিবাতস্থঃ**—বায়ুশূন্য স্থানে; **ন**—না; **ইঙ্গতে**—বিচলিত হয়; **সা উপমা**—সেই উপমা; **স্মৃতা**—বিবেচিত হয়; **যোগিনঃ**—যোগীর; **যতচিত্তস্য**—সংযতচিত্ত; **যুঞ্জতঃ**—অভ্যাসকারী; **যোগম্**—যোগ; **আত্মনঃ**—আত্ম-বিষয়ক।

গীতার গান

যথা দীপ বিনা বায়ু স্থিরভাবে থাকে ।
উত্তম উপমা সেই যোগীর নিষ্ঠাকে ॥

অনুবাদ

বায়ুশূন্য স্থানে দীপশিখা যেমন কম্পিত হয় না, চিত্তবৃত্তির নিরোধ অভ্যাসকারী যোগীর চিত্তও তেমনইভাবে অবিচলিত থাকে।

তাৎপর্য

বাতাস না থাকলে দীপশিখা যেমন স্থিরভাবে জ্বলে, সর্বতোভাবে পরব্রহ্মের চিন্তায় ধ্যানস্থ হয়ে আছেন যে ভক্ত, তাঁর চিত্তও সেই দীপশিখার মতোই স্থির নিশ্চল।

শ্লোক ২০-২৩

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া ।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০ ॥
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্ ।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ২১ ॥
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২ ॥
তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্ ॥ ২৩ ॥

যত্র—যে অবস্থায়; **উপরমতে**—নিবৃত্তি হয়; **চিত্তম্**—চিত্ত; **নিরুদ্ধম্**—জড় বিষয় থেকে প্রত্যাহৃত হয়; **যোগসেবয়া**—যোগ অনুষ্ঠানের দ্বারা; **যত্র**—যেখানে; **চ**—ও; **এব**—অবশ্যই; **আত্মনা**—শুদ্ধ মনের দ্বারা; **আত্মানম্**—আত্মাকে; **পশ্যন্**—উপলব্ধি করে; **আত্মনি**—আত্মাতে; **তুষ্যতি**—তুষ্ট হয়; **সুখম্**—সুখ; **আত্যন্তিকম্**—পরম; **যৎ**—যা; **তৎ**—তা; **বুদ্ধি**—বুদ্ধি দ্বারা; **গ্রাহ্যম্**—গ্রহণযোগ্য; **অতীন্দ্রিয়ম্**—অপ্রাকৃত; **বেত্তি**—জানেন; **যত্র**—যেখানে; **ন**—না; **চ**—ও; **এব**—অবশ্যই; **অয়ম্**—এই অবস্থায়; **স্থিতঃ**—অবস্থিত; **চলতি**—বিচলিত হন; **তত্ত্বতঃ**—আত্মস্বরূপ থেকে; **যম্**—যা; **লব্ধ্বা**—অর্জনের মাধ্যমে; **চ**—ও; **অপরম্**—অন্য কিছু; **লাভম্**—লাভ; **মন্যতে**—মনে হয়; **ন**—না; **অধিকম্**—অধিক; **ততঃ**—তার চেয়েও; **যস্মিন্**—যাতে; **স্থিতঃ**—স্থিত হলে; **ন**—না; **দুঃখেন**—দুঃখের দ্বারা; **গুরুণা অপি**—যদিও খুব কঠিন; **বিচাল্যতে**—বিচলিত হয়; **তম্**—তা; **বিদ্যাৎ**—অবশ্যই জানবে; **দুঃখসংযোগ**—জড় জগতের সংযোগ-জনিত দুঃখ; **বিয়োগম্**—বিয়োগ; **যোগসংজ্ঞিতম্**—যোগসমাধি বলা হয়।

গীতার গান

যোগীর সে আত্মস্থির যোগ সাধনেতে ।
যোগাত্মন তার নাম যোগ অভ্যাসেতে ॥
বিষয় ভোগের উপরতি যোগীর প্রমাণ ।
নিরুদ্ধ সে যোগসেবা সিদ্ধির নিধান ॥
আত্মারাম যদা তুষ্ট আত্মার দর্শনে ।
সিদ্ধ সেই যোগী হয় যোগের সাধনে ॥

সত্য যে সুখ তাহা ইন্দ্রিয়াতীত ।
যেবা সেই নাহি জানে অস্থির তত্ত্বতঃ ॥
যে সুখ হইলে লাভ সর্বলাভ হয় ।
অন্য সব যত লাভ কিছু কাম্য নয় ॥
যাহাতে হইলে স্থিত গুরু দুঃখে অতি ।
অস্থির না হয় থাকে অটল বিচ্যুতি ॥
যোগ সাধি সে অবস্থা যদি লভ্য হয় ।
অষ্টাঙ্গ-যোগের সিদ্ধি তাহারে কহয় ॥

অনুবাদ

যোগ অভ্যাসের ফলে যে অবস্থায় চিত্ত সম্পূর্ণরূপে জড় বিষয় থেকে প্রত্যাহৃত হয়, সেই অবস্থাকে যোগসমাধি বলা হয়। এই অবস্থায় শুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা আত্মাকে উপলব্ধি করে যোগী আত্মাতেই পরম আনন্দ আস্বাদন করেন। সেই আনন্দময় অবস্থায় অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অপ্রাকৃত সুখ অনুভূত হয়। এই পারমার্থিক চেতনায় অবস্থিত হলে যোগী আর আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান থেকে বিচলিত হন না এবং তখন আর অন্য কোন কিছু লাভই এর থেকে অধিক বলে মনে হয় না। এই অবস্থায় স্থিত হলে চরম বিপর্যয়েও চিত্ত বিচলিত হয় না। জড় জগতের সংযোগ-জনিত সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে এটিই হচ্ছে প্রকৃত মুক্তি।

তাৎপর্য

যোগ অনুশীলন করার ফলে ক্রমশ জড় বিষয়ের প্রতি অনাসক্তি আসে। এটিই হচ্ছে যোগের প্রথম লক্ষণ। তারপর যোগী সমাধিতে স্থিত হন। যার অর্থ হচ্ছে—তিনি আত্মা ও পরমাত্মাকে এক বলে মনে করার ভ্রম থেকে মুক্ত হয়ে অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় ও চিত্তের দ্বারা পরমাত্মাকে অনুভব করেন। যোগমার্গ সাধারণত পতঞ্জলির যোগসূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিছু কপট ব্যাখ্যাকার জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে অভেদ স্থাপন করার অসৎ চেষ্টা করে এবং অদ্বৈতবাদীরা সেটিকে মুক্তি বলে মনে করে, কিন্তু তারা পতঞ্জলির যোগ প্রণালীর প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে না। পতঞ্জলির যোগপদ্ধতিতে অপ্রাকৃত আনন্দের উপলব্ধির কথা স্বীকার করা হয়েছে, কিন্তু অদ্বৈতবাদীরা তা স্বীকার করে না, কারণ তা হলে তাদের অদ্বৈত মতবাদ সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্ত বলে পরিগণিত হবে। জ্ঞান ও জ্ঞাতার দ্বৈতবাদকে অদ্বৈতবাদীরা স্বীকার করে না, কিন্তু এই শ্লোকটিতে অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অপ্রাকৃত

আনন্দ অনুভূতির কথা স্বীকার করা হয়েছে এবং সেই কথার স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন স্বয়ং পতঞ্জলি মুনি, যিনি হলেন যোগের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার। এই মহামুনি তাঁর *যোগসূত্রে* (৩/৩৪) বলে গেছেন—*পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি* ।

এই *চিতিশক্তি* অথবা অন্তরঙ্গা শক্তি হচ্ছে অপ্রাকৃত। পুরুষার্থ বলতে বোঝায় ধর্ম, অর্থ, কাম এবং পরিশেষে ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা। ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হওয়াকে অদ্বৈতবাদীরা বলেন কৈবল্য। কিন্তু পতঞ্জলি বলছেন যে, এই কৈবল্য হচ্ছে সেই দিব্য অন্তরঙ্গা শক্তি, যার দ্বারা জীব তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর *শিক্ষাষ্টকে* এই অবস্থাকে বলেছেন, *চেতোদর্পণমার্জনম্* অথবা চিত্তরূপ দর্পণকে মার্জন করা। চিত্তের এই শুদ্ধিই হচ্ছে যথার্থ মুক্তি, অথবা *ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণম্*। প্রারম্ভিক নির্বাণ-মতও এই সিদ্ধান্তের অনুরূপ। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/১০/৬) একে বলা হয়েছে *স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ*। *ভগবদ্গীতার* এই শ্লোকেও সেই একই কথা বলা হয়েছে।

নির্বাণের পরে, অর্থাৎ জড় অস্তিত্বের সমাপ্তি হলে কৃষ্ণভাবনামৃত নামক ভগবৎ-সেবার চিন্ময় ক্রিয়াকলাপ শুরু হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে, *স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ* —এটিই হচ্ছে 'জীবাত্মার যথার্থ স্বরূপ'। এই স্বরূপ যখন বিষয়াসক্তির দ্বারা আবৃত থাকে, তখন জীবাত্মা মায়াগ্রস্ত হয়। এই বিষয়াসক্তি বা ভবরোগ থেকে মুক্ত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তখন আদি নিত্য স্বরূপের বিনাশ হয়। পতঞ্জলি মুনি এই সত্যের সমর্থন করে বলেছেন—*কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি*। এই *চিতিশক্তি* বা অপ্রাকৃত আনন্দ হচ্ছে যথার্থ জীবন। *বেদান্ত-সূত্রেও* (১/১/১২) সেই কথার স্বীকৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, *আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ*। এই স্বাভাবিক অপ্রাকৃত আনন্দই হচ্ছে যোগের চরম লক্ষ্য এবং ভক্তিযোগ সাধন করার মাধ্যমে অনায়াসে এই আনন্দ লাভ করা যায়। সপ্তম অধ্যায়ে ভক্তিযোগ বিশদভাবে বর্ণনা করা হবে।

এই অধ্যায়ে বর্ণিত যোগপদ্ধতিতে সমাধি দুই রকমের—'সম্প্রজ্ঞাত-সমাধি' ও 'অসম্প্রজ্ঞাত-সমাধি'। নানা রকম দার্শনিক অন্বেষণের দ্বারা অপ্রাকৃত স্থিতিকে বলা হয় 'সম্প্রজ্ঞাত-সমাধি'। 'অসম্প্রজ্ঞাত-সমাধিতে' কোন রকম জড় বিষয়ানন্দ ভোগের সম্বন্ধ থাকে না, কারণ এই স্থিতিতে তিনি সব রকম ইন্দ্রিয়জাত সুখের অতীত। এই চিন্ময় স্বরূপে অধিষ্ঠিত যোগী কখনও কোন কিছুর দ্বারা বিচলিত হন না। যোগী যদি এই স্তরে উন্নীত না হতে পারেন, তা হলে বুঝতে হবে যে, তাঁর যোগসাধনা সফল হয়নি। আধুনিক যুগের তথাকথিত যোগ, যা বিভিন্ন

ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের সঙ্গে যুক্ত তা পরস্পর-বিরোধী। মৈথুন ও মদ্যপানে আসক্ত হয়ে যে নিজেকে যোগী বলে, সে উপহাসের পাত্র। এমন কি, যে যোগী যৌগিক সিদ্ধির প্রতি আকৃষ্ট, সেও যথার্থ যোগী নয়। যোগী যদি যোগের আনুষঙ্গিক উপলব্ধির প্রতি আকৃষ্ট থাকে, তবে সে যোগের যথার্থ সিদ্ধি লাভ করতে পারে না, সেই কথা এই শ্লোকে বলা হয়েছে। তাই, যারা যোগ-ব্যায়ামের কসরৎ দেখায় অথবা তাদের সিদ্ধি প্রদর্শন করে ম্যাজিক দেখায়, তারা যোগের অপব্যবহার করছে। তাদের বোঝা উচিত যে, তাদের যোগ-সাধনার সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে।

এই যুগে যোগ-সাধনার শ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে কৃষ্ণভাবনা এবং এই যোগসাধনা ব্যর্থ হয় না। ভগবদ্ভক্তি সাধন করবার মাধ্যমে ভক্ত যে অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করে, তার ফলে তিনি আর কোন রকম জড় সুখভোগ করার আকাঙ্ক্ষা করেন না। শঠতাপূর্ণ এই কলিযুগে হঠযোগ, ধ্যানযোগ ও জ্ঞানযোগ অনুশীলনের পথে অনেক বাধাবিপত্তি আছে, কিন্তু কর্মযোগ অথবা ভক্তিযোগ অনুশীলনে তেমন কোন অসুবিধা নেই।

যতক্ষণ এই জড় দেহটি আছে, ততক্ষণ আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন আদি জড় দেহের চাহিদাগুলিও মেটাতে হবে। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তিযোগ বা কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করার মাধ্যমে যখন এই আবশ্যকতাগুলি মেটান হয়, তখন ভক্তের ইন্দ্রিয়গুলি উত্তেজিত হয় না। বরং, ভক্ত তাঁর জীবন ধারণের জন্য যতটুকু নিতান্ত প্রয়োজন, ঠিক ততটুকুই গ্রহণ করে যথাসম্ভব লাভ ওঠাবার চেষ্টা করেন এবং কৃষ্ণভাবনামৃতের অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করেন। তিনি দুর্ঘটনা, রোগ, অভাব, এমন কি অতি নিকট আত্মীয়ের মৃত্যু আদি প্রাসঙ্গিক ঘটনাতেও নির্বিকার থাকেন। কিন্তু কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্তি সাধনের ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ সজাগ। কোন দুর্ঘটনাই তাঁকে কর্তব্যচ্যুত করতে পারে না। *ভগবদ্‌গীতাতে* (২/১৪) বলা হয়েছে—*আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত*। তিনি এই সমস্ত প্রাসঙ্গিক ঘটনাগুলিকে সহ্য করেন, কারণ তিনি ভালমতেই জানেন যে, এগুলি অনিত্য—এগুলি আসবে ও যাবে, তাই তাঁর কর্তব্যকর্ম কখনই এদের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। এভাবেই তিনি যোগের পরম সিদ্ধি লাভ করেন।

শ্লোক ২৪

স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা ।
সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্বানশেষতঃ ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ২৪ ॥

সঃ—সেই যোগ; **নিশ্চয়েন**—অধ্যবসায় সহকারে; **যোক্তব্যঃ**—সাধন করা কর্তব্য; **যোগঃ**—যোগপদ্ধতি; **অনির্বিণ্ণচেতসা**—অবিচলিতভাবে; **সংকল্প**—সংকল্প; **প্রভবান্**—জাত; **কামান্**—কামনা; **ত্যক্ত্বা**—ত্যাগ করে; **সর্বান্**—সমস্ত; **অশেষতঃ**—পূর্ণরূপে; **মনসা**—মনের দ্বারা; **এব**—অবশ্যই; **ইন্দ্রিয়গ্রামম্**—ইন্দ্রিয়সমূহকে; **বিনিয়ম্য**—নিয়ন্ত্রিত করে; **সমন্ততঃ**—সমস্ত দিক থেকে।

গীতার গান

উৎসাহ ধৈর্য আর নিলয় আত্মিকা ।
যোগসিদ্ধি লাগি ছাড়ি নির্বেদ প্রাপিকা ॥
সংকল্প সমস্ত দ্বারা না হয়ে কিঞ্চিৎ ।
মন দ্বারা ইন্দ্রিয়কে করিয়া বিজিত ॥

অনুবাদ

অবিচলিত অধ্যবসায় ও বিশ্বাস সহকারে এই যোগ অনুশীলন করা উচিত। সংকল্পজাত সমস্ত কামনা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে সব দিক থেকে নিয়ন্ত্রিত করা কর্তব্য।

তাৎপর্য

যোগীকে দৃঢ় সংকল্প ও ধৈর্য সহকারে অবিচলিত থেকে যোগ অভ্যাস করতে হয়। এক সময় না এক সময় সাধনার সিদ্ধি অবশ্যই হবে—এভাবেই পূর্ণ আশাবাদী হয়ে গভীর ধৈর্য সহকারে এই পথ অনুসরণ করতে হয়। সাফল্য লাভে বিলম্ব হলে হতোদ্যম হওয়া কখনই উচিত নয়। কারণ দৃঢ় সংকল্প নিয়ে যিনি যোগ অভ্যাস করেন, তিনি অবশ্যই সাফল্য লাভ করেন। ভক্তিযোগ সম্বন্ধে শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন—

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্যাৎ তত্তৎকর্মপ্রবর্তনাৎ ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতো বৃত্তেঃ ষড়্‌ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি ॥

"আন্তরিক উৎসাহ, ধৈর্য ও দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে ভক্তসঙ্গে ভক্তির অনুকূল কর্ম করে এবং কেবল সত্ত্বগুণময়ী কর্ম করার ফলে ভক্তিযোগে সাফল্য লাভ করা যায়।" (*উপদেশামৃত* ৩)

দৃঢ় সংকল্প সম্বন্ধে সেই চড়াই পাখির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা উচিত, যার ডিম সাগরের জলে ভেসে গিয়েছিল। একটি চড়াই পাখি সমুদ্রের তীরে ডিম পেড়েছিল, কিন্তু মহাসমুদ্রের দুর্বার তরঙ্গে সেই ডিমগুলি ভেসে যায়। অত্যন্ত মর্মাহত চিত্তে সেই চড়াই পাখি তখন সমুদ্রের কাছে আবেদন করে তার ডিমগুলি ফিরিয়ে দিতে। কিন্তু সমুদ্র তার সেই আবেদনে কর্ণপাতই করেনি। তখন সেই চড়াই পাখি সমুদ্রকে শুকিয়ে ফেলার সংকল্প করে তার ছোট্ট ঠোঁটে সমুদ্রের জল তুলতে লাগল। তার এই অসম্ভব সংকল্পের জন্য সকলেই তাকে পরিহাস করতে লাগল। এদিকে সেই চড়াই পাখির কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। অবশেষে বিষ্ণুর বাহন পক্ষীরাজ গরুড়ের কানে সেই কথা পৌঁছল এবং তাঁর ছোট্ট বোনটির জন্য সহানুভূতিতে তাঁর হৃদয় ভরে উঠল। তিনি সেই ছোট্ট চড়াই পাখিটিকে দেখতে সেই সমুদ্রের তীরে এলেন। গরুড় চড়াই পাখির এই দৃঢ় সংকল্প দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তারপর তিনি সমুদ্রকে আদেশ করলেন চড়াই পাখির ডিমগুলি ফিরিয়ে দিতে, আর সে যদি তা না করে, তা হলে তিনিই সেই চড়াই পাখির কাজটি সম্পন্ন করবেন, সেই কথাও তিনি সমুদ্রকে জানিয়ে দিলেন। ভীতগ্রস্ত হয়ে সমুদ্র তখন চড়াই পাখির ডিমগুলি ফিরিয়ে দিলেন। এভাবেই গরুড়ের কৃপায় সেই চড়াই পাখি তার ডিম ফিরে পেয়ে সুখী হল।

তেমনই, যোগসাধনা করা, বিশেষ করে ভগবানের সেবার মাধ্যমে ভক্তিযোগ সাধন করাকে ভীষণ কঠিন বলে মনে হতে পারে। কিন্তু কেউ যদি ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে ভক্তিযোগের অনুশীলন করেন, তখন ভগবান তাঁকে নিঃসন্দেহে সাহায্য করবেন, কেন না যে নিজেকে সাহায্য করে, ভগবান তাকে সব রকমের সাহায্য করেন।

শ্লোক ২৫

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া ।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫ ॥

শনৈঃ শনৈঃ—ধীরে ধীরে; **উপরমেৎ**—নিবৃত্তি করে; **বুদ্ধ্যা**—বুদ্ধির দ্বারা; **ধৃতিগৃহীতয়া**—ধৈর্যযুক্ত; **আত্মসংস্থম্**—চিন্ময় স্তরে স্থিত; **মনঃ**—মন; **কৃত্বা**—করে; **ন**—না; **কিঞ্চিদপি**—অন্য কোন কিছুই; **চিন্তয়েৎ**—চিন্তা করা উচিত।

গীতার গান

ক্রমে ক্রমে উপরাম বিষয় ভোগেতে ।
আত্মস্থিত মন করি বিরাম চিন্তাতে ॥

অনুবাদ

ধৈর্যযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা মনকে ধীরে ধীরে আত্মাতে স্থির করে এবং অন্য কোন কিছুই চিন্তা না করে সমাধিস্থ হতে হয়।

তাৎপর্য

সুদৃঢ় বিশ্বাস ও বুদ্ধির প্রভাবে ইন্দ্রিয়গুলিকে ধীরে ধীরে বশ করতে হয়। একেই বলা হয় 'প্রত্যাহার'। সুদৃঢ় বিশ্বাস, ধ্যান ও ইন্দ্রিয় নিবৃত্তির দ্বারা মনকে সর্বতোভাবে সংযত করে সমাধিস্থ করতে হয়। তখন আর দেহতে আত্মবুদ্ধি হওয়ার কোন আশঙ্কা থাকে না। পক্ষান্তরে বলা যায়, যতক্ষণ জড় দেহের অস্তিত্ব আছে, ততক্ষণ জড় জগতের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও, কখনই ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কথা চিন্তা করা উচিত নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তির কথা ছাড়া আর অন্য কোন সুখের কথা কল্পনা করাও উচিত নয়। সরাসরিভাবে কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করার ফলে অনায়াসে এই স্থিতি লাভ করা যায়।

শ্লোক ২৬

যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্ ।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬ ॥

যতঃ যতঃ—যে যে বিষয়ে; **নিশ্চলতি**—অত্যন্ত বিচলিত হয়; **মনঃ**—মন; **চঞ্চলম্**—চঞ্চল; **অস্থিরম্**—অস্থির; **ততঃ ততঃ**—সেই সেই বিষয় থেকে; **নিয়ম্য**—নিয়ন্ত্রিত করে; **এতৎ**—এই; **আত্মনি**—আত্মাতে; **এব**—অবশ্যই; **বশম্**—বশে; **নয়েৎ**—আনবে।

গীতার গান

অস্থির চঞ্চল মন যথা যথা ধায় ।
চেষ্টা করি সেই মন বশেতে রাখয় ॥

আত্মার বশেতে মন সদাই রাখিবে ।
চঞ্চল স্বভাব তার শোধন করিবে ॥

অনুবাদ

চঞ্চল ও অস্থির মন যে যে বিষয়ে ধাবিত হয়, সেই সেই বিষয় থেকে নিবৃত্ত করে আত্মার বশে আনতে হবে।

তাৎপর্য

মন স্বভাবতই অস্থির ও চঞ্চল। কিন্তু আত্মতত্ত্বজ্ঞ যোগীর কর্তব্য হচ্ছে সেই মনকে নিয়ন্ত্রিত করা, মনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া তাঁর কখনই উচিত নয়। যিনি তাঁর মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে বশ করতে পেরেছেন, তাঁকে বলা হয় গোস্বামী অথবা স্বামী; আর যে মনের অধীন তাকে বলা হয় গোদাস, অর্থাৎ সে তার ইন্দ্রিয়ের দাস। বিষয় ভোগের নিরর্থকতা একজন গোস্বামী ভালমতেই জানেন। অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়সুখে, ইন্দ্রিয়গুলি হৃষীকেশ অথবা ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিরন্তর যুক্ত থাকে। বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবাই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনা। ইন্দ্রিয়গুলিকে পূর্ণরূপে বশ করার সেটিই হচ্ছে প্রকৃষ্ট পন্থা। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, সেটিই যোগ-সাধনার পরম সিদ্ধি।

শ্লোক ২৭

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্ ।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ২৭ ॥

প্রশান্ত—প্রশান্ত, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে নিবিষ্ট; **মনসম্**—যাঁর মন; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **এনম্**—এই; **যোগিনম্**—যোগী; **সুখম্**—সুখ; **উত্তমম্**—সর্বোত্তম; **উপৈতি**—প্রাপ্ত হন; **শান্তরজসম্**—রজগুণ প্রশমিত; **ব্রহ্মভূতম্**—ব্রহ্মভাব-সম্পন্ন; **অকল্মষম্**—নিষ্পাপ।

গীতার গান

প্রশান্ত হইলে মন সুখ উত্তম যোগীর ।
শান্ত হয় রজোগুণ নিষ্পাপ শরীর ॥

নিষ্পাপ হইলে সেই সত্ত্বগুণে স্থিত ।
ব্রহ্মভূত নাম তার শুদ্ধ সমাহিত ॥

অনুবাদ

ব্রহ্মভাব-সম্পন্ন, প্রশান্ত চিত্ত, রজোগুণ প্রশমিত ও নিষ্পাপ হয়ে যাঁর মন আমাতে নিবিষ্ট হয়েছে, তিনিই পরম সুখ প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় সর্বতোভাবে নিয়োজিত হওয়াকে বলা হয় *ব্রহ্মভূত*। *মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্* (*ভঃ গীঃ* ১৮/৫৪)। ভগবানের চরণারবিন্দে মন স্থিত না হওয়া পর্যন্ত *ব্রহ্মভূত* স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া যায় না। *স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ* । ভগবদ্ভক্তি বা কৃষ্ণভাবনামৃতে নিত্য তন্ময় থাকলে রজোগুণ এবং সব রকম জড় কলুষ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ২৮

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮ ॥

যুঞ্জন্—যোগযুক্ত হয়ে; **এবম্**—এভাবে; **সদা**—সর্বদা; **আত্মানম্**—আত্মাকে; **যোগী**—যিনি পরম আত্মার সঙ্গে যুক্ত; **বিগত**—মুক্ত; **কল্মষঃ**—সর্বপ্রকার জড় কলুষ থেকে; **সুখেন**—চিন্ময় সুখে; **ব্রহ্মসংস্পর্শম্**—পরব্রহ্মের সঙ্গে নিরন্তর যুক্ত হয়ে; **অত্যন্তম্**—পরম; **সুখম্**—সুখ; **অশ্নুতে**—লাভ করেন।

গীতার গান

বিধৌত সমস্ত পাপ যোগী অকল্মষ ।
সুখে ব্রহ্মসংস্পর্শ সে ক্রমশ ক্রমশ ॥
ব্রহ্মসুখে মগ্ন হয় সে যোগী তখন ।
প্রাকৃত গুণাদি ত্যজি ব্রহ্ম অনুভব ॥
ব্রহ্মস্পর্শ কিবা হয় কেমনে তা জানি ।
সর্বভূত ব্রহ্মে দর্শন সর্ব ব্রহ্ম জানি ॥

অনুবাদ

এভাবেই আত্মসংযমী যোগী জড় জগতের সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্ম-সংস্পর্শরূপ পরম সুখ আস্বাদন করেন।

তাৎপর্য

আত্মদর্শনের অর্থ হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে আমাদের যে নিত্য সম্পর্ক রয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের স্বরূপ উপলব্ধি করা। জীবাত্মা হচ্ছে ভগবানের অপরিহার্য অংশ। তাই, তার কর্তব্য হচ্ছে ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করা। ভগবানের সঙ্গে এই অপ্রাকৃত সম্পর্ককে বলা হয় *ব্রহ্মসংস্পর্শ*।

শ্লোক ২৯

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি ।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥

সর্বভূতস্থম্—সমস্ত প্রাণীতে স্থিত; **আত্মানম্**—পরমাত্মাকে; **সর্ব**—সমস্ত; **ভূতানি**—জীব; **চ**—ও; **আত্মনি**—আত্মায়; **ঈক্ষতে**—দর্শন করেন; **যোগযুক্তাত্মা**—কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত; **সর্বত্র**—সর্বত্র; **সমদর্শনঃ**—সমদর্শন।

গীতার গান

সর্বত্র সমান দৃষ্টি যোগযুক্ত আত্মা ।
সমাধিস্থ সেই যোগী দেখে পরমাত্মা ॥

অনুবাদ

প্রকৃত যোগী সর্বভূতে আমাকে দর্শন করেন এবং আমাতে সব কিছু দর্শন করেন। যোগযুক্ত আত্মা সর্বত্রই আমাকে দর্শন করেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণচেতনাময় যোগীই হচ্ছেন প্রকৃত দ্রষ্টা, কারণ তিনি সকলের অন্তরে পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন। *ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।* পরমাত্মারূপে ভগবান সকলের হৃদয়ে অবস্থান করেন। তিনি যেমন ব্রাহ্মণের হৃদয়ে

অবস্থান করছেন, তেমনই আবার একটি কুকুরের হৃদয়েও অবস্থান করছেন। যথার্থ যোগী জানেন যে, ভগবান হচ্ছেন নিত্য চিন্ময়, তাই তিনি একটি কুকুরের হৃদয়েই অবস্থান করুন অথবা একজন সৎ ব্রাহ্মণের হৃদয়েই অবস্থান করুন, জড় কলুষের দ্বারা তিনি কখনও প্রভাবিত হন না। এটিই হচ্ছে ভগবানের পরম নিরপেক্ষতা। স্বতন্ত্র জীবাত্মাও স্বতন্ত্র হৃদয়ে অবস্থান করে, কিন্তু সে সর্বজীবের হৃদয়ে অবস্থান করে না। সেটিই হচ্ছে পরমাত্মা ও জীবাত্মার পার্থক্য। যে বাস্তবিকপক্ষে যোগ সাধনে রত নয়, সে তত স্পষ্টভাবে দর্শন করতে পারে না। একজন কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত কৃষ্ণভক্ত আপনা থেকেই বিশ্বাসী অবিশ্বাসী উভয়ের অন্তরে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে পারেন। *স্মৃতি* শাস্ত্রে সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—*আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাচ্চ আত্মা হি পরমো হরিঃ।* সর্বজীবের উৎস হরি মায়ের মতো সকলকে পালন করেন। মা যেমন তাঁর সব কয়টি সন্তানের প্রতি সমদৃষ্টি-সম্পন্ন, পরম পিতা বা মাতা ভগবানও তেমন সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন। পরমাত্মারূপে তিনি সকলের অন্তরে বিরাজ করেন।

বাহ্যিকভাবেও, প্রতিটি জীব ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিতে অবস্থিত। ভগবানের শক্তির মুখ্য প্রকাশ হচ্ছে তাঁর চিৎ-শক্তি বা পরা শক্তি এবং জড়া শক্তি বা অপরা শক্তি। এই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতার* সপ্তম অধ্যায়ে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হবে। জীব ভগবানের পরা শক্তির অংশ হলেও সে অপরা শক্তির দ্বারা বদ্ধ হয়ে পড়েছে। জীব সর্বদাই ভগবানের শক্তিতে অধিষ্ঠিত। প্রতিটি জীবই কোন না কোনভাবে ভগবানের মধ্যে অবস্থিত।

যোগী সর্বভূতে সমদৃষ্টি-সম্পন্ন, কারণ তিনি দেখেন যে, জীব তাদের কর্মফল অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে থাকলেও সর্ব অবস্থাতেই তারা ভগবানের নিত্যদাস। জীব যখন ভগবানের অপরা শক্তিতে বদ্ধ অবস্থায় থাকে, তখন সে জড় ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করে; যখন সে ভগবানের পরা শক্তিতে অধিষ্ঠিত হয়, তখন সে সাক্ষাৎ ভগবানের সেবায় তৎপর হয়। উভয় অবস্থাতে জীব ভগবানেরই দাসত্ব করে। সর্বভূতের প্রতি এই যে সমদর্শন, তা কেবল কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তই পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হন।

শ্লোক ৩০

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি ।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০ ॥

যঃ—যিনি; মাম্—আমাকে; পশ্যতি—দর্শন করেন; সর্বত্র—সর্বত্র; সর্বম্—সব কিছু; চ—এবং; ময়ি—আমাতে; পশ্যতি—দর্শন করেন; তস্য—তাঁর; অহম্—আমি; ন—না; প্রণশ্যামি—হারিয়ে যাই; সঃ—তিনি; চ—ও; মে—আমার; ন—না; প্রণশ্যতি—হারিয়ে যান।

গীতার গান

সে দেখে আমারে সব স্থাবর জঙ্গমে।
অন্য দৃষ্টি নাহি তার নির্গুণ সঙ্গমে ॥
সে হয় আমার প্রেমী আমি হই তার।
নীরস শুক্‌না তর্ক নহে ব্যবহার ॥

অনুবাদ

যিনি সর্বত্র আমাকে দর্শন করেন এবং আমাতেই সমস্ত বস্তু দর্শন করেন, আমি কখনও তাঁর দৃষ্টির অগোচর হই না এবং তিনিও আমার দৃষ্টির অগোচর হন না।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত নিঃসন্দেহে সর্বত্র ভগবানকে দর্শন করেন এবং তিনি সব কিছুই ভগবানের মধ্যে দেখতে পান। যদিও মনে হতে পারে যে, এই ধরনের মানুষ মায়ার ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশকে সাধারণ মানুষের মতো ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখছেন, কিন্তু তিনি অনুভব করেন যে, সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের শক্তিরই প্রকাশ, তাই তিনি সর্বদাই কৃষ্ণভাবনাময়। শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকতে পারে না এবং শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সব কিছুর ঈশ্বর। এটিই কৃষ্ণভাবনার মূলতত্ত্ব। কৃষ্ণভাবনামৃতের উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণপ্রেমের বিকাশ করা—এই স্তর জড় বন্ধন-মুক্তির অতীত। আত্ম-উপলব্ধির অতীত কৃষ্ণভাবনার এই স্তরে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান, অর্থাৎ তাঁর কাছে তখন সব কিছুই কৃষ্ণময় হয়ে ওঠে এবং তিনিও তখন পূর্ণরূপে কৃষ্ণপ্রেমে আবিষ্ট হয়ে যান। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে তখন এক নিবিড় অন্তরঙ্গ প্রেমময় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই অবস্থায় জীব কখনই বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, তখন শ্রীকৃষ্ণ আর কখনও তাঁর ভক্তের দৃষ্টির অগোচর হন না। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে লীন হলে আত্মার স্বাতন্ত্র্যের বিনাশ হয়। তাই ভক্ত কখনও এই ভুল করেন না। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৮) বলা হয়েছে—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি ।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"প্রেমাঞ্জন দ্বারা রঞ্জিত ভক্তিচক্ষু-বিশিষ্ট সাধুরা যে অচিন্ত্য গুণসম্পন্ন শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে অবলোকন করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।"

এই প্রেমাবস্থায়, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কখনই তাঁর ভক্তের দৃষ্টির অগোচর হন না এবং ভক্তও ভগবানের দৃষ্টির অগোচর হন না। যে সিদ্ধ যোগী তাঁর হৃদয়ে পরমাত্মারূপে ভগবানকে দর্শন করছেন, তিনিও এভাবেই নিরন্তর ভগবানকে দর্শন করেন। এই ধরনের সিদ্ধ যোগী শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তে পরিণত হন এবং তিনি এক মুহূর্তের জন্যও ভগবানকে না দেখে থাকতে পারেন না।

শ্লোক ৩১

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥ ৩১ ॥

সর্বভূতস্থিতম্—সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থিত; যঃ—যিনি; মাম্—আমাকে; ভজতি—ভজনা করেন; একত্বম্—অভিন্নরূপে; আস্থিতঃ—আশ্রয়পূর্বক; সর্বথা—সর্বতোভাবে; বর্তমানঃ—অবস্থিত হয়ে; অপি—সত্ত্বেও; সঃ—তিনি; যোগী—যোগী; ময়ি—আমাতে; বর্ততে—অবস্থান করেন।

গীতার গান

সর্বভূতস্থিত দেখে সর্বত্র আমারে।
ভজনে আস্থিত হয়ে সেবয়ে সে মোরে ॥
সে যোগী নিখিল ভবে সর্বত্র থাকিয়া।
আমাতে বসয়ে নিত্য আমারে ভজিয়া ॥

অনুবাদ

যে যোগী সর্বভূতে স্থিত পরমাত্মা রূপে আমাকে জেনে আমার ভজনা করেন, তিনি সর্ব অবস্থাতেই আমাতে অবস্থান করেন।

তাৎপর্য

যে যোগী পরমাত্মার ধ্যান করেন, তিনি তাঁর হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের আংশিক প্রকাশ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুকে দর্শন করেন। যোগীদের এটি জানা উচিত যে, শ্রীকৃষ্ণ থেকে শ্রীবিষ্ণু ভিন্ন নন। শ্রীকৃষ্ণই পরমাত্মা বিষ্ণুরূপে সর্বজীবের অন্তরে বিরাজ করেন। তা ছাড়া, অসংখ্য জীবের অন্তরে যে অসংখ্য পরমাত্মা বিরাজ করছেন, তাঁরাও ভিন্ন নন। তেমনই, ভক্তিযোগে তন্ময় কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত এবং পরমাত্মা বিষ্ণুর ধ্যানে মগ্ন যোগীর মধ্যেও কোন পার্থক্য নেই। কৃষ্ণভাবনাময় যোগী এই জড় জগতে অবস্থানকালে নানা রকম জাগতিক কাজে ব্যস্ত থাকলেও তিনি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণে অবস্থান করেন। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে* (*পূর্ব* ২/১৮৭) শ্রীল রূপ গোস্বামী সেই সম্বন্ধে বলেছেন—*নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে*। সর্বদাই কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্ত সর্ব অবস্থাতেই জীবন্মুক্ত। *নারদ পঞ্চরাত্রেও* সেই সম্পর্কে বলা হয়েছে—

দিক্কালাদ্যনবচ্ছিন্নে কৃষ্ণে চেতো বিধায় চ ।
তন্ময়ো ভবতি ক্ষিপ্রং জীবো ব্রহ্মণি যোজয়েৎ ॥

"যিনি একাগ্র চিত্তে স্থান-কালের অতীত শ্রীকৃষ্ণের সর্বব্যাপক শ্রীবিগ্রহের ধ্যান করেন, তিনি কৃষ্ণভাবনায় তন্ময় হন এবং শ্রীকৃষ্ণের দিব্য সান্নিধ্য লাভ করে চিন্ময় আনন্দ অনুভব করেন।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে মগ্ন হওয়াটাই যোগ সাধনার পরম সিদ্ধি। সমাধিযুক্ত যোগী যখন উপলব্ধি করতে পারেন যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা রূপে সর্বজীবের অন্তরে বিরাজ করছেন, তখনই তিনি সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হন। শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তির সমর্থন করে *বেদে* (*গোপালতাপনী উপনিষদ* ১/২১) বলা হয়েছে, *একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি*—"যদিও ভগবান একজন, তিনি বহুরূপে অসংখ্য হৃদয়ে বিরাজমান।" অনুরূপভাবে, *স্মৃতি-শাস্ত্রে* বলা হয়েছে—

এক এব পরো বিষ্ণুঃ সর্বব্যাপী ন সংশয়ঃ ।
ঐশ্বর্যাদ্রূপমেকং চ সূর্যবৎ বহুধেয়তে ॥

"অদ্বিতীয় হলেও শ্রীবিষ্ণু নিঃসন্দেহে সর্বব্যাপক। তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে এক বিগ্রহরূপে তিনি সর্বত্রই বিদ্যমান। সূর্যের মতো তিনিও একই সময় বহু স্থানে দৃষ্ট হন।"

শ্লোক ৩২

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন ।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২ ॥

আত্ম—নিজের; **ঔপম্যেন**—তুলনার দ্বারা; **সর্বত্র**—সর্বত্র; **সমম্**—সমভাবে; **পশ্যতি**—দর্শন করেন; **যঃ**—যিনি; **অর্জুন**—হে অর্জুন; **সুখম্**—সুখ; **বা**—অথবা; **যদি**—যদি; **বা**—অথবা; **দুঃখম্**—দুঃখ; **সঃ**—সেই; **যোগী**—যোগী; **পরমঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **মতঃ**—মনে করা হয়।

গীতার গান

বসুধা কুটুম্ব তার কেহ নহে পর ।
প্রাকৃত বিচার নাই স্বপর অপর ॥
নিজ সুখ নিজ দুঃখ অন্যেতে ব্যবহার ।
সেই সে সমানদর্শী সর্বত্র প্রচার ॥

অনুবাদ

হে অর্জুন! যিনি সমস্ত জীবের সুখ ও দুঃখকে নিজের সুখ ও দুঃখের অনুরূপ সমানভাবে দর্শন করেন, আমার মতে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তই হচ্ছেন পরম যোগী। নিজের অনুভূতির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সকলেরই সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে সচেতন। ভগবানের সঙ্গে তার শাশ্বত সম্পর্কের কথা ভুলে যাওয়ার ফলেই জীব ক্লেশভোগ করে। আবার পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই যে মানুষের সমস্ত কার্যকলাপের পরম ভোক্তা, সমস্ত দেশ ও গ্রহলোকের মহেশ্বর এবং সমস্ত জীবের অন্তরঙ্গ সুহৃদ, সেই সত্যকে উপলব্ধি করাই হচ্ছে তার সুখের কারণ। সিদ্ধ যোগী জানেন যে, জড়া প্রকৃতির গুণে আবদ্ধ জীব শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্কের কথা ভুলে যাওয়ার ফলেই ত্রিতাপ ক্লেশ ভোগ করছে। আর কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত, যিনি পূর্ণ আনন্দের স্বাদ লাভ করেছেন, তিনি চান যে, আর সকলেই সেই দিব্য আনন্দ লাভ করুক, তাই তিনি সমস্ত বিশ্বে কৃষ্ণভাবনামৃত বিতরণ করার প্রাণপণ চেষ্টা করেন। যথার্থ যোগী কৃষ্ণভাবনামৃতের গুরুত্ব প্রচার করার প্রয়াসী হন, তাই তিনি এই জগতের শ্রেষ্ঠ পরোপকারী এবং তিনি হচ্ছেন ভগবানের প্রিয়তম সেবক। *ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ* (*গীতা* ১৮/৬৯)। পক্ষান্তরে, ভগবদ্ভক্ত জীবের কল্যাণ সাধনে নিত্য তৎপর, তাই তিনি

সকলের প্রকৃত সুহৃদ। তাঁকে সর্বোত্তম যোগী বলা হয়, কারণ তিনি স্বার্থসিদ্ধির জন্য যোগের সিদ্ধি কামনা করেন না, বরং তিনি সমস্ত জীবের যথার্থ কল্যাণ সাধনে নিত্য যুক্ত। তিনি কারও প্রতি হিংসা, দ্বেষ আদি মনোভাব পোষণ করেন না। শুদ্ধ ভক্ত ও সিদ্ধিকামী যোগীর মধ্যে এটিই হচ্ছে পার্থক্য। সিদ্ধি লাভ করার আশায় যে যোগী নির্জনে বসে ধ্যান করেন, তিনি স্বার্থ চিন্তায় মগ্ন। কিন্তু যে ভগবদ্ভক্ত প্রতিটি মানুষকে কৃষ্ণভক্তে পরিণত করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন, তিনি নির্জনে ধ্যানরত যোগীর থেকে অনেক উচ্চমার্গে অবস্থিত।

শ্লোক ৩৩

অর্জুন উবাচ

যোহয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥ ৩৩ ॥

অর্জুনঃ উবাচ—অর্জুন বললেন; **যঃ অয়ম্**—এই পদ্ধতি; **যোগঃ**—যোগ; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **প্রোক্তঃ**—বর্ণিত হল; **সাম্যেন**—সমদর্শনরূপ; **মধুসূদন**—হে মধুসূদন; **এতস্য**—এর; **অহম্**—আমি; **ন**—না; **পশ্যামি**—দেখি; **চঞ্চলত্বাৎ**—চাঞ্চল্যবশত; **স্থিতিম্**—স্থিতি; **স্থিরাম্**—স্থায়ী।

গীতার গান

অর্জুন কহিলেন ঃ

আপনি যে যোগবার্তা কহিলেন আমারে।
হে মধুসূদন! তাহা না সম্ভবে মোরে ॥
মোর মন চঞ্চল সে অস্থির সে মতি।
অতএব বুঝি আমি অসম্ভব গতি ॥

অনুবাদ

অর্জুন বললেন—হে মধুসূদন! তুমি সর্বত্র সমদর্শনরূপ যে যোগ উপদেশ করলে, মনের চঞ্চল স্বভাববশত আমি তার স্থায়ী স্থিতি দেখতে পাচ্ছি না।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে *শুচৌ দেশে* থেকে শুরু করে *যোগী পরমঃ* পর্যন্ত যে যোগ-পদ্ধতির বর্ণনা করেছেন, অর্জুন এখানে সেই যোগকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, কারণ তিনি নিজেকে সেই যোগসাধনে অযোগ্য বলে মনে করেছেন। এই কলিযুগে সাধারণ মানুষের পক্ষে গৃহত্যাগ করে পাহাড়-পর্বতে অথবা বনে-জঙ্গলে গিয়ে নির্জন স্থানে যোগাভ্যাস করা সম্ভব নয়। এই যুগের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্বল্প-আয়ুবিশিষ্ট জীবনের জন্য তিক্ত জীবন-সংগ্রাম। এই যুগের সাধারণ মানুষ এতই অধঃপতিত যে, পরমার্থ সাধন করবার কোন প্রচেষ্টাই তাদের মধ্যে নেই। অতি সহজ সরল পন্থা অবলম্বন করেও তারা পরমার্থ সাধনের প্রয়াসী হয় না। তা হলে জীবনযাত্রা, উপবেশনের প্রক্রিয়া, স্থান নির্বাচন এবং জড় বিষয় থেকে মনের আসক্তি নিয়ন্ত্রণ করে অত্যন্ত দুরূহ ও দুঃসাধ্য যোগের সাধন তারা কিভাবে করবে? তাই বাস্তব জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ অর্জুনের মতো মহাবীর চিন্তা করলেন, এই যোগসাধন করা একেবারেই অসম্ভব, এমন কি বিভিন্ন দিক থেকে তাঁর অনুকূল পরিস্থিতি থাকলেও। অর্জুন ছিলেন অতি উচ্চ বংশজাত রাজকুমার এবং তিনি অনন্ত গুণে বিভূষিত। তিনি ছিলেন মহা বীর্যবান, দীর্ঘায়ু-সম্পন্ন মহারথী এবং সর্বোপরি তিনি ছিলেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সখা। আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে অর্জুনের সুযোগ-সুবিধা আমাদের তুলনায় অনেক বেশি ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এই যোগপদ্ধতি সাধন করতে অস্বীকার করেন। প্রকৃতপক্ষে, ইতিহাসের কোথাও তাঁকে এই যোগ অনুশীলন করতে দেখা যায়নি। তাই আমাদের বুঝতে হবে যে, কলিযুগে অষ্টাঙ্গযোগ সাধন করা সাধারণত মানুষের পক্ষে অসম্ভব। কয়েকজন দুর্লভ মানুষের পক্ষে তা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু সাধারণের পক্ষে এটি অসম্ভব। পাঁচ হাজার বছর পূর্বে যদি এই রকম হয়ে থাকে, তা হলে এখনকার অবস্থা কি হবে? যে সমস্ত মানুষ বিভিন্ন যোগ অনুশীলন কেন্দ্রে এই যোগ-পদ্ধতির অন্ধানুকরণ করে আত্মতৃপ্তি লাভ করে, তারা কেবল তাদের সময়ের অপব্যবহার করছে। তাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

শ্লোক ৩৪

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥ ৩৪ ॥

চঞ্চলম্—চঞ্চল; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **মনঃ**—মন; **কৃষ্ণ**—হে কৃষ্ণ; **প্রমাথি**—বিক্ষোভকর; **বলবৎ**—বলবান; **দৃঢ়ম্**—দুর্দমনীয়; **তস্য**—তার; **অহম্**—আমি; **নিগ্রহম্**—নিগ্রহ; **মন্যে**—মনে করি; **বায়োঃ**—বায়ুর; **ইব**—মতো; **সুদুষ্করম্**—সুকঠিন।

গীতার গান

হে কৃষ্ণ জান না কিবা প্রমাথী মনেরে ।
অতি বলবান সেই সব পণ্ড করে ॥
তাহার নিগ্রহ মানি অতি সুদুষ্কর ।
বায়ুরোধ যথা হয় অত্যন্ত প্রখর ॥

অনুবাদ

হে কৃষ্ণ! মন অত্যন্ত চঞ্চল, শরীর ও ইন্দ্রিয় আদির বিক্ষেপ উৎপাদক, দুর্দমনীয় এবং অত্যন্ত বলবান, তাই তাকে নিগ্রহ করা বায়ুকে বশীভূত করার থেকেও অধিকতর কঠিন বলে আমি মনে করি।

তাৎপর্য

মন এতই বলবান ও দুর্দমনীয় যে, সে কখনও কখনও বুদ্ধির উপর আধিপত্য বিস্তার করে তাকে পরিচালিত করতে থাকে, যদিও স্বাভাবিকভাবে মন বুদ্ধির অধীনেই থাকা উচিত। সাংসারিক মানুষকে প্রতিনিয়ত নানা রকম বিরুদ্ধ প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়, তাই তার পক্ষে মনকে সংযত করা অত্যন্ত কঠিন। কৃত্রিম উপায়ে শত্রু ও মিত্রের প্রতি সমদৃষ্টি-সম্পন্ন হয়ে মনের ভারসাম্য সৃষ্টি করার অভিনয় করলেও, বাস্তবিকভাবে কোন সংসারী মানুষ তা করতে পারে না। কারণ, তা প্রচণ্ড বেগবতী বায়ুকে সংযত করার চাইতেও কঠিন। বৈদিক শাস্ত্রে (*কঠ উপনিষদ* ১/৩/৩-৪) বলা হয়েছে—

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু ।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্ ।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥

"এই দেহরূপ রথের আরোহী হচ্ছে জীবাত্মা, বুদ্ধি হচ্ছে সেই রথের সারথি। মন হচ্ছে তার বল্গা এবং ইন্দ্রিয়গুলি হচ্ছে ঘোড়া। এভাবেই মন ও ইন্দ্রিয়ের সাহচর্যে আত্মা সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। চিন্তাশীল মনীষীরা এভাবেই চিন্তা করেন।" বুদ্ধির দ্বারা মনকে পরিচালিত করা উচিত, কিন্তু মন এত শক্তিশালী ও দুর্দমনীয় যে, বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হওয়ার পরিবর্তে সে বুদ্ধিকেই পরাভূত করে তাকে পরিচালিত করতে শুরু করে। ঠিক যেমন, অনেক সময় জটিল সংক্রমণ ওষুধের রোগ-প্রতিষেধক ক্ষমতাকে অতিক্রম করে। এই রকম শক্তিশালী যে মন, তাকে

যোগ-সাধনার মাধ্যমে সংযত করার বিধান দেওয়া হয়েছে, কিন্তু অর্জুনের মতো প্রবৃত্তি-মার্গের মানুষের পক্ষেও তা সাধন করা বাস্তবসম্মত নয়। সুতরাং, আধুনিক মানুষের সম্বন্ধে আর কি বলার আছে? এই সম্পর্কে এখানে বায়ুর যে উপমা দেওয়া হয়েছে, তা খুবই উপযুক্ত। বেগবতী বায়ুকে দমন করার ক্ষমতা কারও নেই এবং তার তুলনায় অস্থির মনকে বশ করা আরও কঠিন। মনকে দমন করার সবচেয়ে সহজ পন্থা প্রদর্শন করে গেছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। সেই পন্থা হচ্ছে পূর্ণ দৈন্য সহকারে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা। এই পথ হচ্ছে *স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ*—মনকে সর্বতোভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত করতে হবে। তা হলেই আর কোন কিছুর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মন উদ্বিগ্ন হবে না।

শ্লোক ৩৫

শ্রীভগবানুবাচ
অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্ ।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **অসংশয়ম্**—সন্দেহ নেই; **মহাবাহো**—হে মহাবীর; **মনঃ**—মন; **দুর্নিগ্রহম্**—দুর্দমনীয়; **চলম্**—চঞ্চল; **অভ্যাসেন**—অভ্যাসের দ্বারা; **তু**—কিন্তু; **কৌন্তেয়**—হে কুন্তীপুত্র; **বৈরাগ্যেণ**—বৈরাগ্যের দ্বারা; **চ**—ও; **গৃহ্যতে**—বশীভূত করা সম্ভব।

গীতার গান

ভগবান কহিলেন ঃ
অসংশয় সেই কথা তুমি যা কহিলে ।
অত্যন্ত কঠিন সেই মনের চঞ্চলে ॥
কিন্তু যদি করে চেষ্টা শুনহ কৌন্তেয় ।
বৈরাগ্য সাধনে তবে হয় কার্য শ্রেয় ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে মহাবাহো! মন যে দুর্দমনীয় ও চঞ্চল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু হে কৌন্তেয়! ক্রমশ অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশীভূত করা যায়।

তাৎপর্য

অবাধ্য মনকে সংযত করা যে কত কঠিন তা অর্জুন বুঝতে পেরেছিলেন। ভগবানও সেই কথা স্বীকার করলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে ভগবান জানিয়ে দিলেন যে, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা তা সম্ভব। সেই অভ্যাসটি কি? বর্তমান কলিযুগে তীর্থবাস, পরমাত্মার ধ্যান, মন ও ইন্দ্রিয়গুলির নিগ্রহ, ব্রহ্মচর্য, নির্জন বাস আদি কঠোর বিধি-বিধান পালন করা সম্ভব নয়। কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলন করার ফলে নববিধা ভগবদ্ভক্তি সাধন করা যায়। ভক্তির প্রথম ও প্রধান অঙ্গ হচ্ছে কৃষ্ণকথা শ্রবণ। মনকে সমস্ত ভ্রান্তি ও অনর্থ থেকে শুদ্ধ করার জন্য এটি অতি শক্তিশালী পন্থা। কৃষ্ণকথা যত বেশি শ্রবণ করা যায়, মন ততই প্রবুদ্ধ হয়ে কৃষ্ণবিমুখ বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত হয়। কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল কার্যকলাপ থেকে মনকে অনাসক্ত করার ফলে সহজেই বৈরাগ্য শিক্ষা লাভ করা যায়। বৈরাগ্য মানে হচ্ছে বিষয়ের প্রতি অনাসক্তি এবং ভগবানের প্রতি আসক্তি। কৃষ্ণলীলায় মনকে আসক্ত করার থেকে নির্বিশেষ বৈরাগ্য অনেক বেশি কঠিন। কৃষ্ণলীলার প্রতি আসক্তি বস্তুত খুবই সহজসাধ্য, কারণ কৃষ্ণকথা শ্রবণ করা মাত্রই শ্রোতা তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়। এই আসক্তিকে বলা হয় *পরেশানুভব*, অর্থাৎ পারমার্থিক সন্তোষ। এই অনুভূতি অনেকটা ক্ষুধার্ত ব্যক্তির প্রতি গ্রাসে গ্রাসে ক্ষুধা-নিবৃত্তিরূপ তৃপ্তির মতো। ক্ষুধার সময় যতই ভোজন করা হয়, ততই তৃপ্তি ও শক্তি অনুভব হয়। সেই রকম, ভক্তির প্রভাবে মন বিষয়াসক্তি থেকে মুক্ত হয় এবং অপ্রাকৃত তৃপ্তি অনুভূত হয়। এই পদ্ধতি অনেকটা সুদক্ষ চিকিৎসা এবং উপযুক্ত আহারের দ্বারা রোগ নিরাময় করার মতো। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় লীলা শ্রবণ করা হচ্ছে উন্মত্ত মনের সুদক্ষ চিকিৎসা এবং কৃষ্ণপ্রসাদ হচ্ছে ভবরোগ নিরাময়ের উপযুক্ত পথ্য। এই সর্বাঙ্গীণ চিকিৎসা হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত।

শ্লোক ৩৬

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥ ৩৬ ॥

অসংযত—অসংযত; **আত্মনা**—মনের দ্বারা; **যোগঃ**—আত্ম-উপলব্ধি; **দুষ্প্রাপঃ**—দুষ্প্রাপ্য; **ইতি**—এভাবে; **মে**—আমার; **মতিঃ**—অভিমত; **বশ্য**—বশীভূত; **আত্মনা**—মনের দ্বারা; **তু**—কিন্তু; **যততা**—যত্নবান; **শক্যঃ**—সমর্থ; **অবাপ্তুম্**—লাভ করতে; **উপায়তঃ**—যথার্থ উপায় অবলম্বন করে।

গীতার গান

অসংযত মন যার যোগ সে দুষ্কর ।
সেই সে আমার মত বুঝহ বিস্তর ॥
আত্মবশী চেষ্টা করি যে করে উপায় ।
তাহার সে কার্যসিদ্ধি জানহ নিশ্চয় ॥

অনুবাদ

অসংযত চিত্ত ব্যক্তির পক্ষে আত্ম-উপলব্ধি দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু যার মন সংযত এবং যিনি যথার্থ উপায় অবলম্বন করে মনকে বশ করতে চেষ্টা করেন, তিনি অবশ্যই সিদ্ধি লাভ করেন। সেটিই আমার অভিমত।

তাৎপর্য

ভগবান আমাদের এখানে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, জড় বিষয় থেকে মনকে অনাসক্ত করার যথার্থ চিকিৎসা গ্রহণ না করলে কখনই যোগ-সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা যায় না। মনকে সুখভোগে নিয়োজিত রেখে যোগের অনুশীলন করাটা জল ঢেলে আগুন জ্বালাবার চেষ্টার সামিল। মনকে সংযত না করে যোগ অনুশীলন করা কেবল সময়েরই অপচয়। এই ধরনের লোকদেখানো যোগসাধনা অর্থ উপার্জন করার একটি ভাল উপায় হতে পারে, কিন্তু পরমার্থ সাধনের ব্যাপারে তা সম্পূর্ণ নিরর্থক। তাই, নিরন্তর ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময় সেবায় নিয়োজিত করে মনকে সংযত করতে হয়। কৃষ্ণভাবনামৃত বা ভগবৎ-সেবা ছাড়া মনকে কখনও সংযত করা যায় না। কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্ত আলাদা প্রচেষ্টা ছাড়াই অনায়াসে যোগ-সাধনার সমস্ত ফল লাভ করেন। কিন্তু কৃষ্ণভাবনাময় না হয়ে যোগ অনুশীলনকারী কখনই তাঁর যোগ-সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে পারেন না।

শ্লোক ৩৭

অর্জুন উবাচ

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥

অর্জুনঃ উবাচ—অর্জুন বললেন; **অযতিঃ**—ব্যর্থ যোগী; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **উপেতঃ**—যুক্ত; **যোগাৎ**—যোগ থেকে; **চলিত**—ভ্রষ্ট; **মানসঃ**—চিত্ত; **অপ্রাপ্য**—

না পেয়ে; **যোগসংসিদ্ধিম্**—যোগের সম্যক ফল; **কাম্**—কি; **গতিম্**—গতি; **কৃষ্ণ**—হে কৃষ্ণ; **গচ্ছতি**—প্রাপ্ত হন।

গীতার গান

অর্জুন কহিলেন ঃ

চেষ্টা করিয়াও যদি সিদ্ধ নাহি হয় ।
হে কৃষ্ণ! বল তার কি আছে উপায় ॥
সাধ্যমত চেষ্টা করি বিচলিত হয় ।
অপ্রাপ্য সে যোগসিদ্ধি তাহার নিশ্চয় ॥

অনুবাদ

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—হে কৃষ্ণ! যিনি প্রথমে শ্রদ্ধা সহকারে যোগে যুক্ত থেকে পরে চিত্তচাঞ্চল্য হেতু ভ্রষ্ট হয়ে যোগে সিদ্ধিলাভ করতে না পারেন, তবে সেই ব্যর্থ যোগীর কি গতি লাভ হয়?

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতাতে আত্ম-উপলব্ধির পন্থা বা যোগের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। আত্ম-উপলব্ধি বলতে সেই জ্ঞানকে বোঝায় যার ফলে বুঝতে পারা যায় যে, এই জড় দেহটি জীবের স্বরূপ নয়, তার স্বরূপ হচ্ছে সৎ, চিৎ ও আনন্দময় আত্মা। এই স্বরূপ অপ্রাকৃত, তা জড় দেহ ও মনের অতীত। জ্ঞানযোগ, অষ্টাঙ্গযোগ অথবা ভক্তিযোগের মাধ্যমে এই আত্ম-উপলব্ধি অন্বেষণ করতে হয়। এই সব কয়টি পন্থাতেই অনুশীলনকারীকে জানতে হয় জীবের স্বরূপ কি, তার সঙ্গে ভগবানের কি সম্পর্ক এবং কিভাবে ভগবানের সাথে সেই সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে কৃষ্ণভাবনাময় হওয়া যায়। এই তিনটি পথের যে কোন একটিকে অবলম্বন করে সর্বান্তঃকরণে তার অনুশীলন করতে শুরু করলে এক সময় না এক সময় গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো যায়। *ভগবদ্গীতার* দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান আশ্বাস দিয়ে বলেছেন যে, পরমার্থ সাধনের পথে স্বল্প প্রচেষ্টাও জড় বন্ধন থেকে মুক্ত করে এবং মহৎ ভয়ের থেকে ত্রাণ করে। এই তিনটি পন্থার মধ্যে ভক্তিযোগই এই যুগের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী। কারণ, ভগবানকে জানবার জন্য এটিই হচ্ছে সবচেয়ে সহজ পথ। মন থেকে সমস্ত সংশয় দূর করার জন্য অর্জুন আবার

ভগবানকে সেই কথা জিজ্ঞেস করছেন। যথেষ্ট নিষ্ঠার সঙ্গে আমরা জ্ঞানযোগ ও অষ্টাঙ্গ-যোগের অনুশীলন করতে পারি। কিন্তু তাদের মাধ্যমে আত্মজ্ঞান লাভ করা এই কলিযুগে অত্যন্ত কঠিন। তাই, ঐকান্তিক চেষ্টা থাকলেও সিদ্ধি লাভ না হতেও পারে—নানা কারণে তার পদস্খলন হতে পারে। সর্বপ্রথমে, কেউ হয়ত যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে পন্থাটি অনুশীলন নাও করতে পারে। পরমার্থ সাধনে ব্রতী হওয়া মায়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করারই সামিল। অতএব, কেউ যখন জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে, তখন মায়া বা জড়া প্রকৃতি তাকে নানাভাবে প্রলোভিত করে বিপথগামী করার চেষ্টা করে। বদ্ধ জীব এমনিতেই জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা মুগ্ধ হয়ে আছে, তাই পরমার্থ সাধন করার সময় পুনরায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। একে বলা হয় *যোগাচ্চলিতমানসঃ*—যোগের পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়া। এভাবেই যোগভ্রষ্ট হয়ে পড়লে তার পরিণাম কি হয় তা জানতে অর্জুন উৎসুক।

শ্লোক ৩৮

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি ।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮ ॥

কচ্চিৎ—কি; **ন**—না; **উভয়**—উভয়; **বিভ্রষ্টঃ**—ভ্রষ্ট; **ছিন্ন**—ছিন্ন; **অভ্রম্**—মেঘ; **ইব**—মতো; **নশ্যতি**—নষ্ট হয়; **অপ্রতিষ্ঠঃ**—নিরাশ্রয়; **মহাবাহো**—হে মহাবীর কৃষ্ণ; **বিমূঢ়ঃ**—বিমূঢ়; **ব্রহ্মণঃ**—ব্রহ্ম লাভের; **পথি**—পথে।

গীতার গান

উভয় ভ্রষ্ট ছিন্নাভ্র মতো সর্বনাশ ।
বিমূঢ় ব্রহ্মের পথে কিবা তার আশ ॥
মহাবাহো! এ সংশয় করহ ছেদন ।
ঘুচাও আপনি সেই মনের বেদন ॥

অনুবাদ

হে মহাবাহো কৃষ্ণ! কর্ম ও যোগ হতে ভ্রষ্ট ব্যক্তি ব্রহ্ম লাভের পথ থেকে বিমূঢ় হয়ে যে আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে, সে কি ছিন্ন মেঘের মতো একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে?

তাৎপর্য

দুটি পথ ধরে এগোনো যায়। যারা বিষয়াসক্ত, তারা পরমার্থ নিয়ে মাথা ঘামায় না। তাই তারা অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করে জড় বিষয় ভোগ করতে তৎপর, অথবা যথোচিত কর্ম অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে স্বর্গলোকে উত্তীর্ণ হওয়ার প্রয়াসী। কেউ যখন পারমার্থিক পথ অবলম্বন করে, তখন তাকে সব রকম বৈষয়িক কর্ম পরিত্যাগ করতে হয় এবং সব রকম জড় সুখভোগের বাসনা পরিত্যাগ করতে হয়। এই পরমার্থ সাধনে তিনি যদি সফল না হন, তখন আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, তিনি দুই দিকই হারালেন—তিনি জড় সুখভোগ করতে পারলেন না, আর পারমার্থিক সিদ্ধিও লাভ করতে পারলেন না। তিনি যেন বায়ু তাড়িত মেঘের মতোই ছন্নছাড়া। আকাশে অনেক সময় এক টুকরা মেঘ একটি ছোট মেঘ থেকে সরে গিয়ে একটি বড় মেঘের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু সে যদি সেই বড় মেঘটির সঙ্গে যুক্ত হতে না পারে; তা হলে সে বায়ুর দ্বারা বিতাড়িত হয়ে অসীম আকাশে হারিয়ে যায়। *ব্রহ্মণঃ পথি* কথাটির অর্থ হচ্ছে পরমার্থ সাধনের পথ, যার অনুশীলনের ফলে উপলব্ধি হয় যে, জীবের প্রকৃত স্বরূপ হচ্ছে তার আত্মা। এই আত্মা হচ্ছে সেই পরমেশ্বরের অংশ, যিনি ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানরূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম-তত্ত্বের পূর্ণ প্রকাশ; তাই তাঁর চরণে যিনি প্রপত্তি করেছেন, তিনিই হচ্ছেন সার্থক পরমার্থবাদী। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা উপলব্ধির মাধ্যমে জীবনের পরম লক্ষ্যে পৌঁছাতে গেলে বহু বহু জন্মের প্রচেষ্টার ফলে সম্ভব হতে পারে—*বহূনাং জন্মনামন্তে*। তাই পরমার্থ সাধনের পরম শ্রেষ্ঠ পথ হচ্ছে ভক্তিযোগ বা কৃষ্ণভাবনামৃত, যার ফলে আমরা সরাসরিভাবে জানতে পারি—ভগবান কে? শ্রীকৃষ্ণ কে? তাঁর সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক?

শ্লোক ৩৯

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯ ॥

এতৎ—এই; **মে**—আমার; **সংশয়ম্**—সংশয়; **কৃষ্ণ**—হে কৃষ্ণ; **ছেত্তুম্**—দূর করতে; **অর্হসি**—তুমি সমর্থ; **অশেষতঃ**—সর্বতোভাবে; **ত্বৎ**—তুমি ছাড়া; **অন্যঃ**—অন্য কেউ; **সংশয়স্য**—সংশয়ের; **অস্য**—এই; **ছেত্তা**—ছেদনকারী; **ন**—না; **হি**—অবশ্যই; **উপপদ্যতে**—পাওয়া যাবে।

গীতার গান

তুমি কৃষ্ণ সে স্বয়ং সব কিছু জান।
তুমি বিনা ছেত্তা কিবা আছে আর আন ॥

অনুবাদ

হে কৃষ্ণ! তুমিই কেবল আমার এই সংশয় দূর করতে সমর্থ। কারণ, তুমি ছাড়া আর কেউই আমার এই সংশয় দূর করতে পারবে না।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত। *ভগবদ্গীতার* প্রারম্ভে ভগবান বলেছেন যে, প্রতিটি জীবই তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এমন কি, জড় বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করার পরেও তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকবে। এভাবেই তিনি প্রতিটি জীবের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলে দিয়েছেন। এখন, অর্জুন তাঁর কাছ থেকে জানতে চাইছেন, যে সমস্ত সাধকেরা তাঁদের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে পারলেন না, তাঁদের কি পরিণতি হবে? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষ, তাঁর ঊর্ধ্বে আর কেউ নেই, এমন কি তাঁর সমকক্ষও কেউ হতে পারে না। তথাকথিত সমস্ত জ্ঞানী ও দার্শনিকেরা, যারা প্রকৃতির কৃপার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল, তারাও কখনও ভগবানের সমকক্ষ হতে পারে না। তাই, আমাদের সমস্ত সন্দেহ নিরসনের জন্য ভগবানের মুখনিঃসৃত বাণীই হচ্ছে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সূত্র, কারণ তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবগত, কিন্তু তাঁকে কেউ কখনও সম্পূর্ণরূপে জানতে পারে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তেরাই যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ।

শ্লোক ৪০

শ্রীভগবানুবাচ
পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **পার্থ**—হে পৃথাপুত্র; **নৈব**—কখনও এই রকম হয় না; **ইহ**—এই জড় জগতে; **ন**—না; **অমুত্র**—পরলোকে; **বিনাশঃ**

—বিনাশ; **তস্য**—তার; **বিদ্যতে**—বিদ্যমান; **ন**—না; **হি**—যেহেতু; **কল্যাণকৃৎ**—শুভ অনুষ্ঠানকারী; **কশ্চিৎ**—কেউই; **দুর্গতিম্**—দুর্গতি; **তাত**—হে বৎস; **গচ্ছতি**—প্রাপ্ত হয়।

গীতার গান

শ্রীভগবান কহিলেন ঃ

হে পার্থ! শুনহ তুমি সে রূপ তাহার ।
একজন্মে নহে সিদ্ধ বিপত্তি অপার ॥
তাহারও নাহি নাশ ইহ বা অমুত্র ।
কল্যাণ কার্য যে সেই বিজয় সর্বত্র ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে পার্থ! শুভানুষ্ঠানকারী পরমার্থবিদের ইহলোকে ও পরলোকে কোন দুর্গতি হয় না। হে বৎস! তার কারণ, কল্যাণকারীর কখনও অধোগতি হয় না।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৫/১৭) শ্রীনারদ মুনি ব্যাসদেবকে নির্দেশ দিয়েছেন—

ত্যক্ত্বা স্বধর্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্বোঽথ পতেত্ততো যদি ।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্মতঃ ॥

"কেউ যদি সব রকম জড়-জাগতিক কর্তব্য পরিত্যাগ করে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হয়, তা হলে তার কোন রকম ক্ষতি বা পতনরূপী অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকে না। পক্ষান্তরে, সর্বতোভাবে স্বধর্মাচরণে রত অভক্তের কোনই লাভ হয় না।" জাগতিক উন্নতির জন্য নানা রকম শাস্ত্রোক্ত ও প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠান আছে। কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করবার জন্য পরমার্থ সাধককে এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ করতে হয়। তর্কের খাতিরে কেউ বলতে পারে যে, ভগবদ্ভক্তি সাধনের পথে সিদ্ধি লাভ করলে পরমার্থ সাধিত হতে পারে, কিন্তু যদি সিদ্ধি লাভ না হয় তা হলে তার জাগতিক জীবন ও পারমার্থিক জীবন উভয়ই বিফলে

যায়। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, শাস্ত্রের বিধান অনুসারে স্বধর্মের আচরণ না করলে তাকে সেই পাপের ফল ভোগ করতে হয়; তাই কেউ যদি যথাযথভাবে পরমার্থ সাধনে ব্যর্থ হয়, তা হলে শাস্ত্র নির্দেশিত স্বধর্ম আচরণ না করার জন্য তার ফল ভোগ করতে হয়। এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে আমাদের সংশয় দূর করবার জন্য *শ্রীমদ্ভাগবত* অসফল পরমার্থবাদীকে এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে, এক জীবনে পরমার্থ সাধনে সিদ্ধি লাভ না করতে পারলেও তাতে দুশ্চিন্তা করার কোন কারণ নেই। এমন কি যদিও স্বধর্ম যথাযথভাবে অনুষ্ঠান না করার জন্য তিনি তাঁর প্রতিক্রিয়ার অধীন হলেও, তাঁর ক্ষতির কোন কারণ নেই। কারণ, শুভ কৃষ্ণভাবনামৃত কখনও বিফলে যায় না এবং পরবর্তী জীবনে কেউ যদি অত্যন্ত নীচ বংশেও জন্মগ্রহণ করেন, তা হলেও তিনি ভগবদ্ভক্তির মার্গ থেকে বিচ্যুত হন না। পক্ষান্তরে, কেউ যদি একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে স্বধর্মের আচার অনুষ্ঠান করে, কিন্তু অন্তরে যদি ভগবদ্ভক্তি না থাকে, তা হলে তার কোনই কল্যাণ হয় না।

এই তাৎপর্যে আমরা বুঝতে পারি যে, মানুষকে দুভাগে ভাগ করা যায়—সংযত ও উচ্ছৃঙ্খল। যে সমস্ত মানুষ পরজন্মের কথা বিবেচনা না করে, পারমার্থিক মুক্তির কথা বিবেচনা না করে, কেবল পশুর মতো তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করার চেষ্টা করে, তারা উচ্ছৃঙ্খল পর্যায়ভুক্ত। আর যারা শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জীবন যাপন করে, তারা সংযত পর্যায়ভুক্ত। যারা উচ্ছৃঙ্খল, তারা উন্নত হোক বা অনুন্নতই হোক, সভ্য হোক বা অসভ্যই হোক, শিক্ষিত হোক বা অশিক্ষিতই হোক, শক্তিশালী হোক অথবা দুর্বলই হোক, তারা সকলেই পাশবিক প্রবৃত্তির দ্বারা প্রভাবিত। তাদের ক্রিয়াকলাপ কখনও মঙ্গলজনক হয় না, কারণ আহার, নিদ্রা, ভয় আর মৈথুনের মাধ্যমে পশুর মতো ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করে সুখের অন্বেষণ করার ফলে তারা চিরকালই দুঃখময় জড় জগতে পড়ে থাকে এবং নিরন্তর দুঃখকষ্ট ভোগ করে। পক্ষান্তরে, যাঁরা শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী সংযত জীবন যাপন করে ক্রমান্বয়ে কৃষ্ণভক্তির পর্যায়ে উন্নীত হন, তাঁদের জন্ম হয় সার্থক।

যাঁরা মঙ্গলজনক সংযত জীবন যাপন করেন, তাঁদের আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়। ১) 'কর্মী'—যাঁরা শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করে জাগতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করছেন। ২) 'মুক্তিকামী'—যাঁরা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছেন এবং ৩) 'ভগবদ্ভক্ত'—যাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে সর্বতোভাবে আত্মোৎসর্গ করে তাঁর সেবায় নিয়োজিত হয়েছেন। শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করে চলেছেন যে সমস্ত কর্মী, তাঁদের আবার দুভাগে ভাগ করা যায়—'সকাম কর্মী' ও 'নিষ্কাম কর্মী'। ধর্ম আচরণ করার প্রভাবে অর্জিত

পুণ্যফলের বলে যাঁরা জড় সুখভোগ করতে চান, তাঁরা উন্নত জীবন প্রাপ্ত হন, এমন কি তাঁরা স্বর্গলোকও প্রাপ্ত হন। কিন্তু জড় সুখভোগ করার বাসনায় আসক্ত থাকার ফলে তাঁরা যথার্থ মঙ্গলজনক পথ অনুসরণ করছেন না। জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টাই হচ্ছে মঙ্গলজনক কার্যকলাপ। পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার উদ্দেশ্যে অথবা দেহাত্মবুদ্ধি থেকে জীবকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে যে কর্ম সাধিত হয় না, তা কোন মতেই মঙ্গলজনক নয়। কৃষ্ণভাবনাময় কর্মই হচ্ছে একমাত্র মঙ্গলময় কর্ম। এই কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তিযোগের পথে প্রগতির জন্য যিনি স্বেচ্ছায় সব রকম শারীরিক অসুবিধাগুলিকে সহ্য করেন, তিনি নিঃসন্দেহে তপোনিষ্ঠ পূর্ণযোগী। অষ্টাঙ্গ-যোগেরও পরম উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করা, তাই এই প্রচেষ্টাও অত্যন্ত মঙ্গলজনক এবং যিনি এই মার্গে ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন, তাঁরও কোন রকম অধঃপতনের সম্ভাবনা নেই।

শ্লোক ৪১

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥ ৪১ ॥

প্রাপ্য—লাভ করে; **পুণ্যকৃতাম্**—পুণ্যবানদের; **লোকান্**—লোকসমূহ; **উষিত্বা**—বাস করে; **শাশ্বতীঃ**—বহু; **সমাঃ**—বৎসর; **শুচীনাম্**—সদাচারী; **শ্রীমতাম্**—ধনীর; **গেহে**—গৃহে; **যোগভ্রষ্টঃ**—যোগ থেকে বিচ্যুত ব্যক্তি; **অভিজায়তে**—জন্মগ্রহণ করেন।

গীতার গান

যদিবা হইল ভ্রষ্ট যোগের সাধনে ।
তথাপি সে পায় সেই যাহা পুণ্যবানে ॥
উত্তম ব্রাহ্মণ ধনী বণিকের ঘরে ।
যোগভ্রষ্ট জন্ম লয় বিধির বিচারে ॥

অনুবাদ

যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যবানদের প্রাপ্য স্বর্গাদি লোকসমূহে বহুকাল বাস করে সদাচারী ব্রাহ্মণদের গৃহে অথবা শ্রীমান ধনী বণিকদের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।

তাৎপর্য

যোগভ্রষ্ট যোগী দুই প্রকারের—এক শ্রেণী হচ্ছেন যাঁরা অল্প সাধনার পর পতিত হয়েছেন, আর অপর শ্রেণী হচ্ছেন যাঁরা দীর্ঘকাল যোগাভ্যাস করার পর ভ্রষ্ট হয়েছেন। অল্প সাধনার পর যাঁরা পতিত হয়েছেন, তাঁরা উচ্চতর লোকে যান, যেখানে পুণ্যবানেরা প্রবেশ করার অধিকার লাভ করেন। সেখানে দীর্ঘকাল নানা রকম সুখভোগ করার পরে তাঁরা আবার এই জগতে ফিরে আসেন এবং সৎ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব অথবা ধনী বণিকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন।

যোগসাধন করার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনার অমৃত লাভ করা, যা এই অধ্যায়ের শেষ শ্লোকটিতে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এই রকমের লক্ষ্যে পৌঁছাবার আগেই যদি কেউ মোহিনী মায়ার প্রভাবে ভ্রষ্ট হন, তা হলে ভগবানের কৃপায় তাঁরা তাঁদের জাগতিক কামনা-বাসনার তৃপ্তিসাধন করার পূর্ণ সুযোগ পান এবং তারপর ধার্মিক অথবা সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এই ধরনের সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করার ফলে তাঁরা ভগবদ্ভক্তি লাভ করার সুযোগ পান। তাই, তাঁরা ধার্মিক ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন, পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ করে তাঁদের ভগবদ্ভক্তি সাধনে ব্রতী হওয়া উচিত।

শ্লোক ৪২

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্ ।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২ ॥

অথবা—অথবা; **যোগিনাম্**—যোগিদের; **এব**—অবশ্যই; **কুলে**—বংশে; **ভবতি**—জন্মগ্রহণ করেন; **ধীমতাম্**—জ্ঞানবান; **এতৎ**—এই; **হি**—অবশ্যই; **দুর্লভতরম্**—অত্যন্ত দুর্লভ; **লোকে**—এই জগতে; **জন্ম**—জন্ম; **যৎ**—যে; **ঈদৃশম্**—এই প্রকার।

গীতার গান

অথবা যোগীর কুলে তার জন্ম হয় ।
দুর্লভ সে সব জন্ম কিবা তার ভয় ॥
সে সব দুর্লভ জন্ম যদি কেহ পায় ।
তারপর সঙ্গ দোষে যদি না ভ্রময় ॥

অনুবাদ

অথবা যোগভ্রষ্ট পুরুষ জ্ঞানবান যোগিগণের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই প্রকার জন্ম এই জগতে অবশ্যই অত্যন্ত দুর্লভ।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ভগবান যোগী এবং পরমার্থবাদী সাধকের কুলে জন্ম হওয়ার প্রশংসা করেছেন। কারণ, এই কুলে জন্ম হওয়ার ফলে জীবনের শুরু থেকেই পরমার্থ সাধনের প্রেরণা লাভ করা যায়, বিশেষ করে আচার্য অথবা গোস্বামী পরিবারে জন্ম হওয়ার ফলে। পরম্পরা এবং শিক্ষার প্রভাবে এই কুল বিদ্বান ও ভক্তিযুক্ত হয়, তাই তাঁরা গুরুপদ প্রাপ্ত হতেন। ভারতবর্ষে এই রকম বহু আচার্য পরিবার আছে, কিন্তু যথেষ্ট শিক্ষা ও সংযমের অভাবে তারা অধঃপতিত হয়েছে। ভগবানের কৃপার ফলে কোন কোন পরিবারে পুরুষানুক্রমে সাধক উৎপন্ন হয়। এই রকম পরিবারে জন্ম লাভ করা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের আচার্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ ও আমি স্বয়ং এই রকম পরিবারে জন্ম লাভ করেছি এবং জীবনের প্রারম্ভেই আমরা ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। দৈব বিধান অনুসারে পরবর্তীকালে আমরা মিলিত হয়েছি।

শ্লোক ৪৩

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্ ।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩ ॥

তত্র—তার ফলে; **তম্**—সেই; **বুদ্ধিসংযোগম্**—পরমাত্ম-বিষয়িণী বুদ্ধির সঙ্গে সংযোগ; **লভতে**—লাভ করেন; **পৌর্ব**—পূর্ব; **দেহিকম্**—জন্মকৃত; **যততে**—যত্ন করেন; **চ**—ও; **ততঃ**—তারপর; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **সংসিদ্ধৌ**—সিদ্ধি লাভের জন্য; **কুরুনন্দন**—হে কুরুপুত্র।

গীতার গান

বুদ্ধির সংযোগে পূর্ব দেহে যে সাধিল ।
হে কুরুনন্দন জান সেই নিশ্চয়ই বুঝিল ॥

তবে বুদ্ধিমান করে পুনঃ যোগের সাধন ।
দৃঢ় চেষ্টা করি যোগী পুনঃ সিদ্ধ হন ॥

অনুবাদ

হে কুরুনন্দন! সেই প্রকার জন্মগ্রহণ করার ফলে তিনি পুনরায় তাঁর পূর্ব জন্মকৃত পারমার্থিক চেতনার বুদ্ধিসংযোগ লাভ করে সিদ্ধি লাভের জন্য পুনরায় যত্নবান হন।

তাৎপর্য

পূর্ব জন্মের সুকৃতি অনুসারে সৎ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে পারমার্থিক চেতনার বিকাশ করার খুব সুন্দর দৃষ্টান্ত আমরা পাই মহারাজ ভরতের মাধ্যমে। মহারাজ ভরত ছিলেন সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর এবং তাঁরই নামানুসারে স্বর্গের দেবতাদের কাছেও এই গ্রহের নাম হয় ভারতবর্ষ। পূর্বে নাম ছিল ইলাবৃতবর্ষ। পারমার্থিক সিদ্ধি লাভ করবার জন্য ভরত মহারাজ খুব অল্প বয়সে সংসার ত্যাগ করেন কিন্তু তিনি সিদ্ধি লাভে অক্ষম হন। পরবর্তী জীবনে তিনি এক সৎ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। কোন মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতেন না এবং কারও সঙ্গে কথা বলতেন না বলে তাঁর নাম হয় জড় ভরত। পরবর্তীকালে মহারাজ রহূগণ তাঁর সঙ্গে কথোপকথন করার মাধ্যমে জানতে পারেন যে, তিনি পরম ভাগবত। জড় ভরতের জীবনের মাধ্যমে আমরা অনায়াসে বুঝতে পারি যে, পারমার্থিক সাধনা বা যোগসাধনা কখনই বিফলে যায় না। ভগবানের কৃপার ফলে পরমার্থ সাধকেরা কৃষ্ণভাবনায় সিদ্ধি লাভ করবার জন্য বারবার সুযোগ পান।

শ্লোক ৪৪

পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে ॥ ৪৪ ॥

পূর্ব—পূর্ব; **অভ্যাসেন**—অভ্যাসের দ্বারা; **তেন**—সেভাবে; **এব**—অবশ্যই; **হ্রিয়তে**—আকৃষ্ট হন; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অবশঃ**—অবশ হয়ে; **অপি**—ও; **সঃ**—তিনি; **জিজ্ঞাসুঃ**—জানতে ইচ্ছুক; **অপি**—এমন কি; **যোগস্য**—যোগের; **শব্দব্রহ্ম**—বেদোক্ত কর্মমার্গ; **অতিবর্ততে**—অতিক্রম করেন।

গীতার গান

স্বাভাবিক ভাবে সেই ইচ্ছার উদ্যম ।
আকৃষ্ট হইয়া করে সে কার্যে উদ্যম ॥
জিজ্ঞাসু যদি বা হয় যোগের বিষয় ।
তথাপি সে কর্মকাণ্ড অতীত তরয় ॥

অনুবাদ

তিনি পূর্ব জন্মের অভ্যাস বশে যেন অবশ হয়ে যোগ-সাধনের প্রতি আকৃষ্ট হন। এই প্রকার যোগশাস্ত্রের জিজ্ঞাসু পুরুষ বেদোক্ত সকাম কর্মমার্গকে অতিক্রম করেন, অর্থাৎ সকাম কর্মমার্গে যে ফল নির্দিষ্ট আছে, তার থেকে উৎকৃষ্ট ফল লাভ করেন।

তাৎপর্য

উচ্চ স্তরের যোগীরা *বেদের* কর্মকাণ্ডের প্রতি আকৃষ্ট নন, কিন্তু তাঁরা স্বাভাবিক ভাবেই যোগ-পদ্ধতির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন, যা তাঁদের কৃষ্ণভাবনামৃতের স্তরে উন্নীত করে। এই কৃষ্ণভাবনামৃতই হচ্ছে পরমার্থ সাধনের সর্বোচ্চ স্তর। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৩/৩৩/৭) বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রতি উন্নত পরমার্থবাদীর নিরাসক্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্ ।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥

"হে ভগবান! চণ্ডালকুলে জন্মগ্রহণ করেও যদি কেউ তোমার অপ্রাকৃত নাম কীর্তন করেন, তবে বুঝতে হবে যে, তিনি পারমার্থিক জীবনে অত্যন্ত উন্নত। যিনি ভগবানের নাম করেন, তিনি নিঃসন্দেহে ইতিপূর্বেই সব রকমের তপশ্চর্যা, যাগ-যজ্ঞ, তীর্থস্নান ও শাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপ্ত করেছেন।"

এই সম্বন্ধে একটি খুব সুন্দর দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঠাকুর হরিদাস, যাঁকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অন্যতম পার্ষদরূপে গ্রহণ করেছিলেন। যদিও হরিদাস ঠাকুর যবনকুলে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে নামাচার্যরূপে ভূষিত করেছিলেন, কেন না তিনি একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তিন লক্ষ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে জপ করেছিলেন। যেহেতু তিনি নিরন্তর ভগবানের নাম কীর্তন করতেন, এর থেকে বোঝা যায় যে, পূর্ব জন্মে তিনি *শব্দব্রহ্ম* নামক বৈদিক কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান পূর্ণরূপে সম্পন্ন করেছিলেন। অতএব শুদ্ধ না হলে ভগবদ্ভক্তি লাভ করা যায় না এবং ভগবানের অপ্রাকৃত নাম সমন্বিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করা যায় না।

শ্লোক ৪৫

প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৪৫ ॥

প্রযত্নাৎ—যত্ন অপেক্ষা; **যতমানঃ**—যত্নবান; **তু**—কিন্তু; **যোগী**—এই প্রকার যোগী; **সংশুদ্ধ**—বিশুদ্ধ; **কিল্বিষঃ**—সর্বপ্রকার পাপ; **অনেক**—বহু; **জন্ম**—জন্ম; **সংসিদ্ধঃ**—সিদ্ধি লাভ করে; **ততঃ**—তারপর; **যাতি**—লাভ করেন; **পরাম্**—পরম; **গতিম্**—গতি।

গীতার গান

যত্নমাত্র করি যোগী কার্যসিদ্ধি করে ।
জন্ম-জন্মান্তরে সিদ্ধ ভবার্ণব তরে ॥

অনুবাদ

যোগী ইহজন্মে পূর্বজন্মকৃত যত্ন অপেক্ষা অধিকতর যত্ন করে পাপ মুক্ত হয়ে পূর্ব পূর্ব জন্মের সাধন সঞ্চিত সংস্কার দ্বারা সিদ্ধি লাভ করে পরম গতি লাভ করেন।

তাৎপর্য

ধর্মপরায়ণ, সম্ভ্রান্ত ও পবিত্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করার ফলে মানুষ পরমার্থ সাধন করবার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন। তিনি দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে তাঁর অসম্পূর্ণ সাধনাকে পূর্ণ করতে প্রয়াসী হন এবং এভাবেই সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে তিনি কৃষ্ণভাবনা লাভ করেন। কৃষ্ণভাবনাই হচ্ছে জড় কলুষ থেকে মুক্ত হওয়ার প্রকৃষ্ট পন্থা। এই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৭/২৮) বলা হয়েছে—

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্ ।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥

"জন্ম-জন্মান্তরের বহু পুণ্যকর্মের ফলে কেউ যখন পাপ ও জড় জগতের মোহময় দ্বন্দ্ব থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত হন, তখন তিনি দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন।"

শ্লোক ৪৬

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জুন ॥ ৪৬ ॥

তপস্বিভ্যঃ—তপস্বীদের চেয়ে; **অধিকঃ**—শ্রেষ্ঠ; **যোগী**—যোগী; **জ্ঞানিভ্যঃ**—জ্ঞানীদের চেয়ে; **অপি**—ও; **মতঃ**—মত; **অধিকঃ**—শ্রেষ্ঠ; **কর্মিভ্যঃ**—সকাম কর্মীদের চেয়ে; **চ**—ও; **অধিকঃ**—শ্রেষ্ঠ; **যোগী**—যোগী; **তস্মাৎ**—অতএব; **যোগী**—যোগী; **ভব**—হও; **অর্জুন**—হে অর্জুন।

গীতার গান

তপস্বী সে যত আছে, সব নিম্ন যোগী কাছে,
জ্ঞানী নহে তার সমতুল্য ।
কর্মীর কি কথা আর, কোথায় তুলনা তার,
হে অর্জুন! যোগী হও যোগ্য ॥

অনুবাদ

যোগী তপস্বীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং সকাম কর্মীদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। অতএব, হে অর্জুন! সর্ব অবস্থাতেই তুমি যোগী হও।

তাৎপর্য

যোগের অর্থ হচ্ছে পরম-তত্ত্বের সঙ্গে চেতনের সংযোগ। বিভিন্ন পন্থা অনুসারে এই যোগকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। কর্মের মাধ্যমে যখন চেতনাকে ভগবানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়, তখন তাকে বলা হয় কর্মযোগ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে যখন ভগবানকে জানবার চেষ্টা করা হয়, তখন তাকে বলা হয় জ্ঞানযোগ এবং ভক্তির মাধ্যমে যখন ভগবানের সঙ্গে জীবের নিত্য সম্পর্কের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়, তখন তাকে বলা হয় ভক্তিযোগ। সমস্ত যোগের চরম পরিণতি বা পরম পূর্ণতা হচ্ছে ভক্তিযোগ বা কৃষ্ণভাবনা। সেই কথা পরবর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে ভগবান যোগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছেন, কিন্তু তিনি কখনই বলেননি যে, এই যোগ ভক্তিযোগের থেকে শ্রেয়। ভক্তিযোগ হচ্ছে পরম তত্ত্বজ্ঞান এবং তাকে কোন কিছুই অতিক্রম করতে পারে না। আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত তপশ্চর্যার কোন তাৎপর্য নেই। ভগবানে শরণাগতি না হলে গবেষণামূলক জ্ঞানও সম্পূর্ণ নিরর্থক। আর কৃষ্ণভাবনা-বিহীন সকাম কর্ম কেবল সময় নষ্ট করারই নামান্তর। তাই, সমস্ত যোগের মধ্যে ভক্তিযোগকেই শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করা হয়। পরবর্তী শ্লোকে তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

শ্লোক ৪৭

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা ।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭ ॥

যোগিনাম্—যোগীদের; **অপি**—ও; **সর্বেষাম্**—সর্বপ্রকার; **মদ্‌গতেন**—আমাতেই আসক্ত; **অন্তরাত্মনা**—অন্তরে সব সময় আমার কথা চিন্তা করে; **শ্রদ্ধাবান্**—পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে; **ভজতে**—ভজনা করেন; **যঃ**—যিনি; **মাম্**—আমাকে (পরমেশ্বর ভগবানকে); **সঃ**—তিনি; **মে**—আমার; **যুক্ততমঃ**—সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; **মতঃ**—অভিমত।

গীতার গান

যত যোগী প্রকার সে শাস্ত্রেতে নির্ণয় ।
তার মধ্যে মদ্‌গতপ্রাণ যেবা কেহ হয় ॥
সবার সে শ্রেষ্ঠ যোগী জানিহ নিশ্চয় ।
শ্রদ্ধাবান যদি সেই আমারে ভজয় ॥

অনুবাদ

যিনি শ্রদ্ধা সহকারে মদ্‌গত চিত্তে আমার ভজনা করেন, তিনিই সবচেয়ে অন্তরঙ্গভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত এবং তিনিই সমস্ত যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সেটিই আমার অভিমত।

তাৎপর্য

এখানে ভজতে শব্দটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ভজ্ ধাতু থেকে এই শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। 'সেবা' অর্থে এই শব্দটি ব্যবহার হয়ে থাকে। পূজা করা এবং ভজনা করা—এই দুটি শব্দের অর্থ এক নয়। পূজা করার অর্থ পূজ্য ব্যক্তিকে অভিবাদন করা। কিন্তু ভজনা করার অর্থ হচ্ছে প্রেম ও ভক্তি সহকারে সেবা করা, যা কেবল ভগবানেই প্রযোজ্য। পূজ্য ব্যক্তিকে অথবা দেবতাকে পূজা না করলে মানুষ কেবল শিষ্টাচারহীন অভদ্র বলে পরিগণিত হয়। কিন্তু ভক্তি ও ভালবাসার সঙ্গে ভগবানের সেবা না করা নিন্দনীয় অপরাধ। প্রতিটি জীবই হচ্ছে ভগবানের অপরিহার্য অংশ, তাই প্রতিটি জীবেরই ধর্ম হচ্ছে ভগবানের সেবা করা। তা না করার ফলেই তার অধঃপতন হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/৫/৩) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্ ।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥

"পরমেশ্বর ভগবানের ভজনা না করে, যে তার কর্তব্যে অবহেলা করে, সে অবধারিতভাবে ভ্রষ্ট হয়ে অধঃপতিত হয়।"

এই শ্লোকেও *ভজন্তি* কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের ক্ষেত্রেই কেবল *ভজন্তি* কথাটি প্রযোজ্য, কিন্তু 'পূজা' শব্দটি দেব-দেবী ও অন্যান্য মহৎ জীবের বেলায় ব্যবহার করা যেতে পারে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই শ্লোকের *অবজানন্তি* শব্দটির উল্লেখ *ভগবদ্গীতাতেও* পাওয়া যায়। *অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ*—"যারা অত্যন্ত মূঢ়, তারাই কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যথার্থভাবে জানতে না পেরে অবজ্ঞা করে।" ভগবানের প্রতি সেবার মনোবৃত্তি ছাড়াই এই সব মূঢ়রা *ভগবদ্গীতার* তাৎপর্য লেখার দায়িত্বভার গ্রহণ করে, তাই তারা *ভজন্তি* ও 'পূজা' এই শব্দ দুটির মধ্যে যে কি পার্থক্য তা নিরূপণ করতে পারে না।

সব রকমের যোগ-সাধনার চরম পরিণতি হচ্ছে ভক্তিযোগ। অন্যান্য সমস্ত যোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি বা ভক্তিযোগের স্তরে উন্নীত হওয়া। 'যোগ' বলতে প্রকৃতপক্ষে ভক্তিযোগকেই বোঝায়। আর অন্য সমস্ত যোগগুলি ক্রমান্বয়ে ভক্তিযোগেই যুক্ত হয়। কর্মযোগ থেকে শুরু করে ভক্তিযোগের শেষ পর্যন্ত আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভের এক সুদীর্ঘ পথ। নিষ্কাম কর্মযোগ থেকেই এই পথের শুরু। কর্মযোগের মাধ্যমে যখন জ্ঞান ও বৈরাগ্যের উদয় হয়, তখন সেই স্তরকে বলা হয় জ্ঞানযোগ। দৈহিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে যখন জ্ঞানযোগের সঙ্গে ধ্যান যুক্ত

হয়ে মনকে পরমাত্মার উপর একাগ্র করা হয়, তখন তাকে বলা হয় অষ্টাঙ্গযোগ। অষ্টাঙ্গ-যোগকে অতিক্রম করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়াই হচ্ছে ভক্তিযোগ। প্রকৃতপক্ষে, এই ভক্তিযোগই হচ্ছে চরম পরিণতি। কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ভক্তিযোগের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হলে অন্য সমস্ত যোগ সম্বন্ধে অবগত হতে হয়। যে যোগী প্রগতিশীল, তিনি পরমার্থ সাধনের পথে বিশেষ সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। কিন্তু প্রগতিবিহীন হয়ে কেউ যখন কোন এক স্তরে স্থির হয়ে পড়ে, তখন তাকে সেই বিশেষ স্তরের নামানুসারে কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী, ধ্যানযোগী, রাজযোগী, হঠযোগী আদি নামে অভিহিত করা হয়। পরম সৌভাগ্যের ফলে কেউ যখন ভক্তিযোগের স্তরে উন্নীত হন, তখন বুঝতে হবে যে, তিনি অন্য সব যোগের স্তর ইতিমধ্যেই অতিক্রম করেছেন। তাই, কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করে কৃষ্ণভক্ত হওয়াই যোগমার্গের সর্বোচ্চ শিখর। যেমন, আমরা যখন হিমালয় পর্বতের কথা বলি, তখন আমরা পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতমালা সম্পর্কে বলি, এই হিমালয়ের আবার সর্বোচ্চ শিখর হচ্ছে মাউন্ট এভারেস্ট।

অনেক সৌভাগ্যের ফলে মানুষ কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করে ভক্তিযোগের পথ অবলম্বন করে এবং বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী এই যোগ অনুশীলন করে। আদর্শ যোগী শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে মগ্ন থাকেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে শ্যামসুন্দর বলা হয়, কারণ তাঁর অঙ্গকান্তি জলভরা মেঘের মতো নীলাভ, তাঁর পদ্মের মতো মুখারবিন্দ সূর্যের মতো প্রফুল্লোজ্জ্বল, তাঁর বসন মণি-রত্নের দ্বারা বিভূষিত, তাঁর শ্রীঅঙ্গ ফুলমালায় সুশোভিত। তাঁর দিব্য অঙ্গকান্তি ব্রহ্মজ্যোতির সর্ব ঐশ্বর্যময়ী প্রভায় সর্বদিক উদ্ভাসিত। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীনৃসিংহদেব, শ্রীবরাহদেব এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে তিনি অবতরণ করেন। তিনি হচ্ছেন সমস্ত অবতারের অবতারী—তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তিনি মাতা যশোদার নন্দনরূপে সাধারণ মানুষের মতো আবির্ভূত হন এবং শ্রীকৃষ্ণ, গোবিন্দ, বাসুদেব আদি নামে পরিচিত হন। তিনি হচ্ছেন আদর্শ সন্তান, আদর্শ পতি, আদর্শ সখা, আদর্শ প্রভু। তিনি সমস্ত ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ এবং অপ্রাকৃত গুণাবলীতে বিভূষিত। ভগবানের এই স্বরূপ যিনি সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছেন, তিনিই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ যোগী।

যোগের সর্বোচ্চ সিদ্ধির এই স্তর লাভ হয় ভক্তিযোগের মাধ্যমে, যা বৈদিক শাস্ত্রে প্রতিপন্ন হয়েছে—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

"যে সমস্ত মহাত্মারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও গুরুদেবের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি লাভ করেছেন, তাঁদের কাছে সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সম্পূর্ণ তাৎপর্য প্রকাশিত হয়।"

(*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* ৬/২৩)

ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুষ্মিন্ মনঃকল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্যম্। "ভক্তি মানে হচ্ছে লৌকিক অথবা পারলৌকিক সব রকম বিষয়-বাসনা রহিত ভগবৎ-সেবা। বিষয়-বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে মনকে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় পূর্ণরূপে তন্ময় করা। সেটিই হচ্ছে নৈষ্কর্মের উদ্দেশ্য।"

(*গোপালতাপনী উপনিষদ* ১/১৫)

এগুলি হচ্ছে যোগপদ্ধতির সর্বোচ্চ সিদ্ধির স্তর—ভক্তিযোগ বা কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করার কয়েকটি উপায়।

ভক্তিবেদান্ত কহে শ্রীগীতার গান ।
শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ ॥

ইতি—ধ্যানযোগ নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়

বিজ্ঞান-যোগ

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **ময়ি**—আমাতে; **আসক্তমনাঃ**—অভিনিবিষ্ট চিত্ত; **পার্থ**—হে পৃথার পুত্র; **যোগম্**—যোগ; **যুঞ্জন্**—যুক্ত হয়ে; **মদাশ্রয়ঃ**—আমার ভাবনায় ভাবিত হয়ে (কৃষ্ণভাবনা); **অসংশয়ম্**—নিঃসন্দেহে; **সমগ্রম্**—সম্পূর্ণরূপে; **মাম্**—আমাকে; **যথা**—যেরূপে; **জ্ঞাস্যসি**—জানবে; **তৎ**—তা; **শৃণু**—শ্রবণ কর।

গীতার গান

শ্রীভগবান কহিলেন ঃ

আমাতে আসক্ত হয়ে যোগের সাধন ।
তোমারে কহিনু পার্থ সব এতক্ষণ ॥
সে যোগ আশ্রয় করি সমগ্র যে আমি ।
অসংশয় বুঝিবে যে অনিবার্য তুমি ॥